হিমালয়পারে

কৈলাস ও মানসসরোবর

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়
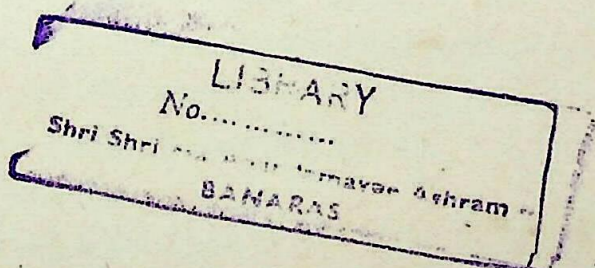
ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২
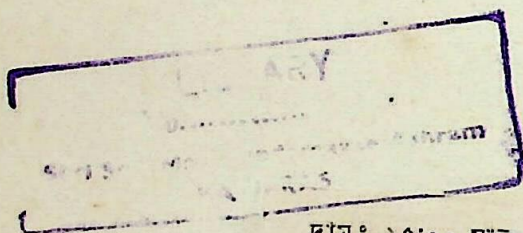
॥ শ্রীশ্রীপরমানন্দপুরী স্বামী ॥
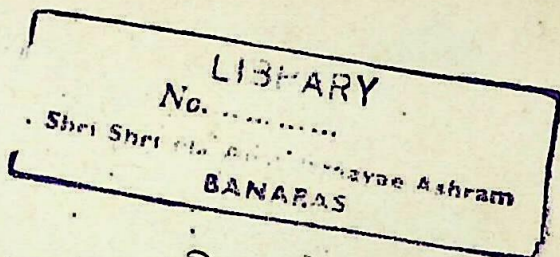
॥ গুরবে নমঃ ॥

সে এক তুঃসহ যাতনাময় জীবনপ্রবাহ।
যৌবনের সন্ধিক্ষণে, একদা যখন
গৃহসুখ স্বস্তি, শান্তিহারা পাগলের মত
প্রত্য . গুরুর লাগি, মর্ম্মে মর্ম্মে করি অনুভব
ছুটাছুটি করি হেথাসেথা, দেশময়, পথের সন্ধানে।
কোথা সে অদৃষ্ট ম—,
অস্থির আকুল চিত্ত শান্ত হবে যাঁহার পরশে।
তারপর,—দৈবযোগে একদিন,—বড়ই নিকটে—
পেয়ে গেনু বাঞ্ছিত দেবতা ;—মিলিল সন্ধান।
দরশনে তাঁর, তাঁরি উপদেশে, নিরমল প্রভাবে
আত্মচেতনার পথে, প্রাথমিক পাদক্ষেপে যাঁহার কৃপায় ;—
এবে স্বর্গত, সেই মূর্ত্তিমানপ্রীতি।
স্মরণে তাঁহার ; আজি এই ভ্রমণকাহিনী-গ্রন্থ মোর
সাহিত্যের প্রথম উদ্যম
সমর্পণ করি সেই রাজীব চরণে—।

কয়েকটি কথা

তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ করিলাম টনকপুরে রেলে উঠিয়া। পরদিন বৈকালে আউদলোহিলখণ্ডের প্রতাপগড় ষ্টেশনে সঙ্গী মহাশয়ের নিকট বিদায় লইয়া জ্বরগায়ে, পীড়িত এবং ভগ্নপদে এলাহাবাদে মাসিমার আশ্রয়ে পৌছাইয়া একটি মাস ভোগের পর সুস্থ হইলে সেইখানেই ভ্রমণকাহিনী লিখিতে আরম্ভ করি, সেটি ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস। উহা শেষ হইল ১৯১৮ সালের জুন মাসে,—প্রিয়তম বন্ধু এবং তখনকার একমাত্র সহায় মদনমোহনের কাশীপুর উদ্যান আশ্রমে। ছবিগুলি শেষ করিতে আরও দুই মাস লাগিয়াছিল। এইরূপে তখন, পঁয়ত্রিশখানি ছবির সঙ্গে সাড়ে তিন শত পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ হইল। তারপর যাহা হইয়া থাকে—দুর্ভাবনা, ইহা লইয়া কি করিব?

প্রথমে,—বিনয়ের অবতার এবং বিখ্যাত 'হিমালয়'-এর গ্রন্থকার প্রবীণ জলধর বাবুর কাছেই গেলাম। তিনি মহা উৎসাহে লেখাটি গ্রহণ করিলেন। তারপর এক সপ্তাহ পরে দেখা হইলে, বেশ হয়েচে, চমৎকার হয়েচে,—বলিয়া তাঁহার স্বভাবমূলক বিনয় এবং সন্তোষের পরিচয় দিলেন। শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশ করিতে অনুরোধও করিলেন। নানা কথা আলোচনার পর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শেষে বলিলেন যে (বর্দ্ধমানের) মহারাজ ত এখন দার্জ্জিলিং-এ, তিনি ফিরিয়া আসিলে ধরিয়া ছাপাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিতেন; এতই উৎসাহ তাঁহার। এইভাবে কিছুদিন গেল।

মনটা পড়িয়াছিল 'প্রবাসী'র পানে, যদি প্রবাসীতে বাহির হয় ত ধন্য হইব। কিন্তু অজ্ঞাত অখ্যাতনামা একজনের লেখা প্রবাসীর মত পত্রে স্থান পাইবে—ইহা দুরাশা। কোন গুণ নাই, প্রতিষ্ঠা নাই, কি বলিয়া দাঁড়াইব? তবুও একখানি রিপ্লাই-কার্ডে সকল কথা পরিষ্কার লিখিয়া শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবুকে পাঠাইয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম। ফেরত ডাকেই উত্তর আসিল, লেখাটি পড়িতে এবং ছবিগুলি দেখিতে পারিলে তিনি সুখী হইতেন কিন্তু তাঁহার সময় নাই। প্রবাসীর আশা ত এইখানেই শেষ হইল, এখন বাকি রহিল 'ভারতবর্ষ'।

স্বভাবতঃ শান্ত স্বল্প এবং স্পষ্টভাষী হরিদাসবাবু বলিলেন,—আগাগোড়া সব লেখাটা ভারতবর্ষে বাহির হইতে দুই বৎসর লাগিবে, তাহা পারিব না; —মাঝে মাঝে যে যে স্থান আমাদের ভাল লাগিবে, কোন কোন সংখ্যায় তাহা প্রকাশ করিতে পারি। তবে যে ছবিগুলি আমরা ব্লক করাইব সেগুলি আপনি বই ছাপাইবার সময় ব্যবহার করিতে পারিবেন।

কাজেই পাণ্ডুলিপিখানি একখানা খবরের কাগজে মুড়িয়া বইয়ের র‍্যাকের উপর রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিজ কর্ম্মে মনোনিবেশ করিলাম। তারপর ১৯২০ হইতে আট বৎসর দেশ-বিদেশে শিল্পচর্চ্চা করিয়া বেড়াইলাম। ইতিমধ্যে ১৯২২ সালে সঙ্গী-মহাশয়ের লেখা মাসিক বসুমতীতে বাহির হইয়া গেল;—তার পর পুস্তকও বাহির হইল। শেষে ১৯২৮ সালে দেশে ফিরিয়া আপন স্থানে আসিলাম। আর কোথাও যাইব না, দাসত্ব না করিয়া স্বাধীনভাবে দেশে বসিয়াই কাজ করিব। ইতিমধ্যে প্রবাসীর সঙ্গে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইয়াছে। অনেকগুলি ছবি এবং সেইসঙ্গে দেশবাসীর কাছে আমার শিল্প এবং কর্ম্মক্ষেত্রের পরিচয়-কথা প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। এখন কর্ম্মসূত্রে তাঁহাদের ওখানে যাতায়াত চলিতেছিল। একদিন কথা-প্রসঙ্গে কেদার বাবু আমায় ভ্রমণ-বৃত্তান্তের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং লেখাটি দেখিতে চাহিলেন। দশ বৎসর পরে লেখাটি বাহির করিয়া আমি তাঁহার হাতে দিয়া আসিলাম। তিনি উহা পাঠ করিয়া প্রীত হইলেন। —১৩৩৬ সালের বৈশাখ হইতে ধারাবাহিকভাবে প্রবাসীতে বাহির হইবে, পরে উহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলেন। দীর্ঘ দশটি বৎসর পর এইভাবে লেখাটির আশানুরূপ একটি গতি হইল।

প্রবাসীতে যাহা বাহির হইয়াছিল তাহা সংক্ষিপ্ত, এখন পুস্তকাকারে বাহির হইল সম্পূর্ণ। এখনকার দিনে এই আকারের চিত্রবহুল একখানি পুস্তক প্রকাশ করা কতটা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার তাহা অভিজ্ঞ সাধারণ বিশেষরূপেই বুঝিতে পারিবেন, সুতরাং যাহাতে আশু লাভবান হইবার সম্ভাবনা নাই এমনই একটি ব্যাপারের সংঘটন প্রকাশকের অনুগ্রহ ব্যতীত আমি ত আর কিছুই ভাবিতে পারি না। ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নাই।

গ্রন্থ প্রকাশের যোগাযোগ ব্যতীত ভ্রমণ ব্যাপারেও অনেকের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা-ঋণে বদ্ধ আছি। তাহার মধ্যে সরলপ্রাণ বন্ধুসর্ব্বস্ব,

সর্ব্বব্যাপারে উৎসাহশীল এবং পরহিত-ব্রতী মদনমোহন বর্ম্মণের কথা প্রথমেই মনে আসে। কারণ তাঁহার মুক্তহস্ত সাহায্য না পাইলে এ সুদূর তীর্থভ্রমণ সম্ভব হইত না। ১৯১২ হইতে ১৯২০, এই আটটি বৎসর তিনিই আমার নিকটতম বন্ধু, সহায় এবং একমাত্র অবলম্বন ছিলেন। তাঁহার ঋণ জীবনে পরিশোধ হইবার নয়। তার পর হিমালয়ের পথে যাঁহাদের ঘরে অতিথিরূপে প্রীতির অন্ন গ্রহণ করিয়া শরীর রক্ষা করিতে হইয়াছে। তাঁহাদের নিকটও আমার ঋণ কম নহে। বিশেষতঃ ধারচুলার স্বর্গীয় পণ্ডিত লোকমনিজী। মহৎপ্রাণ মানুষটি শুধু আতিথেয়তার জন্য নয়, উত্তর হিমালয় এবং তিব্বতে বাণিজ্য-সংক্রান্ত বাৎসরিক আমদানী-রপ্তানী মালের তালিকা তাঁহারই সাহায্যে প্রাপ্ত এবং গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তারপর আসকোট রাজওয়াড়ার কুমারগণ, লালসিং পাতিয়াল, রুমাদেবী এবং কিষণ সিং প্রভৃতি যাঁহারা হিমালয়ে এবং তিব্বতে আমাদের আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং দস্যুপ্রধান তিব্বতে আমাদের ধন প্রাণ রক্ষা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে যাত্রাটি সফল করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিতে সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদের কথা কি ভুলিবার? রুমার কথা গ্রন্থমধ্যে বলিয়াছি। আমরা ফিরিয়া আসিবার পর সে প্রথমে শীতকালে কলিকাতায় আসিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া প্রায় চার-পাঁচ মাস কাল বাগবাজারে নিবেদিতা আশ্রমে ছিল। পর বৎসর সে আবার আসে, তখনও তাহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। সে এখনও সেইরূপ সাধুসন্তদের সেবা করিয়া কখনও ধারচুলায় কখনও বা গারবিয়াংএ আপন আশ্রমে কাল কাটাইতেছে।

এটি ১৩৪১ সালের কথা। গত ১৩৫৯ সালের চৈত্রমাসে রুমা দেহত্যাগ করিয়াছে খবর পাইয়াছিলাম।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পী, সতীর্থ, যতীন্দ্রকুমার সেন মহাশয় গ্রন্থখানির প্রচ্ছদপট আঁকিয়াছেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত তাঁহার প্রীতির এই অবদানটি গ্রন্থের শিল্প-গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

সর্ব্বশেষে দুইটি বিষয়ে আমার বিশেষ ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। প্রথমটি এই,—তিব্বতে, কৈলাস অঞ্চলের কয়েকটি দেশাচার বা ব্যবহার এ দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিল থাকায় তাহা আমাদের বঙ্গদেশ হইতে ওখানে গিয়াছে এরূপ অনুমান এবং অভিমত প্রকাশ করিয়াছি। এখন

মডার্ন রিভিউ, আগষ্ট সংখ্যায় অধ্যাপক নগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের Home of Tantricism শীর্ষক যে সারগর্ভ প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে তন্ত্রধর্ম্ম, এবং তৎসংক্রান্ত অনেকগুলি আচার-ব্যবহার, যাহা বাংলায় এখনও প্রচলিত, উহা তিব্বতের কৈলাস অঞ্চল হইতেই এদেশে আসিয়াছে। ছাপার কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে সুতরাং এখন এ ত্রুটি সংশোধনের উপায় নাই। যাঁহারা, এই ভারতবর্ষ তথা বাংলা দেশেই তন্ত্রধর্ম্মের উৎপত্তি, এই ধারণা পোষণ করেন তাঁহারা ঐ প্রবন্ধটি পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন। দ্বিতীয় ত্রুটি এই যে, গ্রন্থ ছাপার সময়ে আমার উপর যে সকল কর্ম্মভার ছিল, তাহা সুচারুরূপে নির্ভুলভাবে সম্পাদন করিতে পারি নাই। এ কাজে অনভিজ্ঞ বলিয়াই নানাপ্রকার ভ্রম-ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য মনের মধ্যে আনন্দ পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে পারিতেছি না, কাজের মধ্যে খুঁত থাকিলে পূর্ণ আনন্দ পাওয়া যায় না।

শ্রদ্ধেয় সঙ্গী-মহাশয়ের সঙ্গে সংযোগ না ঘটিলে এ যাত্রায় আমার তীর্থ-ভ্রমণ যে সম্ভব হইত না, তাহা গ্রন্থমধ্যেই উল্লেখ করিয়াছি। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন, ইহাই প্রার্থনা। ইতি—

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

বালীগঞ্জ, কসবা
আশ্বিন, ১৩৪১ সাল।

॥ দ্বিতীয় সংস্করণের কথা ॥

যথাসম্ভব সংস্কৃত হইয়া দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল। প্রকাশক বদল হইয়াছে, আকৃতি এবং সৌষ্ঠব,—সকল দিকেই উন্নত হইয়াছে;—ব্যয়সাধ্য হইলেও যাহা কিছু ঘটিয়াছে প্রকাশকের গুণ। এ অবস্থায় মূল্যবৃদ্ধি স্বাভাবিক।

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

৭৭, রসা রোড, সাউথ
টালীগঞ্জ।

॥ তৃতীয় সংস্করণের কথা ॥

হিমালয়পারে কৈলাস ও মানসসরোবরের তৃতীয় সংস্করণ বর্ধিত কলেবরে মুদ্রিত হইল।

আমি যে সময়ে হিমালয়ে তীর্থভ্রমণে গিয়াছিলাম সেই সময়ের চেয়ে আজকের দিনে কৈলাস ও মানসসরোবরযাত্রা বহু সুগম হইয়াছে। তীর্থপথযাত্রীর নিকট আমার এই অভিজ্ঞতা যদি কিছু উপকারে আসে তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক মনে করিব। ইতি—

গ্রন্থকার

॥ সূচীপত্র ॥

॥ রেখা-চিত্র সূচী ॥

	বিষয়		পৃষ্ঠা

পর্য্যটক ৩১ বৎসর

কৈলাস
কেদারনাথ
বদরীনাথ
যোশীমঠ
গুরলা-১০
মান্ধাতা-১০
আলমোড়া
কাঠগুদাম
পিলিভিত
বেরেলী
ভারত
নেপাল

পথের নিশানা

॥ ১ ॥

উদ্যোগ পর্ব্ব—আলমোড়ার পথে

সঙ্গ-সংযোগের কথাটাই প্রথম। কারণ বিনা সঙ্গে এত বড় তীর্থ ভ্রমণ সম্ভব হইত না। সেটি ঘটিল স্বামী পরমানন্দের নব-প্রতিষ্ঠিত শঙ্কর-মঠে আর শঙ্কর-উৎসবের সময়, এবং পঞ্চানন জ্যোতিষী মহাশয়ের মধ্যস্থতায়। সেদিন সেখানে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সাধারণের সমাবেশ হইয়াছিল।

গায়ে ফিতাওয়ালা ব্যানিয়ান, তাহার উপর পাতলা চাদর, পরনে থানধুতি, পায়ে চিনাবাড়ীর পেনেলা জুতা, মুখে কাঁচা-পাকা ছাঁটা গোঁফ ও দাড়ি, কিছু খর্ব্বাকৃতি, ভব্যযুক্ত, আগমনশীল একটি মূর্ত্তিকে দেখাইয়া, জ্যোতিষী মহাশয় আমায় বলিলেন,—এই যে আমাদের কৈলাস-যাত্রী-মশাই এই দিকেই আসছেন, আসুন আলাপ করিয়ে দি।

আরও নিকটে আসিলে নমস্কারাদির পর পরিচয় হইল। ইনি বর্ম্মা, শ্যাম, জাভা, বালী প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়াছেন,—এই পরিচয় দিয়া সঙ্গী-মহাশয়কে, তারপর ইনিও মধ্যে মধ্যে ডুব মারেন, ভ্রমণে বিশেষ অনুরাগ, এই পরিচয়ে আমাকে পরিচিত করিয়া জ্যোতিষী মহাশয় ধীরে ধীরে পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিলেন, তাঁর সেখানে অনেক কাজ।

এই যে আমার সঙ্গী মহাশয়, ইঁহার বেশ দেখিলে পণ্ডিত, এবং মুখাকৃতি দেখিলে মনঃশক্তিসম্পন্ন, চতুর ও কর্ম্মক্ষম ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। মাথায় টাক পড়ায় কপালখানি উচ্চ দেখাইতেছে। উজ্জ্বল চক্ষু-দুটিতে একটা জাজ্জ্বল্যমান—আমি-ভাবের ব্যক্তিত্ব সুস্পষ্ট। সাহিত্যিক, বাগ্মী এবং স্বদেশসেবক বলিয়া প্রতিষ্ঠা তাঁহার আছে।

আগে তিনিই কথা কহিলেন। দৃঢ় গম্ভীর স্বরে সর্ব্ববিষয়ে ব্যক্তিগত

অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া কথা কওয়াই তাঁহার অভ্যাস। এক্ষেত্রে, প্রথম-দর্শনেই আমার মূর্ত্তিটি তাঁহার ভাল লাগিয়াছে ইত্যাদি, কল্পিত কতকগুলি গুণের কথায় উৎসাহিত করিয়া ঈষৎহাস্থে তিনি একেবারেই যাত্রার কথা পাড়িয়া বসিলেন এবং সম্মতির অপেক্ষায় তীক্ষ্নদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন,—একটু ভাবিয়া দেখিবার অবসর দিতেও যেন নারাজ।

আমাকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া তিনি সম্ভবতঃ সন্দেহ করিলেন হয়তো আমার যাওয়া ঘটিবে না। তা বলিয়া, তিনি অনুরোধ করিতেও ছাড়িলেন না। ভাবিয়া-চিন্তিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—কতদিনে যাত্রা করবেন?

আগামী সপ্তাহে ত্রয়োদশীর দিন একটার ঐ এক্সপ্রেসে যাওয়াই তাঁর দৃঢ়সংকল্প। যদি আমার যাওয়াই স্থির হয়, শতখানেক টাকা আর যথাসম্ভব শীতপ্রধান দেশের উপযুক্ত বস্ত্রাদি এবং একটা বর্ষাতি সংগ্রহ করিয়া যেন ঐদিন তাঁহার সঙ্গে হাওড়া ষ্টেশনেই দেখা করি। ইতিমধ্যে আর দেখাশুনার কোনও প্রয়োজনই নাই। মালপত্রের বোঝাটি একজন লোক সহজে লইতে পারে, এমনটি হওয়া চাই।

তাঁহার সঙ্গে সকল রকম প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র, রান্নার সরঞ্জাম, একটা লণ্ঠন এমন কি ফটোগ্রাফীর সরঞ্জামও থাকিবে। মোটামুটি আমার রান্না আসে কিনা খোঁজ লইয়া শেষে উৎসাহে বলিলেন, আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে এরূপ কতই না ভ্রমণ করেছি, সেইজন্য এই যোগাযোগ। পূর্ব্বজন্মের সম্বন্ধের ইঙ্গিত—।

গত তিন বৎসর ধরিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন, ঘটিয়া উঠে নাই, এবারে তিনি দৃঢ়সংকল্প। ফিরিয়া একখানি পুস্তক লিখিবেন। রেলে কাটগুদাম অবধি, তারপর ঘোড়ায় বা পদব্রজে আলমোড়া, সেখান হইতে আবশ্যকীয় যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়া আরও উপরের দিকে যাওয়া যাইবে। এই সব কথার পর,—জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আপনার যাওয়া ঠিক ত?

আমি,—চেষ্টা দেখব,—বলাতে তিনি উন্নতমস্তকে বক্তৃতার ভাবে দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, 'একোঽহং অসহায়োঽহং দীনোঽহং অপরিচ্ছদঃ, স্বপ্নেপ্যেবম্বিধ চিন্তা মৃগেন্দ্রস্থ ন যায়তে।' যখন আমি যাব এই সংকল্প করেছি তখন কোন প্রাকৃতিক নিয়ম আমার যাওয়ার প্রতিবন্ধক হতেই পারে না, বুঝলেন?

বলিলাম,—সত্য বটে, যদিও আমরা সব সময়ে ঠিক সংকল্পমত কাজ

করতে পারি না। তিনি পুনরায় বলিলেন,—আমার একটা মটো আছে সেটা এই,—প্রভু, তোমার চরণ স্মরণ করিয়া সিংহের হৃদয়ে সদাই ফিরি; রাজা বা প্রজা মানিনা কাহারে, মানুষ দেখিয়া কভু না ডরি,—আমি এই মন্ত্রে কাজ করে থাকি।

বলিলাম—অতীব সুন্দর ভাবটি; এর মধ্যে যে নির্ভীকতা ও আত্ম-নির্ভরতার প্রেরণা আছে একথা কেউ অস্বীকার করবেন না।

যাহা হউক কথা এই পর্য্যন্ত রহিল যে, আগামী বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশীর দিন দুইটায় দিল্লী এক্সপ্রেসের সময়ে—টাকাকড়ি ও প্রয়োজনমত মালপত্র সঙ্গে লইয়া হাওড়া ষ্টেশনে, দশ নম্বর প্ল্যাটফরমে যেন তাঁহার সঙ্গে দেখা করি। অবশ্য যদি যাওয়ার সুবিধা ঘটে, তবেই।

৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ সাল, বৃহস্পতিবার শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন কথামত বেলা ১২টার সময়ই হাওড়ায় উপস্থিত হইলাম। কি ভয়ঙ্কর ভীড়। মাড়োয়ারী ভায়াদের দেশে যাইবার দিন, তাহার উপর সঙ্গে আমার স্ত্রী, তাঁহাকে এলাহাবাদে রাখিয়া যাইতে হইবে, তাহার উপর আমরা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। ভীড় দেখিয়াই ত হৃদকম্প উপস্থিত। সঙ্গী-মহাশয়কেই বা পাইব কোথা?

তিনি আমায় খুঁজিয়া বাহির করিলেন,—দেখিয়া ভরসা হইল। সঙ্গে স্ত্রীকে দেখিয়া এবং সকল কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন,—আমি আগে গিয়ে দেখি, পরে ফটক খুললে আপনারা যাবেন। ট্রেনখানি ত এসেছে দেখছি, বলিয়া ভীড়ের মধ্যে তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

এদিক-ওদিক নানাদিক দিয়া ভিতরে যাইবার চেষ্টায় অপারগ হইয়া শেষে বড় কষ্টে ষ্টেশন-মাষ্টারের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া প্ল্যাটফরমের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলাম। তারপর সেই জন-সমষ্টিপূর্ণ ট্রেনখানির অবস্থা দেখিয়া নিরাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখিলাম, সঙ্গী-মহাশয় একখানি মধ্যম শ্রেণীর গাড়ির দণ্ড ধরিয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ক্ষিপ্রগতিতে দ্বার খুলিয়া স্থান দখল করিতে বলিলেন। তিনি দুই-একজন বিপন্ন যাত্রী ছাড়া আর কাহাকেও ভিতরে প্রবেশ করিতে দেন নাই। সেইজন্য সঙ্কটের মধ্যে ভগবানের কৃপায় আমরা বড়ই আরামে স্থান পাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। অল্পক্ষণেই গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

অন্তরের কৃতজ্ঞতা সঙ্গী-মহাশয়কে কি ভাবে জানাইব। একটু সুস্থ হইয়া

বলিলাম,—আপনার আকর্ষণই আমার যাত্রার চেষ্টা সফল করেছে। তিনি সহাস্যে,—পূর্ব্ব হইতেই এই-সব ঠিক্‌ঠাক্‌ হয়েই আছে, আমার কর্ত্তৃত্ব কিছুই নাই, বলিয়া কি কি সংগ্রহ করিয়াছি জানিতে চাহিলেন।

দুইখানি কম্বল, একটি মোটা পট্টুর কোট, একটি উলেন সোয়েটার, ছোট তুলাভরা জামা একটি, চারিখানি কাপড় এবং একটি পুরাতন বর্ষাতি ও দুইশত টাকা—ইহাই আমার পুঁজি। আপাততঃ এতেই চলে যাবে, বলিয়া তিনি তাঁহার সরঞ্জাম দেখাইলেন। উহা প্রায় ঐরূপই, বেশীর মধ্যে উলেন মোজা, একটি পাঞ্জাবী ধরনের পাগ্‌ড়ি, আর একটি ছাতা। আরও একটি কাম্বিসের ব্যাগে খান-পঞ্চাশ গীতা। উহা তাঁহার নিজ সম্পাদিত, ভগবদ্গীতার হিন্দী-সংস্করণ। তাহার কীটদষ্ট মলিন লাল মলাট অনেকদিন ঘরে পড়িয়া থাকার পরিচয় দিতেছিল। তিনি আরও লইয়াছিলেন একটি ছোট ব্যারোমিটার এবং একখানি Tibetian Manual. পরে ছোটছোট শিশিতে কতকগুলি ঔষধও ছিল। বলিলেন,—কাল গণনাথের ওখানে গিয়েছিলাম, ইষ্টানিষ্ট ভেবে সে যত্ন করেই এগুলি দিয়েছে। এতে পেটের অসুখ, জ্বর, বমন, বিরেচন প্রভৃতি কয়েকটি সাধারণ রোগের ঔষধ আছে।

আমাদের কামরায় বেশী লোক ছিল না, আমরা তিনজন আর দুইটি মাত্র হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক। বেশ আরামেই আমরা গাড়ির গতিতে গা ভাসাইয়া কত কি ভাবিতে ভাবিতে চলিতেছিলাম। অপরিচিত লোক-দুইটির মধ্যে একজন সঙ্গী-মহাশয়ের সঙ্গে এক-বেঞ্চেই যাইতেছিলেন; কথাপ্রসঙ্গে পরিচয়ে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ জানিয়া সঙ্গী-মহাশয় তাঁহাকে একখানি গীতা উপহার দিলেন, তাহাতে তিনিও যে পরমাপ্যায়িত হইলেন, তা ভাবেই বুঝা গেল। তারপর এ-কথা সে-কথার পর সেই ব্যক্তি পকেট হইতে একটি চুরুট বাহির করিয়া ধরাইবার যোগাড়ে পুনরায় পকেটে যেমন হাত দেওয়া, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সঙ্গী-মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—ও ক্যা হ্যায়? সে অপ্রতিভ হইয়া,—ও বিড়ি হ্যায়, হাম্ পিতা হ্যায়, বলিয়া যেন কত অপরাধী এরূপভাবে তাঁহার মুখের পানে চাহিল।

তখন সঙ্গী-মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক ভঙ্গীতে আরম্ভ করিলেন,—তোম্ ব্রাহ্মণ হোয়কে ও চিজ কেঁও পীতা হ্যায়। তোমারা পীনা দেখকে তোমারা আপনা লেড়কা লোকভি পীনেকো শিখেগা। উস্‌মে জহর হ্যায়, তামাকু

কা পাত্তিমে কোই জানোয়ারভি মু নেহি লাগাতা। যো আদমি ও পীতা ও জানোয়ার সে অধম হ্যায়—ও চিজ হরগিজ মৎ পিনা করে। সে বেচারা ত একেবারে যেন এতটুকু হইয়া গেল। তখন আবার প্রশ্ন হইল—

—কেতনা রোজসে পীতা হ্যায়?

—বহোৎ রোজসে জী মহারাজ, বাচপন্‌সে, বলিয়া সে চাহিয়া রহিল।

—ও পীনা ছোড় দেও, শিকো গে?—বলিয়া তাহার দিকে চাহিতেই সে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, ধীরে ধীরে ছোড়েগা মহারাজ। অবশেষে তাহার প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া তিনি, যাও উধার যায়কে পিও, বলিয়া তাহাকে তখনকার মত অনুমতি দিয়া আরও একবার, ছোড়নে কো ওয়াস্তে কোসিস্ করো, বলিয়া দিলেন। সে বেচারা সম্মত হইয়া তখন একটু তফাতে গিয়া সেটি ধরাইয়া বাঁচিল।

কিছুক্ষণ পরে সে ব্যক্তি কাজ শেষ করিয়া আবার নিজস্থানে আসিয়া বসিল এবং ধীরে ধীরে পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া তাঁহার প্রদত্ত গীতাখানির মূল্যস্বরূপ লইতে অনুরোধ করিল।

তিনিও লইবেন না, সেও ছাড়িবে না, অবশেষে তাহার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তিনি টাকাটা গ্রহণ করিলেন এবং আমার কাছে রাখিতে দিলেন, বলিলেন,—পথে এমন কত হবে, টাকা আসবে, জিনিষপত্র কত আসবে তখন দেখবেন!

এইরূপে ট্রেনে আমাদের নিয়মিত কালটুকু কাটিয়া গেল। পরদিন সুনিদ্রার পর সকালে আমাদের মোগলসরাইয়ে ছাড়াছাড়ি হইল বটে, কিন্তু কথা রহিল পরদিন শাজাহানপুরে তাঁহার সঙ্গে আবার মিলিত হইব। আমার মালপত্র বেশীর ভাগ তাঁহার সঙ্গেই দিলাম।

পরদিন কথামত, জ্যৈষ্ঠমাসের সেই অসহ্য গরমে দগ্ধীভূত হইয়া আউদ-রোহিলখণ্ড রেলে এলাহাবাদ হইতে শাজাহানপুর যাত্রা করিলাম। কিন্তু ষ্টেশনে আসিলে নামিবার পূর্ব্বে দেখি সঙ্গী-মহাশয় মোটঘাট্ কুলির মাথায় দিয়া গাড়ীতে আসিয়া চাপিলেন। বলিলেন, আর এখানে নেমেই কাজ নেই, চলুন একেবারে বেরেলীতেই যাওয়া যাক্—ভারি ধূলা এখানে আর বড় গরম, অসহ্য। তাই হইল, আটটার সময় বেরেলী পৌছিয়া হাত-পা, মুখ ধুইয়া একটু ঠাণ্ডা হওয়া গেল। রাত্রি সাড়ে এগারোটার পর কাটগুদামের গাড়ী।

জ্যোৎস্না রাত্রি, একবার শহরটি দেখিতে গেলে হয়। দুইটি লোটারও প্রয়োজন ছিল, এখনও হয়তো শহরের দোকানপাট বন্ধ হয় নাই। সঙ্গী-মহাশয় রহিলেন, আমি একখানি টাঙ্গা লইয়া বাহির হইলাম। একটু ঘুরিয়া শহরের প্রধান রাজপথ, জেলখানা, টাউন হল, স্কুল, খেলিবার ময়দান, হাসপাতাল বাহির হইতে যতটুকু দেখা যায়, দেখা হইল বটে, কিন্তু দুরদৃষ্ট, লোটা পাওয়া গেল না জানিয়া সঙ্গী-মহাশয় একটু বিরক্ত হইলেন। বলিলেন,—বৃথা এত দেরী করবার কি দরকার ছিল, আপনার জন্য আমায় এতটা উদ্বেগ ভোগ করতে হল। গাড়ী ছাড়িবার তখনও তিন কোয়ার্টার দেরি। যাহা হউক, আমরা গুছাইয়া গাড়ীতে উঠিয়া চিন্তিত মনে শুইয়া পড়িলাম।

পরদিন প্রাতে হলদোয়ানী হইয়া কাটগুদামে পৌছিতে প্রায় আটটা হইল। মালপত্র লইয়া আমরা ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম। এখানে এজেন্সী থাকায়, মোটরগাড়ি, ঘোড়া, ডাণ্ডি, কাণ্ডি, ঝাঁপানি মোটবাহক প্রভৃতি নিয়মিত হারে পাওয়া যায়। নৈনিতাল, রাণীখেৎ, আলমোড়া যাইবার এখান হইতে প্রশস্ত রাস্তা আছে। এখন এপথে মোটর রোড এবং বাস সার্ভিস হইয়া গিয়াছে। সকল স্থানই বাসে যাওয়া যায়,—সময়ও খুব কম লাগে।

এখানকার ঠিকাদার আসিয়া কি কি চাই সন্ধান লইল এবং যাহা আমাদের প্রয়োজন, দুইটি ভাল ঘোড়া ও দুইটি কুলী,—তাহা কাল সকালে নিশ্চয়ই হাজির করিবে জানাইয়া গেল। প্রত্যেক ঘোড়া সাত টাকা, ও কুলী তিন টাকা, এই ভাড়াই স্থির হইল।

হলদোয়ানীতে এবং এখানেও কাঠের কারবার আছে। পাহাড়ী ঝাউ অর্থাৎ পাইনকে এ অঞ্চলে চীড় বলে। ইহা হইতে প্রভূত গন্ধবিরজা ও টারপিন তৈল উৎপন্ন হয়। ভীমতাল হইতে ভাওয়ালী তিন মাইল, সেখানে ইহার কারখানা আছে। এখানে কাঠের চালানী কারবারই প্রসিদ্ধ। মধ্য এবং নিম্ন হিমালয়ের মধ্যে যত সরকারী জঙ্গল আছে, তাহাতে উৎপন্ন যত কাঠ এখান হইতে কাটাই হইয়াই চালান যায়। কাঠগুদামে কেবল পাইনেরই গন্ধ সর্ব্বত্র।

আমরা স্নান করিলাম—ষ্টেশনের নিকটেই একটি প্রবল ধারায়, আর হালুয়াইর দোকানের দগ্ধীভূত ঘৃতপক্ক খাবার খাইয়া সমস্ত দিন এবং রাত্রি

কাটাইলাম। প্রভাতে ঘোড়া ও কুলি আসিল। ঘোড়া দুইটির মধ্যে একটি নির্জ্জীব, আর সেইটিই আমার ভাগ্যে পড়িল ; কারণ, সঙ্গী-মহাশয়ের শরীরটি আমাপেক্ষা স্থূল। যাইবার সময়, দুঃস্থ ঘোড়াটির কথা বলিতে,—কোন চিন্তা নাই, পাহাড়ী ঘোড়া, দেখিতে যেমনই হোক কর্ম্মে খুব পটু ইত্যাদি ভরসার কথা শুনাইয়া বিজয়চাঁদ দালাল, দামটি অগ্রিম আদায় করিয়া ছাড়িয়া দিল। সঙ্গী-মহাশয় রেকাবে পা না দিয়া একেবারে উঠিতে পারেন না, একটা উঁচু ঢিবির উপর উঠিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বসিলেন, বলিলেন,—এই কাটগুদাম থেকে যাত্রাই আমাদের ঠিক কৈলাসযাত্রা, রেলে যেটুকু আসা হল,—এটা ছেড়ে দিতে হবে। বলিলাম, তাইতো।

আমরা বেশ একটি বড় দল কাটগুদাম হইতে যাত্রা করিলাম। যখন ঘোড়াগুলি চলিতে লাগিল প্রাণে বড়ই স্ফূর্ত্তি ছিল। একে হিমালয়ে উঠিতেছি, তাহাতে দূর তিব্বত ভ্রমণের আশা লইয়া একটা আনন্দ প্রথম হইতেই আছে, তাহার উপর প্রভাতের স্নিগ্ধ প্রকৃতি,—নয়নতৃপ্তিকর দৃশ্য চারিটিদিকেই পরিপূর্ণ, মৃদুমন্দ শীতল সমীরণ স্পর্শে পুলকে শরীর শিহরিয়া উঠিতেছিল। এক অনির্ব্বচনীয় ভাব-রসে ভাসিয়াই চলিলাম।

সঙ্গী-মহাশয় অতি সাবধানে ঘাড় ফিরাইয়া আমার দিকে একবার দেখিয়া, মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—আমরা দুজন বঙ্গবাসী ক্যাভেলিয়ার, হিমালয় এক্সপ্লোর করতে চলেছি। চমৎকার, শুনিয়া হাসি আসিল। ঘোড়া যদি একটু দৌড়ায় তাহা হইলে কে যে কেমন ক্যাভে-লিয়ার বুঝা যাইবে। আমার কিন্তু নিজের বাহনটির জন্য প্রথম হইতে মন বড়ই খারাপ ছিল, এমন ইচ্ছা হইতেছিল উহার পিঠ হইতে নামিয়া হাঁটিয়া যাই,—তাহাতে বেচারা অব্যাহতি পাইবে, আমিও নিরুদ্বিগ্ন হইব।

কতকটা চলিবার পর, দেখা গেল দুইটি রাস্তা দুই দিকে গিয়াছে। রাণীখেৎ-নৈনিতাল যাইবার পথটি বামে, অর্থাৎ উত্তর দিকের পাকা এবং প্রশস্ত রাস্তা তাহাতে মোটর প্রভৃতি চলে ; আর একটি সরু রাস্তা দক্ষিণে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে নামিয়া গিয়াছে,—ঐটিই আলমোড়া যাইবার পথ। কাঁচা রাস্তা,—সে পথে মোটর যায় না, কেবল মানুষ, ডাণ্ডি ঘোড়া প্রভৃতি চলে। আমাদের প্রথম পড়াও ভীমতাল।

প্রায় আড়াই মাইল চড়াই, তারপর আরও আড়াই মাইল গেলে পাঁচ মাইলের মাথায় ভীমতাল। ক্ষুণ্ণ মনে সেই মুমূর্ষু ঘোড়াটির উপর চড়িয়া

ঘোড়া বিভ্রাট

আমি মাঝে ছিলাম। প্রথমে ছিলেন আগরা নিবাসী একজন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী ভদ্রলোক, কাজের জন্য তিনি ভীমতালের নিকট ভাওয়ালী যাইবেন। তাঁর ঘোড়াটি বেশ সুন্দর। আর সব শেষে সঙ্গী-মহাশয়। আমার ভয়, ঘোড়াটির কখন কি অবস্থা ঘটে। সেই ঠিকাদার লোকটার উপর রাগ হইতেছিল, অগ্রে পয়সা লইয়া এরূপ প্রবঞ্চনা! এখন কিন্তু নিরুপায়। আমার দুর্গতি দেখিয়া সেই মাড়োয়ারী ভদ্র ব্যক্তিটি বলিলেন যে, আপনি আমার ঘোড়াটি লইয়া যাইবেন, আমি ত মোটে ভীমতাল পর্য্যন্ত যাইব।

তাহা হইলে ত ভালই হয়, কিন্তু ঘোড়াওয়ালা কি রাজী হইবে?

ঘোড়াটি আমার কিছুদূর গিয়া মাঝে মাঝে দাঁড়াইতে লাগিল, পরে কাঁপিতে কাঁপিতে শুইয়া পড়িল। তখনও ভীমতাল আধমাইলের উপর। সঙ্গী-মহাশয় পশ্চাতেই ছিলেন। একজন পাহাড়ী যাত্রীর সাহায্যে ঘোড়াটিকে দাঁড় করাইয়া কোনমতে লাগাম হাতে ধরিয়া টানিয়া লইয়া

যাইতে লাগিলাম। সে দুই এক পা চলে আর মাঝে মাঝে থমকিয়া দাঁড়ায়—, আর মাথা নাড়িতে থাকে, যেন বলে,—তাহার আর চলিবার শক্তি নাই, সে চায় অব্যাহতি।

ঘোড়ার সঙ্গে একটি করিয়া লোক থাকে, আড্ডা হইতে বরাবর সঙ্গে যায়, প্রত্যেক পড়াওতে ঘোড়ার তদ্বির করে, সাজ জিন খোলে, দলেমলে দানা পানি খাওয়ায়, যত্ন লয়, শেষে যাত্রীকে উদ্দিষ্ট স্থানে পৌছাইয়া ঘোড়া লইয়া অধিকারীর নিকট ফিরিয়া আসে।

মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটির ঘোড়ার যে রক্ষক, তিনি সর্ব্বপশ্চাতে দড়িদড়া ঘাড়ে করিয়া আসিতেছিলেন। যুক্তি এবং ন্যায় সহকারে যথোচিত প্রার্থনা করিলেও তিনি প্রথম হইতে শেষ অবধি সেই এক কথাই বলিলেন,—হামারা উপর যো হুকুম নেহি, সো কভি নেহি, হোয়েগা। কাজেই ক্ষুণ্ণ মনে চলিতে লাগিলাম।

এরূপ অবস্থায় আধঘণ্টা পরে ভীমতাল পৌছিলাম। ততক্ষণে সঙ্গী-মহাশয় আসিয়া পড়িলেন।

এ অঞ্চলে ছোট-বড় মিলাইয়া প্রায় সাতটি তাল বা হ্রদ আছে, তাহার মধ্যে নৈনিতালই সর্ব্বাপেক্ষা বড় তাল। ভীমতাল একটি লম্বা ধরনের হ্রদ। কতকগুলি ছোট ছোট দোকান; দোকানী ও কতকগুলি শ্রমজীবী লোকের বসতি। হ্রদের চারিদিক লইয়াই এই পড়াও। হ্রদের জল স্বচ্ছ, সাধারণের স্নান, বা কাপড় কাচা প্রভৃতি নিষিদ্ধ। জল হইতে একদিকের জমিটি ক্রমশ উচ্চ হইয়া রাস্তা অবধি আসিয়াছে। তাহাতে কতকটা শস্যক্ষেত্রও রহিয়াছে। কিছু দূরে ডাক-বাংলায় সাহেব-সুবাদের ঘন যাতায়াতও আছে।

মধ্যে সদর রাস্তা, দুই ধারে দ্বিতল ত্রিতল কাষ্ঠনির্ম্মিত পাহাড়ী মকান। তলগুলি সব নীচু। প্রথম তলে মুদিখানা জ্বালানী কাঠ, চাল, ডাল, লবণ, তৈল, ঘৃত, গুড়, আলু প্রভৃতি, আবার সিগারেট, বিড়ি, দিয়াশলাই এই সকলও পাওয়া যায়। পান এখানে বিশেষ মহার্ঘ। দ্বিতলে যাত্রীদের থাকিবার ঘর, ত্রিতলে চৌকা বা রান্নাঘর। সব গৃহই এক ছাঁদের। দরজাগুলি নীচু। মাথা হেঁট না করিয়া ঢুকিবার যো নাই। জানালা না থাকারই মত, মাঝে মাঝে চতুষ্কোণ ঘুলঘুলির মত আছে। সরু সিঁড়িগুলি সব কাঠের। এ অঞ্চলে খাটিয়া, চৌকী জামাকাপড় ঝুলাইবার

গোঁজা প্রভৃতি সকল আসবাবই চীড় কাষ্ঠের। সাধারণতঃ এ অঞ্চলের অধিবাসীগণ জাতিতে ব্রাহ্মণ ও ছত্রী।

আমরা তিনজন এক ঘরেই বাসা লইলাম। একজন ব্রাহ্মণকুমারকে তুই চারি আনা পারিশ্রমিক দিয়া ভাত-তরকারীর যোগাড় করা গেল। ইতিমধ্যে ঘোড়ারও যোগাড় হইল, এখান হইতে আলমোড়া পাঁচ টাকা বারো আনা। কাটগুদাম হইতে ঘোড়ার সঙ্গে যে লোকটা ছিল তার মারফতে সেই বিজয়চাঁদকে একখানা রোকা লেখা হইল যে, তোমার ঘোড়া অব্যবহার্য্য হওয়ায় আমরা ছাড়িয়া গেলাম, তুমি আমাদের প্রাপ্য বাকি দামটা আলমোড়ায় পোষ্টমাষ্টারের কেয়ারে পাঠাইয়া দিও, না হইলে আইন আছে। বলা বাহুল্য, এর সবটাই বৃথা হইয়াছিল। অসুবিধায় না পড়িলে আইন মানে কে?

আহারাদির পর আনন্দে নূতন ঘোড়ায় উঠিয়া রামগড়ের দিকে যাত্রা করা গেল। ঘোড়াটি এবার ভাল পাইয়া মনটা প্রফুল্ল ছিল। মোটঘাট লইয়া আমাদের বাহক আগেই রওনা হইয়াছিল।

এখানকার কুলীরা বড়ই সৎ, নিরীহ এবং পরিশ্রমী। তাহারা একমণ দেড়মণ বোঝা লইয়া বনপথে খাড়া চড়াই উঠিয়া যায়। আমরা সে পথে যাইতে পারি না। তাহারা পর্ব্বতবাসী, অতি সরল, কৌপীনমাত্র তাহাদের পরিধেয়।

এবারে আমাদের উৎরাইয়ের পালা। পা ডুবিয়া যায়, ধূলিপূর্ণ সদর রাস্তা, কাঁচা ও অসমতল। বেশী লোক চলাচলে ধূলায় আচ্ছন্ন হইয়া যায় চারিদিক। জঙ্গলের মধ্য দিয়া যে পথ উহা চমৎকার এবং ধূলিশূন্য বনপথ; বনপথকে পাকডাণ্ডি বলে। প্রায় চার মাইল ছাড়াইবার পর ঘোড়া হইতে নামিয়া আমরা পদব্রজে যাইতে লাগিলাম। উৎরাইয়ের মুখে হাঁটিয়া যাওয়াই ভাল। কিছুদূর আসিয়া আমরা দেখিলাম একটি য়ুরোপীয় ভদ্রলোক, কাঁধে বন্দুকের বাঁট,—নলটি বামহস্তে মুষ্টিবদ্ধ এবং দক্ষিণ হস্তে পাহাড়ী লাঠি, মাথায় টুপী, পর:ন খাকির আজানু পাজামা ও শার্ট,—সস্ত্রীক, ধীরে ধীরে বাক্যালাপ করিতে করিতে উঠিতেছিলেন।

সঙ্গী-মহাশয় অগ্রেই ছিলেন, অগ্রসর হইয়া কথা কহিলেন। পরিচয় হইল তিনি শ্রীযুক্ত নেস্‌ফিল্ড, আই-এম এস., বেরেলীর সিভিল সার্জ্জন।

পিণ্ডারি গ্লেসিয়া প্রভৃতি হিমালয়ের বিখ্যাত স্থানগুলি ভ্রমণ করিয়া বাগেশ্বর ও আলমোড়া হইয়া কাটগুদাম যাইতেছেন। সঙ্গী-মহাশয় আমাদের পরিচয় দিলেন তীর্থযাত্রী, সুদূর তিব্বতে কৈলাস-মানসসরোবর ভ্রমণে যাইতেছি এই বলিয়া।

তিব্বতের ওদিকে দস্যুভয় জানাইয়া মিঃ নেস্‌ফিল্ড আমাদের সঙ্গে কোনরূপ হাতিয়ার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে সঙ্গী-মহাশয় সগর্ব্বে উত্তর করিলেন, আমরা অহিংসপরায়ণ দরিদ্র হিন্দু ব্রাহ্মণ, তীর্থযাত্রী, হিংসা ভয় আমাদের নাই। পরে সাহেবের স্কন্ধস্থিত বন্দুকটি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই পবিত্র হিমালয়ে আপনার সঙ্গে এ অস্ত্র কেন? তাহাতে মধুর হাসিয়া তিনি বলিলেন,—এ অঞ্চলে জঙ্গলে বাঘের ভয় যথেষ্ট। পথে প্রায়ই বাঘের উৎপাত দেখা যায়, এই কারণেই আমরা উহা সঙ্গে রাখিয়াছি, নচেৎ অনর্থক প্রাণিহত্যা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সাহেব আরও বলিলেন,—শুনিলে সুখী হইবেন আমরা নিরামিষাশী। পরে স্ত্রীর হাতখানি লইয়া তাঁহার অঙ্গুলীতে ওঁকার মুদ্রিত একটি আঙটি দেখাইলেন, পবিত্র হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি তাঁহারা কতটা আস্থাবান। তিনি সঙ্গী-মহাশয়ের এই প্রবীণ বয়সে এতবড় পর্য্যটন-স্পৃহা গৌরবের বিষয় বলিয়া হর্ষ প্রকাশ করিলেন। বিদায়কালে বলিয়া গেলেন, আপনাদের কাছে যদি নোট থাকে তো আলমোড়ার মধ্যে এদিকেই ভাঙ্গাইয়া লইবেন, কারণ ওদিকে আর নোট চলিবে না। তাঁহারা চলিয়া গেলে সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন,—কেমন বলা হইয়াছে?

হাসিয়া বলিলাম,—বাস্তবিক, এরূপ স্ত্রী-পুরুষের স্বাধীনভাবে একত্র ভ্রমণ দেখিলেও আনন্দ হয়? যেন হরপার্ব্বতী।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে রামগড় পৌছিলাম এবং ডাক-বাংলায় না গিয়া আমরা চটিতেই উঠিলাম। কিছু মিষ্টান্ন খরিদ করিয়া জলযোগ ছাড়া এখানে আর অন্য উপায় ছিল না। কাজেই এইভাবে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রভাতে আট মাইলের মাথায় পিউড়ে নামক একটি পল্লীতে উঠিলাম। সেখানে মুদীর দোকান হইতে আবশ্যক মত মালপত্র লইয়া স্বয়ংপাক এবং ভোজন সমাপ্ত করা গেল। তারপর ডাক-বাংলার পার্শ্বে একটি আখরোট গাছতলায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পরে আবার দুইটার সময় যাত্রা। তের মাইলের পর আলমোড়া।

পথিমধ্যে একটি লৌহ-সেতু, তাহার বাঁদিকে একটি পাকা প্রশস্ত রাস্তা, বরাবর নৈনিতালের দিকে গিয়াছে।

সেই সেতু উত্তীর্ণ হইয়া আমাদের রাস্তাটি দক্ষিণে বাঁকিয়া ক্রমাগত খাড়া চড়াই, সোজা উঠিয়া গিয়াছে। সেই অপ্রশস্ত রাজপথের বামে খাড়া পর্ব্বত, বহু উচ্চে তাহার শেষ—আর দক্ষিণে খড্। ব্যবধানে একটি তিন হাত পরিমিত উচ্চ প্রস্তর-প্রাচীর। যাইতে যাইতে সেখান হইতে একটু

নেস্ফিল্ড দম্পতি

ঝুঁকিয়া বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা দেখা যায় তাহাতে সাহস লুকায়, তাহার পরিবর্ত্তে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। কিন্তু এমন ভীষণ গম্ভীর এবং বিশাল পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্য পূর্ব্বে এ পথে আর দেখি নাই। সেই বিরাটকায় কঠিন প্রস্তরসমষ্টির তলদেশ হইতে তীব্র বেগবতী স্রোতস্বিনীর উন্মাদ হুহুঙ্কার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ছুটিয়াছে। সেই দৃশ্য,—প্রাণের মধ্যে ভয়
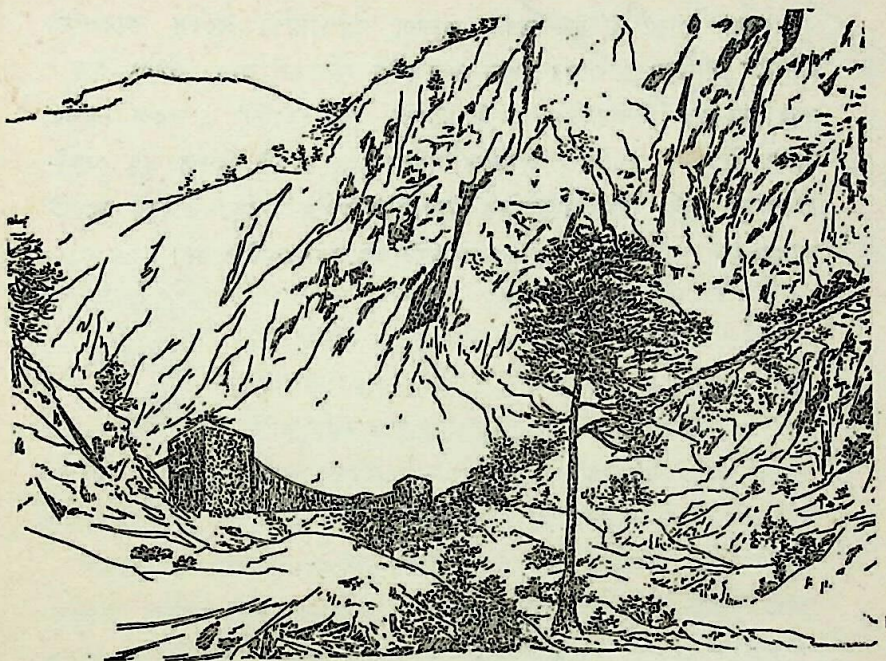
আলমোড়ার পথে

বিস্ময় ও আনন্দ মিলিয়া এক অপূর্ব্ব ভাবরসে ডুবাইয়া দেয়। হুঙ্কারমিলিত সেই ভয়াবহ দৃশ্যের অন্তরালে একটি অব্যক্ত অস্তিত্ব অনুভব করিয়া প্রাণ যেন সকল ক্রিয়া বন্ধ করিয়া ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া রহিল, তারপর বোধ হইল যেন এক জীবন্ত বিশালতা সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া আমার চৈতন্যকে সবলে আকর্ষণ পূর্ব্বক আপনার মধ্যে মিলাইয়া লইল ;—কিছুক্ষণের জন্য যেন আমার আমিটি তাহাতে ডুবিয়া রহিল। কি অপূর্ব্ব দৃশ্যই এ পথে আজ দেখিলাম ;—জীবন ধন্য হইল।

সে পথটি পার হইয়া যখন শীর্ষদেশে উঠিলাম তখন দিবা প্রায় তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার পরে যে পথটি, তাহা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত এবং নির্জ্জন পাইন ফরেষ্টের মধ্য দিয়া একেবারে আলমোড়া অবধি চলিয়া গিয়াছে। বড় সুন্দর পবিত্র এই পথটি,—দিব্য বায়ু, দিব্য দৃশ্য এবং দিব্য গন্ধের রাজ্য ;—দৃশ্য এরূপ নয়নতৃপ্তিকর যেন তাহাতে এক প্রকার মত্ততা আনিয়া দেয়। এখনও বেশ মনে আছে যে, সে পথে যাইতে যাইতে এক অপূর্ব্ব আনন্দ-রসে মস্তিষ্ক কিছুক্ষণ চিন্তাশূন্য ছিল।

বেলা প্রায় পাঁচটা তখন আমরা আলমোড়া প্রবেশ করিলাম। সেখানে পৌঁছিয়া আমাদের প্রধান কর্ম্ম হইল বাসা খোঁজা। ভগবৎ ইচ্ছায় তাহা সহজেই মিলিয়াছিল। সঙ্গী-মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই এ সকল ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন। নরসিংহ বাড়িতে মন্দিরসংলগ্ন একটি দ্বিতল গৃহ; সঙ্গী-মহাশয়ের পূর্ব্ব পরিচিত পণ্ডিত নন্দাকিশোরজীর যত্নে, তাহার মধ্যেই আমরা বাসা পাইলাম। উহা ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের একটি শাখা।
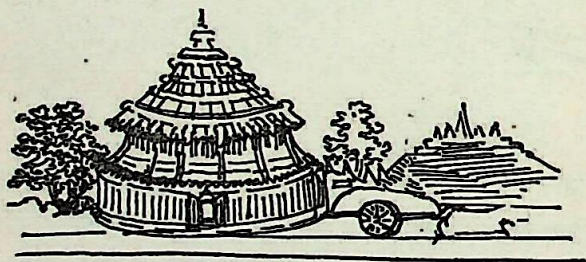
॥ ২ ॥

আলমোড়ার কথা, নন্দাদেবী, আমাদের কথা

কুঁমায়ুঁ বিভাগের সদর ও পাইন ফরেষ্টের জন্য যে খ্যাতি, এক শতাব্দী পূর্ব্ব পর্য্যন্তও আলমোড়া ইহা অপেক্ষা উচ্চ গৌরবের স্থান ছিল। সেই কারণে এ স্থানের কিছু ঐতিহাসিক মাহাত্ম্য আছে। বহুকাল পর্য্যন্ত ইহা প্রাচীন আর্য্যবংশীয় হিন্দুরাজগণের স্বাধীনতা ও বীরত্বের লীলাভূমি বলিয়া ইহার প্রতাপ ও গৌরব হিমালয়ের মধ্য প্রদেশটি ছাইয়া ফেলিয়াছিল।

গাড়োয়াল, কুঁমায়ুঁ, দোতি, শোর, আসকোট প্রভৃতি মধ্যহিমালয়স্থ কয়েকটি প্রাচীন হিন্দু জনপদ। তাহার মধ্যে গাড়োয়াল, কুঁমায়ুঁ এবং দোতি এই তিনটি বহুকাল ধরিয়া প্রবল ছিল এবং, শোর, আসকোট প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি প্রায়ই এই তিনটির মধ্যে কাহারও না কাহারও অধীনতা স্বীকার করিত। কুঁমায়ুঁই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী বলিয়া এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল।

কুঁমায়ুঁতে সোম অর্থাৎ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ রাজত্ব করিতেন, চম্পাবতী, —অধুনা চম্পাওয়াৎ ছিল ইহার বহুকালের রাজধানী। কুঁমায়ুঁর উত্তরে ভোট এবং আসকোট, দক্ষিণে রোহিলখণ্ড, পূর্ব্বে শোর এবং সারদা নদী, পশ্চিমে গাড়োয়াল। সারদার অপর নাম কালী।

কুঁমায়ুঁর পূর্ব্ব সীমান্তে যে সারদানদী তাহার পূর্ব্বপারেই দোতি রাজ্য, —সেথায় পূর্ব্বে রায়ক্ক রাজারা রাজত্ব করিতেন। এই দোতির সঙ্গে কুঁমায়ুঁর বহুকালের ঘোরতর শত্রুতা। দোতি রাজ্য এখন নেপালের অন্তর্ভুক্ত।

উহাদের আক্রোশের মূল কারণটি কালী কুঁমায়ুঁ লইয়া। সে ছিল এইরূপ :—

কুঁমায়ুঁর পূর্ব্ব সীমানায় শোর রাজ্যের ঠিক দক্ষিণে কুঁমায়ুঁর কতক অংশ সারদার কোল অবধি বিস্তৃত ছিল, তাহাকে কালীকুঁমায়ুঁ বলিত। চম্পাওয়াৎ রাজধানীটি ছিল কালীকুঁমায়ুঁর মধ্যে, যাহা নদীতীর হইতে

মাত্র চারি ক্রোশ পশ্চিমে, আর সারদার ওপারেই অর্থাৎ পূর্ব্বপারে দোতি রাজ্য। শোর রাজ্যটি তখন দোতিরাজের অধিকারে ছিল।

বহুপূর্ব্বে একসময় পররাজ্যলোলুপ দোতিয়াল রাজা, কুঁমায়ুঁ রাজার অনুপস্থিতিতে সুযোগ বুঝিয়া সারদা পার হইলেন এবং অতর্কিত অবস্থায় হঠাৎ রাজধানী আক্রমণপূর্ব্বক চম্পাওয়াতের সুদৃঢ় কেল্লা দখল করিয়া বসিলেন।

দোতিরাজ এই বুঝিয়াছিলেন যে, কোনরূপে একবার চম্পাওয়াৎ দখল করিতে পারিলে, কালীকুঁমায়ুঁর সবটাই ক্রমে তাঁহার অধিকারে আসিবে। তাহার পর, একবার বসিতে পারিলে পশ্চিমের সমস্ত কুঁমায়ুঁ অধিকার করিতে আর বেশী অসুবিধা হইবে না। কিন্তু সে আশা কার্য্যে পরিণত হইবার সুযোগ ঘটিবার পূর্ব্বেই কুঁমায়ুঁরাজ সসৈন্যে আসিয়া দোতিগণকে পরাজিত, বিপর্য্যস্ত ও লাঞ্ছিত করিয়া সারদা পার করিয়া দিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে শোর রাজ্যের উপরও তাঁহাদের প্রভুত্ব গেল। সেই অবধি কুঁমায়ুঁ এবং দোতির মধ্যে শত্রুতা কখনও মিটে নাই।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে, ভীষম্‌চন্দ নামে চন্দ্রবংশীয়, বলবীর্য্য-শালী বিচক্ষণ এবং শান্তপ্রকৃতি একজন নরপতি কুঁমায়ুঁতে রাজত্ব করিতেন। পুত্রাদি না থাকায় তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা এবং পিতৃব্যের বালকল্যাণ নামে একটি পুত্রকে দত্তকরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কুমার কল্যাণ বয়সে নবীন হইলেও অসাধারণ কর্ম্মদক্ষ বীর এবং প্রতাপশালী যোদ্ধা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বিক্রমে তাঁহার সমকক্ষ ও অঞ্চলে তখন আর কেহ ছিল না।

কালীকুঁমায়ুঁ লইয়া দোতিয়ালের সঙ্গে ঐ ঘটনার পর হইতেই রাজধানী হইতে রাজা কিছুদিনের জন্য অনুপস্থিত থাকিলেই দোতিয়ালগণ সারদা নদী পার হইয়া হঠাৎ রাজধানী আক্রমণ করিত। ইহাতে রাজাকে মধ্যে মধ্যে বড়ই বিপর্য্যস্ত হইতে হইত। তাহা ছাড়া কুঁমায়ুঁর আশেপাশে সিন্নরা, খাসিয়া প্রভৃতি ছোট ছোট কয়টি পার্ব্বত্য জাতি বাস করিত। ক্ষমতায় অধীন হইলেও মাঝে মাঝে দলবদ্ধ হইয়া নিকটস্থ কুঁমায়ুঁর নিরীহ এবং অসতর্ক গৃহস্থ প্রজাগণের মধ্যে পড়িয়া, লুটপাঠ এবং দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধাইয়া বিষম উৎপাত করিত। রাজধানী হইতে অনেকটা দূর বলিয়া রাজা তাহার সদ্য প্রতিকার করিতে পারিতেন না।

এই সকল কারণে রাজা ভীষম্‌চন্দ, চম্পাবতী হইতে দূরে, রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী কোন কেন্দ্রে রাজধানী স্থাপন করিবার সংকল্প করিলেন।

চম্পাবতী হইতে প্রায় বার ক্রোশ পশ্চিমে খাগমারা নামক স্থানে একটি পুরাতন কেল্লা ছিল। তিনি বিশেষরূপে অঞ্চলটি পরিদর্শন করিয়া অবশেষে এই স্থানটিই তাঁহার রাজধানীর জন্য মনোনীত করিলেন; এবং সসৈন্যে তিনি খাগমারায় উপস্থিত হইলেন। যতদিন রাজপ্রাসাদাদি নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ না হয় ততদিন ঐ পুরাতন দুর্গের মধ্যেই থাকিবেন স্থির কারলেন। সঙ্গে ছিল কুমার কল্যাণ আর কয়েকজন বিশ্বাসী কর্ম্মচারী।

এমন অবস্থায় কিছুদিন পর সংবাদ আসিল তাঁহার অনুপস্থিতিতে সুযোগ পাইয়া দোতিয়ালেরা পুনরায় বিপ্লব করিবার যোগাড় করিতেছে। তিনি তাহাতে অধিকাংশ সৈন্য সঙ্গে দিয়া কুমার কল্যাণকে উহাদের দমনার্থে পাঠাইয়া দিলেন।

এদিকে এখানে রাজার নূতন রাজধানী স্থাপনের কথা প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার বিরুদ্ধে এক ভীষণ ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইল। রাজা তাহার বিন্দুবিসর্গ জানিতেও পারিলেন না, বা সাবধান হইবার অবসরও পাইলেন না। নিয়তির বিধানই স্বতন্ত্র।

পূর্ব্বে একবার ভীষম্‌চন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা, কীর্ত্তিচন্দের সময়ে, খাসীয়াগণ কর্ত্তৃক সীমান্তের প্রজারা উৎপীড়িত হওয়ায় উহাদের ঐ অঞ্চল হইতে একেবারে তাড়াইবার জন্য রাজা সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। উহারা খাসীয়াগণকে এক ধার হইতে ভীষণরূপে আক্রমণ করিয়া ঐ পরগণার সমস্ত খাসীয়াবংশ নির্ম্মূল করিবার যোগাড় করিয়াছিল। সেই সময়ে একটি দল তাহাদের আক্রমণ হইতে পলাইয়া রামগড়ের নিকট গাগর শৈলশ্রেণীর মধ্যে একটি পুরাতন ভগ্নপ্রায় দুর্গে আশ্রয় লইয়া বাঁচিল এবং সেই অবধি সেইখানেই তাহারা কতকটা স্বাধীনভাবে বাস করিতে লাগিল।

ইহাদের সর্দ্দারের নাম ছিল গজোয়া। খাগমারায় নূতন রাজধানী পত্তনের কথা গজোয়ার কানে গেল। রামগড় হইতে খাগমারা মাত্র একবেলার পথ। এখানে রাজধানী হইলে তাহাদের নিরাপদে বাস করা কঠিন হইবে ভাবিয়া তাহাদের দলবল একত্র করিয়া মন্ত্রণা আরম্ভ করিল।

তাহাদের পূর্ব্বের রাগ, কীর্ত্তিচন্দের সৈন্যের উৎপীড়ন তাহারা এখনও ভুলিতে পারে নাই। প্রতিহিংসার বহ্নি উহাদের মধ্যে তখন দীপ্ত হইয়া উঠিল। রাজা ভীষম্‌চন্দ তখন রাজধানী প্রতিষ্ঠার জন্য খাগমারার দুর্গ মধ্যে অবস্থান করিতেছেন এবং সঙ্গের সৈন্যগণও কল্যাণের সঙ্গে চম্পাওয়াতের দিকে গিয়াছে, এ সকল সংবাদও তাহাদের নিকট পৌছিল। পরে,—এই উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া এক নিশীথ রাত্রে হঠাৎ গজোয়া সদলবলে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল, এবং বিশ্বস্ত অনুচরবর্গের সহিত রাজাকে বধ করিয়া, পূর্ব্ব অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করিল। তারপর, এবার তাহারা নিরাপদ হইল ভাবিয়া, নিজস্থানে প্রস্থান পূর্ব্বক আনন্দে উৎসবে মত্ত হইল।

সংবাদ বালকল্যাণের নিকট পৌছিতে বিলম্ব হইল না। কুমার কল্যাণ তৎক্ষণাৎ সুকৌশলে দোতিয়ালদিগের সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিলেন এবং সসৈন্যে দ্রুতগতিতে খাগমারায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার পর তিনি রামগড়ে আসিয়া খাসীয়াদিগকে একেবারে সমূলে ধ্বংস করিয়া সেই রক্তে ভীষম্‌চন্দের তর্পণ করিলেন।

তাহার পর কল্যাণ নিরাপদে কুঁমায়ুঁ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন এবং সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই ভীষম্‌চন্দের মনোনীত এই খাগমারাকেই আলমোড়া নাম দিয়া নূতন রাজধানী বলিয়া ঘোষণা করিলেন ইহাই হইল আলমোড়ার জন্মকথা।

এই কল্যাণ আলমোড়াকে কুঁমায়ুঁ রাজ্যের রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, আর এক কল্যাণ ইহার ধ্বংসের কারণ হইলেন। সে ব্যাপারটি এইরূপ :—

এই কল্যাণচন্দই কুঁমায়ুঁর শেষ স্বাধীন রাজা, তিনি নিষ্ঠুর, যথেচ্ছাচারী এবং প্রজাপীড়ক ছিলেন বলিয়াই এতকালের প্রতিষ্ঠিত রাজ্য উচ্ছেদের কারণ হইয়াছিলেন।

তাঁহার অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়াই রাজ্যের কয়েকটি প্রধান ব্যক্তি, গোপনে বিদ্রোহী হইয়া, রোহিলাগণের শরণাপন্ন হইয়াছিল। রাজবংশের সহিত সম্পর্ক থাকায়, সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং বিদ্রোহী এইরূপ সন্দেহ করিয়া তিনি হিম্মু গোঁসাইকে প্রহরীর দ্বারা দরবারে আনাইয়া, সভাস্থ সকলের সমক্ষে, তাঁহার এক চক্ষু উৎপাটিত করিয়া দণ্ডিত করেন।

তাহাতে হিম্মু গোঁসাই, সপরিবারে রোহিলাদের প্রধান, আলী মহম্মদ খাঁর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

কাপুরুষ কল্যাণ, এই সংবাদ জানিতে পারিয়া, হিম্মুকে সমূলে নিপাত করিবার জন্য গুপ্তহন্তা প্রেরণ করিলেন।

হিম্মু প্রাণভয়ে আলী মহম্মদের সৈন্যবেষ্টিত তাঁবুর মধ্যে আশ্রয় লইয়া ছিলেন। গুপ্তহন্তা গভীর নিশীথে সেথায় উপস্থিত সপরিবারে গোঁসাইকে হত্যা করিয়া পলাইয়া আসে।

আলী মহম্মদ একে পূর্ব্ব হইতেই কুঁমায়ুঁ রাজ্যের প্রতি লোলুপ এবং কল্যাণের উপর বিদ্বিষ্ট ছিলেন; তাহার উপর সৈন্যবেষ্টিত তাঁবুর মধ্যে তাঁহারই শরণাগত একজনকে সপরিবারে নিহত দেখিয়া, এবং উহা কল্যাণেরই কাজ জানিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন। তিনি কল্যাণচন্দের উচ্ছেদের জন্য কুঁমায়ুঁ আক্রমণ করিতে দশ সহস্র শিক্ষিত সৈন্যের এক বাহিনী এবং তাঁহার দুইজন দক্ষ সেনাপতিকে প্রেরণ করিলেন।

আজন্ম স্বাধীন চন্দ্রবংশের বংশধর হতভাগ্য কল্যাণ, বিনা যুদ্ধে লোভার পথে গাড়োয়াল রাজ্যে পলায়ন করিয়া রাজার সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। আর এদিকে, রোহিলা সেনাপতি হাপিজ রহমৎ বিনা বাধায় আলমোড়ায় প্রবেশ এবং কেল্লা অধিকার করিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইল।

তারপর বিজয়োন্মত্ত দলবদ্ধ মুসলমান লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। দেবমন্দির সকল ভগ্ন করিল। প্রতিমা বা বিগ্রহ-অঙ্গের যত অলঙ্কার—স্বর্ণ, রৌপ্য মণি, মাণিক্য—কিছুই রাখিল না। স্বর্ণ রৌপ্যের মূর্ত্তি সকল গলাইয়া ধাতুগুলি সংগ্রহ করিল। আর্য্যপুরাঙ্গনাগণের প্রতি যে অমানুষী অত্যাচার হইল তাহা আর বলিবার কথা নহে। তবে অত্যাচারের ভয়ে পূর্ব্বেই অনেকে পর্ব্বত হইতে পড়িয়া, কেহ বা জহর খাইয়া, অনেকে স্বামীর অস্ত্রে মরিয়া এবং কতক জঙ্গলে পলাইয়া বাঁচিল। গোরক্তে আলমোড়ার রাজপথ রঞ্জিত হইল,—অধিকন্তু প্রত্যেক মন্দিরাধিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তিকে গোরক্তে স্নান করাইল। পরে আলমোড়া সম্পূর্ণরূপে লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হইলে তাহারা আনন্দে উন্মত্ত হইয়া দলে দলে প্রতিবেশী পরগণাগুলিতে লুণ্ঠনে অগ্রসর হইল। এই ব্যাপার অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। তখন ইংরাজেরা ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তারের মধ্যাবস্থায়।

তাহার পর ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে আলমোড়া কিছুদিনের জন্য গোরখালির অধিকারে আসে, পরে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ময়রার সময়ে বৃটিশ অধিকারে আসিয়াছে।

আলমোড়ার পুরাতন স্মৃতির মধ্যে আছে কেল্লাটি, নন্দাদেবী, আর মিশনারী স্কুলের নিকট পুরাতন লুপ্তপ্রায় রাজবাটী, উদ্যান প্রভৃতির কতকটুকু।

নন্দা দেবী

১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে রাজা ত্রিমল চন্দ গতায়ু হইলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বাজ বাহাদুর চন্দ কুঁমায়ুঁর রাজা হইয়াছিলেন। তিনি যেমন প্রতাপশালী তেমনি সৌভাগ্যশালী ছিলেন। তাঁহার সময়ে এই আলমোড়ার অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। তাঁহার যুদ্ধ অভিযান কখনও বিফল হয় নাই। রাজা হইয়াই তিনি গাড়োয়াল রাজ্যের পিণ্ডার উপত্যকাস্থিত ব্যধান এবং লোভা আক্রমণ করিলেন। সেখানে বিজয়ী হইয়া আরও অগ্রসর হইয়া প্রসিদ্ধ জুনিয়াগড় দুর্গ আক্রমণ করিলেন। নন্দাদেবী এই জুনিয়াগড়েই ছিলেন। বিজয়ী মহারাজ বাজ বাহাদুর ফিরিয়া আসিবার কালে বিজয়চিহ্নস্বরূপ এই নন্দার প্রতিমাটি আলমোড়ায় লইয়া আসিলেন। পরে পুষ্পমালা, গন্ধ, চন্দনাদি এবং বিচিত্র আভরণে সজ্জিতা পুরসুন্দরীগণের শঙ্খধ্বনির মধ্য দিয়া পুরাতন দুর্গমধ্যস্থ এক মন্দিরে দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

পূর্ব্বকালে রাজারা রাজ্য জয় করিলে, সেই রাজার রাজ্যশ্রী অর্থাৎ সেই রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত উপাস্য বা ইষ্টমূর্ত্তিটি অগ্রে অধিকার করিতেন। তাঁহাদের সংস্কার এইরূপ ছিল যে,—রাজ্যজয়ের সঙ্গেই পরাজিত রাজার ভাগ্যলক্ষ্মীটিকেও জয় করিয়া না লইলে সে জয় সম্পূর্ণ নহে। যুদ্ধ জয় না হইলে ক্ষতি নাই, কোন প্রকারে রাজ্যলক্ষ্মী, অর্থাৎ সেই বংশের প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তিটি হস্তগত হইলেও যুদ্ধের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল বুঝিতে হইবে। এমন কি পরাজিত হইলেও যদি ঠাকুর হাতে আসে তাহা হইলে উহা জয় অপেক্ষা অনেকাংশে গৌরবজনক, যেহেতু ঠাকুর হাতে আসিলে সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যও আসিবে। এই প্রকার সংস্কার তাঁহারা তখনকার দিনে পোষণ করিতেন।

ইহা শুধু এই হিমালয় নহে, বোধ হয় সমগ্র ভারতের প্রত্যেক রাজ-বংশের এই সংস্কার, ভারতবর্ষ সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ অধিকারে আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল।

আমাদের ভারতবর্ষে যতগুলি প্রসিদ্ধ দেবালয় আছে কোন-না-কোন রাজার জয়পরাজয়ের ইতিহাস তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। হিন্দুস্থানের যত পুরাতন দেবমূর্ত্তি, সুরক্ষিত রাজবাটী, দুর্গ বা কেল্লা অথবা সেনা-নিবাসের মধ্যেই স্থাপিত এবং সর্ব্বদাই সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত রাখা হইত। কারণ ঠাকুর চুরি ও লুট তখনকার রাজধর্ম্মের একটা অঙ্গ ছিল।

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে হিমালয়ের মধ্যে নন্দাদেবী সর্ব্বত্রই পরিচিত। মধ্য হিমালয়ে যে চিরতুষারাবৃত সর্ব্বোচ্চ শিখরটি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই নাম নন্দাদেবী। এই নন্দাদেবীকে সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারিণী আদ্যাশক্তি রুদ্রাণী বলিয়াই এ অঞ্চলে পূজা করে। বাজ বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত এই নন্দাই তাহার প্রতীক। ইহার সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে ঃ—

খৃষ্টীয় ১৮১৫ অব্দে আলমোড়া বৃটিশ অধিকারে আসিবার পরেই, নন্দাদেবীর পূজা অনেক দিন বন্ধ ছিল। তাহার কারণ, নূতন বন্দোবস্তের জন্য, যাহার যতটুকু রাজস্ববিহীন সম্পত্তি এবং দেবোত্তর ছিল, সরকার বাহাদুর সমস্তই নিজ হাতে রাখিলেন। এমন কি, রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত দেবসেবার সম্পত্তিটুকুও বাদ গেল না। উহার জন্য তখন দাবী করিবে কে? রাজবংশ তখন ত বলবীর্য্য এবং শ্রীহীন, হতমান, ভীত এবং লুপ্তপ্রায় সাধারণ গৃহস্থের মত গাড়োয়াল রাজ্যে বাস করিতেছিলেন। দেবসেবার ত্রুটি হইতেছে, ইহাতে না জানি আরও কি অমঙ্গল ঘটে ভাবিয়া, ভয়ে ভয়ে দেশের দুই চারিজন্ প্রবীণ ব্যক্তি একত্র পরামর্শ করিয়া সরকার বাহাদুরকে জানাইলেও কর্ত্তৃপক্ষ তাহাতে দেবীপূজার হুকুমও দিলেন না আর দেব-সম্পত্তিও ছাড়িলেন না, তখনও পর্য্যাপ্ত প্রমাণের অপেক্ষায় রহিলেন। তাহাতেই দেবীর পূজা অনেক দিন বন্ধ ছিল।

এই নন্দাকোট সম্বন্ধে এ অঞ্চলে একটি কিম্বদন্তী আছে যে, হিমালয়ের অধিষ্ঠাত্রী রুদ্রাণী, দেবী নন্দা, এই স্থানে সভা করিয়া বসেন এবং নিত্য সঙ্গিনীগণ লইয়া ইচ্ছামত ক্রীড়া বিহারাদি করেন। এখান হইতে চিরতুষারাবৃত শৃঙ্গটি সুন্দর, অতি পরিষ্কার দেখা যায় এবং অতি নিকটে বলিয়াই মনে হয়।

এইভাবে তিন বৎসর কাটিয়া গেল। পরে, কুঁমায়ুঁ বিভাগের কমিশনার হইয়া ট্রেল সাহেব, বিশেষরূপে পরিদর্শনের জন্য ভোটিয়া অঞ্চলে, অর্থাৎ হিমালয়ের যে-অংশে ভোটিয়াগণ বাস করে, সে অঞ্চলে যোহার উপত্যকায় যাইতেছিলেন। সেই সময় নন্দাকোট অতিক্রম করিতে করিতে তাঁহার এক বিভ্রাট উপস্থিত হইল।

সাহেব যখন এই স্থানটি উপভোগ করিতে করিতে অতিক্রম করিতেছিলেন, প্রখর সূর্য্যকিরণে দীপ্ত, নন্দার সেই চিরতুষারমণ্ডিত ধবল শিখরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র, বিজলী প্রভার ন্যায় উহা তীব্র জ্যোতিতে ঝলসিত হইয়া উঠিল। উহা সহ্য করিতে না পারিয়া কমিশনার সাহেবের চক্ষু দুটি পীড়িত হইয়া উঠিল এবং বিষম যন্ত্রণার কারণ হইল। তিনি চক্ষে আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না; ক্রমাগত চক্ষে জল পড়িতে লাগিল, তখন তিনি একপ্রকার অন্ধের মতই হইলেন।

শুভ্র তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতমালা দর্শনে অনেকেরই ওরূপ হয়, উহাকে snow blindness বলে। উহা সারিয়া যায়। সাহেব ভাবিলেন যে তাঁহার তাহাই হইয়াছে। কিন্তু সেটা তাঁহার পক্ষে তাহা অপেক্ষাও কিছু গুরুতর হইল।

সেখানকার স্থানীয় কয়েকটি লোক তাঁহাকে বলিল,—যে, তুমি আলমোড়ার নন্দাদেবীর পূজা বন্ধ করিয়াছ, অনেক দিন হইতে দেবীর পূজা হইতেছে না, তাহাতেই তোমার এরূপ হইয়াছে। যদি এখনও পূজার বন্দোবস্ত এবং দেবসম্পত্তি প্রত্যর্পণ না কর তাহা হইলে তুমি চিরঅন্ধ হইয়া থাকিবে।

সাহেব তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন যে, দেবীর যাহা কিছু সমস্তই ফিরাইয়া দেওয়া হইবে, পূর্ব্বের মত পূজার ব্যবস্থাও করিয়া দিবেন। আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহার স্বীকার-উক্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার চক্ষু সুস্থ হইয়া উঠিল; তিনি শান্তি পাইলেন।

নন্দাদেবীর মূর্ত্তি এখন আর কেল্লার মধ্যে নাই। উহা কমিশনার কর্ত্তৃক স্থানান্তরিত হইয়া কিছু দূরে রাস্তার ধারেই একটি নূতন মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছে, আর কেল্লার মধ্যে সরকারী আপিস, হইয়াছে। এখানকার মন্দিরে কোন বৈশিষ্ট্যই নাই। উহা উড়িষ্যার সাধারণ মন্দিরের ছাঁচেই অনেকটা গঠিত এবং সাদা চুনকাম করা এবং সর্ব্ববিধ স্থাপত্যালঙ্কারশূন্য।

কেল্লার মধ্যে এখন আর দেখিবার কিছুই নাই। আছে কেবল প্রস্তর-প্রাচীরবেষ্টিত একটি উচ্চভূমি। তাহাতে একটি অশ্বত্থবৃক্ষ আর দুই-তিনটি ইমারত—তাহার মধ্যে এখন সরকারী আপিস হইয়াছে। তবে মাটির নীচে যে ঘর-দ্বার-গুহা ছিল তাহার মধ্যে যাইবার উপায় নাই, বহুকালাবধি উহা সরকার কর্ত্তৃক বন্ধ হইয়াছে।

আলমোড়ার প্রতিষ্ঠাতা বালকল্যাণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রুদ্রচন্দই মনোমত করিয়া এই কেল্লাটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

কেল্লাটি এখন সরকারী বড় রাস্তার উপরেই বাজারের দিকে যাইতে বামপার্শ্বে অবস্থিত।

* * * * * * *

বর্ত্তমান আলমোড়া একটি অতীব সুন্দর পার্ব্বত্য নগর। তাহার সুপরিষ্কৃত রাস্তাগুলি পর্ব্বতটি বেড়িয়া আছে। চতুর্দ্দিকেই পর্ব্বতমালা তাহার উপরে পাহাড়ী ঝাউ বা পাইনের বন এবং শস্যক্ষেত্রগুলি সর্ব্বত্র সকল স্থান হইতে দৃষ্টির মধ্যে আসে।

পর্ব্বতের উপরে শস্যক্ষেত্র দেখিতে এক নূতন দৃশ্য। দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন শিখরস্থ কোন অদৃশ্য দেউলে উঠিবার জন্যই প্রশস্ত অর্দ্ধচক্রাকার সোপানশ্রেণী, পর্ব্বতের মূল হইতে আয়তন ক্রমে স্তরে স্তরে কেহ কাটিয়া বাহির করিয়াছে। সেই স্তরগুলি বেশী দূর হইতে রেখার মত দেখায়।

সে সময় জ্যৈষ্ঠ মাস, কোথাও কোথাও সবে চাষ আরম্ভ হইয়াছে কোথাও বা হয় নাই। বহুদিন বৃষ্টি না পাইয়া, তরুলতা সকল চারিদিকেই বিবর্ণ, তাহাদের স্বাভাবিক হরিৎ বর্ণের লাবণ্য নাই। আলমোড়ায় সর্ব্বত্রই কৃষ্ণবর্ণের মূল এবং বাহু ও গাঢ় হরিদ্বর্ণের কঠিন সুচিক্কণ পত্রগুচ্ছ, প্রকাণ্ড দেবদারু বৃক্ষ সকল ইতস্ততঃ বহুল দৃষ্টিগোচর হয়। তাহাতে নীলবর্ণের এক প্রকার ফল হয়—দেখিতে বড় সুন্দর।

একটি বড় রাস্তা, পর্ব্বতটি বেড়িয়া বরাবর পূর্ব্বদিকে চলিয়া গিয়াছে তাহার দুই পার্শ্বে দ্বিতল এবং ত্রিতল গৃহ সকল, আলমারীর মত সারি সারি দাঁড়াইয়া আছে। নীচের তলে দোকান এবং দ্বিতল ও ত্রিতলে থাকিবার ঘর। সকল ঘরই নীচু এবং একদিকে ক্ষুদ্র গবাক্ষ।

হিমালয়ের পাদদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরাজশাসনাধীন ভারত-

খণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত সকল লোকালয় এই একই স্থাপত্যের অন্তর্গত। শীতের প্রাধান্য হেতু প্রায় সকল ঘর গবাক্ষশূন্য, কেবল দ্বিতলে, সম্মুখের কক্ষগুলির দুইটি করিয়া প্রশস্ত জানালা দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ জানালার দুইটি করিয়া কপাট থাকে, কিন্তু এখানে দৈর্ঘ্য অপেক্ষা প্রস্থ মাত্রায় অধিক বলিয়া তাহার তিনটি করিয়া কপাট। তাহার বহিরাংশ অর্থাৎ যেদিক বাহির হইতে দেখা যায়, চৌকাট এবং কপাটের উপর নানাবিধ কারুকার্য্য-বিশিষ্ট;—লতাপাতা প্রভৃতি অনেক গড়ন, স্থানীয় সূত্রধরগণের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিতেছে। সেগুলি আবার বিচিত্র বর্ণে বিচিত্র, কিন্তু যাহা কিছু কারিগরী তাহা ঐ সম্মুখস্থ ত্রিধাবিভক্ত প্রশস্ত বাতায়নগুলিতেই। কোন কোন গৃহে, দ্বিতলে উহার মধ্যেই অপ্রশস্ত একটু বারান্দা আছে তাহাতে চিকের পরদা ফেলা। ছাদগুলি সর্ব্বত্রই পাতলা পাথরের টালি কিম্বা শ্লেট দিয়া ছাওয়া। সুমুখ ও পিছন দুই দিক ঢালু।

রাস্তার দুইধারে গৃহগুলির নিম্নতলে মুদী, মনিহারী, মসলা, খাবার, কাপড়, দরজি ও পানের দোকান। তাহার সম্মুখে রাস্তার উপরেই কেহ কেহ শাক-সবজি লইয়া বসে। ফলফুলারীও বিক্রয় হয়, ইহাই এখানকার বাজার। শাক-সবজি এসময় ওখানে বেশী পাওয়া যায় না তবে সময়ের ফল অনেক রকম পাওয়া যায়। পীচ্, আপেল, খোবানী, আখরোট, আনার; এবং ক্যাফল নামে একপ্রকার ফল পাওয়া যায়, তাহা দেখিতে পিপুলের মত। পশ্চিমে, এবং আমাদের দেশে ইহাকে তুঁতফল বলে, আস্বাদ অম্ল কষায় অম্লমধুর রসযুক্ত। ইহা না কি লবণ ও চূর্ণ মরীচ সংযোগে আমাশয়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ। পিচ্‌কে এ অঞ্চলে আড়ু বলে।

এ অঞ্চলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই জাতিই বেশী। আলমোড়ায় কিছু কিছু বৈশ্যও আছে। তাহারাই এখানকার বড় ব্যবসায়ী, সেইহেতু ধনবান এবং প্রতিপত্তিশালী। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় মাত্রেই গরীব, কদাচিৎ দুই একজন ছত্রী সামান্য রকমের জমিজমা রাখে।

শীতের প্রাধান্য এবং জলের অভাবহেতু এ দেশবাসিগণের আচার, সমতল দেশবাসিগণের তুলনায় কিছু ভিন্ন। সে আচার আমাদের কারো কারো কাছে হয়তো নোংরা, অনাচার বলিয়া বোধ হইতে পারে।

আপাদশীর্ষ হিমালয়বাসী পুরুষমাত্রেই চুড়িদার পাতলুন পরে, কাপড়ের

আলমোড়ার রাজপথ

প্রচলন নাই বলিলেই হয়। কেবল রন্ধন এবং ভোজনের সময় ব্রাহ্মণেরা একখানি খাটো কাপড় পরিয়া থাকে। ভোজনের সময় এদিকের হিন্দুমাত্রেই কাপড় পরে। অন্য সময় পাতলুন, তাহার উপর কামিজ ও তাহার উপর ফতুয়া ও গরম কাপড়ের কোট। আর স্ত্রীলোকে ঘাগরা, কাঁচুলী ও ওড়না পরে। আবার কখনও কখনও কাপড়ও পরে, তবে সে সকল কাপড়গুলি মোটামুটি শীতকালের ব্যবহারোপযোগী। গরমের সময়ও ঐরূপ বেশভূষা। উহা প্রায়ই ধোয়া হয় না। প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া শৌচাদি ক্রিয়ার পর বাসি কাপড় না ছাড়িলে ইহাদের শুচিবোধের হানি হয় না। জলের ছিটা তিনবার দিলেই শুদ্ধ। এদেশে জনসাধারণের মধ্যে পলাণ্ডু ও মাংসের প্রচলন আছে। কুঁমায়ুঁ, গাড়োয়াল প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশের সর্ব্বত্রই এইরূপ।

এখানে সাধারণ গৃহস্থের মধ্যে আজকাল লেখাপড়ার বেশ প্রসার। অনেকগুলি গ্রাজুয়েট ও আণ্ডারগ্রাজুয়েট দেখিলাম। তাহা ছাড়া এণ্ট্রান্স পাস বালকবৃন্দের সংখ্যাও কম নহে। বাঙ্গালী বলিয়া তাহারা আমাদের শ্রদ্ধা যত্ন ও সম্মান দেখাইয়াছিল। তবে লেখাপড়া শিখিয়া ইহারাও মাদ্রাজী ও বাঙ্গালীর ন্যায় বেশীর ভাগ চাকরিজীবী হইয়া পড়িয়াছে। যেহেতু ইংরাজ শাসনাধীন ভারতের মধ্যে কোথাও এই শিক্ষার বিধান ঠিক আমাদের জাতীয় সংস্কার এবং প্রয়োজন অনুসারে হয় নাই।

বিবাহপ্রথা সমতলবাসী হিন্দুদেরই মত। যৌতুক দেওয়ার প্রথা কন্যা-পক্ষেরই ঘাড়ে, কেবল ব্রাহ্মণ বিবাহ করিতে গেলে টাকা পণ দিয়া বিবাহ করিতে হয়। তবে পাওনার প্রতি কিছু কড়াকড়ি নাই।

ইহাদের প্রকৃতি বড় শান্ত—চেহারায় এমন একটি কমনীয় ভাব আছে যাহা দেখিলে স্বভাবতঃ প্রীতির উদয় হয়। বাহ্য শৌচাচারের অধিক আড়ম্বর নাই। ইহারা বিলাসী মোটেই নয়। ব্যবহার সরল যাহা সরল অন্তঃকরণের পরিচয়, তবে দেশটি অত্যন্ত গরীব।

মশা, মাছি, ছারপোকা এই কয়টি ছাড়া এখানে আরও একটি উপসর্গ আছে—যাহার অত্যাচার আমরা পূর্ব্বে কখনও ভোগ করি নাই। একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র কীটাণু, মানুষের শরীরের তুলনায় সে গণনাতেই আসে না। তাহার জ্বালায় প্রথম দিন হইতেই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার নামটি পিশু। শুনিলাম, এই শীতপ্রধান দেশেই ইহার

উৎপত্তি, গরমে বাঁচে না। সমস্তরাত্রিই তাহার স্পর্শ সহ্য করিতে হইয়াছে। তাহার দংশন এমন কিছু অসহ্য নয়, কিন্তু তাহার পরশন দুঃসহ! দেহের যে কোন স্থানে, তাহার আবির্ভাব মাত্রেই, যে দুঃসহ কণ্ডূয়ন-স্পৃহা জাগাইয়া তুলে, সংযমের উপায় থাকে না। ইহার পরিণামে, জ্বালা ত সহ্য করিতে হয়ই—অধিকন্তু দেখা যায় প্রায় সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে।

কোনরূপে জামা বা কাপড়ের মধ্যে একটি ঢুকিলে আর রক্ষা নাই; —সে রাত্রে ঘুমের দফা নিশ্চিন্ত। তাহাকে আঙ্গুল দিয়া ধরা যায় না, যেহেতু সে আকৃতিতে ক্ষুদ্র এবং তাহার গা মসৃণ। হিমালয়ে ও তাহার ওপারে তিব্বতের মধ্যে যতদূর গিয়াছি এবং যত লোক দেখিয়াছি প্রায় সকলেই এই পিশুর অত্যাচারে সর্ব্বক্ষণই চঞ্চল এবং অস্বস্থ।

এখানে জলের ব্যবস্থা স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির একটি বৈজ্ঞানিক কীর্ত্তি! আলমোড়ার পার্শ্বস্থ পাহাড়ের একটি ধারা হইতে নলযোগে জল আনিয়া শহরের এক স্থানে বড় বড় জলাধার চৌবাচ্চা পূর্ণ করিয়া রাখা থাকে। তাহা হইতেই সর্ব্বশ্রেণীর লোক পাত্র পূর্ণ করিয়া লইয়া যায়। শহরের বড় রাস্তা হইতে একটু দূরে যাহারা থাকে, তাহাদের কিছু বেশী পরিশ্রম করিতে হয়, অনেকটা চড়াই উৎরাই করিয়া তবে ব্যবহারের জল ঘরে আনিতে হয়।

ছোট একটি সমচতুষ্কোণ চৌবাচ্চা, পাথরে বাঁধান এবং মন্দিরের ন্যায় উহার উপরে গম্বুজওয়ালা ছাদ। তাহার পাড়ের ধাপগুলি প্রশস্ত এবং উচ্চ, ভূগর্ভস্থ ঝরনা হইতে অবিরাম জল উঠিয়া সেই প্রস্তরনির্ম্মিত ক্ষুদ্র জলাশয়টি পূর্ণ হইতেছে। ইহার নাম গোধেরা। স্নানাদি, কাপড় কাচা প্রভৃতি কর্ম্ম কলসে ভরিয়া ঐ জল বাহিরে আনিয়া সম্পন্ন করিতে হয়।

স্নান সেখানে অল্প লোকেই করে। গরীব স্ত্রীলোকেরা কলসে কলসে জল মাথায় লইয়া যায়, আর চৌবাচ্চার বাহিরে প্রশস্ত পাথরে বাঁধান ঢালু চাতাল আছে, সেখানে, সাজিমাটি সাবান দিয়া কাপড় কাচে। ব্যবহৃত অপরিষ্কার জল বাহির হইবার পথ আছে, সেই পথে জল বাহির হইয়া নিম্নে কোন ক্ষেত্রে গিয়া পড়ে। জলের একটুও অপব্যবহার নাই।

তখনকার আলমোড়ার অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় তিন হাজার, তাহার মধ্যে প্রায় দুইশত মুসলমান।

এ অঞ্চলে ভাদ্রমাসে নন্দাষ্টমীতে একটি উৎসব বা পর্ব্ব হয়, সেইটিই এখানকার সর্ব্বপ্রধান উৎসব। ঐ সময় নন্দাদেবীর স্থানে বহু ছাগ বলি হয়, তার সঙ্গে মহিষ বলির প্রথাও আছে।

যখন মহিষ বলি হয় তখন সর্ব্বাগ্রেই এখানকার রাজবংশের কেহ তরবারী দ্বারা মহিষের গর্দ্দানে প্রথম কোপ বা আঘাত দেন, তাহার পর, অপরে উপর্য্যুপরি অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিয়া মহিষটাকে হত্যা করে।

এখানে সকল গ্রামেই শক্তিপূজার অনুষ্ঠান হয়। কোন কোন গ্রামে মহিষমর্দ্দিনী পূজাতে বড় ভয়ানক ব্যাপার হয়।

পূর্ব্বদিনে বধ্য মহিষশাবকটিকে অতি যত্নে ডাল, ভাত প্রভৃতি মানবের নিরামিষ আহার্য্য সকল এবং পূজার দিন তাহাকে নানাপ্রকার মিষ্টান্ন খাওয়ান হইয়া থাকে। তাহার পর তাহাকে পুষ্পমালায় ভূষিত করিয়া ধূপদীপ দ্বারা পূজা করা হয়। পূজা শেষ হইলে, প্রথমে গ্রামের প্রধান মহাশয় একখানি শাণিত তরবারী দ্বারা তাহার কণ্ঠ ভেদ করেন। তাহার পর গ্রামের অন্যান্য সকলে দলবদ্ধ হইয়া তাহাকে তাড়া করে এবং তাহার উপর লাঠি, ছুরি, ছোরা, পাথর প্রভৃতি যাহার পক্ষে যেটি সুবিধাজনক সকলেই সেই অস্ত্রে ক্রমাগত আঘাত করিতে থাকে, যতক্ষণ না তাহার শরীর হইতে প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যায়। ইহা হইল তাহাদের মহিষাসুর বধ! মহিষমর্দ্দিনী পূজার সময় এই কাণ্ডটি ঘটিয়া থাকে, যেহেতু দেবী নাকি মহিষাসুরকে এইরূপে বধ করিয়া জীব কোটি আতঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

আশ্বিন মাসকে এখানে অশৌজ বলে। সেই সময় এখানে নব রাত্রের পর্ব্ব হইয়া থাকে। তখন এখানে দেবী-পূজাদি হয় এবং মেলা বসে। ইহা ছাড়া খুচরা পর্ব্ব এখানে বাঙ্গালাদেশ অপেক্ষা কম নয়। বঙ্গে লক্ষ্মী ও সরস্বতী পূজার যেমন ধুম এদিকে সেটি একেবারেই নাই। বঙ্গদেশ ছাড়া বোধ হয় ভারতের কোথাও সরস্বতী এবং লক্ষ্মীর পৃথক পূজা হয় না।

পশ্চিমাঞ্চলবাসিগণের নিকট বাঙ্গালীদের, মাস মছলীখোর এবং আচারভ্রষ্ট বলিয়া যে একটা দুর্নাম বহুকালাবধি আছে তাহাতে এক ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও হিন্দুস্থানী সমাজের মধ্যে তাহাদের ভোজনের স্থান নাই। ভাত ত দূরের কথা, রুটি পুরী প্রভৃতি পক্কদ্রব্যাদিও বাঙ্গালীর হাতে খাইলে তাহাদের জাতিপাতের বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে। এমন দুএক

স্থানে দেখিয়াছি যে বাঙ্গালীকে তাহারা বাড়ীতে খাইতে দিতেও রাজী নহে।

এই পশ্চিমাঞ্চলের চৌকা বা রন্ধনশালা একটু বিশিষ্ট ধরনের। ঘরের এক কোণে চুলা বা উনান। যিনি রাঁধিবেন তিনি চুলার সম্মুখে একখানি খুরসীতে বসিয়া কার্য্য করিবেন। চুলার কাছে পাচক ও অন্নব্যঞ্জনাদি রাখিবার মত কতকটা স্থান প্রায় এক বিঘৎ উচ্চ আল দেওয়া আছে। সেই বিভক্ত, প্রায় সমচতুষ্কোণ স্থানটিই চৌকা। আর সেই চৌকার পার্শ্বেই আহারের স্থান। এমনই উহার অবস্থান যাহাতে পাচক ঐ স্থান হইতে হাত এবং লম্বাহাতা বাড়াইয়া পরিবেশন পর্য্যন্ত করিতে পারেন। যতক্ষণ রন্ধনকার্য্য শেষ না হয় এবং সকলকার আহারাদি শেষ না হয় ততক্ষণ পাচকের চৌকা হইতে বাহির হইবার নিয়ম নাই, হইলে অশুচি হইবে। পুনরায় তাহাকে স্নান অথবা বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রবেশ করিতে হইবে। আবার কোথাও কোথাও দেখিয়াছি যেমন রন্ধনের জন্য চতুষ্কোণ আল দেওয়া চৌকা, সেইরূপ ভোজনের স্থানগুলিও আল দিয়া পৃথক পৃথক অবস্থিত। এইরূপ ব্যবস্থা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সর্ব্বত্রই আছে, ইহাই প্রাচীন আর্য্য হিন্দুগণের আচরিত প্রথা।

এদেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য মাত্রেই সাধারণত প্রাতঃকালে উঠিয়া শৌচাদির পর স্নান এবং সন্ধ্যাবন্দনা না করিয়া অন্য কাজ করে না।

এখন একটু আমাদের কথা বলি :—

যে নন্দকিশোরজীর সাহায্যে আমরা এখানে বাসা পাইয়াছিলাম, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গী-মহাশয়ের প্রয়াগে কোন সভায় দেখা হয়, সেই পরিচয়েই আমাদের এখানে সহজেই বাসা জুটিয়া গেল।

ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের একটি শাখা বলিয়াছি, তাহারই দ্বিতলের ছোট একটি ঘরে আমাদের থাকিবার স্থান। আমরা যখন চাটাই পাতা সেই ছোট ঘরটিতে, পাশাপাশি নিজ নিজ স্থান ঠিক করিয়া কম্বলাদি বিছাইলাম তখন পাতলুম কোট এবং মাথাটি শ্বেতবর্ণ প্রকাণ্ড পাগড়িতে শোভিত পণ্ডিত নন্দকিশোরজী আসর পিঁড়িতে বসিয়া, আমাদের যাত্রা সম্বন্ধে উৎসাহপূর্ণ বাণীসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন যে আপনারা এখান হইতে শোর দিয়া (অর্থাৎ শোরের প্রধান নগর পিথোরাগড় হইয়া) আসকোটে যাইবেন। আরও বলিলেন, যে, ঘোড়া কুলী যাহা

কিছু লাগিবে সে সমস্ত আমি যোগাড় করিয়া দিব। আপনাদের কোন চিন্তা নাই, সব ঠিক হইয়া যাইবে। এখন আপনারা এখানে কিছুদিন আনন্দে থাকুন। আলমোড়া জায়গা ভাল।

সঙ্গী-মহাশয় সরল মানুষ এ হেন সহায় পাইয়া বিশেষ আপ্যায়িত হইলেন। তিনি আনন্দে পূর্ণ হইয়া হাসিমুখে তাঁহার অভ্যস্ত হিন্দিতে বলিলেন,—যাঁহা হামারা নন্দকিশোরজী হ্যায়,—উহাঁ সব পুরা হ্যায়, কোই চিজকা কমি নেহি। নন্দকিশোরজী তাহাতে অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া সেই প্রকাণ্ড পাগড়ি-আবৃত মস্তকটি নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন,—পণ্ডিতজী, আপ অভি নিশ্চিন্ত হোয়কে ঠার যাইয়ে, সব বন্দবস্ত ঠিক হো যায়গা। পরে নানা প্রকার কথার অবতারণা করিলেন। শেষে ক্লান্তিবোধ করিয়া নমস্কার করিয়া বিদায় লইলেন।

তখন সঙ্গী-মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, নন্দকিশোরজী যে আমাদের শোর অর্থাৎ পিথোরাগড় হয়ে যেতে পরামর্শ দিলেন, আমাদের কি সত্য সত্যই শোর হয়ে যাওয়া হবে নাকি?

আলমোড়া জেলার দুইখানি মানচিত্র সঙ্গেই ছিল। তখনই আমরা ম্যাপ দুইখানি খুলিয়া বিশেষরূপে দেখিয়া ঠিক করিলাম যে নন্দকিশোরেরই হিসাবে ভুল হইয়াছে। আলমোড়া হইতে পিথোরাগড়ের রাস্তা দিয়া আসকোটে যাইতে হইলে আটাত্তর মাইল, আর বেণীনাগ হইয়া যাইলে মোট আটষট্টি মাইল। যখন দশ মাইলের বেড় বা তফাত তখন আমরা বেণীনাগ হইয়া যাইব। তাহাতে দশ মাইল কম, রাস্তাও ভাল।

রাত্রে জলযোগান্তে নিশ্চিন্ত মনে কম্বলমুড়ি দিয়া শয়ন করিলাম। সামান্য শীত ছিল। ভগবৎকৃপায় ঘুমটি বাধ্য থাকায় শয়নমাত্রই সঙ্গী-মহাশয়ের নাক ডাকিতে বিলম্ব হইল না। পিশু এবং একটি ইঁদুরের দৌরাত্ম্যে সে রাত্রে আমার নিদ্রা হইল না।

একটি গণপতির বাহন প্রথম হইতে বড়ই জ্বালাতন আরম্ভ করিলেন। ঘরের মধ্যে তিনি যাহাই করুন তাহাতে বড় ক্ষতি বোধ করি নাই কিন্তু মধ্যে মধ্যে আমার কম্বলাবৃত ক্ষীণ শরীরটির উপর দিয়াই নিঃসঙ্কোচে যাতায়াত, আবার কখনও কখনও বক্ষের উপর বসিয়া কিংকর্তব্য চিন্তাও করিতেছিলেন। শুধু আমার নহে, মধ্যে মধ্যে সঙ্গী-মহাশয়ের ঘন শ্মশ্রুযুক্ত গণ্ডের উপর দিয়াও যাতায়াত করিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে উঠিয়া

বাতি জ্বালিয়া সতর্ক হইতে হইয়াছিল। সেই পাহাড়ী মূষিকবরের বীর আচরণ দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম - ওরূপ ভয়াবহ নাসিকা গর্জ্জনেও তাহার সেই বিন্দুপ্রমাণ ক্ষীণ হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল না!

প্রভাতে দেখা গেল আমার গায়ের কাপড়খানির কোণে, আর পরনের একখানি কাপড়ের কিয়দংশ কাটিয়া মূষিকপ্রবর তাঁহার কর্ম্মশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। দেখিয়া সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন,—তাহলে ত বড় মুস্কিল হল হ্যা! দেখি আমার কিছু কেটেছে কিনা, বলিয়া তাঁহার জামাকাপড়গুলি বেশ করিয়া দেখিয়া শেষে বলিলেন, না আর আমার কিছু কাটেনি, তবু ভাল, আমার উপর তাদের শ্রদ্ধা আছে।

যাহা হউক, অতঃপর আর কোন দিন কিছু অত্যাচার হয় নাই। যা কিছু সেই প্রথম রাত্রেই ঘটিয়াছিল। কিন্তু পিশুর উপদ্রব বরাবরই ছিল। কর্ম্মের বিশেষ ভার থাকায় নন্দকিশোরজীকে দুই তিন দিন পাওয়াই গেল না। আরও দুই একদিন গেল, নন্দকিশোরজীর দেখাই নাই।

এইখানে বাসায় কাজকর্ম্মের জন্য নাগুয়া নামে আমাদের একজন সাময়িক পরিচায়ক রাখা হইয়াছিল। তাহাকে প্রত্যহ চারি আনা করিয়া দিতে হইত। সে বাজার হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আনিয়া দিত, চুলা ধরাইত, জল আনিত, কাপড় কাচিত, ফাইফরমাস খাটিত। নন্দকিশোরের তল্লাসে তাহাকে পাঠাইলে, সে আসিয়া সংবাদ দিল, তিনি দুই এক দিন পরে আসিয়া সব ঠিক করিয়া দিবেন। তিনি একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ে কর্ম্ম করেন এখন তাঁর কাজ বড় বেশী।

তিনি আর আসিলেন না, আমার আর একজন সহায় পাইলাম। তাঁহার নাম লালা অন্তিরাম সা। জাতিতে বৈশ্য, মহাজনী কারবার আছে, এই আলমোড়ায় তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বণিক এবং বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি। প্রথম পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমাদের দুইজনকে পরদিন মধ্যাহ্নে তাঁহার ভবনে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন।

পরদিন তিনি আবার একজন লোকও পাঠাইয়া দিলেন। প্রায় এগারটার সময় তাহার সঙ্গে অন্তিরামের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার শিষ্টাচারে সঙ্গী-মহাশয় অত্যন্ত প্রীত হইয়া মৃদু-হাস্যে আলাপ আরম্ভ করিলেন,—আপ্ ব্যয়েশ্ লোক (অর্থাৎ বৈশ্যজাতি), সারা দুনিয়াকো ধন্‌কি মালিক হ্যায়। ঐ ধন্‌কা সদ্‌ব্যয় করনে আপহি লোক্ জানতা হ্যায়।

গো ব্রাহ্মণকো পালন করনা, দেশমে বাণিজ্যকো বিস্তার করনাই তো আপ্ লোকন কো ধরম হ্যায় ইত্যাদি।

তাহাতে মুগ্ধ সা-জী জোড় হাতে, বিনীত বাক্যে,—মহারাজ, জী-মহারাজ, সম্বোধনে আপ্যায়িত করিলেন। আমরা উপবেশন করিলে সা-জী একটু দূরে গরুড়াসনে উপবেশন করিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের

লালা অন্তিরাম সা
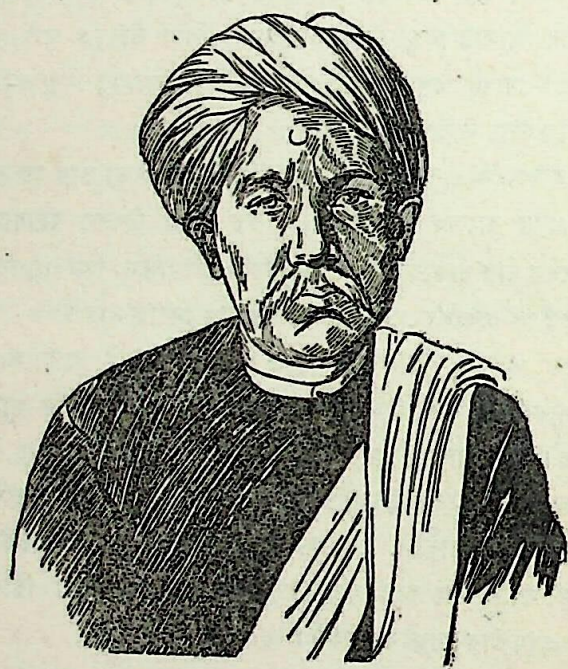
পূর্ব্বপরিচয় সম্বন্ধে দুই একটি কথা এইরূপ বলিলেন যে,—এই আলমোড়া পত্তনের পরে চন্দবংশীয় উদ্যৎ চন্দ্ মহারাজের সঙ্গেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষ লালা নারায়ণ সা এখানে আসিয়াছিলেন। রাজবংশের সহিত আমাদের সখ্য পূর্ব্বাপর অক্ষুণ্ণ ছিল। এই বাড়ীখানিতে আমাদের অনেক পুরুষের বাস। মহাপুণ্যবান ছিলেন লালা নারায়ণ সা, তিনিই মহারাজের আদেশে এইখানে থাকিবার জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করেন। মহারাজ উদ্যৎ চন্দ্, নিজের প্রাসাদ মাল্লা-মহলটি পত্তনকালে যখন ভিত্তি স্থাপন করেন সেই সঙ্গেই তিনি নিজ হস্তে নারায়ণ সার এই গৃহের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করিয়াছিলেন

এবং তিনিই তাঁহাকে, 'থুলঘড়িয়া' উপাধিতে ভূষিত করেন। সেই অবধি আমরা পুরুষানুক্রমে এখানে বাস করিতেছি।

অস্তিরামের কথা শেষ হইলে তখন সঙ্গী-মহাশয় অন্যান্য কথা আরম্ভ করিলেন। সেখানে অস্তিরামের কনিষ্ঠ পুত্রটি দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল, এখন পিতার আদেশে সে আমাদের জন্য আহারাদির ব্যবস্থা করিতে গেল।

ধনপুত্রে লক্ষ্মীলাভ যাহাকে বলে সা-জীর ঠিক তাহাই। পুত্র তাঁহার চারিটি—তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ লালা প্রেমলাল, তিনি পিউড়ের ডেপুটি কলেক্‌টার, মধ্যম ঠাকুর দাস, মহাজনী ও মৃগনাভির ব্যবসায়ে পিতার সহকারী, তৃতীয় গোপাল সা, লোহালক্কড় এবং মনিহারী বিভাগের অধ্যক্ষ, কনিষ্ঠ মনোহর লাল, এলাহাবাদে বি. এ. পড়ে। এখন গরমের ছুটি থাকায় এখানেই ছিল এবং সেই-ই আমাদের তত্ত্বাবধান করিতেছিল।

দুইজনের সঙ্গে আমাদের মিলিবার সুযোগ হইয়াছিল, তাঁহারা বড়ই সরল, বিনয়ী এবং মিষ্টভাষী।

সা-জীর ঘরকন্না বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সাধারণ পর্ব্বতবাসিদের মত নয়। অবশ্য এদিকে সাধারণতঃ ঘরবাড়ী যেমন নীচু হয় সেইরূপ নীচু হইলেও ঘরগুলি এমনভাবে সাজানো যাহাতে গৃহস্থের মার্জ্জিত এবং শিক্ষিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

ভোজনের সময় যে আসনে আমরা বসিলাম উহা উৎকৃষ্ট। নীচে একখানি পিঁড়ি তাহার উপর তিব্বতের পুরু গালিচা। আর আহার্য্য দ্রব্যাদিও তদুপযুক্ত। নানাবিধ নিরামিষ উপকরণের সহিত সূক্ষ্ম আতপান্ন এবং শেষে পরমান্ন। তারপর আচমনান্তে বিবিধ মসলায় মুখ-শুদ্ধি করিয়া কিছুক্ষণ মিষ্টালাপ।

সা-জী বলিলেন যে,—আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন; ঘোড়া, কুলী প্রভৃতি যাহা প্রয়োজন সমস্ত আমি যোগাড় করিয়া দিব; সে কিছু বড় কথা নহে। তাহা ছাড়া পথে স্থানে স্থানে দুই এক পড়াওতে পত্র দিব আপনাদের যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয়। সা-জীর মত লোকের এতাদৃশ অনুগ্রহ ভাবিয়া আমরা পরমাপ্যায়িত হইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা ফিরিবেন কোন্ পথে?

সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন,—কৈলাস হইয়া আমরা আরও পশ্চিমের দিকে, তীর্থ পুরী ভস্মাসুরে স্থানটি দেখিয়া, ওদিকে নীতি পাশ দিয়া বদরী-

নারায়ণের পথে নামিব মনে করিতেছি। অর্থাৎ সেই সঙ্গে আর একবার বদরীকাশ্রমও দেখা হইবে।

সা-জী বলিলেন—আপনারা কদাচ ঐ আশাটি মনে স্থান দিবেন না। একে পথ দুর্গম তার উপর ওপথে ভীষণ ডাকাতের ভয় আছে। কোনরূপ যানবাহনও পাওয়া যাবে না। এদিককার কেউ ও পথ দিয়ে যায় না।

একে বেলা হইয়াছিল, তখনও সা-জীর আহারাদি হয় নাই। পরে এ সম্বন্ধে বিচার করা যাইবে ঠিক করিয়া আমরা উঠিলাম। সঙ্গী-মহাশয় প্রসন্নমুখে অভয় মুদ্রা দেখাইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সা-জীও প্রসন্নচিত্তে আমাদের বিদায় দিলেন।

আমরা ক্রমে ক্রমে পথের জন্য বিশেষ আবশ্যকীয় দ্রব্যাদিও সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। রন্ধনের পাত্র দুইচারিটি, যথা দুইজনের উপযুক্ত একটি পিতলের হাঁড়ি, পিতলের দুই একটি পাত্র, বড় একটি লোটা, চাটু চিম্‌টা প্রভৃতি এইখানেই খরিদ করা হইল।

গরম কাপড়-চোপড় সঙ্গে যাহা ছিল, যথেষ্টই মনে হইল,—আর বোঝা বাড়াইবার প্রয়োজন নাই ভাবিয়া অধিক কিছু লওয়া হইল না। আমার মোজা ছিল না। মোটা পশমের মোজা একজোড়া লওয়া হইল। উপরে বরফান মুলুকে, বরফ দেখিতে দেখিতে চক্ষু খারাপ হয় সেই কারণ ঠুলীদার চশমাও একখানি লইয়াছিলাম। সঙ্গী-মহাশয়ের সঙ্গেই সেইরূপ একখানি ছিল, উহা কলিকাতা হইতে আনা।

এখন আমরা নন্দকিশোরের আশা ছাড়িয়া অন্তিরামের আশায় রহিলাম। নিত্য বৈকালে সহরের মধ্যে এদিক ওদিক বেড়াইতে বাহির হইয়া, ফিরিবার সময় একবার অন্তিরামের গদিতে যাইয়া যাত্রা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা; আর ঘোড়া ও কুলীর যোগাড় কতদূর হইল সেটাও জানিয়া আসিতাম।

তখন ইউরোপের প্রথম মহাসমর মহাবেগেই চলিতেছিল। গৌরাঙ্গের সময়ে যেমন ভগবৎ প্রেমের হিল্লোলে, শান্তিপুর ডুবু-ডুবু, নদে ভেসে যাবার যোগাড় হইয়াছিল, এই মহাসমর হিল্লোলেও সেইরূপ ইউরোপ ডুবু-ডুবু হইয়া শান্তিপ্রিয় এই ভারতভূমি ভাসিয়া যাইবার মত হইয়াছিল। ইউরোপ তখন যথার্থরূপেই টলটলায়মান—ভারতবর্ষে তাহার ধাক্কা লাগিয়া দেশটি নিঃসাড়ে ধনে, জনে এবং প্রাণে দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছিল।

সৈন্য টান পড়ায়, ভারতসরকার কৃপা করিয়া ভারতখণ্ডের সর্ব্বত্র সুস্থ ও সবল যুবকবৃন্দ সৈনিক দলভুক্ত করিয়া রণক্ষেত্রে পাঠাইতেছিলেন। সেখানে তাঁহাদের স্বজাতীয় শ্বেতাঙ্গ সেনাদলকে পিছনে নিরাপদে রক্ষা করিয়া সম্মুখে এই নবীন ভারতীয় সৈন্যবাহিনী প্রবল শত্রুদলের অগ্নিবৃষ্টির মাঝে পাঠাইয়া কিরূপ নির্ভীক ভাবে মরিতে হয় এবং স্বজাতি স্বদেশের জন্য যখন সে কর্ম্ম না থাকিবে তখন বিদেশী প্রভুগণের জাতীয় স্বার্থ ও মান রক্ষার জন্য অন্ততঃ অভ্যাস করিয়া রাখা যে বিশেষ প্রয়োজন, সে কথা নিশ্চিতরূপে বুঝিবার এবং দেখাইবার সুযোগ দিয়া এতদিনের অধীনতাক্লিষ্ট জাতিকে কৃতার্থ করিলেন।

তখন ভারতের সর্ব্বত্রই বৃটিশের তুরীভেরী ও জয়ঢক্কা বাজিতেছিল। সর্ব্বত্রই সৈন্য সংগ্রহের ধুম, যাহার সাধারণ নাম রিক্রুট, (recruit) আর পশ্চিম অঞ্চলে গ্রাম্যভাষায় তাহার নাম রংরুট। সেই রংরুটের ধুম এদিকেও বড় কম ছিল না।

নৈনীতাল, আলমোড়া এবং গাড়োয়াল এই তিনটি জেলা লইয়া কুঁমায়ুঁ বিভাগ। ইহার অধিবাসীর মোট সংখ্যা ১৩,২৮,৭৯০। ইহার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভোটিয়া। ইহার মধ্যে পাঠক ভাবিয়া দেখুন, ষোল হইতে চল্লিশের মধ্যে দেশের যতগুলি যোয়ান মরদ প্রায় সকলেই যুদ্ধের খাতায় নাম লিখাইয়াছে। তারপর বৃটিশবন্ধু নেপালের প্রজাও কম নয়। আমরা দেখিতাম নিত্যই সৈনিকবেশে সজ্জিত হইয়া নবীন এবং প্রবীণ ভোটিয়া এবং নেপালী যুবকের দল আলমোড়া সহরে আসিতেছে এবং দুই একদিন থাকিয়া কাটগুদামের রাস্তা দিয়া রেলযোগে সরকারী কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক উদ্দিষ্ট স্থানে প্রেরিত হইতেছে। আলমোড়া কেন্দ্রে, রণবাদ্য অবিরাম বাজিত। যতক্ষণ আমরা জাগ্রত থাকিতাম ততক্ষণ তুরীধ্বনি আমাদের সজাগ রাখিতে ক্লান্ত হয় নাই। ফলকথা সে সময়ে গাড়ওয়ালী, কুঁমায়ুঁনী এবং হিমালয়ের উচ্চস্তরের নব নব পাহাড়ী সৈনিক দলের যাতায়াতে সহরটি মুখরিত বলিলেও ভুল হয় না। হাটে, মাঠে, বাটে, বাজারে রংরুটের হুড়াহুড়ি। কোথাও দলে দলে দোকানে ঢুকিয়া যথেচ্ছা ধূলিপূর্ণ এবং অসংখ্য মক্ষিকাপৃষ্ট খাদ্যগুলি কিনিয়া খাইতেছে, কোথাও বা পান চিবাইতে ও সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে চলিয়াছে। কোথাও বা পাঁচিলের ধারে পাঁচ সাতজন মিলিয়া আনন্দে গান ধরিয়াছে। তাহাদের সুরের কথা

আর কি বলিব, ভারতীয় সঙ্গীতকলা-পদ্ধতির মধ্যে তাহার স্বরের বিচার হইবে না।

সেদিন নন্দাদেবীর মন্দিরের দিকে আমরা বেড়াইতে গিয়াছিলাম। বাজার পার হইয়াই কাছারী এবং স্কুলের নিকটে দেখা গেল প্রশস্ত এবং ফাঁকা রাস্তার পাশে কতকগুলি পাহাড়ী যুবক রংরুট সশব্দে সিগারেট টানিতেছিল। গম্ভীর সঙ্গী-মহাশয়, স্বাস্থ্যবান পার্ব্বত্য এই নবীনদের মধ্যে ধূমপান দেখিলেন, তাঁহার সহ্য হইল না। অগ্রসর হইয়া তাহাদের সঙ্গে হিন্দীতে কথা আরম্ভ করিলেন। প্রথমে, তাহাদের ঘর কোথা, কি জাতি ইত্যাদি জিজ্ঞাসাবাদ করিতে করিতে ক্রমে তাঁহার স্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে ধূমপানের দোষ সম্বন্ধে বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। এবং পুনঃ পুনঃ,—যো চিজ্‌মে কোই জানওয়ার কভি মু নহি লাগাতা, ও চিজ তোমলোক মানুষ হোয়কে কেঁও পী'তা হ্যায়, ইসমে কলেজা জ্বল্-জাতা হ্যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাহারা প্রথমটা চুপ করিয়া শুনিতেছিল। পরে অপ্রত্যাশিত ঐ সকল কথাগুলি বিশেষ অসম্মানের কটাক্ষ মনে করিয়া তাহাদের মধ্যে একজনের মেজাজ একেবারে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। একে পাহাড়ী, স্বাধীন স্বভাব, তাহাতে বুট ও পাটি বাঁধিয়া এখন সৈনিক হইয়াছে। সেই তপ্তরক্ত সৈনিক পূর্ণমাত্রায় সোজা হইয়া বুক ফুলাইয়া, একেবারে সঙ্গী-মহাশয়ের মুখের কাছে হাত নাড়িয়া সতেজে উত্তর করিল,—তোমরা ডরসে্ পীনা ছোড়েগা? ক্যাহে নেহি পিয়েগা? তোমারা ক্যা হৈ? সরকার বাহাদুর হপ্তেমে নও প্যাকিট সিক্‌রায়েট্ হর সিপাহিকো ওয়াস্তে বাঁটতা; আচ্ছা না মানো তোম্ আপনে মৎ পিয়াকরো; হামকো বলনেকো তোমারা ক্যা এ্যাকৃতিয়ার্ হৈ,—দুনিয়ামে এতনা আদমী,—সিক্‌রায়েট্—পীতে,—

তাহার দফাদার, ভদ্রলোকের সহিত কথান্তর হইতেছে দেখিয়া তাহাকে ধরিয়া ওদিকে ঠেলিয়া দিল। যাইতে যাইতেও সে একবার মুখ ফিরাইয়া,—যব্ সরকার বাহাদুর দেতা তব কেঁও নহি পিয়েগা, বলিতে বলিতে চলিয়া গেল।

আমরা নন্দাদেবীর মন্দির ছাড়াইয়া আরও অনেকটা গেলাম, মিশনারী স্কুলের কোণ পর্য্যন্ত। সেখানে এখন লণ্ডন মিশন স্কুলটি আছে। সহরের সেই একান্ত প্রদেশে রুদ্রচন্দের পুত্র মহারাজ উদ্যৎচন্দের একটি

বিশাল কীর্ত্তি ছিল,—এখন ইহার কতকাংশ স্কুল সংশ্লিষ্ট জমির মধ্যে আসিয়া গিয়াছে। রাজা এক সময় রায়ঙ্ক রাজাদের আক্রমণ হইতে রাজ্য বাঁচাইয়াছিলেন। তিনি অদম্য উৎসাহে যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষের সকল চেষ্টা বিফল এবং আক্রমণকারী সৈন্য সকল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সারদা পার করিয়া দেন। পরে বিজয়ী রাজা রাজধানীতে আসিয়া এই স্থানেই ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে এবং তাহার নিকটেই পর্ব্বতের উপর উদ্যৎচন্দেশ্বর নামে একটি শিবমন্দির স্থাপন করেন। তাহা ছাড়া এই স্থানেই বিজয়-কীর্ত্তিস্বরূপ মল্লামহল নামে তাঁহার মনোমত একটি নূতন প্রাসাদ এবং তৎসংলগ্ন উদ্যান এবং তাহার মধ্যে একটি সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন।

সে আজ প্রায় তিনশত বৎসরের কথা; এখন তাহার যৎসামান্য ভগ্নাবশেষ আছে। এই লণ্ডন মিশন স্কুলটি ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড জে. এইচ. বুডেন কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। কুঁয়ায়ুঁর মধ্যে এইটিই প্রধান স্কুল। বহুদূরস্থ গ্রাম হইতে বালকেরা উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া এখানে পড়িতে আসিয়া থাকে।

এই স্কুলসংলগ্ন উচ্চ জমির উপর রাস্তার নিকটেই একটি সুন্দর এবং বিশাল ইউক্যালিপ্‌ট্যাস গাছ আছে, সেইরূপ বিশাল আয়তনের গাছ প্রায়ই দেখা যায় না।

আমাদের যাইবার দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল ততই সঙ্গী-মহাশয় ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্বেগের কারণ এখনও ঘোড়া, কুলী ঠিক হইতেছে না। আজ প্রাতে আবার সংবাদ পাওয়া গেল যে ঘোড়া পাওয়া যাইবে না। এখান হইতে যে সকল ঘোড়া সওয়ার লইয়া দূরে গিয়াছিল এখন আসিয়া পৌঁছায় নাই। অন্তিরাম বলিলেন, আমি পুনরায় লোক পাঠাইয়াছি।

এখানে ডাকঘরে পর্যটকদের জন্য ছাপা সরকারী একটি তালিকা পাওয়া যায়। তাহাতে স্থানগুলির নাম এবং সেই সেই স্থানে যাইতে ঘোড়া ও কুলীর হার লিপিবদ্ধ আছে কিন্তু তাহাতে ঘোড়া ও কুলীর হার যেরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে অর্থাৎ সাদার উপর বড় বড় কালীর অক্ষরে ছাপা আছে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ব্যবহারের কোন সম্বন্ধ নাই। কখনও দ্বিগুণ কখনও ত্রিগুণ আবার সময়ে সময়ে অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

আলমোড়া হইতে সহজ পথে তিব্বতে যাইতে হইলে আসকোট ও গারবিয়াং হইয়া যাইতে হয়। গারবিয়াংই বৃটিশ রাজ্যের প্রায় শেষ, ঐ অবধি ডাকঘর আছে। তখনকার সরকারী ছাপা তালিকাতে আলমোড়া হইতে আসকোট পর্য্যন্ত ঘোড়া ও কুলীর হার এইরূপ।

আলমোড়া হইতে	মাইল	পড়াও	ঘোড়ার হার	কুলির হার
"	১৩৷৷০	ধওলছিনা	২৲	।৵০
"	৩০	গনোই	৪৲	৸০
"	৪২	বেণীনাগ	৬৲	১৲
"	৫২	থল	৮৲	১।০
"	৬১	ডাণ্ডীহাট	৯৷৷০	১৷৷০
"	৬৮	আসকোট	১১৲	১৷৷৵০
"	১৩০	গারবিয়াং	২৭৲	৩৷৷৵০

আসকোটের পর যে রাস্তা তাহাতে আর সর্ব্বস্থানে ঘোড়া যাইবার সুবিধা নাই। তাহা ছাড়া, আসকোট অপেক্ষা আরও উত্তর দিকে যাইবার কুলী আলমোড়া হইতে পাওয়া যায় না, উহা আসকোট হইতে বন্দোবস্ত করিতে হয়, তাহাও আবার পথের কতকটা পর্য্যন্ত। এ সকল পরে যথাস্থানে বলা আছে।

সরকারী হিসাবে, আলমোড়া হইতে আসকোটের ঘোড়ার ভাড়া এগার টাকা আর কুলী এক টাকা দশ আনা। তবে তালিকাতে একেবার গারবিয়াং অবধি ঘোড়া ও কুলীর হার বাঁধিয়া ছাপান আছে। আলমোড়া হইতে গারবিয়াং ১৩০ মাইল, ঘোড়ার ভাড়া ২৭৲ সাতাশ টাকা আর কুলী ৩৷৷৵০ তিন টাকা দশ আনা মাত্র।

এই ত গেল সরকারের ছাপা রেট, এখন অধিকারীর রেট বড় ভয়ানক। গারবিয়াং ত বহুদূর, শুধু আলমোড়া হইতে আসকোট যাইতে একজন ঘোড়াওয়ালা একটি ঘোড়ার জন্য চাহিল ত্রিশ টাকা। কুলীর কথা এখন থাক্ পরে হইবে।

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর প্রত্যহ ঘুম তাড়াইবার ব্যবস্থায় আমরা দুইজনে বসিয়া নানান কথা কহিতাম। সেই অবসরে আমরা সেদিন ঠিক করিলাম, অত বেশী দাম দিয়া ঘোড়া লওয়া সুবিধাজনক নহে। আমি ভাবিলাম যদি তেমনই হয় তবে আমরা পদব্রজেই যাইব। আগেও তো

দুবার এই দেবভূমিতে হাঁটিয়াই ঘুরিয়াছি,—এটা অজানা পথ বলিয়াই না এত বাহনের খোঁজাখুঁজি। সঙ্গী-মহাশয় যখন বলিলেন,—হিমালয়ের মত মহান, সর্ব্বদেশ পূজ্য গিরিপথে যদি পদব্রজে ভ্রমণই না করলাম তো করলাম কি? আনন্দেই তো আমরা হাঁটবো কি বলো, কেবল কুলী দুটি এখান হতে নিতেই হবে, সঙ্গে জিনিষপত্রের বোঝা ত আছে, ওটি না হলেই নয়। আমি আনন্দেই সায় দিলাম।

তখন তিনি একখানি প্রকাণ্ড ছুরিতে পায়ের কড়া কাটিতেছিলেন। সেই দিকে লক্ষ্য করিতেছি দেখিয়া তিনি বলিলেন,—এখানি ঐতিহাসিক ছুরি জানো, এক সময়ে জাভায় ভ্রমণকালে, এই ছুরিখানি আর একটি লাঠি মাত্র আমায় সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে। এখন এখানি আমার সঙ্গের সাথী, হৃদয়ের সাহস—বলিয়া কিরূপে একরাত্রে একদল বিদেশী লোকের ভয় হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, সেই গল্পও করিলেন। ভাগ্যে ছুরিটি কাছে ছিল।

তারপর তিনি বলিলেন যে—আমি এই হিমালয়ে হাজার মাইল বেড়িয়েছি। কাশ্মীর গিয়েছি, কেদার ও বদরী গিয়েছি, তবে লোকের কাঁধে চড়েই গিয়েছি, হাঁটিনি। এবার কৈলাস যাচ্ছি। হাঁটতে আমি পেছপাও নই, কাল এবং পরশু এই দুইটা দিন দেখে আমরা পরশু দিন অবশ্য অবশ্যই যাত্রা করব। আমার সম্মতি বুঝিয়াই আবার বলিলেন, যা কিছু জিনিষ-পত্র কিন্‌তে বাকী আছে, তা ঠিক করে কাল পরশুর মধ্যে কিনে নেওয়া যাবে। হাঁ ভাল কথা, একখানি আত্মদর্শন আনতে হবে, লিখে নাও ত! প্রথমে আমি ভাল বুঝিতে পারি নাই, জিজ্ঞাসা করিতে তিনি বলিলেন,—আঃ, এটা আর বুঝলে না? যার ভিতর দিয়ে নিজ মুখখানি দেখা যায়; যেখানে যাই আমার সঙ্গে এখানি থাকে, চিরুণীও থাকে, ব্যবহারের কোন জিনিষ কখনও আমি ভুলি না।

সঙ্গী-মহাশয় আলমোড়া অবধি আমায়, আপনি সম্ভাষণ করিতেছিলেন, এখান হইতে, তুমি, ধরিয়াছেন। তিনি বিজ্ঞ এবং বয়োজ্যেষ্ঠ সুতরাং আমার তাহাতে অপ্রীতির কারণ ছিল না।

সেদিন আমাদের ঘরে একজন নূতন লোক আসিলেন। যিনি আসিলেন, তাঁহার নাম পদম্ প্রধান। এই আলমোড়া সহরে তাঁহার এক-খানি মসলাপাতির দোকান আছে। মানস সরোবরের যাত্রী শুনিয়া

আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। তিনি আসিয়া হাত যোড় করিয়া প্রণাম করিলেন এবং ধীরে ধীরে বসিয়া সঙ্গী-মহাশয়ের দিকে চাহিয়া হিন্দীতে বলিলেন—

আমি অধম সংসারী, এ অঞ্চলের পাহাড়িয়া অধিবাসী, আপনারা বিদ্বান, সভ্য এবং বঙ্গদেশীয় মহাত্মা এবং তীর্থযাত্রী, এদেশ পবিত্র করিতে এসেছেন শুনে আপনাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় এসেছি।
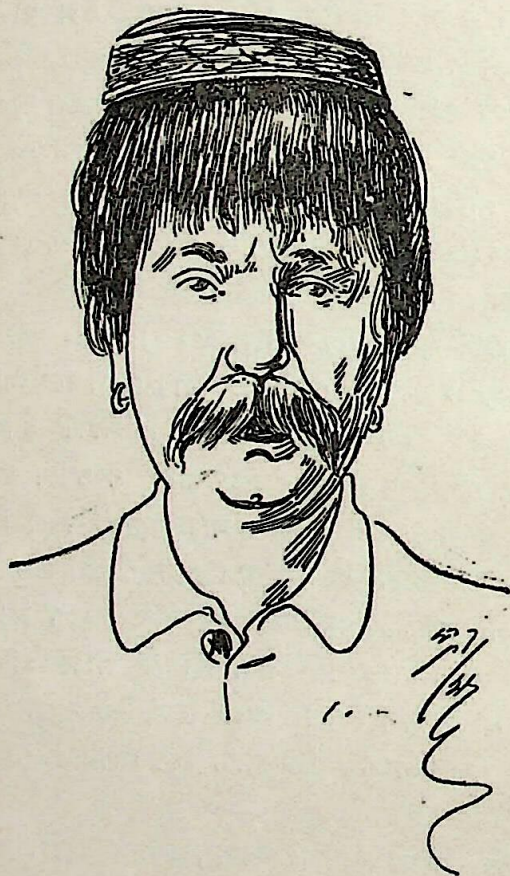
পদম্ প্রধান

তাঁহার এই বিনীত বচনের মধ্যে এক তিলও বাহ্য সৌজন্যের ভান ছিল না। উহা অকপট সরল অন্তঃকরণের কথা। আমরা মুগ্ধ হইলাম।

সঙ্গী-মহাশয় তখন উঠিয়া সোজা হইয়া বসিলেন এবং বেশ সদয় ভাবেই জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপ্ কৌন জাতি হো। পদম্ প্রধান বৈশ্য বলিয়া

নিজের পরিচয় দিলেন। শুনিবামাত্রই সঙ্গী-মহাশয়,—তব তা তোম হামারা বাচ্ছো হো, মেরা লেড়কা হো, বলিয়া সস্নেহে হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

পদম্ প্রধান বিনীত সঙ্কোচের সহিত বলিলেন, আমি আপনাদের কৃপাকাঙ্ক্ষী, আমায় কি করতে হবে আদেশ করুন। আপনাদের কোন-রূপে সাহায্য করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

কিছুদিন পূর্ব্বে স্বামী সত্যদেব নামক একজন পাঞ্জাবী সন্ন্যাসী এই রাস্তা দিয়া মানসসরোবর গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তের মধ্যে এই পদম্ প্রধানের নাম উল্লেখ করিয়া, ইঁহাদের সততা, পরোপকারী ও সাধুসঙ্গপ্রিয় স্বভাবের কথা বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন।

যাহা হউক, তাঁহার প্রতি কৃপার্ত্ত হইয়া আমাদের যে জিনিষগুলি এখনও কিনিতে বাকী আছে, সঙ্গী-মহাশয় সেইগুলি তাঁহাকেই খরিদ করিবার ভার দিলেন। তিনি তাহার একটি তালিকা লিখিয়া লইয়া বলিলেন, আপনাদের এই সমস্ত জিনিষগুলি পরশু সন্ধ্যার মধ্যে এইখানে নিয়ে আসব। এখন বোধ হয় আপনারা বেড়াতে বার হবেন। চলুন আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব। আর আর কথা বেড়াতে বেড়াতেই হবে। আর আপনাদের ন্যায় সাধু মহাত্মাদের সঙ্গে আজ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটাব।

তিনজনে বাহির হইলাম। পথে আরও দুই চারিজন পরিচিত স্থানীয় ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গ লইলেন।

কথা হইতেছিল, সঙ্গী-মহাশয় এখানে একটি বক্তৃতা দিলে বড় ভাল হয়। একজন অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া বসিল, বলিল, কৃপা করিয়া যদি আপনারা এখানে এসেছেন তবে আমাদের কিছু শুনিয়ে যেতে হবে। সঙ্গী-মহাশয় ঈষৎ হাস্যে গম্ভীরভাবে বলিলেন, যেইসা আপলোক কা খুসী ওইসাই হোয়েগা,—লেকেন হাম লোক তরস্থ ইহাঁসে তো যানেকো ওয়াস্তে তৈয়ার হ্যায়, ব্যাখ্যান (বক্তৃতা) কাল হোয়তো আচ্ছা হ্যায়।

তাহাই ঠিক হইল। একজন বলিলেন, ব্যাখ্যানের বিষয়টি ঠিক হইলে আজই সাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া দেওয়া যায়।

সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন, আপনারা যে বিষয় বলবেন সেই বিষয়ই বলা যেতে পারে। আমার ভাণ্ডারে সকল রকমই কিছু কিছু সংগৃহীত আছে। তবে যখন আমরা তীর্থযাত্রী হয়ে বেরিয়েছি তখন বিষয়টি

রহিল তীর্থযাত্রা। আনন্দে সকলেই সম্মত হইলেন। পরদিন নন্দাদেবীর প্রাঙ্গণে তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে সঙ্গী মহাশয়ের বক্তৃতা হইবে, একথা সেইদিনই প্রচার হইয়া গেল।

পরদিন যথাসময়ে মন্দির-প্রাঙ্গণে সভা হইয়াছিল, সভাপতি ছিলেন লালা অন্তিরাম সা। বিশিষ্ট শ্রোতার মধ্যে ওখানকার কয়েকজন উকীল ও স্কুলের দুইচারিজন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় একজন পণ্ডিত স্বললিত হিন্দীতে, গুণবান সঙ্গী-মহাশয়কে শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকটে পরিচিত করাইয়া সভা আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাহার পর সঙ্গী-মহাশয় উঠিলেন।

তাঁহার ভাষা উর্দ্দু, হিন্দী, সংস্কৃত, বাংলা, ইংরাজী মিলিত, তাহা ছাড়া সঙ্গী-মহাশয়ের বক্তৃতা কিছু বিশিষ্ট ধরণের, বেশ চমৎকার। প্রথমে তিনি অতি মৃদুস্বরে আরম্ভ করিলেন—সাধারণ কথা, যেন তাহাতে মনোযোগের বিশেষ কিছুই নাই। এইরূপে সাধারণের মনোযোগ শিথিল করিয়া পরে বক্তৃতার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া হঠাৎ বজ্রগম্ভীর নাদে সভাস্থল কাঁপাইয়া দিলেন। তখন এরূপ ভাবে শ্রোতৃবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন যে তাহাতে সকলে কিছুক্ষণের জন্য একটি উত্তেজনা অনুভব করিল। ভৈরবকণ্ঠে অনেকের তিনি বিস্ময় উৎপাদন করিয়া বেশ অনেকক্ষণ বলিলেন।

তাঁহার বক্তৃতার ভাবটি বড়ই উপযোগী হইয়াছিল। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণগণ জ্ঞান আহরণ, নানাদেশ দর্শন এবং তীর্থ-স্নানের জন্য বসুধা পর্য্যটন করিতেন। তাহার ফলে ভারতের বাহিরে নানাস্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। শ্যাম, জাভা প্রভৃতি দেশ-গুলি এখনও তাহার উজ্জ্বল প্রমাণস্বরূপ রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে যবদ্বীপে বাঙ্গালী প্রবাসী বলিয়া তাঁহার একখানি পুস্তক আছে। দেশ পর্যটন না করিলে কখনও কোন জাতি স্বাধীনতা, জ্ঞান এবং ধন সম্পদে ঐশ্বর্য্যবান হইতে পারে না। এখন আমাদের এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত, ইহাই ছিল তাঁহার বক্তৃতার বিষয়।

তাঁহার ব্যাখ্যান সেখানে সকলেই পছন্দ করিলেন। কেবল স্থানীয় কতকগুলি পাসকরা যুবক, পণ্ডিতজী আচ্ছা হিন্দী নাহি জান্তা—মামূলী জান্‌তা, লেকেন বহুৎ বোলনেওয়ালা হ্যায়,—বলিয়া পরস্পর বাদানুবাদ করিতে লাগিল।

শেষে পরশ্বদিন আমাদের যাওয়া হইবে শুনিয়া সভাপতি অন্তিরাম সা উঠিয়া একেবারে শ্রোতৃবর্গকে শুনাইয়া বলিয়া দিলেন যে, কালও এমনই সময়ে এখানে পণ্ডীতজীর বক্তৃতা হইবে! তাঁহারা পরশুদিন যখন আমাদের ছাড়িয়া যাইবেন তখন আর একদিন একটু কষ্ট করিয়া কিছু বলিতে বোধ হয় তাঁহার আপত্তি হইবে না। পণ্ডিতজী সম্মত হইলেন, সভাও ভঙ্গ হইল। সেইখানেই সা-জী পরদিন মধ্যাহ্নে আবার আমাদের ভোজনের নিমন্ত্রণও করিলেন।

বাসায় ফিরিবার কালে আমার প্রতি সঙ্গী-মহাশয়ের প্রশ্ন হইল, বক্তৃতাটি কেমন হল? বলিলাম, অতি সুন্দর বলা হয়েছে, বিষয়টিও সুন্দর কালোপযোগী হয়েছিল। আপনি বেশ উর্দ্দুও বলতে পারেন। তিনি বলিলেন, ঐ রকম।

পরদিন আবার লালা অন্তিরামের বাটিতে নিমন্ত্রণ, সেখানে যাত্রা সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। অন্তিরাম সা-জী বলিলেন, আমি আপনাদের জন্য ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে পারলাম না। ওদিকে কেউ ঘোড়া ছেড়ে দিতে চায় না, কুলি যখন ইচ্ছা পাওয়া যেতে পারে। তবে আপনারা এখান হতে কিছুদূর গিয়ে গাঙ্গুলীহাটেও ঘোড়া পেতে পারেন। আপনারা বাগেশ্বরের পথে যাবেন নাকি? সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন, আমরা বেণীনাগ হয়ে আসকোট যাব। বাগেশ্বরের রাস্তা ভাল নয়।

বাগেশ্বর একটি প্রাচীন তীর্থ স্থান, সেখানে অনেকগুলি দেবালয় আছে। সেখানে এত শিবমন্দির আছে যে এ অঞ্চলে তাহাকে কৈলাস বলিয়া থাকে। হিমালয় প্রদেশে এত মন্দির এক উত্তর কাশী ব্যতীত আর কোথাও নাই। অন্তিরাম বলিলেন, আপনারা এখান হতে গারবিয়াং অবধি নিশ্চিন্ত হয়ে যাবেন। তারপর লিপুধুরা পার হয়ে তিব্বতে পড়বেন। তখন হতে আপনাদের বিশেষ সাবধানে চলতে হবে। সঙ্গে হাতিয়ার থাকলে ভাল হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—কেন? সা-জী বলিলেন,—তিব্বতের লোকেরা ডাকাত, তারা বিদেশী যাত্রী দেখলে যথাসর্ব্বস্ব লুটে ত নেবেই পরন্তু প্রাণে পর্য্যন্ত মেরে ফেলতে পারে। সেবারে একজন লোকের লাস এখানে এসেছিল তাকে কোনরূপে চিনতে পারা গেল না। তাকে মেরে লিপুধুরার নিকটে ফেলে রেখেছিল। না জানি তাকে কত

পীড়নই করেছে ; তার আপন জন, বেচারার আর কোন খবরই পেলে না।

তাহাতে আমি বলিলাম,—অনেকেই ত যাচ্ছে এবং নিরাপদে ফিরেও আসছে—সকলকারই তো এরূপ দশা হবে একথা ভাবা যায় না।

সা-জী : না তা কেন, সাধুসন্ন্যাসী বা গৈরিকধারী দেখলে তারা প্রায়ই কোন অত্যাচার করে না। লামা মনে করে তাদের ছেড়ে দেয়। ওরা একমাত্র লামাদেরই মানে।

তারপর, আগে অনেক সাহেবও ওখানে গিয়াছিলেন, তার মধ্যে শেরীং, ল্যান্‌ডর প্রভৃতি ইংরাজগণ এই পথেই গিয়াছিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি—

তাহাতে সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন হঁা, তাদের বৃত্তান্ত সব পড়েছি। ল্যান্‌ডর অনেক ভুল এবং আজগুবি কথা লিখেছেন, শেরীংএর রিপোর্টই ঠিক। লর্ড কার্জ্জনের সময় ভারত গভর্ণমেণ্ট হতে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল।

সা-জী শুনিয়া দৃঢ়ভাবে বলিলেন,—ল্যান্‌ডরের রিপোর্ট যথার্থ বলেই আমার বিশ্বাস। তাছাড়া আমি এটা জানি যে তিনি অতি কঠিন কষ্ট স্বীকার করে ওদিকে দুবার গিয়েছিলেন। প্রথমবারে সরকার তাঁর পথে অনেক বাধা সৃষ্টি করেন, তাতেই তিনি দ্বিতীয়বার গিয়েছিলেন। বিলাতে অনেক ক্ষমতাশালী লোক তাঁর পশ্চাতে থাকায় সেবারে সরকারের আর কোন বাধাই কার্যকরী হয় নাই। আর আপনি বোধ হয় এও জানেন শেরীং তার রিপোর্টে অনেকস্থানে ল্যান্‌ডরের ভ্রমণ-কাহিনীর সাহায্য নিয়েছেন।

সঙ্গী-মহাশয়,—তবুও ইহার উত্তরে বলিলেন,—আমি জানি গভর্ণমেণ্ট তার সকল রিপোর্ট ভুল বলে প্রচার করেছেন।

সা-জী,—গভর্ণমেণ্টের কথা যাই হোক না কেন ল্যান্‌ডর কিন্তু অতি সুন্দর লোক ছিলেন। তিব্বতে যাবার আগে তাঁর সমস্ত টাকাকড়ি আমার কাছে রেখে গিয়েছিলেন। পরে তাঁর বিপদের পর আমি এখান হতে তাঁকে টাকা পাঠাই। তাঁর পুস্তকমধ্যে আমার কথাও উল্লেখ করেছেন, তাঁর সঙ্গে আমার বড় প্রীতি হয়েছিল। তাঁর বয়স বেশী নয়,—আটাশ কি ত্রিশ হবে, তিনি ভাল "ড্রইং" জানতেন। ফটোগ্রাফের

সমস্ত সরঞ্জামও তাঁর সঙ্গে ছিল। কিন্তু মোটেই সেখানে ও সমস্ত নিয়ে যাবার যো নাই।

অধীর কৌতুহল লইয়া এবার আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—কেন বলুন দেখি, সা-জী? তখন সা-জী বলিলেন,—ওখানে তারা কোনরূপ যন্ত্র নিয়ে যেতে দেখলে বা কিছু নক্‌সা করতে দেখলে একেবারে সর্ব্বনাশ। সব কেড়ে নিয়ে নষ্ট করে দেবে। ওদের মনে এই ভয় যে ওদের নক্‌সা নিয়ে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট পাছে কোন বিপদ ঘটায়। বিশেষতঃ শরৎচন্দ্র দাসের সেই ব্যাপারের পর ভারতবাসীর উপর তাদের প্রীতি এবং বিশ্বাস চলে গিয়েছে। বিশেষতঃ বাঙ্গালীর উপর।

পাঠক! শরৎচন্দ্র দাসের লামা সাজিয়া ছদ্মবেশে তিব্বতে যাওয়া এবং লর্ড কার্জ্জনের সময় সেখান হইতে বহুতর প্রাচীন পুস্তকাদি এবং নক্‌সা প্রভৃতি আনা ও তিব্বতীয় অভিযানের কথা বোধ হয় অবগত আছেন।

তিনি তিনবার তিব্বত গিয়াছিলেন। লামা সাজিয়া সেখান হইতে গুপ্ত রাজনৈতিক সংবাদসকল সংগ্রহ এবং সেখানকার বিশেষ বিশেষ স্থান দুর্গ এবং রাস্তার নক্‌সা করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়াই গভর্ণমেণ্টের তিব্বতীয় অভিযানটি হইয়াছিল। তাহার ফলে শরৎচন্দ্রের মাথা লইবার জন্য তিব্বত শাসনকর্তৃপক্ষ হইতে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়, এমনকি কলিকাতায় অবস্থানকালেও সরকার বাহাদুর তাঁহাকে প্রহরীবেষ্টিত রাখিয়াছিলেন।

সেথায়,—যাহাদের আশ্রয়ে তিনি ছিলেন তাহাদের যে কি ভীষণ, অমানুষী অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে তাহা আর বলিবার নয়। রাজদ্রোহী সন্দেহে অনেককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইয়াছিল।

তখন হইতেই ভারতবাসী, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর উপর তিব্বতের রাজসরকার বিষম বিদ্বিষ্ট হইয়া আছেন।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের ভাগ্যে যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এখন আমার যে মনটা খারাপ হইয়া গেল। মানসসরোবর, কৈলাস এবং তিব্বতের বিশিষ্ট স্থানগুলির চিত্র লইব বলিয়া কলিকাতা হইতে এত খরচা করিয়া নানা উপকরণসম্ভার সঙ্গে আনিয়াছি তাহার কি গতি হইবে? অন্তিরাম আবার বিশেষ করিয়া বলিলেন যে, ওসকল কিছুতেই সঙ্গে লওয়া হইতেই পারে না, তা হইলে বিপদ সঙ্গে যাইবে।

বাধ্য হইয়া সেগুলি আবার পুনঃ প্রেরণ করাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিলাম। এসম্বন্ধে অন্তিরামের প্রত্যেক কথাটি যে যথার্থ সে পরিচয় সেখানে পাইয়াছিলাম—

বাসায় আসিয়া সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন, বুঝলে হ্যা! আমি সাড়া দিলাম। তিনি বলিলেন,—আমাদেরও গৈরিক ধারণ করে লামা হলে ক্ষতি কি? আমি বলিলাম, অন্ততঃ ধন প্রাণ বাঁচাবার জন্য, কি বলেন? তিনি বলিলেন,—তা নয়ত আর কি! আমি ত অনেক দিনই কাশীতে ছিলাম, বহুদিন সেখানে পাঠাভ্যাস করেছি; সুতরাং আমি ত কাশীর লামা বটেই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তা হলে আমি কোথাকার লামা হব? তিনি—বলিলেন—তুমি ত আমার সঙ্গেই আছ, অর্থাৎ চেলা।

অত লামা-লামির কথায় কাজ নাই। দু'জনের দুইখানি চাদর, সময় মত ব্যবহারের জন্য গৈরিক রং করিয়া লওয়া হইল। তিনি মাত্র একদিন সেখানি ব্যবহার করিয়া তাহার পর তুলিয়া রাখিলেন। মাঝে মাঝে ছোটখাটো দ্রব্য কিছু বাঁধিবার প্রয়োজন হইলে একটু একটু করিয়া ছিঁড়িয়া দিতেন এবং বাকীটুকু তীর্থের পবিত্র চিহ্নস্বরূপ বাটিতে ফেরত লইয়া গিয়াছিলেন। আর আমার খানি সেখান হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর মাথায় বাঁধিয়া রৌদ্র হইতে মাথা বাঁচাইতাম। সঙ্গী-মহাশয়ের ছাতা ছিল।

আমাদের যাত্রার উদ্যোগ এইবারে একেবারে পূর্ণ হইয়া গেল। এখানকার সরকারী কোষাগার হইতে একশত টাকার নোট ভাঙ্গাইয়া লওয়া হইল নগদ পঞ্চাশটি টাকা আর পঞ্চাশ টাকার রেজকী। কথা হইল সামান্য কয়েকটি টাকা যাহা আমার সঙ্গে ছিল,—আর সমস্ত রেজকী আমার কাছেই থাকিবে ও খরচপত্র আমার হাত দিয়াই হইবে। আর সঙ্গী-মহাশয়ের নিজের কাছে টাকা পঞ্চাশটি থাকিবে। আমার নিকট হইতে টাকা কয়টি ফুরাইলে যেখানে টাকার বিশেষ দরকার হইবে রেজকী দিয়া তাহার নিকট হইতে টাকা লইলেই চলিবে। আর সঙ্গে যে টাকা থাকিবে তাহা কি ভাবে লইতে হইবে তাহাও ঠিক করিয়া লওয়া হইল। কথা ছিল এমন সাবধানে আমরা উহা লইব যে বাহিরের কোন ব্যক্তির সন্দেহের কিছুমাত্র কারণ থাকিবে না। শেষে সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন—অভাব মোচনের জন্য পর্য্যাপ্ত টাকা হাতে থাকিলেও খরচের সময়

লোকের কাছে আমরা বিলক্ষণ কার্পণ্য দেখাইব কারণ এইরূপ দূরাগত তীর্থযাত্রী, বিদেশী, খরচের ব্যাপারে উদারতা দেখাইলে লোকের লোভ হওয়া এবং শত্রুতার চেষ্টা অসম্ভব নহে। শাস্ত্রীমহাশয় বিচক্ষণ, তাঁহার উপদেশ মূল্যবান, বিশেষ এই অবস্থায়।

বৈকালে আবার বক্তৃতা আছে আজ সেখানে একা তিনিই গেলেন। ইতিমধ্যে দ্রব্যাদি ভাল করিয়া গুছাইয়া লইব, আরও যাহা কিছু খরিদ করিতে বাকী আছে তাহাও খরিদ করিয়া লইব বলিয়া আমি আর গেলাম না।

সন্ধ্যার পর যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন, জিজ্ঞাসা করিলাম, বক্তৃতা আজ কেমন হল? তিনি বলিলেন,—খুব লোক হয়েছিল, কালকের চেয়ে ঢের বেশী, আজও অনেক কথা বললাম।

কিছুক্ষণ পরে চারিজন ভদ্রলোক সঙ্গী-মহাশয়কে বিদায়সূচক সম্মান দিতে আসিলেন। তিনজন এখানকার উকিল, আর একজন বোধ হয় এখানকার স্কুলের হেডমাষ্টার হইবেন। সকলের হাতেই প্রাচীন প্রথামত, কাগজে মোড়া কিছু না কিছু উপহার। পেস্তা বাদাম, কিশ্‌মিশ খেজুর, পদ্মের খৈ যাহাকে বলে মাখনা প্রভৃতি উপহার্য্য বস্তুগুলি।

তাহার পরেই অস্তিরামের পুত্র আসিয়া পথের জন্য কয়েকখানি পরিচয়-পত্র দিয়া গেল। তাহার পর আর একজন লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, একটা ঘোড়া পাওয়া যেতে পারে, আপনাদের চলবে কি!

সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন,—একটা হলেই বা, মন্দ কি? কতকটা আমি চড়লাম, কতকটা তুমি চড়লে, তাতে অনেকটা শ্রম বাঁচবে, কি বল? আমি বলিলাম,—তাও হয়। তাহাকে বলিয়া দেওয়া হইল যেন প্রাতে ঘোড়াটি আনা হয়।

তাহার পর পদম্ প্রধান আসিলেন, তাঁহার সঙ্গে বাকী সকল দ্রব্য আসিয়া পৌছিল। একটি মিলিটারী স্যাক্ খুব পুরু এবং বড়, অনেক কিছু ধরে এবং ঢাকাওয়ালা ক্যাম্বিসের থলে, আর দুইটি সিপাহীদের জন্য প্রস্তুত কান মুখ ঢাকা পুরু উলের টুপি, আবার সেইরূপ মোটা দুইটি সোয়েটার বা গেঞ্জী পদম্ প্রধানজী যোগাড় করিয়া আনিয়াছেন, সেগুলি পাহাড়ে শীতে ব্যবহারোপযোগী। শ্রদ্ধাপ্রযুক্ত তিনি সঙ্গী-মহাশয়ের জন্য যে জামাটি আনিয়াছেন তাহার মূল্য লইলেন না। মোটা

ক্যাম্বিসের থলেটির জন্যও কিছু লইলেন না, বলিলেন যে,—উহা এমনই পাওয়া গিয়াছে। বিছানা ছাড়া সকল বস্তুই সেই স্যাকের মধ্যে আয়তন-ক্রমে গুছাইয়া লইলাম। প্রয়োজনীয় সকল বস্তুই আমাদের সংগ্রহ হইয়াছিল এমন কি দুইজনের পাহাড়ে উঠিবার লম্বা লাঠি যাহাকে এল্‌পাইন বা হিল-ষ্টিক বলে সেই দুইটি পর্য্যন্ত। পরে মঙ্গলের ঊষা বুধে পা দিবার জন্য সে রাত্রে আমরা জলযোগান্তে শয়ন করিলাম।

মশা এবং পিশুর অত্যাচারে প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটিয়াছে। ভোরে উঠিয়া কোন প্রকারে প্রাতঃকৃত্য শেষে বিছানাপত্র বাঁধিয়া ঘোড়া ও কুলীর অপেক্ষায় রহিলাম। সাড়ে সাতটার সময় ঘোড়া লইয়া একটি লোক আসিল। তাহাকে কুলীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল যে, উহা আড্ডায় পাওয়া যাইবে। স্কুলের নিকট বড় রাস্তার উপর কুলীর আড্ডা। কোনরকমে মালগুলি বাসা হইতে আড্ডার দিকে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া আমরা বাহির হইলাম।

সঙ্গী-মহাশয় ছাতা বগলে, এক হাতে লাঠি লইয়া উচ্চৈঃস্বরে,—জয়তি জয় বলরাম লক্ষ্মণস্থ মহাবল, রাজা জয়তি সুগ্রীবো রাঘবেনাপি পালিতম্, ইত্যাদি শুভযাত্রার মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অগ্রে, আর মাথায় সেই গৈরিক পাগড়ী বাঁধিয়া হাতে লাঠি লইয়া আমি পশ্চাতে চলিলাম। ক্রমে সদর রাস্তার নিকটবর্ত্তী হইলে ঘোড়াওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল—বাবুজী ঘোড়েকো কীরায় (ভাড়া) কেতনা দেউঙ্গা? সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন,—ওবাত সা-জীকা আদ্‌মীকো সাথ ঠিক্ কিয়া নহি?

সে যেন আকাশ হইতে পড়িল। কৌন সা-জী, কৌইকো সাথ কুছ বাত হুয়া নহি। তখন সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন—তব যো রেটমে সবলোক যাতা হায় ওই রেট মিলেগা। সে বিরক্ত হইয়া বলিল,—ও রেটমে কৌন যাতা হায়, পঁচিশ রূপেয়া কো কৌড়ি কম্ হোনেসে ঘোড়া নহি ছোড়েগা।

যাত্রার প্রথমেই ঘোড়া লইয়া এইরূপ কচকচিতে সঙ্গী-মহাশয় একটু চটিয়া গেলেন, বলিলেন—তব নহি চাহিয়ে, লে যাও তোমরা ঘোড়া। সে তৎক্ষণাৎ সেলাম করিয়া—বহুত আচ্ছা, বলিল; আমরাও বড় রাস্তায় উঠিয়া কুলীর আড্ডার নিকটস্থ হইলাম।

কৌন্ জমাদার হিঁয়া হায়, হামলোক আসকোট যায়েগা, দুইঠো কুলী চাহিয়ে,—বলিয়া তিনি জমাদারকে ডাক দিলেন।

জমাদার সাহেব শীতল প্রভাতে, বালসূর্য্যকিরণে একটু আরামে বসিয়া তামাকু টানিবার যোগাড় করিতেছিল, হঠাৎ এইরূপ একজন আগন্তুকের হুকুমে সেও একটু কড়া হইয়া,—আচ্ছা, খাড়া রহিয়ে কুলী বোলায়েগা, রেট ঠিক হোগা তব চলেগা, বলিয়া,—আড্ডার দিকে মুখ ফিরাইয়া একটা হাঁক দিল।

পুরাতন সরকারী দর চারি আনা করিয়া পড়াও—তাহার পর শেষে ছয় আনা করিয়া রেট হইয়াছে। আসকোট পাঁচটি পড়াও সুতরাং সরকারী সংস্কৃত রেট হিসাবে একটাকা চৌদ্দ আনা হওয়া উচিত।

দর লইয়া অনেক বকাবকি হইল। প্রাতঃকালে যাত্রারম্ভেই এইরূপ ব্যাপারে সঙ্গী-মহাশয় চটিয়া গেলেন। তাহাতে তাহারাও বিগড়াইয়া গেল। শেষে জমাদার মধ্যস্থ হইয়া, আসকোট পর্য্যন্ত প্রত্যেক কুলীকে পাঁচ টাকা এবং প্রত্যহ ছয় আনা করিয়া প্রত্যেককে খোরাকী দিতে হইবে ঠিক করিয়া তাহাদের পিঠে মোট তুলিয়া দিল। দুর্গানাম করিয়া আমরা যাত্রা করিলাম। এতক্ষণে শান্ত সঙ্গী-মহাশয় অগ্রে যাইতে যাইতে ঈষৎ আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—এখান থেকেই আমাদের ঠিক কৈলাস যাত্রা সুরু হোলো। আমি বলিলাম,—তা ঠিক।

ইতি, আমাদের আলমোড়া ত্যাগ।
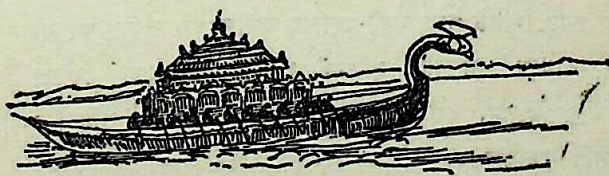
॥ ৩ ॥

আসকোটের পথে

মে নন্দাদেবীর মন্দির অতিক্রম করিয়া বামে মিশনারী স্কুলও ছাড়াইলাম। তাহার পর একেবারে পাইন ফরেষ্টের মধ্যে পড়িয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ক্রমশঃ আমরা যখন কন-সামটিভ্ এসাইলাম্ ছাড়াইয়া পর্ব্বতের চূড়ায় উঠিলাম তখন সূর্য্যদেব অনেকখানি উঠিয়াছেন। সেই স্থান হইতে সহরটি বেশ সুন্দর দেখাইতে লাগিল। আর একবার ভাল করিয়া আলমোড়াকে দেখিলাম।

আলমোড়া হতে আমাদের বেশ সতর্ক হয়েই চলতে হবে, বলিয়াই সঙ্গী-মহাশয় একটু হাসিলেন। আমি,—হাঁ, বলিয়া চলনের বেগ একটু বাড়াইয়া দিলাম। তাহাতে—ওদের সঙ্গে সঙ্গে যাওয়াই ভাল—বলিয়া তিনি কুলীদের প্রতি দেখাইয়া দিলেন।

আলমোড়া হইতে বরীছিনা নয় মাইল,—দেখা গেল,—রাস্তায় মাইলের পাথর দেওয়া আছে। পথটি আগাগোড়া পাইন ফরেষ্টের মধ্য দিয়া, পরিষ্কার, চড়াই উৎরাই বিশেষ নাই।

প্রায় এগারটার সময় গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলাম। স্থানটির নাম বরীছিনা। দুইখানি দোকান পরে পরে, তাহা পার হইয়া রাস্তার ধারে দ্বিতল বারান্দাওয়ালা একটি কাঠের বাড়ী আছে। তাহার নীচের তলে দরজীর দোকান, তাহাতে সিংগার সেলাই-এর কল সজোরে চলিতেছে। উপরে দুইখানি ঘর, তাহা বন্ধ ছিল।

প্রায় পনর মিনিট পরে সঙ্গী-মহাশয় ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমে ছাতাটি মুড়িয়া জামাটি ছাড়িয়া রৌদ্রে দিলেন। বসিয়াই হাঁক্ দিলেন, এই কোন হ্যায়, ইধার আও। শুনিয়া মুদীর যুবক পুত্র আসিয়া দাঁড়াইল।

তু কোন জাতি হ্যায়? সে বলিল, ব্রাহ্মণ। তব তো আচ্ছা, বলিয়া

সঙ্গী-মহাশয় তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, আমরাও ব্রাহ্মণ, কৈলাস যাইতেছি। তোমায় কিছু দেওয়া যাইবে,—ভাত এবং একটি তরকারী রাঁধিয়া দাও; বলিয়া কত চাল এবং কত তরকারী লইতে হইবে বলিয়া দিলেন। তারপর আমার দিকে ফিরিয়া, আমি আগে স্নান করিয়া আসি, বলিয়া গামছা কাঁধে বাহির হইয়া পড়িলেন। এখানে একটি ঝরণা আছে আর সরকারী রাস্তা হইতে প্রায় দেড় শত ফিট নদীর মত আছে। তিনি ঝরণাই পছন্দ করিলেন। তিনি আসিলে নদীতে গিয়া স্নান করিয়া আসিলাম।

এখানে পাইন ফরেষ্টের শোভা অতুলনীয়। তাল গাছের মত লম্বা, উপরে ডগার দিকে, চারিদিক দিয়া শাখা বাহির হইয়াছে—তাহাতে গোছা গোছা ঝাউয়ের শোঁয়া, খাস গ্লাসের ফানুসওয়ালা ঝাড়ের মত প্রত্যেক উপশাখার ডগে এক-একটি লাগিয়া আছে। মূল কাণ্ডটির উপর স্তরে স্তরে অসংখ্য ছাল পড়িয়া মধ্যে ফাটিয়া চৌচীর হইয়া গিয়াছে। ফাটার স্থানগুলি ঘোর নীলবর্ণ, বাকী মধ্য স্থানটি পিঙ্গল, তাহার উপর ঈষৎ নীলবর্ণের আভা। সারি সারি গাছগুলি কতকাল যে ঐরূপ দাঁড়াইয়া আছে তাহার ঠিক নাই। এক একটি গাছ প্রায় চল্লিশ হাত হইবে মনে হয়, তবে সাধারণতঃ গাছগুলি ত্রিশ হইতে পঁয়ত্রিশ হাতের মধ্যেই। এ অঞ্চলে সর্ব্বক্ষণই এই পাইনের গন্ধে দিঙমণ্ডল পরিপূর্ণ, অন্য কোনও গন্ধ নাই।

আমরা আহারাদির পর কিছুক্ষণ সেই বারান্দাতে বিশ্রাম করিয়া যখন উঠিলাম তখন প্রায় দুইটা।

প্রায় তিন মাইল চলিবার পর চড়াই আরম্ভ হইল, তাহাও প্রায় দেড় মাইল হইবে। যখন পর্ব্বত-শিখরে উঠিলাম, তখন সন্ধ্যা আগতপ্রায়। ডাকঘর সংযুক্ত এক মুদীখানায় আমরা আশ্রয় লইলাম। স্থানটির নাম ধওলছিনা, ররীছিনা হইতে সাড়ে চার মাইল। ছিনা শব্দটি শৃঙ্গ শব্দের হিন্দী অপভ্রংশ।

পোষ্টমাষ্টারজী ব্রাহ্মণ। কলিকাতা হইতে আগত, তীর্থ-যাত্রী পরিচয় পাইয়া অতি যত্নে আমাদের দুজনকে স্থান দিলেন। গিয়া বসিবামাত্রই লবণ ও মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত কতকগুলি অম্ল মধুর, ক্যাফল, যাহাকে বাংলায় আমরা তুঁত ফল বলি, পাতায় করিয়া, আমাদের হাতে দিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। পরে রাত্রের জন্য পরিপাটি আহারের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন।

গৃহস্বামীর দুইখানি ঘর—ছেলেমেয়ে স্ত্রী লইয়া একটি ঘরে থাকেন আর একখানিতে মুদীর দোকান এবং ডাকের কার্য্য করা হয় আর রন্ধনের জন্যে একখানি অতি ক্ষুদ্র কুঁড়ে আছে। তাহা ছাড়া বাহিরে গরু এবং অভ্যাগতের জন্য সরু লম্বা দুইখানি ঘর আছে। এ অঞ্চলে শয়ন-ঘরে খাটিয়ার তলায় তৈজস-পত্র এবং আহার্য্য দ্রব্যের ভাণ্ডার থাকে।

এখানে কিছু বেশী ঠাণ্ডা, যেহেতু উহা প্রায় সাড়ে ছয় হাজার ফিট উচ্চ হইবে। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে উত্তর এবং পূর্ব্বদিকের তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতমালা অতি পরিষ্কার দেখা যায়। এখানে একটি ঝরণাও আছে, তাহার জল অতীব শীতল।

পোষ্টমাষ্টার এবং মুদী মহাশয় একই ব্যক্তি। আমাদের দেশে আগে সরকারী স্কুলে যেমন ড্রয়ীং ও ড্রিলের জন্য একই মাষ্টারের ব্যবস্থা ছিল, এদিকেও তেমনি ডাকঘর ও মুদির কাজ একই ব্যক্তির দ্বারা চালানো হয়। মাহিনা আট হইতে দশ টাকার মধ্যেই হইবে, ঠিক মনে নাই। তাঁহার পাঁচ ছয়টি ছেলে-মেয়ে বেশ আনন্দে চারিদিকে খেলিয়া বেড়াইতেছে দেখিলাম।

আট হইতে দশ টাকা ত মাহিনা, না হয় মুদীর দোকানে আরও চার পাঁচ টাকা আয় হইবে, এত অল্পে কি করিয়া তাঁহাদের চলে? আবার আমাদের মত অতিথি অভ্যাগত দুই একজন যে নাই এমন নয়। তাঁহার ছেলেগুলি দেখিয়া নেহাত যে ক্ষুধাক্লিষ্ট শ্রীহীন বা দরিদ্র তাহাতো বোধ হইল না। তাহাদের প্রফুল্ল মুখ, গালে গোলাপের ঈষৎ আভা যাহা স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলিয়া পরিচিত,—এবং যাহা হইতে আমরা ম্যালেরিয়া-পীড়িত বঙ্গসন্তান, অনেকদিন বঞ্চিত হইয়া স্বাস্থ্যলাভের আশায় দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। দেখিয়া প্রাণে বড় আনন্দ হইল।

প্রাঙ্গণে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুইটি কাঠের গুঁড়ি জ্বলিতেছিল। একদিকে পণ্ডিতজী আর একদিকে আমি শয়নের যোগাড় করিলাম। সঙ্গী-মহাশয় বিশেষ বিপন্ন না হইলে ঘরে শুইতেন না। তাহার মূল কারণ এই যে ঘরে শুইলে পাছে কেহ অসহায় পাইয়া আক্রমণ করে এবং বলপূর্ব্বক টাকা কড়ি কাড়িয়া লয়। যাহা হউক পাশে লাঠি আর তাঁর সেই ঐতিহাসিক ছুরিখানি রাখিয়া তিনি সাবধানে সেই অঙ্গনে শয়ন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে বেশ ঠাণ্ডা বোধ হইল। গরম জামা গায়ে দিয়া

বাহির হইলাম। রাস্তা ভাল ছিল আর চড়াই নাই এবার কেবলই উৎরাইয়ের পালা। তাহার উপর জঙ্গলের ভিতর দিয়া পথ। পণ্ডিতজী বলিলেন, ওহে এরূপ ভয়াবহ জঙ্গলের মধ্যে দিয়া একা যাওয়া কোন মতে উচিত নয়, কুলীদের সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া ভাল। একেবারে একসঙ্গে না হয় অল্প ব্যবধান থাকুক, একেবারে এতটা তফাৎ থাকা ভাল নয়।

বুঝিলাম কথাটা সত্য, কিন্তু আমার এটি ভয়ানক দোষ। নগ্নপদে যখন রাস্তা দিয়া চলিতে আরম্ভ করি তখন কত কি মাথা মুণ্ডু ভাবিতে ভাবিতে যাই, আর অজ্ঞাতসারে পা দুইখানি আমার লঘু শরীরটাকে লইয়া ক্রমাগত দ্রুত হইতে দ্রুততর গতিতে সঙ্গীদের অনেক অগ্রে চলিয়া যায়। সময়ে সময়ে ব্যবধান এক মাইলও হইয়া যায়। সঙ্গী-মহাশয় সেটা অত্যন্ত অপছন্দ করিতেন। তিনি মনে করিতেন তাঁহাপেক্ষা দ্রুত চলিতে পারি তাহা দেখাইবার জন্যই আমি ঐরূপ করি। ইহার জন্য তিনি সময় সময় সস্নেহে মিষ্ট তিরস্কারও করিতেন। তিনি যদি অগ্রসর হইয়া বেশী দূর গিয়া পড়েন তাহাতে ক্ষতি নাই, যেহেতু তিনি ধীরে চলেন,—শনৈঃ পন্থা শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনম্, এই মহাবাক্যের সার্থকতা রক্ষা করিয়াই তিনি চলিতেন এবং আমাকেও চলিতে বলিতেন। কিন্তু বয়সের দোষ কোথায় যাইবে। মোটের উপর আমার যে রোগ সেই রোগই রহিয়া গেল।

এ বেলা আমাদের উৎরাইয়ের পালা—জঙ্গলের মধ্য দিয়াই পথ। দেখি বৃক্ষতলে হরিতকি ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে,—দুই চারিটা পকেটস্থ করিলাম। রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে নিম্নে গভীর প্রবল জলস্রোত, আর বামে জঙ্গলময় উচ্চকায় পর্ব্বত কতদূর উঠিয়াছে তাহার ঠিক নাই। মধ্য দিয়া আমরা যাইতেছি, আর দেখিতেছি, পাহাড়ি শ্রমজীবী সকল, পিঠে মোট-বোঝাই, সারি সারি চলিতেছে। ঘাড়ে একটি করিয়া লাঠি প্রত্যেকেরই আছে; লাঠির একপ্রান্তে কাষ্ঠের পাত্রে ঘৃত ঝুলিতেছে—অপর প্রান্ত এক হস্তে মুষ্টিবদ্ধ। কাহারও পৃষ্ঠে কাষ্ঠের বোঝা। তাহারা আলমোড়ার দিকেই যাইতেছে; কারণ যাহা কিছু তাহাদের মাল আলমোড়া সহর ব্যতীত বিক্রয় করিবার অন্য স্থান নাই।

এইরূপ দেখিতে দেখিতে ক্রমে আমরা একাদিক্রমে দশটি মাইলের পাথর অতিক্রম করিয়া সরযূ-তটে আসিলাম। পরে তাহার উপরে সেতুটি

পার হইয়া তীরস্থিত একটি আম্রকাননের মধ্যে আশ্রয় লইলাম এবং বাহকেরাও আসিয়া সেইখানে বোঝা নামাইল।

স্থানটির নাম শুনিলাম ভানাউলীসেরা আবার সরযূঘাটও বলে। সেখানে সরযূর বেগ অত্যন্ত প্রবল—সেইজন্য সেতুটি দৃঢ়-স্থূল লৌহরজ্জু ও শলাকা নির্ম্মিত নীচে কাঠের পাটা, তাহার উপর দিয়াই চলিতে হয়। এখানে জলের বেগ এত প্রখর যে হাঁটু-জলে দাঁড়ান যায় না। সরযূ এখানে উত্তর হইতে নামিয়া পশ্চিম দিকে চলিয়া যাওয়ায় বাঁকের জলবেগ ঘূর্ণাবর্ত্তে পরিণত হইয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

সেখানে পৌছিয়াই আমি একখানি পাথরের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িলাম। শরীর ভাল ছিল না, বোধ হয় গত রাত্রে কিম্বা ভোর বেলা ঠাণ্ডা লাগিয়া থাকিবে।

একখানি হিন্দু ও একখানি মুসলমানের দোকান এইখানে আছে—দেখিতে দেখিতে দুই একটি বালক সেই দিক হইতে আমাদের দিকে আসিতে লাগিল। তাহার মধ্যে একটি বালক একেবারে আমাদের কাছে আসিয়া বসিল এবং বিদেশী দেখিয়া মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। তাহাকে দেখিতে বেশ সুন্দর, গৌরবর্ণ, তাহার উপর গালে লালের আভা, মুখখানি গোল গোল, যেন গোপালটি। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার নাম কি? সে বলিল, ইব্রাহিম। পরে বলিল, উপর হামারা পিতাজীকো দুকান হ্যায়। জিজ্ঞাসা করিলাম, কিসের দুকান? সে বলিল,—মোদিকা, আউর কাপড়া ভি হ্যায়; আপকো ক্যা চাহিয়ে বলিয়ে না,—হাম আভি লাউঙ্গা। সে একেবারে তটস্থ। হিমালয়ের এতদূরেও মুসলমান আছে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম।

সঙ্গী-মহাশয় তেল না মাখিয়া স্নান করেন না—তিনি বলিতেন, তেলে জলেই বাঙ্গালীর শরীর। তৈল আনাইবার অভিপ্রায়ে তিনি প্রথমে হিন্দুর দোকানে পাওয়া যায় কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। পাওয়া গেল না, ফুরাইয়া গিয়াছে, অগত্যা ইব্রাহিম তাহাদের দোকান হইতে তৈল আনিল। আমরা যতক্ষণ ছিলাম ততক্ষণ সে কাছ-ছাড়া হয় নাই, কত কথাই কহিতে লাগিল,—হামারা পিতাজী আলমোড়েমে মাল খরিদনে গিয়া, কাল আয় যায়গা,—আপকো আউর ক্যা চাহিয়ে বলিয়ে না? আমি বলিলাম,—কুছ নেহি, তুম্ ইহাঁ বৈঠা রহো উর হামারা সাথ বাত করো।

আমি শুইয়াছিলাম, দেখিয়া সে কারণ জিজ্ঞাসা করিল। শরীর সুস্থ নাই, বলাতে সে বলিল, বাবুজী ইহাঁ মৎ শোনা, বিচ্ছু হ্যায়, পাত্থরমে ঘুসা রহতা—আদমী দেখ্‌নেসে নিকালকে কাটতা, ঔর ডঙ্ক্‌ মারতা হৈ। শুনিয়া আমি উঠিয়া বসিলাম, তখন সে বলিল—

হাঁ বৈঠনাই আচ্ছাহৈ, বাবুজী, ও যদি নিকাল্‌কে ডঙ্ক্‌ মারে গা, তব তো বিখ চড় যায়গা। ফির ও উতারনা মুস্কিল হৈ।

আমরা যখন এখানে আসিয়া পৌঁছিলাম—সেই সময় একজন মুরুব্বি গোছের লোক জাতিতে ছত্রী ঐ স্থানে পানভোজন সারিয়া যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন। সঙ্গী-মহাশয় বাক্যলাপে তাঁহাকে বেশ তরল করিয়া, ভোজনের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আনাইয়া লইলেন, পরে স্নানান্তে আসিয়া ভাতে ভাত চড়াইয়া দিলেন। তাহারা একটু দূরে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল।

এখানে, পর্ব্বতের এই অঞ্চলে বেশ কলা হয়,—বাগানের মধ্যে অনেকগুলি গাছ আছে। শুধু কলা নয়, আম প্রভৃতি আরও কয়েকটি ফলের গাছ আছে দেখিয়াছি।

আলমোড়া পার হইয়া প্রত্যেক পড়াওতে একটি করিয়া সরকারী মুদীর দোকান, এরূপ আসকোট পর্য্যন্ত আছে। তাহাতে মোটা চাল, মোটা আটা, ডাল, আলু প্রভৃতি পাওয়া যায়, তাহা ছাড়া কলা মূলাও কখন কখনও পাওয়া যায়, আর কিছুই পাইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির মধ্যে কিছু তরকারীর অভাব আমরা বাঙ্গালী হইয়া বিলক্ষণ বোধ করিয়াছিলাম; কারণ, আমাদের আর কিছু হোক বা না হোক, শাক পাতা ও তরকারীটাই বেশী চলে। এদিকে আলু, তাহাও আবার সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না। এদেশের লোকেরা নিজ নিজ গৃহে প্রাঙ্গণের মধ্যে এধারে ওধারে কিছু কিছু শাক সব্‌জি, কুমড়া, লাউ, করলা প্রভৃতি বুনিয়া থাকে, তাহাতে তাহাদের কষ্টে সৃষ্টে এক প্রকার চলিয়া যায়। আর যখন কিছু পায় না তখন উরূদ, চানা কিম্বা ড়হরকি দাল আর আমকি আচার ত আছেই। সুতরাং এক্ষেত্রে শাক্‌-সব্‌জি আমাদের মত যাত্রীদের পক্ষে একপ্রকার দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল। দয়ায় শ্রদ্ধায় যদি কেহ দিল তো হইল নচেৎ সংক্ষেপেই সারিতে হইত, তবে আসকোট অবধি আলুটা কোথাও কোথাও মিলিত।

আমরা সরযূঘাটের পর ওদিকে আর মুসলমান দেখি নাই, যদি থাকে তো অতি অল্প কিন্তু আসকোটের পরে ওদিকে আর মোটেই নাই। তবে ওদিকে আর হিন্দুও বড় নাই, সামান্যই আছে, তাহাদের পর যাহারা বাস করে এদিকের হিন্দুরা তাহাদের ভুটিয়া বলে।

স্নান ভোজন শেষ হইতে প্রায় একটা বাজিয়া গেল। তারপর আমরা সেই কাননের একটি বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিয়া দুইটা নাগাদ তল্পী গুটাইলাম। দেনা পাওনা চুকাইয়া দিবার সময় ইব্রাহিমের তেলের দাম দুই পয়সা তাহাকে দিতে গেলে সে কিছুতেই লইল না, কেবল ঘাড় হেঁট করিয়া 'নেহি নেহি' বলিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন লইবে না? সে বলিল—বো জীমিদারনে আপকো দহি দিয়া, আলু দিয়া, চাউল ভি দিয়া, হামতো কুছ দিয়া নেহি, হামরা থোড়া তেল আপ নেহি লেঙ্গে? তাহার মুখখানি এত সুন্দর এবং কথাগুলি এমন মিষ্ট। সে যখন কিছুতেই লইল না, তখন সঙ্গী-মহাশয় সেই পয়সা দুইটি অপর বালকের হাতে দিলেন। যাত্রা করিবার সময় যখন সকলে 'রাম রাম' বলিল তখন সেও জোড় হাত করিয়া 'রাম রাম' বলিল, আমরাও চলিলাম।

পথটি বন্ধুর, তাহার উপর চড়াই, তাহার উপর জঙ্গলের মধ্য দিয়া। যাহা হউক চলিতে চলিতে আমরা এমন একটি জঙ্গলময় স্থানে আসিলাম যেখানে একপা চলিতে আতঙ্ক হয়। দেখিলাম, সঙ্গী-মহাশয় অপেক্ষা করিতেছেন, তিনি অগ্রেই বাহির হইয়াছিলেন। এপথের আরও একটি অসুবিধার কারণ ঝরণা নাই বলিলেই হয়। চলিতে চলিতে পথে একটি ক্ষীণ ধারা পাওয়া গেল, তাহাতে আবার কেহ একটা গাছের পাতা আটকাইয়া দিয়া গিয়াছে জল ঠিক ধারায় পড়িবার জন্য। অতীব ক্ষীণ ধারাটি যাহার নিকট একমিনিট কাল ভিক্ষা করিলে পূর্ণ এক অঞ্জলি জল পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। চড়াই ভাঙ্গিয়া যে তৃষ্ণা পায় তাহাতে এরূপ অপ্রচুর দানে তৃপ্তি হওয়া ত দূরের কথা, তৃষ্ণা যেন আরও বাড়িয়া যায়। এখন এ চড়াই না পার হইলে ত জল পাওয়া যাইবে না, সুতরাং ধৈর্য্য ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখা গেল পার্শ্বে উচ্চ পাহাড়ের একদিক ফাটিয়া কৃষ্ণবর্ণ শিলাজতু বাহির হইয়া নীচে পড়িয়া আছে, তাহার উপর কাল কাল লম্বা দাগ ঠিক যেন বসুধারা পাহাড়ের গায়ে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে।

একস্থানে দেখিলাম পাহাড়ের গায়ে, যেখানে দিয়া পথ গিয়াছে সেই স্থানের প্রায় দুই তিন বিঘা জমি ধসিয়া পড়িয়াছে, উপরে গাছপালা জঙ্গল যাহা ছিল তাহার চিহ্নটি রাখে নাই। বর্ষাকালে বৃষ্টিবাদলের পর পাহাড়ে ধস্ নামে। হিমালয়ে সর্ব্বত্রই এটা হয়। ধস্ নামিলে প্রায়ই তাহার মধ্যে অনেক খনিজ পদার্থ বাহির হইয়া পড়ে দেখা যায়। এই স্থানটিতে

পথের ঝরণা

বহু পরিমাণে চুন বাহির হইয়াছে দেখা গেল। প্রায় পঞ্চাশ কি ষাট হাত একটি গহ্বর, ধবল শ্বেত অসংখ্য চুনের চাপ উদ্গীরণ পূর্ব্বক যেন হাঁ করিয়া রহিয়াছে। তাহারই গা দিয়া রাস্তা। ধস্ নামিলে, যে দিকে সুবিধা সেই দিক দিয়াই পথ পড়ে, কখন উপর কখন নীচে দিয়াও পথের রেখা পড়িতে দেখা যায়। তাহার পর লোক্যাল বোর্ড হইতে লোকজন সাথে ওভারসিয়ার আসিয়া রাস্তাটি কাঠ পাথর চাপাইয়া মজবুত করিয়া দেয়।

প্রায় আলমোড়া হইতেই আমি নগ্ন পদে ছিলাম। খালি পায়ে চলিতে বেশ আরাম আছে, যদি রাস্তায় পাথরের কুচি বেশী না থাকে। আরও শুধু পায়ে হাঁটার আর একটি গুণ, গতি স্বভাবতই দ্রুত হইয়া যাইত। বোধ হয়, সঙ্গী-মহাশয়ের নিকট হইতে আমি যে অনেক দূর আগে গিয়া পড়িতাম তাহার কারণই ছিল নগ্ন পদে চলিতাম। তিনি জুতা পায়ে ত চলিতেন বটেই, তাহা ছাড়া একটু মোটা মানুষ কাজেই তিনি মাটো রকম চলিতেন। কোথাও যাত্রার আরম্ভেই বলিতেন,—আমি তোমাদের মত অত দ্রুত চলতে পারব না, ধীরে ধীরে যাব, একটু আগে যাই।

এখন কিন্তু দুজনেই একসঙ্গে যাইতে লাগিলাম। যে রাস্তা দিয়া আমরা যাইতেছিলাম, তাহার বাম পার্শ্বে একটি উচ্চ পর্ব্বত। এই দুই পাহাড়ের মধ্যে দিয়া একটি ক্ষুদ্র জলস্রোত চলিয়াছে। স্থানে স্থানে এরূপ ঘন বৃক্ষলতাসমাকীর্ণ যে, উপর হইতে জলস্রোতটি দেখা যায় না, কিন্তু শব্দ অবিরাম চলিতেছে। এই পাহাড়ের পাথরগুলি অত্যন্ত পুরাতন। মধ্যে মধ্যে সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড স্খলিত হইয়া এক-একটি বৃহৎ গহ্বরের সৃষ্টি করিয়াছে। উহা সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আশ্রয় স্থান।

সঙ্গী-মহাশয় একটু ত্রস্ত হইলেন, বলিলেন,—দেখলে হ্যা, কি ভয়ানক জঙ্গল,—কিছু আওয়াজ পাচ্ছ কি? বলিলাম, কৈ না! বলিতে বলিতে দেখা গেল, দূরে বাম পার্শ্বের সেই জঙ্গলের ভিতর হইতে কি একটা যেন বেশ বড় প্রাণীবিশেষ, সবেগে বাহির হইয়া আর একটি ঝুপী জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। সঙ্গী-মহাশয় তখন বলিলেন,—একটু দ্রুত চল, কুলীরা আগে চলে গিয়েছে।

দূরে যে জঙ্গলে ঐরূপ দেখা গেল, আমরা ঠিক সেইরূপ জঙ্গলের ধার দিয়াই যাইতেছিলাম, সুতরাং আশঙ্কার কারণ যে একেবারেই ছিল না এমন নহে তবে মনে ভয়টা তখনও আসে নাই, সে-কারণ আমি দ্রুত যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলাম না। তাহা ছাড়া সেই গম্ভীর স্তব্ধ পার্ব্বত্য অরণ্যের মধ্যে ক্বচিৎ দুই একটি পাখীর ডাক, তাহাতে নিস্তব্ধ ভাবটি আরও গভীর বোধ হইতেছিল। সেই বন্য মাধুর্য্য মনুষ্যবিশেষের প্রাণকে কিরূপভাবে আকর্ষণ করে, আনন্দ দেয় আবার কাহারও আতঙ্কের কারণ হয়, কেন? তবে ইহাও নিশ্চিত সত্য যে, সেই জঙ্গলেই ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর বাস আর মানুষের সহিত তাহাদের চিরশত্রুতা, তথাপি ইহার মধ্যে কি

এক অমৃত আছে যাহাতে হয়ত কাহারও কাহারও ভয়ের কথা স্মরণেও আসে না। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে কতকটা বিস্ময়, কতকটা অস্পষ্ট আনন্দ অনুভব করিতে করিতে চলিতেছিলাম। সঙ্গী-মহাশয় তখনকার মত বড়ই দ্রুত চলিতে লাগিলেন।

হিমালয়ের সর্ব্বত্রই জলবায়ু ভাল, একথা যেন কেহ মনে স্থান না দেন। এক একটি স্থান খানা খন্দ তাহাতে বৃষ্টির জল জমিয়া তার উপর কতকালের জীর্ণ স্তূপীকৃত তৃণগুল্ম বৃক্ষলতা এবং গলিত পত্রাদিসঙ্কুল, অত্যন্ত দূষিত বায়ু পূর্ণ, তাহাতে আবার বিষাক্ত পাহাড়ি মশক এবং জলৌকার প্রাদুর্ভাব আমাদের বাঙ্গালাদেশের পল্লীগ্রাম অপেক্ষা কম নহে। দংশনমাত্রেই জ্বালা ও সঙ্গে সঙ্গেই স্ফীতি।

স্থানে স্থানে এক একটি পাহাড় আগাগোড়াই অভ্রমিশ্রিত প্রস্তরোৎপন্ন, তাহা এত পুরাতন, এত জীর্ণ যে মাটির মত অঙ্গুলি পেষণেই চূর্ণ হইয়া যায়। এই সকল পর্ব্বতেই বেশী ধস্ নামে। বৃষ্টি হইলে প্রত্যেক প্রস্তরের সংযোগ স্থানের মধ্যে অনেক দুর অবধি জল প্রবেশ করে, পরে ধীরে ধীরে আল্গা হইয়া যায়, তাহার ফলেই স্থানচ্যুতি ঘটে।

এবার আমরা যে পড়াও পাইব তাহার নাম গণোই, সরযূঘাট হইতে আট মাইল। যাইতে যাইতে চড়াইয়ের উপর পর্যন্ত বড় আর বেশী লোক-জন দেখা গেল না। আমরা পর্ব্বতশীর্ষে কিছুক্ষণ বসিয়া পরে জলের সন্ধানে নীচের দিকে নামিতে লাগিলাম। শুনিলাম উপরে জল পাইবার সম্ভাবনা নাই। নীচে উৎরাইয়ের শেষে একটি ছোট নদী আছে, তাহার ঘোলা জলই এখানকার পানীয়। সেই নদীটি পার হইয়া গণোই যাইতে হইবে।

পার হইবার সময়ে দুই তিন অঞ্জলি জল পান করিয়া দেখিলাম জল বিস্বাদ, তাহার উপর আবার অপরিষ্কার। পাছে অসুখ করে সে ভয়ও আছে, অধিক পানের লোভ সম্বরণ করাই ভাল। সঙ্গী-মহাশয় এ সকল বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইয়া চলিতেন এবং আমাকেও সাবধান করিয়া দিতেন।

পাহাড়ের পথে চড়াই, উৎরাই আর ময়দান। চড়াই বলিতে নিম্ন হইতে ক্রমোচ্চ পথ, উৎরাই ক্রমনিম্ন, আর ময়দান বলিতে সামান্য চড়াই, সামান্য উৎরাই অথবা প্রায় সমতল হইয়া গিয়াছে এমন পথ। আমাদের আজিকার মত চড়াই উৎরাই হইয়া গিয়াছে, এখন ময়দান।

চড়াই

ময়দানকে সঙ্গী-মহাশয় বলিতেন,—ময়দানব, যে হেতু তাহার গতির ঠিক নাই।

গণোই স্থানটি এইরূপ ময়দান পথের উপর অবস্থিত। একটি ক্ষুদ্র পল্লী,

তাহার দক্ষিণ দিকে শস্যক্ষেত্রে বিস্তৃত। উহা পার হইয়া রাস্তা ধরিয়া বরাবর খানিকটা যাইয়াই বাম দিকে কিছু উচ্চ ভূমির উপর একখানি মুদীর দোকান। আমরা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বোঝা নামাইতে বলিলাম। নদী পার হইয়া আসিতে আসিতে এক সরকারী পিয়ন আমাদের সঙ্গী হইয়াছিল। সঙ্গী-মহাশয়ের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে প্রথম পরিচয়েই জানা গেল সে ব্রাহ্মণ, আলমোড়াতে কাজ করে, ছুটি লইয়া ক্ষেতি বাড়ী করিবে বলিয়া সে নিজ গৃহে যাইতেছে।

সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব্বেই গণোই পৌছিলাম। প্রথমে বৃদ্ধ মুদী মহাশয়ের দোকানে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। অল্পে অল্পে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, এমন সময় আরও দুই চারিজন যাত্রী বেণীনাগের দিক হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহারা আলমোড়ায় যাইবে। সঙ্গী-মহাশয় একজনকে তাহাদের মধ্যে মাতব্বর দেখিয়া ডাকিয়া কথা কহিতে কহিতে ক্রমে নীতি-উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। ক্রমে যখন তাহারা আকৃষ্ট হইল তখন সময় বুঝিয়া আমাদের আহারাদি প্রস্তুতের কথা জানানো হইল। বেশী কিছুই বলিতে হইল না, ভোজনের ব্যবস্থা সহজেই হইয়া গেল। উপরন্তু তাহারা বলিল যে আপনারা আজ আমাদের অতিথি আমরা আপনাদের খাওয়াইব, কিছু কিনিতে হইবে না বা পয়সা লাগিবে না।

সদ্যঃপ্রস্তুত অসম্পূর্ণ একটি দ্বিতল গুদাম ঘরে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হইল। তাহার নিম্নে দোকান, আর উপরে দুই দিকে ঢালু ছাদের নীচে ঘর। এতটা পরিশ্রমের পর নিদ্রার ঘোরটা কিছু বেশী লাগিয়াছিল। আহারাদির পরে শয়নের জন্য যখন কম্বলাশ্রয় করা গেল, তখন সেই আশ্রয়দাতা ও আরও দুই চারিজন তাহার সঙ্গে আসিয়া করজোড়ে সঙ্গী-মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল যে মহারাজের আর কি প্রয়োজন? খাওয়া-দাওয়া কেমন হইয়াছে, তৃপ্তি হইয়াছে কি-না ইত্যাদি। শয্যায় শায়িত সঙ্গী-মহাশয়,—বহুত আচ্ছা খিলায়া, বহোত প্রীত হুয়া, তোম লোক কা বহুত ভালা হোগা বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তারপর পায়ের দিকে দেখাইয়া বলিলেন,—হামারা পায়ের তো থোড়া দাবা দেও। তাহারা শেষে এইটুকু সেবাতেও কৃপণতা করিল না।

গণোইতে চাষ-আবাদ বেশ আছে বটে, কিন্তু স্থানটির জলবায়ু আদৌ স্বাস্থ্যকর নয়।

প্রভাতে আমরা বেণীনাগ যাত্রা করিলাম। প্রথমে নয় মাইল আন্দাজ ময়দান রাস্তা, তাহার পর প্রায় দেড় মাইল চড়াই, চড়াইয়ের উপরেই বেরীনাগ বা বেণীনাগ শৃঙ্গ।

এখানে একটি প্রকাণ্ড চা-বাগান আছে, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন, কারণ বেরীনাগ-চা ভাল বলিয়া উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় সর্ব্বত্রই খ্যাতি আছে। প্রায় পর্ব্বতের শিখরদেশে উঠিয়া নীচের দিকে নামিতে বিস্তৃত কয়েক স্তর সমতল ভূমির উপরেই এই চা-বাগিচাখানি। পরিদর্শকের গৃহ কিছু দূরে। বাজারের দিকে যাইতে একখানি ডাকবাঙ্গালা আছে, সরকারী কর্ম্ম উপলক্ষে এবং শিকারের জন্যও বটে, সাহেব-সুবাদের গতি-বিধি মধ্যে মধ্যে এখানে হইয়া থাকে।

বাজার বলিতে, রাস্তার উপরেই বেশ প্রশস্ত কতকটা সমতল লম্বা চতুষ্কোণ ভূমি, যেন একটি প্রাঙ্গণ; তাহার বাম পার্শ্বে একখানি মুদী ও একখানি স্বর্ণকারের দোকান। তাহার গায়েই একদিকে একটা ঘরে পোষ্টঅফিস ও তাহার বারান্দায় একটি আস্তাবল, তাহাতে একটি পাহাড়ী পক্ষীরাজ। আর রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে একজন ধনী মুসলমানের দুইখানি দোকান, একখানি কাপড়ের ও একখানি দরজীর দোকান। তাহাতে নানাবিধ কাপড়চোপড় রহিয়াছে; দুইটি সেলাইয়ের কল হুহু শব্দে চলিতেছে। সম্মুখে এক বেশ বড় লম্বা একতল স্কুলগৃহ। ইহাই এখানকার বাজার : লোকালয় ইতস্ততঃ কিছু দূরে দূরে।

স্কুল-গৃহখানি প্রস্তরময়,—একটি বাঙ্গলার ধরন। লম্বা একখানি ঘরকে দুইটি পার্টিসন দিয়া তিনখানি বেশ বড় বড় ঘর করা হইয়াছে। সেই প্রশস্ত পাঠশালার চারি ধারেই চারিহাত প্রশস্ত বারান্দা উপরে ঢালু ছাদ। বারান্দাতেই আমরা আশ্রয় লইলাম। তখন গ্রীষ্মাবকাশ, সুতরাং স্কুল বন্ধ। বাহকেরা সেইখানেই মোট নামাইল।

একটি মাত্র ছোট ধারা। দেখি অনেক লোক জল পাইবার অপেক্ষায় পাত্র হাতে দাঁড়াইয়া,—সুতরাং, এতটা পরিশ্রমের পর শরীরটি স্নিগ্ধ করিবার আশা ত্যাগ করিতে হইল। গা-হাত মুছিয়া যতটা ঠাণ্ডা হওয়া যায় তাহা করিয়া লইলাম। তারপর এক ব্রাহ্মণের সাহায্যে ভোজনের ব্যবস্থা হইল।

আহারাদির পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া উঠিবার ব্যবস্থা করিতে না

করিতেই চারিদিকে কাজল-মেঘ ঘনাইয়া আসিল, তারপর জল আরম্ভ হইল। মেঘ পূর্ব্ব হইতেই জমা হইতেছিল, অতটা তখন লক্ষ্য করি নাই। এখন মুষলধারায় বর্ষণ। প্রায় একঘণ্টা অবিশ্রান্ত বর্ষণের পরেও যখন জল থামিল না, তখন আজিকার মত বেশ যুত করিয়া বিছানা পাতা হইল। এত বৃষ্টিতে যাওয়া যাইতেই পারে না।

আমার বিছানাটি মন্দ নহে। তলায় একখানি বেশ বড় প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট,—ট্যান-করা হরিণের নরম ছাল—লম্বালম্বি ডবলপাট করিয়া রাখা, তাহার উপর দুইখানি কম্বল চারি ভাঁজ করিয়া আমার মত একটি সরু শরীর লম্বা শুইবার উপযুক্ত করিয়া পাতা, আর গায়ের গরম জামাগুলি, ওভার কোট, কোট, বর্ষাতি প্রভৃতি বেশ কায়দায় পর পর পাট-করা মাথার দিকে রাখা, উহা মাথার বালিসের কাজ করিতেছে। আর গায়ে চাপা দিবার জন্য একখানি কম্বল ইহাই আমার বিছানা যখন ডেরা উঠাইতে হয়, তখন ঐ পাট-করা জামাগুলি তলাকার কম্বলের এক প্রান্তের সহিত গুটাইয়া লাক্‌লাইন দড়ি, লম্বে একটা প্রস্থে দুইটা দৃঢ় বন্ধন দিলেই চুকিয়া গেল। যাহা কিছু আমার সরঞ্জাম এবং যথাসর্ব্বস্ব সবই ঐ বেডিং-এর মধ্যে।

দূর হইতে সুদূর তীর্থ উদ্দেশ্যে আমরা আসিয়াছি শুনিয়া, বৈকালে দুই-একজন শ্রমজীবী বৃদ্ধ কলাটা মূলাটা হাতে করিয়া আসিল। সঙ্গী-মহাশয় এখানে একজনকে দুধ যোগাড় করিতে বলিলেন। সে বিশেষ ভরসা দিল না, বলিল যে দুধ এখানে কমই হয় এবং সকলের গাই কি ভেঁষ নাই। অবশেষে সঙ্গী-মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে এক গোয়ালা একটি ছোট ঘটিতে পোয়াটাক দুধ আনিয়া ঘটিটি তাঁহার নিকটে রাখিয়া দিল ও পরে জোড় হাতে তাঁহার আসনের পার্শ্বে বসিয়া, বুঝুক না বুঝুক, হাঁ করিয়া তাঁহার নীতি-কথাসকল উদরস্থ করিতে লাগিল।

সঙ্গী-মশায়ের নাম হইয়া গেল পণ্ডিতজী; এবার হইতে আমরাও তাঁহাকে পণ্ডিতজী নামে অভিহিত করিব। পণ্ডিতজী আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, কেমন, রাত্রের জন্য ত খানিকটা দুধ যোগাড় করা গেল, এখন আর অন্য কি যোগাড় করা যাবে? উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই, যে ব্যক্তি সকালে রান্না করিয়াছিল, তাহার সঙ্গেই পণ্ডিতজী—রাত্রের জন্য রুটি ও তরকারির ব্যবস্থা করিলেন।

স্কুলটি উচ্চ এবং নিম্ন প্রাথমিক, গভর্ণমেণ্ট-সাহায্যপ্রাপ্ত। এ অঞ্চলের

যত গরীব, মধ্যবিত্ত ও মধ্য-শ্রেণীর ছেলেরাই পড়ে। যাহাদের অবস্থা স্বচ্ছল ছেলেদের প্রথমে এখানে পড়াইয়া পরে আলমোড়ায় পড়িতে পাঠায়। আলমোড়া ছাড়িয়া আমরা যে-কয়টি স্থান হইয়া আসিতেছি, দেখিলাম, উহার মধ্যে এই স্থানটিতেই বেশ লোকসমাগম আছে। আবার চা-বাগিচা থাকায় অনেক শ্রমজীবী এখানে কার্য্য উপলক্ষেও থাকে। কেহ কুলীগিরি করে, সর্দ্দারী করে, ডাকের কাজকর্ম্মও করে। এখানে দুই-এক ঘর মুসলমানও আছে। তাহাদের আচার-ব্যবহার হিন্দুদের সঙ্গে প্রায় সমান এবং পরস্পর একেবারে বিদ্বেষশূন্য; খেলাধূলা কাজকর্ম্ম একসঙ্গেই চলিতেছে।

এখানকার জলবায়ু বিশেষ ভাল নহে। চারিদিকেই জঙ্গল, জ্বরাদি মাঝে মাঝে হয়, আর জলের অসুবিধা ত আছেই। বেণীনাগ সমুদ্রতল হিসাবে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ফিট্ হইবে। এখন গরম বেশী নাই, নাতিশীতোষ্ণ বলা যাইতে পারে। তবে শীতের সময় যে খুব শীত তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রায় সমস্ত রাত্রই জল হইল। প্রভাতে বৃষ্টি ছিল না, কুয়াশা এত বেশী হইয়াছে যে তিন চার হাত অন্তরের মানুষও বুঝি দেখা যায় না। মোট-ঘাট বাঁধা হইলে কুলীদের উঠাইতে বলিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম, পণ্ডিতজী আমায় জিনিসপত্র গুছাইয়া কুলীদের উপর তুলিয়া দিবার ভার দিয়া, জয়তি জয় বলরাম লক্ষ্মণস্থ মহাবল ইত্যাদি শুভযাত্রার মন্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে অগ্রে চলিয়া গেলেন।

প্রায় আধ মাইল চলিয়া হঠাৎ তিনি ফিরিয়া আসিতেছেন দেখা গেল। ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে তাঁহার জামা হইতে টাকার থলিটি বাহির না করিয়া ভুলিয়া বিছানার সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়াছেন, এখন স্মরণ হওয়ায় ফিরিয়া ভ্রম সংশোধন করিবেন। বলিলেন, কি জানি, কুলীদের বিশ্বাস নাই, তারা সন্ধান পেয়ে যদি পথের মাঝে বার করে নেয়—এখনই ওটা বার করে নেওয়াই ভাল, কি বল? আমি বলিলাম, ওরা তেমন নয়, মোট খুলতে কখনই সাহস করবে না। ওরা বিশ্বাসী, তবে যখন আপনার মনে হয়েছে তখন সাবধান হওয়াই ভাল।

তিনি অবিলম্বে কুলীদের ধরিয়া সেই বিছানার মোট নামাইলেন; পরে টাকাটা বাহির করিয়া গায়ের জামার পকেটে রাখিয়া দিলেন। তাঁহার এই সাবধানতা দেখিয়া হাসিব কি ভয় পাইব কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম

না। কারণ আমি ইচ্ছা করিয়া যে কর্ম্ম করিয়াছি তাহা যদি তিনি জানিতেন তাহা হইলে এখানেই বোধ করি তাঁহার সঙ্গে একত্র ভ্রমণের সংযোগ ছিন্ন হইয়া যাইত। যেহেতু প্রথম পড়াও বরিছিনা হইতেই তাঁহার প্রদত্ত রেজকী ও টাকার অধিকাংশ এবং আমার নিজের নোটগুলি সমস্তই পাট-করা ওভারকোটের ভিতরের দিকের পকেটে রাখিয়া বিছানার সঙ্গে পরিপাটি বাঁধিয়া দিয়া আমি নিরুদ্বেগে লঘু শরীরে চলিয়াছি।

তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না, বলিতেন, আমার একটি বন্ধু বলিতেন যে, তরমুজ চেনা বড়ই কঠিন, তাহার ভিতরটা কিরূপ হইবে কিছুতেই বাহির হইতে বুঝা যায় না। তাও বরঞ্চ চেনা যায়, কিন্তু মানুষ চেনা যায় না। তুমি এখন ছেলেমানুষ, মনটি ভাল, তাই সবই ভাল দেখ, কিন্তু আমরা ভালটাও দেখিয়াছি, মন্দটাও দেখিতেছি; সংসারের অনেকটা দেখিয়া ফেলিয়াছি, তাই কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারি না।

যাহা হউক, এখন টাকাটা বাহির করিয়া নিজের কাছে রাখিয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে চলিতে লাগিলেন। তবে সেই মোট নামানো, খুলিয়া ফেলা আবার গুটাইয়া বাঁধিতে রাস্তার মাঝে বাহকদ্বয়ের কিছু কষ্ট হইল, আর কিছু সময়ও গেল।

পথে বিষম জোঁকের উৎপাত। দুই তিনটি করিয়া একেবারে পায়ে ধরিতেছে, পা ঝাড়িলেও যায় না। পণ্ডিতজীর পায়ে জুতা থাকায় ততটা অসুবিধা হয় নাই। তথাপি তিনি অতি সাবধানে চলিতেছিলেন। যখন আমি বলিলাম, কি ভয়ানক জোঁক? তিনি বলিলেন, আঃ, সে কথায় আর কাজ কি! আমি পাদুটি মাথায় রেখে চলছি, বুঝলে হ্যা?

বেণীনাগ হইতে থল প্রায় দশ মাইল। রাস্তায় বিশেষ চড়াই উৎরাই নাই—সুতরাং ময়দান। দ্বিপ্রহরের প্রায় আধঘণ্টা পূর্ব্বে প্রখর বেগবতী রামগঙ্গার সেতু পার হইয়া আমরা থলে পৌছিলাম। নদীতীরে উচ্চভূমির উপর একটি নাতিউচ্চ শিবমন্দির আছে দেখা গেল, তাহার চূড়ান্ত রক্তবর্ণ পতাকা উড়িতেছে। উহা কুঁমায়ুঁর রাজা উদ্যতচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটি পার হইয়া চড়াইয়ের মুখে আমাদের বিশ্রামের স্থান। নদীতীর দিয়া একটি রাস্তা সোজা উত্তরমুখে গিয়াছে, সেটি গাড়োয়ালের পথ। আর সেই রাস্তার দক্ষিণে, যে চড়াই আরম্ভ হইয়াছে সেইটি আসকোটের পথ। সেই পথ দিয়া অল্প খানিকটা উঠিয়া গেলে একধারে মুদী এবং আর

একধারে নানাবিধ কাপড়-চোপড়ের একখানি দোকান পাওয়া যায়। উহা নদীতীরের রাস্তা হইতে অনেকটা উচ্চভূমির উপর। সেই দোকানের অনতিদূরে নূতন একতল প্রস্তর-নির্ম্মিত স্কুলগৃহ; তাহার বারান্দাতেই আমাদের এ-বেলার বিশ্রামস্থান।

আলমোড়া ছাড়িয়া চারটি পড়াওর পরে দেবমন্দির এই প্রথম দেখিলাম। মন্দিরগুলি অলঙ্কারবর্জ্জিত পুরী-ভুবনেশ্বর মন্দিরের ছাঁচ। বোধ করি সেই আদর্শেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। এ অঞ্চলে প্রস্তরের উপর সূক্ষ্ম আলঙ্কারিক ভাস্কর্য্য, যেমন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সর্ব্বত্রই দেখা যায়, সেরূপ মোটেই নয়;—মোটামুটি অলঙ্কারশূন্য দেউলের একটি স্থূল আকৃতি হাতে মাত্র এইটুকু বুঝা যায় যে এটি উৎকলদেশীয় মন্দিরের ছাঁচ।

আমাদের বাঙ্গালাদেশে থান বলিয়া একটি কথা আছে। পল্লীগ্রামের সঙ্গে যাঁহাদের একটু সম্বন্ধ আছে তাঁহারা বোধ হয় এটি বিশেষ অবগত আছেন। সেই থান কথাটি যেমন 'স্থান' শব্দের পল্লীভাষা, যেমন শীতলা-ঠাকুরের থান, শিবের থান বা কালীর থান ইত্যাদি,—এই থল কথাটিও সেইরূপ 'স্থল' শব্দের হিন্দী পল্লীভাষা; এখানেও দেওতাকা থল, ইত্যাদি ব্যবহার আছে। দেবস্থল হইতে ইহার নাম থল হইয়া গিয়াছে।

এখানে অতি প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ ছত্রিদের বংশ এখনও রহিয়াছে, নিজ নিজ বংশের প্রাচীনতা এবং গরিমার কথা তাঁহারা গল্প করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এখানে অনেকগুলি দেবমন্দির আছে সেগুলি কুঁমায়ুঁ, আসকোট প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দু রাজাদের কীর্ত্তি। এতটা উচ্চ পাহাড়ের উপর অত্যুচ্চ মন্দির নিরাপদ নয় বলিয়াই মন্দিরগুলি এত ছোট।

এদেশের লোকসংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে, আর আশানুরূপ তেমন বাড়িতেছে না।

মুদী মহাশয়ের সাহায্যে ত্রয়োদশবর্ষীয় একটি ব্রাহ্মণকুমারের দ্বারাই আমাদের রন্ধনকার্য্যটি সহজেই সুসম্পন্ন হইল।

ছেলেটির নাম দুর্গা দত্ত, দেখিতে অতি সুন্দর। তাহার কথাগুলি এত মিষ্ট এবং মৃদু, তাহা আর কি বলিব। প্রকৃতি তাহার নম্র এবং শান্ত। মুখে লাবণ্য, তাহাতে অন্তরের পবিত্রতা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে সে এই স্কুলে পড়ে। এখন গরমের ছুটি তাই স্কুল বন্ধ আছে।

আজ এই গ্রামে একজনের বাড়াতে শ্রাদ্ধ, সেইজন্য সেখানে তাহার

রন্ধনের এবং ভোজনের নিমন্ত্রণ আছে। সে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিয়া যাইবে, কিন্তু সেই তাড়াতাড়ির মধ্যেও এমন একটি সংযমের ভাব দেখাইল, তাহাতে মুগ্ধ হইলাম। সুকুমার মুখখানি কপালে চন্দন, মাথায় পাহাড়ী টুপি, গায়ে কোট ও পরনে চুড়িদার পাতলুন—নগ্ন পদ। কাজের সময়ে ওসকল বেশ ত্যাগ করিয়া ছোট একখানি কাপড় পরিয়া চৌকার মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রথম হইতেই আমি তাহার নিকট বসিয়া

দুর্গা দত্ত

কথাবার্ত্তায় কিছুক্ষণ কাটাইলাম। হিন্দু শ্রাদ্ধের সাধারণ নিয়ম, যাহার বাড়ীতে শ্রাদ্ধ হইবে তাহাদের নিজ হাতে কিছুই করিতে নাই, যেহেতু তখন পূর্ণরূপে অশৌচান্ত হয় নাই। পুরোহিত শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করাইবে আর প্রতিবেশী কিংবা আত্মীয় বা কুটম্বের মধ্যে ভিন্ন গোত্রীয় কেহ আসিয়া রন্ধনের কার্য্য করিবে। শ্রাদ্ধে, দানের একখানি বাসন, একখানি বস্ত্র ও কিছু দক্ষিণা তাহার প্রাপ্য। গরীব বা অবস্থাহীন হইলে সামান্য দক্ষিণা দিলেই কাজ চলে। ব্রাহ্মণভোজনের জন্য কেহ কাচ্চি অর্থাৎ কাঁচা ফলার —ভাত, ডাল, তরকারি ইত্যাদি, আর কেহ বা পাক্কি অর্থাৎ পাকা ফলার পুরী কচৌরি ইত্যাদি আয়োজন করে।

বিবাহ-প্রথার কথাও কিছু হইল। এখানে কন্যার পিতাকে পণ দিয়া পাত্রকে বিবাহ করিতে হয়,—কন্যাশুল্ক হিমালয়ের সর্ব্বত্র, যাহা আমাদের দেশের বিপরীত। বঙ্গদেশে পাত্রীর পিতাকে বরের পণ যোগাড় করিতে করিতে যেমন পাত্রীর বয়স পড়িয়া যায়, এখানে তেমনি টাকা যোগাড় করিতে করিতে পাত্রের বয়স বাড়িয়া যায়, সেইজন্য পাত্রের বিবাহ কিছু বেশী বয়স হইলেই হয়। যদি পাত্র পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়সে টাকা যোগাড় করিয়া বিবাহের সঙ্কল্প করেন তাহা হইলে তাঁহাকে একটি সপ্তম বা অষ্টম কিংবা নবমবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিতে হইবে। প্রাচীন কাল হইতেই এখানে বেশী বয়স অবধি কন্যা ঘরে রাখিবার নিয়ম নাই। ষষ্ঠে সপ্তমে অষ্টমে, না হয় নবমের মধ্যে দানের ব্যবস্থা। পাঁচ বৎসর কন্যা পিত্রালয়েই থাকিবেন, তবে পাত্রটি নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে কখনও কখনও শ্বশুর-বাড়ী যাইতে পারেন। কন্যাটি উপযুক্ত হইলে তখন এক শুভদিনে তাহাকে স্বামী নিজগৃহে আনিয়া গার্হস্থ্য জীবনারম্ভ করেন।

বালক এইরূপে কত কথাই বলিল। ক্রমে সে রন্ধন শেষ করিয়া চৌকা হইতে বাহির হইল এবং সেই ছোট কাপড়খানি ছাড়িয়া ধড়াচূড়া পরিয়া হাত তুলিয়া 'রাম রাম' বলিল। তাহাকে দুই আনা মাত্র দেওয়া হইল, তাহাতেই সে পরম খুশী হইয়া গেল। তাহার মধ্যে এমন একটি বিশিষ্টতা ছিল—যাহাতে তাহাকে এখনও মনে আছে।

একটি গোধেরাতে স্নান করিয়া আহারাদির পর আমরা অল্পই বিশ্রাম করিয়া উঠিলাম। তখন একজন স্থানীয় ভদ্রলোক বলিলেন যে, এখানে একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে, তাহা আপনাদের যাইবার রাস্তার দক্ষিণ দিকে পড়িবে, বেশীদূর নহে, যাইবেন কি?

কিছুদূর যাইয়া মন্দিরটি দেখা গেল। ছোট বটে কিন্তু গড়নটা ঐ ভুবনেশ্বর-পুরী মন্দিরের ধরন, তবে ক্ষুদ্রায়তন, অলঙ্কারাদি কিছুই নাই। সে বলিল, আমাদের দেশে এই মন্দিরটিই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রাচীন। এটি কতদিনের তা কেউ জানে না। এ-সময়ে এখানে বড় একটা কেউ আসে না। তবে শিব-চতুর্দ্দশীর দিন এখানকার আশপাশের দূর স্থান হতে অনেকে এখানে এসে পূজাদি দিয়ে থাকেন, নচেৎ নিত্যপূজার জন্য একজন ব্রাহ্মণ এসে দুইটা ফুল-বিল্বপত্র দিয়ে যায়।

থল হইতে ডাণ্ডীহাট যাইবার যে রাস্তা রামগঙ্গার তীর হইতেই

চড়াই। তীর হইতে শিখরদেশ অবধি তুই মাইলের উপর হইবে। আহারাদির পর অতি অল্পই বিশ্রাম ঘটিয়াছে; তাহার উপর কেবলই খাড়া-চড়াই,—কোন কথাটি নাই, কেবল উঠিয়া যাও। রাস্তাও ভাল নয়। পাহাড়ের উপরিভাগ কেবলই অভ্রমিশ্রিত পচা পাথরের কাঁড়ি, তাহাতে পথটি এত বন্ধুর যে, সোজা সোজা পা ফেলিয়া চলা যায় না। এই স্তরে অনেকগুলি বিগত জীবন, জীর্ণ শৈবালাকীর্ণ স্তূপ দেখা গেল।

যখন শৃঙ্গে উঠিলাম, তখন বোধ করি সাড়ে ছয়টা, পণ্ডিতজী পশ্চাতে আসিতেছিলেন। শৃঙ্গে উঠিয়াই দেখা গেল, আবার একটি অভ্রভেদী বিশাল কায়া বিস্তার করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে; সেটি কিন্তু আমাদের চড়িতে হইবে না; তাহার তলে তলে ময়দান-পথ গিয়াছে। রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে অটল অচল গর্ব্বিত মস্তকে দাঁড়াইয়া, তার বামে অতল স্পর্শ খড নামিয়া গিয়াছে, তাহা জঙ্গলে পরিপূর্ণ। সেই রাজবর্ত্ম নিস্তব্ধ, বোধ হয় পক্ষিগণের কলরব পর্য্যন্ত নাই, অতীব গম্ভীর। একটি প্রশস্ত শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া দৃশ্যের সঙ্গে নিস্তব্ধতা উপভোগ করিতে লাগিলাম, আর সঙ্গিগণের অপেক্ষায় রহিলাম।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে পণ্ডিতজী পশ্চাতে বাহকদ্বয়কে রাখিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি; বুঝিলাম গতিক ভাল নহে। হাসিতে হাসিতে বলিলাম, দেখেছেন কি অপরূপ গাম্ভীর্য্য! বলিয়া পার্শ্বস্থ সেই বৃক্ষলতাপূর্ণ, কোথাও বা বহুকাল সঞ্চিত ঘন শ্যামল, শৈবালাচ্ছাদিত নগ্ন প্রস্তরখণ্ডসংযুক্ত বিরাট অভ্রভেদীর উচ্চ শৃঙ্গের পানে চাহিয়া দেখাইয়া দিলাম। তিনি একবার মাত্র ঝটিতি সেদিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই, সেই দৃষ্টি ফিরাইয়া আমার মুখের উপর ফেলিলেন, তাহার পর বিরক্তভাবে বলিলেন,—এরূপ ভয়ঙ্কর স্থানে বিপদ ঘটতে কতক্ষণ! তুমি কি বাহাদুরী করে দ্রুত চলতে পার তাই দেখাচ্ছো? বাহাদুরী দেখাবার স্থান এ নয়, অন্য কিছু থাক্ না থাক্ সঙ্গে টাকাকড়ি আছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

টাকাকড়ি কোথায় কাহার নিকট আছে তাহা তিনি জানিতেন না। আমি বলিলাম,—তাতে ক্ষতি কি? আমি জানি, এ সকল স্থানে চোর-ডাকাতের কোন ভয় নেই, আর অন্য বিপদ যা বলেন, তাহা ত সর্ব্বদা সঙ্গেই আছে।

তাহার পর মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া অগ্রসর হইলাম, তবে এবারে

চেষ্টা করিয়া প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে লাগিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। সেই সন্ধ্যার স্তিমিতপ্রায় অন্ধকার মিশ্রিত আলোকে আমরা ডাণ্ডীহাট ডাক-বাঙ্গালার বারান্দায় আশ্রয় লইলাম। বাহকেরাও মোটঘাট নামাইয়া কাঠ ও অগ্নির সন্ধানে গেল। একে ত অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, তাহার উপর দেখিতে দেখিতে চারিদিকে কুয়াশা নামিয়া গেল।

মুদী মহাশয় গৃহে যাইবার জন্য দোকান বন্ধ করিতেছিলেন। অপ্রত্যাশিত আগন্তুক দুইটি দেখিয়া একেবারে পণ্ডিতজীর সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, জল্‌দী বোলিয়ে, আপ্‌ লোক্‌ন কো ওয়াস্তে ক্যা চাইয়ে। সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন, হাম আজ ঔর কুছ নহি খায়েগা। হামরাবাস্তে দেড় পৌয়াভর আলু ওবালকে (সিদ্ধ করিয়া) দেও। মুদী মহাশয়ই ডাক-বাঙ্গালার রক্ষক এবং আমাদের এখনকার মুরুব্বি।

পরে বলিলেন, ঔর দেখো, হামারা বাস্তে একঠো খাটিয়া ঘরসে নিকালকে দেও, হাম্‌ নিচুমে শোনে নেই শিকেগা, বড়ি ঠাণ্ডা। আমার সম্বন্ধে কোন কথাই নাই, আমার যেন কোনও অস্তিত্বই নাই।

মুদী বলিল—আমি এখনই দোকান বন্ধ করে যাব, আলু দিতে পারি, কিন্তু সিদ্ধ করতে পারব না; নিজেরা সিদ্ধ করে নেবেন, অল্পই কাঠ আছে দিতেছি।

সে বাঙ্গালা ঘরের মধ্য হইতে একখানি খাটিয়া বাহির করিয়া দিল, তাহাতে পণ্ডিতজী বেশ গুছাইয়া নিজের বিছানা পাতিয়া আরাম করিয়া বসিলেন, আর সেই পাথরের মেঝেতে আমি আপন বিছানা বিছাইলাম।

তাঁহার এই ব্যবহারে আমি যে ব্যথা পাই নাই তাহা নহে। মনে মনে যাহাই হোক না কেন, এ-সম্বন্ধে অবশ্য মুখে কিছু তাঁহাকে বলিলাম না, তবে আহারের বিষয় বলিতে বাধ্য হইলাম। বলিলাম, আপনার দেড় পোয়া আলু সিদ্ধ চলতে পারে, আমার অত্যন্ত ক্ষুধা পেয়েছে, আমি রুটি খাব। মুদীকে বলিলাম, চলো, তুমরা দুকানে কেয়া হ্যায় দেখেগা।

দোকানের মধ্যে ঢুকিয়া বলিলাম, কিছু আটা চাই, আর কিছু আলুও চাই। কোন রকমে নুন দিয়া আলুসিদ্ধ আর রুটী পাকাইতে হইবে।

দোকান খুলিয়া সে অন্ধকারের মধ্যেই একটি পাত্রে গোটাকয়েক আলু আর কিছু আটা বাহির করিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। যাইবার সময় সে কেবল,—আপনারা এই দাওয়ায় রান্না করিয়া লইবেন, এখানে চুলা আছে—এই কথাটি বলিয়া অন্ধকারে মিশাইয়া গেল। আমি চিৎকার করিয়া বলিলাম, জল কোথা? দূর হইতে সে যে কি উত্তর দিল তাহা মোটেই বুঝা গেল না। কুলীরা প্রায় আধ ঘণ্টা অনুসন্ধান করিয়া একটি ছোট বালতি করিয়া জল লইয়া আসিল। সেই এক বাল্‌তি জলে রান্না, খাওয়া, মুখ ধোয়া আবার বাসন মাজা সকলই করিতে হইবে; আবার বৃষ্টি তখন আরম্ভ হইয়াছে, জলের অভাব নাই, আসমান হইতে ঝমাঝম পড়িতেছে!

পণ্ডিতজী যখন দেখিলেন যে আমার সাহায্য লইতেই হইল, নচেৎ রাত্রের ভোজনটা অসম্ভব হইয়া পড়ে, তখন নিজ সুখশয্যা ছাড়িয়া উঠিলেন। যেখানে আমি চুলা ধরাইতে প্রবল হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছি সেখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তাইতো হ্যা, তোমার যে বড়ই বেগ পেতে হল দেখছি, আমি এখন তোমার কি সাহায্য করতে পারি বল দেখি?

আমি বলিলাম, ধন্যবাদ, প্রয়োজন হলে খবর দিব।

সঙ্গে বাতি ছিল,—তাহা জ্বালাইয়া কোনরূপে কাঠ ধরাইবার চেষ্টা করা গেল। বাহিরে প্রবল বেগে বাতাস বহিতেছে, বাতি কেবলই নিবিয়া যাইতে লাগিল। অতি কষ্টে প্রথম এক ঘণ্টা পরিশ্রমের পর কুলীদের সাহায্যে চুলা ধরাইয়া ছয়খানি রুটী আর শুধু ঘৃত ও লবণ সংযুক্ত বে-মসলা কতকটা আলুর তরকারি প্রস্তুত হইল, রাত্রের মত দুই জনের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। বাহকেরা আপনাদের জন্য পৃথক প্রস্তুত করিয়া লইল।

এই হিমালয়-ভ্রমণে যেখানেই অন্ন গ্রহণ করিতে হইয়াছে, সেই অন্নের সহিত প্রতি গ্রাসে দুই চারিটা কাঁকর থাকিতই। গ্রাস মুখে তুলিয়া দাঁতের চাপ দিতেই কটাকট্ শব্দে ভোজনে বাধা জন্মাইত। সঙ্গী-মহাশয় বলিতেন, আমরা যে শুধু হিমালয় পর্ব্বত ভ্রমণ করছি তা নয় বুঝলে হ্যা, —হিমালয় পাহাড় আহারও করছি!

সেই রাত্রে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই আহারান্তে কম্বলমুড়ি দিয়া

শয়ন করিতে করিতে পণ্ডিতজী বলিলেন, তাই তো হ্যা, আর একখানি খাটিয়া হলে বেশ হত, পাথরের মেজে বড় কন্‌কনে্। তা এখন আর কোথায় পাওয়া যাবে—কোন রকম করে রাত্রিটা কাটিয়ে দাও, কি বল। তারপর তিনি, আঃ,—বলিয়া বড়ই আরামে পাশ ফিরিয়া কম্বলমুড়ি দিলেন।

আমিও শয়ন করিলাম। পণ্ডিতজী পুনরায় বলিলেন, দেখ, এই অন্ধকার কুয়াশার মধ্যে—ঐ দিকের আকাশে অতি আশ্চর্য্য মণ্ডলাকৃতি জ্যোতিঃ দেখলাম, অতি অপূর্ব্ব তাঁর,—ভগবানের বুঝলে হ্যা,—কি আশ্চর্য্য, তাঁর অতি অদ্ভুত কৃপা আমার উপর, শুনচো, হ্যা, ঘুমালে নাকি ?

আমার অল্প অল্প তন্দ্রা আসিতেছিল, বলিলাম, হ্যাঁ ঘুম আসছে বটে, আলো আমিও দেখেছি।

দেখেছি কুয়াশাচ্ছন্ন বাদল রাত্রে, বাহিরে কোথাও আলো পড়িলে তাহা দূরে ছড়াইয়া পড়ে এবং গোলাকার দেখায়—যেন মণ্ডলাকার জ্যোতির মত। সময় সময় সেই মণ্ডলটি ক্ষীণ রামধনুর মতও দেখায়। আবার সেই আলো যদি কোন বস্তুর দ্বারা প্রতিহত হয়, তাহা হইলে তাহার ছায়া এত বড় ও ভয়ানক দেখায় যে দেখিলে ভয় হয়।

তিনি বলিলেন, না হে, সে রকম কোন প্রাকৃতিক আলো নয়; যাক ওসকল কথা, এখন ঘুমান যাক্। তারপর শান্তি।

প্রাতে আমরা নয়টার সময় আসকোটে পৌছিলাম। ডাণ্ডীহাট হইতে আসকোট সাত মাইল। সেখানে ডাকখানায় গিয়া চিজ বস্তু নামাইয়া বাহকদিকের প্রাপ্য হিসাব করিয়া চুকাইয়া দেওয়া হইল।

এখানে দুইখানি পত্র পাইলাম, কলিকাতা হইতে আসিয়াছে, তাহাতে বাড়ীর খবর ছিল। আলমোড়ার বরাট মহাশয়ের পরিচয়পত্র ছিল। তাহা পণ্ডিতজী আসকোটে রাজওয়াড়ার কুমার সাহেবের নিকট পেশ করিলেন।

কুমার বিক্রমসিং পাল, বৃদ্ধ রাজা গজেন্দ্র সিং পালের মধ্যম পুত্র; তিনি দেখা করিতে আসিলেন। কুমারজীর পরিধানে অশ্বারোহীর পরিচ্ছদ। মোজার উপর চুড়ীদার পাজামা, তাহার উপর চামড়ার বগলসওয়ালা গার্ডার আঁটা, উপর অঙ্গে ফতুয়া, ইংরাজী ছাঁটের কোট,

মাথায় জাতীয় টুপী। মাছি তাড়াইবার জন্য হাতে বালামচির চামর। তিনি এখানকার পাটোয়ারী। ডাকখানার মুন্সী, তাহাকে বল্লভজী বলিয়া ডাকা হইত, নামটি কি স্মরণ নাই, বোধ হয় রাধাবল্লভ কি গোপীবল্লভ এইরূপ একটি কিছু হইবে,—তিনি একখানি তিব্বতী আসন বিছাইয়া দিলেন, কুমারজী তাহাতে বসিলেন।

অনেক স্তুতি নতি ও গুণ ব্যাখানের পর সঙ্গী-মহাশয় তাঁহাকে একখানি গীতা উপহার দিলেন। কুমারজী নতশিরে শিষ্টাচার দেখাইয়া সেখানি গ্রহণ করিলেন। আলাপ চলিতে লাগিল। আমাদের পণ্ডিতজী প্রত্যেক আলাপেই রাজবংশের মহিমা-কীর্ত্তন,—বহোত প্রাচীন কালসে আপ্‌হি লোক, গো ঔর ব্রাহ্মণকো প্রতিপালন কিয়া, রক্ষা কিয়া হ্যায়, মহৎ বংশ হ্যায়, অভিতক্‌ভি আপ্‌হি লোক ভারতবর্ষকা মালিক হ্যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি গুণগান করিতে লাগিলেন।

তিনি কুমারজীর সহিত নানাবিধ সদালাপ করিতে থাকুন, আর কুমারজী কলিকাতা নামক মহানগরী নিবাসী পণ্ডিতের মুখে তদীয় বংশের গাঢ় প্রশস্তি-বচন শুনিয়া আনন্দ অনুভব করিতে থাকুন, ইত্যবসরে আসকোট রাজওয়াড়ার পরিচয় সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।
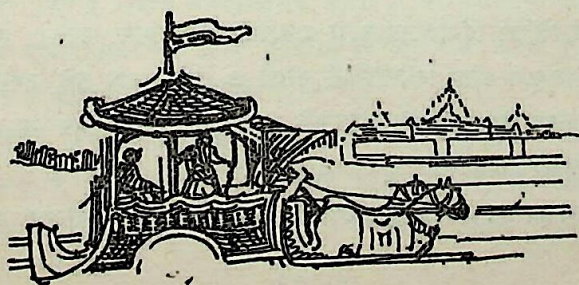
॥ ৪ ॥

আসকোট রাজওয়াড়—হৈজাকী বিমারী

গুপ্তবংশের পতনের পর খ্রীষ্টীয় নবম শতকের প্রারম্ভে পালবংশের অভ্যুদয় হয়। ঐ পালবংশের একটি শাখা অনেক দিন অযোধ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। ক্রমে বহিঃশত্রুর উৎপাতে হীনবল পালরাজ অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া উত্তর দিকে আসিতে থাকেন। এইরূপে পিথোরাগড়ের পথ দিয়া মহারাজ শালিবাহন পাল আসকোটে আসিয়া একটি ক্ষুদ্র রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করিলেন,—এবং ত্রিশ মাইল ব্যাপী হিমালয়স্থ ভূখণ্ডের আধিপত্য লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। কোট অর্থে দুর্গ, তখনকার দিনে ইহার মধ্যে ছিল বলিয়াই আসকোট নাম। আবার এক দল বলেন যে অশ্বকোট রাজার রাজ্য হইতেই ঐ নাম হইয়াছে। ইহারাই আসকোট রাজওয়াড় নামে এ অঞ্চলে খ্যাত। নেপালের সঙ্গেই এখন ইহাদের বিবাহ প্রভৃতি করণ-কারণ হইয়া থাকে। আসকোট পর্ব্বতের পাদমূলে কালীনদী, ওপারে নেপালের এলাকা।

বৃদ্ধ রাজার অনেকগুলি পুত্র, তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভূপেন্দ্র সিং পাল এখানকার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও মধ্যম বিক্রম সিং পাল এখানকার পাটওয়ারী। পাটওয়ারী বলিতে পুলিসের দারোগার মত একটি পদ বুঝায়। গ্রামের মধ্যে যাহার অবস্থা ভাল তাহাকে প্রধান এবং সেই অঞ্চলের মধ্যে যাহার অবস্থা ভাল তাহাকেই পাটওয়ারী করা হয়। প্রয়োজন হইলে হেডকোয়ার্টার হইতে ইহারা পুলিসের সাহায্যও পাইয়া থাকেন। এইভাবে শান্তিপ্রিয় হিমালয়ের মধ্যে এ অঞ্চলে শাসনকার্য্য চলে। আসকোট পর্ব্বতের পাদমূলে প্রখর বেগশালিনী কালী ও গৌরী এই দুই নদীর সঙ্গম, সুতরাং ইহাকে একটি প্রয়াগ বলিতেই হয়;—এবং নবরাত্রির সময় এখানে বড় মেলাও হইয়া থাকে।

কিছুক্ষণ আলাপের পর কুমারসাহেব চলিয়া গেলে আমাদের জন্য সিধা

আসিল, পোষ্টমাষ্টার বল্লভজী রাঁধিলেন। ভোজনান্তে আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে হইল। যেখানে যাইয়া আসন বিছাইলাম, সেটি কুমার ভূপেন্দ্র সিং পালের এজলাসের পার্শ্বস্থ কক্ষ। ব্যবস্থা একপ্রকার ঠিক হইয়া গেল, এখানে চারি দিন থাকিয়া পঞ্চম দিনে আমরা যাত্রা করিব।

বৈকালে আবার ভূপেন্দ্র সিং দেখা করিতে আসিলেন, বিক্রমও আসিলেন। অনেকক্ষণ তাঁহাদের সহিত বৈঠকী আলাপ চলিতে লাগিল; পণ্ডিতজীর মন বড়ই প্রফুল্ল ছিল। তাঁহার নানা স্থানে ভ্রমণের কথা এবং এই হিমালয়েই তিনি, হাজারো মিল ভ্রমণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের বিস্ময় উৎপাদন করিলেন। এইরূপে গল্প যখন জমিয়া উঠিয়াছে, তখন নিরতিশয় আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া আমাদের পণ্ডিতজী হঠাৎ গলার আওয়াজটি বেশ একটু খাটো করিয়া বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবেই জ্যেষ্ঠ কুমারের দিকে আরও সরিয়া বসিলেন এবং একবার চারিদিকে সর্তক দৃষ্টি ঘুরাইয়া, কেহ শুনিতে না পায়, যেন কোন বিরাট গুহ্য-রহস্য প্রকাশ করিতে যাইতেছেন এইরূপ ভাবটা দেখাইয়া বলিলেন,—দেখিয়ে হামারা কুমার-সাহেব, আপকো রাজমে সোনেকা খান্ (খনি) হ্যায়। জরুর হ্যায়, আপ হামারা বাৎ মান লিজিয়ে,—পিছে দেখেঙ্গে ইস্ জমিনসে আপকো বহোত চিজ মিলেগা।

শ্রবণমাত্র, কুমারজী, একেবারে সোজা হইয়া বসিলেন এবং হর্ষ-বিচলিত হস্তে তাকিয়াটি ভাল করিয়া দাবাইয়া, একটি পা বেশ জোরে আর একটি পায়ের উপর আঁটিয়া, পণ্ডিতজীর স্বরে স্বর মিলাইয়া বলিলেন, —হাঁ, ও হো সকৃতা, গেয়া বরষ আংরেজ লোক দো চার আদমী দেখনে আয়াথা, ইধার উধার বহোৎ জরিপ করকে দেখা, ফিন্ চল গিয়া। এইরূপ খোশগল্প কিছুক্ষণ চলিল। তারপর দেশ-হিতৈষণার ভাব আসিয়া, কি করিয়া দেশের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হয় ইত্যাদি আলোচনাও কিছুক্ষণ চলিল। শেষে কুমারসাহেবেরা রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন আমরাও আহারাদির পর শয়ন করিলাম।

রাত্রে এখানে বেশ মনোরম ঠাণ্ডা। তবে, রেতে মশা, দিনে মাছি, এই লইয়াই চারি দিন ও চারিটি রাত্র আসকোটে যাপন করিতে হইয়াছিল।

এদেশে ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে এক বিশিষ্ট নিয়ম আছে যে তাহারা

তাহাদের জননীর হাতে ভাত খায় না। পাক্কি খায় কিন্তু কাচ্চি খায় না। রুটি পুরী ইত্যাদি পাক্কি অর্থাৎ যাহা শুষ্ক, পক্কান্ন, তাহাদের আপত্তি নাই, কিন্তু ভাত পরমান্ন প্রভৃতি কাচ্চি অর্থাৎ যাহা সিদ্ধান্ন অথবা ঘিয়ে ভাজা নয় তাহা খায় না। এ প্রথা আধুনিক নহে, বহুকাল পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ক্ষত্রিয় ছিল দেশের রাজা। রাজার নিয়ম স্বতন্ত্র,—তাঁহারা অবাধে যে কোন জাতি হইতে স্ত্রী গ্রহণ করিতেন, লোকধর্ম্ম অনুসারে তাহাতে কোন দোষ আসিত না। ক্ষেত্র যে কোন জাতি হউক ঔরস শক্তি সর্ব্বকালেই বলবৎ, হিন্দুশাস্ত্র এবং হিন্দু-বিজ্ঞানসম্মত সত্য। ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন পুত্রের পিতার জাত্যধিকার লাভ করিত কিন্তু ক্ষেত্র যে হীন সেই হীনই থাকিত, শাস্ত্রমতে তাহাদের ক্ষত্রিয়ের অধিকার আসিত না। সেই কারণেই মা হইলেও সন্তানদের মায়ের হাতে খাইবার নিয়ম নাই। বহুপূর্ব্বে একেবারেই খাইবার নিয়ম ছিল না, এখন পাক্কি খাওয়া চলিতেছে। আশা করা যায়, কালে কোনও নিয়মের বাধা থাকিবে না।

এখানে আলমোড়ার ন্যায় গোধেরা আছে। সমুদয় আসকোটে প্রায় ছয়টি ঝরনা আছে, তাহার মধ্যে দুইটি গোধেরা বাকিগুলি ধারা, মুখগুলি পাথর দিয়া বাঁধান। এদিকে পানীয় জলের কষ্ট নাই। তবে সাধারণতঃ জলের ব্যবহার কম এবং স্ত্রী-পুরুষ মাত্রই বড়ই অপরিষ্কার। স্ত্রীলোকেরা রংকরা ছিটের অথবা ছাপা নানা রংয়ের বস্ত্র এবং ঘাঘরা ব্যবহার করে, তাহা কখনও কাচা বা পরিষ্কার করা হয় না যতদিন না জীর্ণ হয়। গায়ের হাওয়াতে একটা দুর্গন্ধ।

মাংস ও পলাণ্ডুর ব্যবহার খুব বেশী, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে এটা পুরানো চাল। বৈশ্য এখানে খুবই কম। মাংসকে শিকার বলে। আসকোটের চারিদিকেই শস্যক্ষেত্র। যব, ধান, গম, চানা, ভুট্টা ও অন্যান্য ডাল এখানে প্রচুর উৎপন্ন হয়। তবে গমের চাষই বেশী। এ বৎসর অজন্মা হওয়ায় টাকায় সাড়ে ছয় সের গম ও চারি সের চাউল বিকাইতেছে। ফল ও তরিতরকারি বিক্রয় হয় না। বাজার নাই। নিজ নিজ জমিতে প্রয়োজনমত ফলমূল শাকসবজি উৎপন্ন করাই সাধারণ নিয়ম।

আসকোট সাড়ে চারিহাজার ফিট্। উচ্চতম শৃঙ্গে একটি দেবালয়
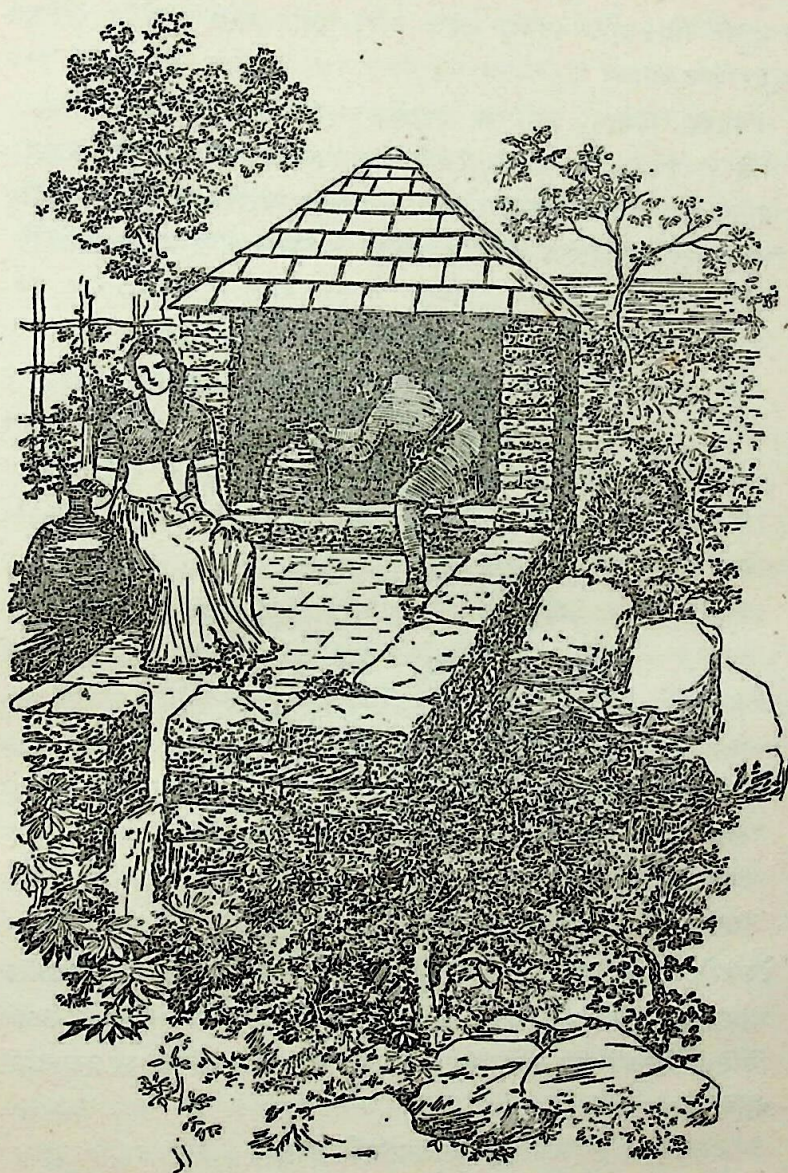
আসকোটের গোধেরা

আছে, তাহা কালিকাদেবীর স্থান। তাহার সকল দিকই মাটি ও পাথরে ঢাকা। কেবল একদিকে একটু কাঠের রেলিং আছে, ভিতরে অন্ধকার।

কাহারও সন্তান হইলে কিংবা মানত করিয়া রোগ আরাম হইলে এখানে পূজা দিতে আসে।

আমরা এখানে আসিবার কিছুদিন পূর্ব্বে নাথসম্প্রদায়ের লোকনাথ নামে একজন নবীন সন্ন্যাসী, কৈলাস ও মানসসরোবর যাইবার উদ্দেশ্যে আসিয়া এখানেই অবিস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, তাঁহাকে নাথজী বলিয়াই ডাকা হইত। তিনি

নাথজী

তৈলঙ্গী, বয়স প্রায় চব্বিশ, খর্ব্বাকৃতি ও ঘন শ্যামবর্ণ। নিঃসঙ্কোচে আমাদের সঙ্গেই তিনি আসন বিছাইয়া আমাদের একজন হইয়া গেলেন। তিনি বেশ ভজন গান করিতেন। প্রায়ই নিজ আসনে বসিয়া না হয় শুইয়া থাকিতেন। বলিতেন,—

চল্‌না ফিরনা বড়ী উপাধি।
বৈঠ্‌না লেট্‌না বড়ী সমাধি।

আমার মনে হইত ইহা তাঁহার আলস্য-প্রসূত। সঙ্গী-মহাশয় তাঁহাকে পছন্দ করিতেন না। কারণ নাথজী ধূমপানাসক্ত ছিলেন।

দিনে একবার ও সন্ধ্যায় একবার করিয়া কুমারসাহেবেরা আসিয়া

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া আমাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতেন। তখন সঙ্গী-মহাশয় নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেন। একদিন পুরানো পুঁথির কথা উঠিল। বড় কুমার ভূপেন্দ্র সিং বলিলেন যে, তাঁহাদের ঘরে একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত মানসখণ্ডের পুঁথি আছে। তাহা অনেক দিনের জানিয়া সঙ্গী-মহাশয় দেখিতে চাহিলেন। উহা তৎক্ষণাৎ আনানো হইল।

আমাদের দেশে অনেকেরই ঘরে পুরানো হস্তলিখিত পুঁথি আছে, কিন্তু অধিকারীরা সে সকল প্রকাশ বা প্রচার করিতে চান না। ইহা ভাল নয়। প্রচার হইলে অনেকেরই কল্যাণ হয়। কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে যে কত হস্তলিখিত পুঁথির সংগ্রহ আছে, সেই কথা সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন।

রাজবাড়ী হইতে রক্তবস্ত্রমণ্ডিত যে পুঁথিখানি আসিল তাহা সঙ্গী-মহাশয় কতকমত দেখিলেন, আমিও তাহার কতকটা দেখিয়াছিলাম। তুলট কাগজের উপর বড় বড় হস্তাক্ষর, অক্ষর ভাল না হইলেও বেশ পড়া যায়। ইহাতে হিমালয়স্থ সকল তীর্থের কথাই আছে। মানসসরোবর হিমালয়ের শেষ তীর্থ বলিয়া ইহার নাম মানস-খণ্ড হইয়াছে; পুঁথিখানি বেশী প্রাচীন নহে, লেখা পঞ্চাশ ষাট বৎসরের হইতে পারে, তার বেশী নয়। কোন্ তীর্থ কোন্ স্থানে,—হরিদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে মানস-সরোবর এবং সুদূর তীর্থ পুরী প্রভৃতি যাইতে হয়, তাহার পর বদরিকাশ্রম দিয়া পরিক্রমণ। ইহার মধ্যে এমন কতকগুলি স্থানের নাম আছে যাহার সহিত এখনকার নামের মিল নাই। যিনি এইসকল স্থান পর্য্যটন করিয়া গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন গ্রন্থে তাঁহার নামও নাই। সঙ্গী-মহাশয় কুমারসাহেবদের প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, কলিকাতায় পৌছিয়াই তিনি এইখানি ছাপাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

আমাদের কৈলাস হইয়া মানসসরোবর ভ্রমণ শেষ করিয়া নিতির পথে বদ্রীনারায়ণের পথ দিয়া ফিরিবার ইচ্ছা ছিল। এখানকার সকলেই পুনঃপুনঃ ওপথে ফিরিতে নিষেধ করিলেন, যেহেতু ওদিকের পথে বিপদের সম্ভাবনা অনেক; ডাকাত ত আছেই, তাহা ছাড়া অনেকগুলি বড় বড় বেগবতী নদী, স্থানে স্থানে গভীর ভয়ানক প্রখর স্রোত পার হইতে হয়।

এইরূপে নানা প্রসঙ্গ আলোচনায় আমাদের দিন কাটিত। একদিন কুমার বিক্রম তাঁহার পঞ্চমবর্ষীয়া শিশু-কন্যাটিকে কোলে করিয়া আসিলেন।

সুন্দর মুখশ্রী এবং তপ্ত কাঞ্চনের মত তাহার বর্ণ; শরীর এত ক্ষীণ, দেখিলে কষ্ট হয়। জিজ্ঞাসা করিলে অস্পষ্ট মিষ্ট ভাষায় তাহার নাম বলিল, চন্দ্রপ্রভা।

আমাদের কাছে বসাইয়া কুমার তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, চন্দা, তুমনে কৈসে রামায়ণ শিখা, জরা স্বামীজীওকো শুনা তো দো। নিঃসঙ্কোচে শিশু তখনই আরম্ভ করিল,—আদৌ রাম তপোবনাদি গমনম্,

চন্দার রামায়ণাবৃত্তি

হত্বা মৃগম্ কাঞ্চনম্, বৈদেহীহরণম্, জটায়ুমারণম্, সুগ্রীবসম্ভাষণম্, বালীনিগ্রহণম্, সমুদ্রতরণম্, লঙ্কাপুরীদহনম্, পশ্চাৎ রাবণকুম্ভকর্ণাদিহননম্ চ এতদ্ধি রামায়ণম্। আমরা শুনিয়া যথার্থই আনন্দ পাইলাম। সঙ্গী-মহাশয় উচ্চস্বরে,—আরে মায়ি, তোম্ হামকো পুরা রামায়ণ শুনায় দিয়া, তোম্ বহুত ভাগ্যবতী হো, রাণী হো, ইত্যাদি সম্ভাষণে পিতা-পুত্রীকে গৌরবান্বিত ও উৎসাহিত করিলেন।

আসকোটে আমরা দুইজন নূতন মানুষ বা সঙ্গী পাইয়াছিলাম; একজন নাথজী—তাঁহার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আর একজন লালসিং ওরফে লালগীর। বৃদ্ধ রাজার ঔরসে ও এক ক্ষত্রিয়াণী উপপত্নীর গর্ভে ইহার জন্ম। সে রাজ-সংসারে ভৃত্যদের মধ্যেই লালিতপালিত। বিবাহাদিও হইয়াছিল, পরে বৈরাগ্য আসিয়া তাহাকে সংসার হইতে পৃথক্ করিয়া দিয়াছে। গিরি-সম্প্রদায়ের এক সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা লইয়া কিছুদিন এদেশ-সেদেশ ঘুরিয়া আবার আসকোটে ফিরিয়া বৈরাগীর মতই সে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ
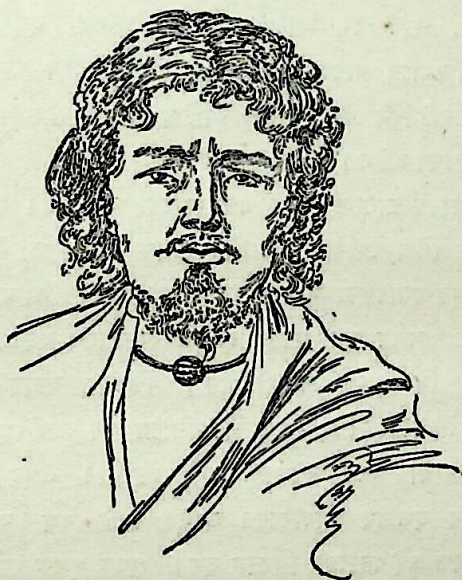
লালগীর

করিতেছে। নাথজীর সঙ্গে তার বড়ই প্রণয়, বোধ হয় এক ছিলিমের বন্ধু বলিয়াই তাহাকে প্রায়ই আমাদের আসনের নিকটেই দেখিতে পাইতাম।

লালগীরকে দেখিতে সত্যই সুপুরুষ। দীর্ঘ শরীর, আজানুলম্বিত বাহু, যথার্থই রাজপুত্র। রাজার এতগুলি পুত্রের মধ্যে ইহাকেই দেখিতে সুন্দর, অথচ সে বিবাহিতা রাণীর গর্ভজাত নহে। তাম্রবর্ণের উপর ভস্মমাখা, রুক্ষ চুল, ঢুলু ঢুলু আঁখি, পরিধানে কৌপীন ও বহির্ব্বাস বুকের সঙ্গে বাঁধা, স্থির গম্ভীর এবং তেজস্বী স্বভাব, যেন যোগীশ্বর মহাদেব। তাহাকে আমার বড়ই ভাল লাগিত।

ভজন-সাধনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার এক বাঁধা বুলি আছে

তাহাই সে পুনঃ পুনঃ আওড়াইত। তাহা এই,—তলধর তীপুর, উপর অম্বর, পরমহংস মহামুনি, শ্রীবদরীনাথ বিশ্বেশ্বরং গুরু কেদারনাথ সদাশিবং। বলিত—য়হ হমারে গুরুনে শিখায় হৈ—। এই কয়দিনের ঘনিষ্ঠতায় সে আমাদের অনুরক্ত হইয়া পড়িল এবং আমাদের সঙ্গে কৈলাস যাইবার সংকল্প প্রকাশ করিল। তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ইহা অগোচর ছিল না যে, সঙ্গী-মহাশয় তাহাকে পছন্দ করিতেন না, সেজন্য আমলও দিতেন না। পাছে সঙ্গে থাকিলে আহার দিতে হয় সেজন্য তাহাকে সঙ্গে রাখিতে অস্বীকার করেন, তাই সে আগে হইতেই বলিল, হম্ তো মাঙ্গকে খানে-য়ালা ঠহরা, হমারে বাস্তে কুছ চিন্তা মত করো, সির্ফ সাথ চলুঁগা।

আমাদের তিনটি দিন বেশ আনন্দে কাটিয়া গেল, কিন্তু চতুর্থ দিন প্রাতে একটু অশান্তির কারণ ঘটিল।

প্রাতেই শৌচান্তে স্নানের কাজ শেষ করিয়া লইতাম। আজ স্নানার্থে গোধেরার দিকে গিয়া দেখি রাজবাড়ীর লোক সকল চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। মজুর লোকেরা মাথায় শুষ্ক কাঁটাগাছের বোঝা লইয়া এক স্থানে জমা করিতেছে। অপর জন তাহা হইতে কতকাংশ লইয়া আনাগোনার রাস্তা বন্ধ করিয়া দিতেছে। ব্যাপার কি? জিজ্ঞাসা করায় একজন বলিল, হৈজাকী বীমারী ফৈল রহী হৈ, সব পানীকে রাস্তে বন্দ করেঁগা।

হৈজাকী বীমারী অর্থে কলেরা বা ওলাউঠা। এখন এখানে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় সাধারণের জলের রাস্তা বন্ধ করা হইতেছে, যেহেতু জল হইতে এই রোগের বিস্তার হয়। পৃথক্ পৃথক্ পল্লী হইতে পৃথক পৃথক্ ধারায় জল লইবার ব্যবস্থা করা হইল। সংক্রমণ বন্ধ করিবার জন্যই এত কড়াক্কড়। মূলে কিন্তু সাংঘাতিক গলদ। প্রত্যেক বাড়ীতে ছাগল ভেড়া এবং পল্লীবাসী সাধারণের মধ্যে অধিকাংশ স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা গৃহের অঙ্গনেই মলমূত্র ত্যাগ করে, তাহাতে এত মাছি যে দিনমানে স্থির হইয়া এক মুহূর্ত্ত বসিবার যো নাই। সদর রাস্তা ছাড়া গলি-ঘুঁজিতে চলিবার উপায় নাই।, এত দুর্গন্ধ যে তাহাতে অসুখ আপনিই আসে। বর্ষাতে ঐ সকল পচিয়া রোগের জীবানু চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এমন স্থানে যে প্রতি বৎসরই এ প্রকার মড়ক হইবে, বিচিত্র কি।

গ্রামের মধ্যে কাহারও পেটের অসুখ হইলে রাজাওয়াড়াতে খবর দেওয়াই নিয়ম, সেইখান হইতে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। পেটের অসুখ

শুনিলে সকলের মুখ শুকাইয়া যায়। ভয়ে কেহ রোগীর সেবা করিতে সাহস করে না। জল চাহিলে কেহ জল দেয় না, ভয়,—জল খাইলেই মরিয়া যাইবে। রোগের সেবা এই হিমালয়ে কোথাও হয় না, বিশেষতঃ হৈজাকী বীমারী হইলেই মরণ সিদ্ধান্ত করিয়া আত্মীয়স্বজন দূরে সরিয়া পড়ে। স্ত্রী স্বামীকে, স্বামী স্ত্রীকে, এমন কি পিতামাতা সন্তান ছাড়িয়া পালায়।

স্নানান্তে আসিয়া শুনিলাম, আমাদের পাচকঠাকুর পথ দেখিয়াছেন, তিনি ভিন্ন গ্রামের লোক। কাছেই একজন প্রজা ও তাহার একটি সন্তান কাল রাত্রে মারা গিয়াছে। সেই আতঙ্ক চারিদিকে ছড়াইয়া আজ সকালে পল্লীবাসিগণের মুখে প্রফুল্লতা একেবারেই যেন লোপ করিয়া দিয়াছে। আজ আমাদের স্বয়ংপাকের ভোজন। উহা শেষ হইলে দ্বিপ্রহরে কুমার ভূপেন্দ্র আসিলেন, পরামর্শ-বৈঠক বসিল। আমরা কাল প্রত্যুষেই যাত্রা করিব, দুইজন বাহক আমাদের মালপত্র গাঁওসেরায় লইয়া যাইবে, খরচ লাগিবে না। গ্রামে যখন মহামারী তখন কুমার বাহাদুরেরা আর বেশীদিন থাকিতে অনুরোধ করিতে পারিলেন না। পথে যাহাতে আমাদের কোনও কষ্ট না হয় সেজন্য কয়েকখানি আজ্ঞাপত্র দিলেন। এখান হইতে খেলা অবধি তাঁহাদের এলাকা। ফিরিবার পথে পুনরায় কিছুদিন থাকিয়া যাইতে এবং এখানকার উৎকৃষ্ট আম খাইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। শুধু অনুরোধ নয়, প্রতিশ্রুতি লইলেন।

বৃদ্ধ রাজার একটি ভাই ছিল, তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন না। অনেক দিন হইল দুইটি পুত্র রাখিয়া মারা যান। জ্যেষ্ঠ খড়্গসিং এবং কনিষ্ঠ জগৎসিং পাল। খড়্গ সিংহের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। তিনি পিথোরাগড়ের ডেপুটি কলেক্টর, আর কনিষ্ঠ জগৎ সিং সেখানকার পেস্কার। তিনিও বিখ্যাত ব্যক্তি, সৌজন্য ও দয়া-দাক্ষিণ্যের জন্য।

আমরা কাল চলিয়া যাইব শুনিয়া জগৎ সিং অন্যান্য কুমারগণের সঙ্গে আজ সন্ধ্যায় আলাপ সাক্ষাৎ করিতে এবং আমাদের বিদায় দিতে আসিলেন। পুরুষোচিত রূপবান, দীর্ঘ শরীর প্রায় সাড়ে ছয় ফুট হইবে। বর্ণ গৌর—বদনে রক্তের স্পষ্ট আভা, উন্নত নাসিকা, প্রশস্ত ললাট—তাহার উপরে চন্দনের ছোট একটি ফোঁটা। নিখুঁত আর্য্য-মূর্ত্তি, তাহার উপর রাজবংশের সন্তান। তাঁহার তুল্য শ্রীমান্ এ যাত্রার মধ্যে কাহাকেও দেখি নাই। তাঁহার মিষ্ট বাক্যালাপ যথার্থই একটি আকর্ষণের ব্যাপার।

সঙ্গী-মহাশয় নানাভাবে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়া শেষে বলিলেন, যদি তিব্বতীয়দের সঙ্গে কারবার করা যায় ত অনেক লাভ আছে। তিনি জানিতেন না যে বহুকালাবধি উত্তর হিমালয়ের ভেটিয়া অধিবাসিগণের সহিত করবার চলিতেছে, তাহা অপেক্ষা অধিক আয়তনের কারবার চালানর স্থবিধা মোটেই নাই। জগৎ সিং বিনীতভাবে তাঁহাকে এই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সঙ্গী-মহাশয় নিজের ভাবের আবেগে অসাধারণ যুক্তি সকল প্রয়োগ করিয়া নিজের মতই বজায় রাখিয়া অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন; তখন জগৎ সিং ।জজ্ঞাসা করিলেন, আপনি বোধ হয় ল্যাণ্ডর সাহেবের তিব্বতের কাহিনী পড়িয়াছেন; তাহাতে তিান খুলিয়াই সকল কথা লিখিয়াছেন—তিব্বতীয়গণ কিরূপ জঘন্য, অসভ্য ও দুর্দ্দান্ত হিংস্র জাতি। সঙ্গী-মহাশয় তাহাতে বলিলেন—তার ও-সব কথা অতিরঞ্জিত মিথ্যা বলিয়া সরকার বাহাদুর প্রকাশ করিয়াছেন। জগৎ সিং তখন ধীরে ধীরে বলিলেন, না, তা নয়, তাঁর প্রত্যেক কথাই সত্য, আমার সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় এবং আমার ভাই খড়্গ সিং—যিনি ডেপুটি কলেক্টর—তাঁর সঙ্গেও খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তা ছাড়া আমরা তিব্বতবাসীদেরও খুব ভাল জানি। তাঁহার কাহিনীর কোনটাই মিথ্যা নয়। তখনকার আলমোড়ার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট উপর হইতে হুকুম পাইয়া, তাহাকে অনেক বাধা দিয়াছিলেন। পরে বিলাত হইতে কি ভাবে হুকুম আনাইয়া, এই পথে তিনি গিয়াছিলেন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। তখন সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন, বটে! আমরা ত এত ব্যাপার জানি না। যাহা হউক, আমি ফিরে গিয়ে যখন এ সম্বন্ধে পুস্তক লিখব, তখন তাতে সাধারণের ভ্রম ভেঙ্গে দেব, পরে গম্ভীরভাবে বললেন, আর সরকারকেও বেশ করে ঠুকে দেব।

আমাদের কথার শেষে কুমার বিক্রম সিং আত্মরক্ষার্থে একটি রিভলভার লইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু ব্যবহার জানা না থাকায় তাহা লওয়া হইল না।

কালের অনির্ব্বচনীয় লীলা। আসকোট ছাড়িবার দুই সপ্তাহ পরে যখন আমরা গারবেয়াংএ, আরামে রুমাদেবীর আশ্রয়ে কাল কাটাইতেছিলাম, তখন হঠাৎ এই কুমার জগৎ সিংএর মৃত্যুসংবাদ পাইলাম,—তিনি হৈজাকী বীমারীতে মারা গিয়াছেন।

॥ ৫ ॥

ব্যাসক্ষেত্রের পথে—বালুয়াকোট, ধারচুলা, খেলা

মালয়ের এ অঞ্চল দিয়া তিব্বতে যাইতে আরও উচ্চস্তরে ব্যাসক্ষেত্র হইয়াই যাইতে হয়। গার-বিয়াং এই ব্যাসক্ষেত্রেই অবস্থিত। আমরা এখন গারবিয়াং অভিমুখেই যাত্রা করিলাম। আমাদের মোটঘাট গাঁওসেরায় চলিল। গ্রামের ভূস্বামী বা পাটওয়ারী অথবা প্রধানের হুকুমমত গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে মাল পৌছাইয়া দেওয়াকেই গাঁওসেরা বলে। ইহাই প্রাচীন কালের নিয়ম। ইহাতে মাস্থলের ব্যাপার নাই, মাল খোয়াও যায় না, তবে অসুবিধা বিস্তর। সব সময়ে প্রয়োজন মত বেগার ধরা বা পাওয়া সম্ভব নয় ত।

সঙ্গী-মহাশয়, নাথজী ও আমি এই তিনজনে মঙ্গলের উষায় না হউক, বুধের সকালে পা বাড়াইলাম। সেদিন বর্ষা। সঙ্গী-মহাশয়ের যাত্রার শুভমন্ত্র,—জয়তি জয় বলরাম লক্ষ্মণস্থ মহাবল—বিফল হয় নাই। সেদিন প্রথম হইতেই বর্ষায় সমস্ত রাস্তাটি আমাদের মালপত্র সমেত ভিজিয়া কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

কালী নদীর তীরভূমি ধরিয়া যে রাস্তা গিয়াছে, বালুয়াকোট গ্রামখানি সেই পথ হইতে প্রায় একপোয়া চড়াইয়ের উপর, বার মাইলের মাথায়। পথে এমন জনপ্রাণী দেখিলাম না যাহাকে জিজ্ঞাসা করি। গ্রাম ছাড়াইয়া যখন প্রায় এক মাইল চলিয়া গিয়াছি তখন একজনকে নদী হইতে জল লইয়া যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, পথ পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি। হায়রান হইয়া আবার ফিরিলাম, এবং চড়াই ভাঙ্গিয়া বেলা প্রায় দেড়টার সময় বালুয়াকোটের মঙ্গল সিং প্রধানের অতিথিশালায় উঠিলাম।

প্রধান মহাশয় জাতিতে ক্ষত্রিয়। তাঁহার তিনটি পুত্র, হৃষ্টপুষ্ট ও

বলিষ্ঠ শরীর ও গৌরবর্ণ স্থকুমার মুখশ্রী। কনিষ্ঠই এক্ষেত্রে আমাদের সৎকার করিল, সিধা প্রভৃতি আনিয়া পাকের জোগাড় করিয়া দিল। আসকোট পার হইয়া আর দোকানপাট নাই, স্থতরাং অতিথি হওয়াই সনাতন প্রথা। নিজেদের জন্য আনাজ অর্থাৎ চাল, ডাল, আটা প্রভৃতি সঙ্গে থাকিলে কোনও ভাবনা নাই, কিন্তু পথে যে ঐসকল দ্রব্য খরিদ করিতে পাওয়া যাইবে না, ইহা জানা ছিল না। তাহা ছাড়া বেশী দিনের জন্য দুই জনের উপযুক্ত রসদ সঙ্গে লইতে বাহক বা কুলীও বেশী চাই, বোঝাও অনেক বাড়িয়া যায়। অতিথি হওয়াটা গা-সওয়া হইয়াছিল। এই আসকোট হইতে আরম্ভ করিয়া কৈলাস অবধি যাওয়া, এবং ফিরিয়া মায়াবতী আসা পর্য্যন্ত আমাদের অর্থ ব্যয় করিয়া আহার জুটাইতে খুব কমই হইয়াছে।

এখন আমাদের আহারাদির পর একটু বিশ্রাম প্রয়োজন। সঙ্গী-মহাশয় একখানি খাটিয়া ও একখানি সতরঞ্চ আনাইয়া তাহাতেই বিশ্রামের যোগাড় করিয়া লইলেন। আমরা মেজেতেই বসিলাম, তখনও আমাদের মালপত্র পৌঁছায় নাই। উদ্বেগ বড় কম ছিল না, যেহেতু মালের সঙ্গে আমার যথাসর্ব্বস্ব রহিয়াছে, তাহা কেহ জানে না। গাঁওসেরার এই স্থখ। মনে মনে উদ্বেগে মরিতে লাগিলাম। আমাদের ভোজনপর্ব্ব চুকিয়া গেল, তারপর ঘর-বাহির করিতেছি কতক্ষণে মাল আসিবে।

সঙ্গী-মহাশয় খাটিয়ার উপর শুইয়া কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ প্রধানের সেই অনুগত যুবা পুত্রটিকে, এই,—হমারে পয়ের তো থোড়া দাবাও, বলিয়া তাহাকে পা টিপিতে ইঙ্গিত করিলেন। সে অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল,—যেন জানাইল ওরূপ পুরস্কারের আশা সে করে নাই। পরে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তেজোদীপ্ত কণ্ঠে, নহী, হম লোগ ছত্রী হৈ, কিসীকে পয়ের নহী ছুতে,—বলিয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিল।

প্রায় তৃতীয় প্রহরের শেষে আমাদের মাল আসিল। ক্ষিপ্রহস্তে খুলিয়া দেখিলাম, সব ঠিকই আছে।

বৈকালে প্রধানের সেই পুত্রটি আমাদের কাঁচা পীচ কতকগুলি আনিয়া দিল। পীচকে আড়ু বলে। এ দিকে পীচ পাকিতে পায় না, কাঁচাবেলাতেই নুন ও মরিচচূর্ণযোগে নিঃশেষ করা হয়। মৃদু অম্ল রসটা দেখিতেছি এ

পর্ব্বত অঞ্চলে মিষ্ট অপেক্ষা অধিক প্রিয়। এখানকার লোকের পিত্ত-প্রধান ধাত।

আসকোটের পর হইতে আরও একটি বিশেষত্ব দেখিতেছি, এদিকে খুব ভাঙ্গের জঙ্গল। তাহা হইতে চরসও উৎপন্ন হয়। ভাঙ্গই এখানকার প্রধান নেশা।

ছোট ছোট ছেলেরাও চরস বাহির করিতে জানে। দুইটি বালক আসিল। নাথজী তাহাদের নিকট হইতে দুইটি বড় বড় ডেলা চরস বাহির করিলেন। ঐরূপে চরস তুলিয়া তাহারা গোপনে বিক্রয় করে। লালগীরও সঙ্গে ঠিকই আছে, মাঙ্গকে খাইতেছে আর মাঝে মাঝে আমাদের দেখা দিয়া যাইতেছে।

বালুয়াকোটের চারিদিকেই কৃষিক্ষেত্র। আমরা যেখানে আস্তানা গাড়িয়াছিলাম সেখান হইতে সম্মুখেই শস্যক্ষেত্র দেখা যাইতেছিল, তারপর দূরে কালীপারে পর্ব্বতশ্রেণী, উহা নেপালের এলাকা। মাঝে মাঝে বাঘের ডাকও শুনা যাইতেছিল। ঘন জঙ্গলময় পর্ব্বত-মালা, তাহার উপরে বর্ষার ঘোর ঘনঘটা, কি চমৎকার বর্ণের যোজনা, নির্ম্মল সবুজের উপর ঘোর নীল অথবা কৃষ্ণধূসরের ছড়াছড়ি।

প্রভাতে আমরা ধারচুলা যাত্রা করিলাম। রাস্তা ভাল, কালীগঙ্গার উপত্যকা দিয়াই সারা পথটি বিচিত্র দৃশ্যে পরিপূর্ণ। তাহার মধ্যে দুইটির কথা বলিব। প্রথম, একটি প্রকাণ্ড পাকুড় গাছ, পাহাড় অঞ্চলে এতবড় গাছ দেখা যায় না, সেথায় বৃক্ষমূলে এক বিশাল সিন্দুররঞ্জিত প্রান্তরে কালিকাদেবীর স্থান। বহু দূরদূরান্তর হইতে পল্লীবাসিগণ দেবীর স্থানে পূজা ও বলি দিতে আসে। বৃক্ষতল দিয়াই সাধারণ পথটি গিয়াছে। উহা পার হইবার সময়, সেই বিশাল শাখা ও ঘনপত্র সমাচ্ছন্ন বৃক্ষমূলের দিকে তাকাইলে প্রাণের মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদ্রেক করে। দ্বিতীয় দৃশ্যটি, জনমানবশূন্য ঘনসন্নিবিষ্ট গৃহপূর্ণ একখানি গ্রাম।

স্থানটির নামও কালিকা। কালীনদীর উপত্যকা দিয়া আসিতে বামে পড়ে। প্রথমে সেই গ্রামখানিকেই ধারচুলা ভাবিয়াছিলাম। নিকটে আসিয়া দেখিলাম জনপ্রাণীর চিহ্নই নাই। সারি সারি ঘর খাড়া আছে, কোনোটির ভগ্নদশাও নয়, প্রত্যেকখানিই পরিষ্কার, কিন্তু জনশূন্য। বড় আশ্চর্য্য লাগিল, ব্যাপার কি? মনে হইল, বুঝি মহামারী হইয়াই এরূপ

জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। এইরূপে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশখানি গৃহ পার হইয়া ভাবিতে ভাবিতে অনেকটা আগে যাইয়া পড়িলাম। পথে একজনও পাইলাম না যাহাকে জিজ্ঞাসা করি। অবশেষে ধারচুলায় পৌছাইয়া শুনিলাম যে, শীতের সময় নেপালের সীমানার মধ্যে পূর্ব্ব-উত্তর হিমালয়ের উচ্চস্তরের অধিবাসিগণ ঐখানে আসিয়া বাস করে। এখন সেইজন্য উহা জনশূন্য।

পাকুড় গাছ

এই ধারচুলাও সেইরূপ একখানি গ্রাম। ইহাও উচ্চস্তরের হিমালয়স্থ বৃটিশ প্রজাগণের শীতাবাস। গারবিয়াং, কুটি, গুঞ্জি প্রভৃতি স্থানগুলি শীতের সময়ে যখন বরফে ডুবিয়া যায়, তখন সেখানে বাস করা অসম্ভব হয়, তাই শীত কাটাইবার জন্য তাহাদের এইরূপ একটি স্থানে পৃথক্‌ভাবে এক-একটি আশ্রয় রাখিতে হইয়াছে। কার্ত্তিক মাসে তাহারা নামিয়া আসে আবার চৈত্রের মাঝামাঝি উঠিয়া যায়।

ধারচুলায় আমরা তিনজনেই লোকমণি মুন্সীজীর গৃহেই উঠিলাম। তিনি এখানকার সরকার তরফের ইম্‌পোর্ট-এক্সপোর্ট ট্র্যাফিক ক্লার্ক,—অর্থাৎ, আমদানী রপ্তানী মালামাল সরবরাহের হিসাবনবীশ। তিনি গাড়োয়ালবাসী। দুই দিনের জন্য আমরা এইখানেই রহিলাম। সঙ্গী-

মহাশয় নাথজীকে সঙ্গে রাখিতে চাহিলেন না, বলিলেন, একে আমরা দুইজন আছি, কোনও গৃহস্থের আশ্রয়ে উঠলে একরকম চলতে পারে, কিন্তু যদি তিন জন হয় তা হলে গৃহস্থের আশ্রম-পীড়া উপস্থিত হবে। কাজেই তাহাকে ব্যাপারটি ইঙ্গিতে বলা হইল। এইভাবে সে এখান হইতে পৃথক্ হইল, পরে গারবিয়াং-এ এক সঙ্গে মিলিয়াছিল।

লোকমণি মুন্সীজীর দপ্তর

এই ধারচুলা গ্রামখানি কালীনদীর উপত্যকার এপারে বৃটিশ সীমানার মধ্যে,—আর ওপারেও নেপাল রাজ্যের অধিকারে একখানি গ্রাম আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই কালীনদীই বৃটিশ ও নেপালের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। নদীর অবিরাম অতিপ্রখর স্রোতের উপর দিয়া নর-শরীর লইয়া পারাপারের কোনও সম্ভাবনা নাই, যদিও নদীগর্ভ প্রস্থে কোনো স্থানেই বিশ হইতে পঁচিশ ফিটের বেশী নহে। প্রাচীনকাল হইতে মালামাল এবং জনসাধারণের পারাপার এবং কর্ম্মসম্পর্কে যোগাযোগ ঘটাইবার একটি বিশেষ উপায় আছে।

এপারে তিনটি, ওপারেও সেইরূপ তিনটি বিশাল দেওদার বৃক্ষদণ্ড, ঊর্দ্ধে লৌহকীলক সাহায্যে একত্র এবং নিম্নে সমব্যবধানে পৃথক্‌ভাবে

প্রোথিত। দুই দিকেরই দণ্ডের উর্দ্ধে, সংযোগস্থলে দৃঢ় স্থূল পশুলোমনির্ম্মিত রজ্জু বা কাছি। এবং তাহার মধ্যে এক লোহার আংটায় বাঁধা ঝুড়ি বা ঐরূপ একপ্রকার আধার দৃঢ়বদ্ধ আছে। এইভাবেই তাহারা এপার ওপারের মালামাল এবং মানুষের নিত্য যাতায়াতের সম্বন্ধ ঘটায়। শীতের সময় উপরে বরফ জমিয়া নদীর বেগ মন্দীভূত হইলে হাঁটিয়া পারাপার হওয়া চলে।

এই ধারচুলাই উপর হিমালয়ের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং তিব্বতের মাল আমদানী-রপ্তানীর একটি ঘাটি, আর লোকমণিজীই এই ব্যাপারে সরকার তরফের একমাত্র ভারপ্রাপ্ত হিসাবনবীশ, তাহা বলিয়াছি।

গত বৎসরের আমদানী ও রপ্তানীর হিসাব দেখিলেই বুঝা যাইবে যে কিভাবে এই কারবার চলিতেছে।

মাল	মণ	দাম, প্রতি মণ
সোহাগা	২২০০	১৬৲
গন্ধ্রাণী জড়ি (১)	১৬৭	১৬৲
লবণ	১৭০০	৯৲
জাম্বু খাস চৌকান (২)	২০০	১৬৲
মেজ, তিব্বতী	১৷৷০	৬০৲
কাঁচা উল (পশুলোম)	৯৩২২৷৷০	৪০৲
চামর পুচ্ছ	১০	৪০৲
কম্বল (নাগপুরী)	৩৯২টি, মোট দাম—	২৯৬০৯৲
ভালুপিত (ভল্লুকের পিত্ত)	১৷৷০	৬২০০৲
মৃগনাভি কস্তুরী, প্রতি তোলা	২৪৲ হিঃ	৩২৪০০০৲
ছোট মৃগচর্ম্মাদি	১২০০টি	২৬১৬৲
বড় চামর ও ব্যাঘ্র-চর্ম্মাদি	১০০টি	৫০০০৲
ঘোড়া	২০টি	২২০০৲
ঝাব্ব	২০টি	১৫০০৲
ভেড়-বকরী	৩৬৫৭টি	১৬৮০০৲
বাজ (পাখী)	৯টি	৪৯০৲
শিলাজিৎ··· ইত্যাদি		১৫০০৲

(১) একপ্রকার মূল. মসলার মত তরকারীতে ব্যবহৃত হয়, তিব্বতেই উৎপন্ন।
(২) একপ্রকার তৃণ যাহার গন্ধ পলাণ্ডুর ন্যায় তরকারীতে ফোড়ন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহাও তিব্বতে উৎপন্ন।

এইবার আমাদের কথা একটু বলি—

গাঁওসেরায় মাল আনার অশেষ দুর্গতি। বালুয়াকোট হইতে প্রথম দিনেও মাল আসিল না। দ্বিতীয় দিন বৈকালে আসিল। পাইবামাত্রই খুলিয়া দেখিলাম, সবই ঠিক আছে। এবারে আমরা নগদ মূল্যেই কুলির ব্যবস্থা করিয়া লইলাম। তারপর, এই যাত্রায় আমাদের যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রধান সহায় হইয়াছিলেন তাঁহাকে এইখানেই পাইলাম।

নাম তাঁহার লালসিং পাতিয়াল। তিনি উপর হিমালয়স্থ একজন প্রসিদ্ধ ভোটিয়া মহাজন। চৌদাসের অন্তর্গত তিজা গ্রামে তাঁহার নিবাস, এই ধারচুলায় একখানি বড় দোকান আছে যাহা বারমাসই চলে। আর প্রতি বৎসরই আষাঢ়ের শেষার্দ্ধ হইতে কার্ত্তিকের শেষার্দ্ধ পর্য্যন্ত তিব্বতের তাক্‌লাখার মণ্ডিতে কারবার চলে। কার্ত্তিকের শেষে কারবার গুটাইয়া নীচে চলিয়া আসিতে হয়। এখন লালসিং পাতিয়াল এইখানেই

লালসিং পাতিয়াল

আছেন, মালামাল সংগ্রহ ও যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত। আসকোট রাজওয়াড়া হইতে তাঁহার নামে খৎ ছিল, সেই সূত্রে পরিচয় হইল। লোকমণিজীও আমাদের জন্য তাঁহাকে বিশেষরূপে বলিয়া দিলেন।

পরে আমাদের বন্ধুত্ব ঘনীভূত হইয়াছিল। তিনি নিত্যই দুই চারিবার এখানে আসিতেন, বসিতেন, মুন্সীজীকে গুরুসম্বোধন করিতেন। তাঁহার দোকান এবং বাসস্থান মুন্সীজীর অতি নিকটেই, মধ্যে দুইতিনখানি ঘরের ব্যবধান মাত্র।

এই ভোটিয়া মহাজন যারা তিব্বতে ব্যবসায় উপলক্ষে যাতায়াত করে, প্রত্যেকেই প্রায় তাহারা নেপালী, হিন্দী ও তিব্বতী এই তিনটি ভাষা ভাল জানে। হিন্দিতেই লালসিং আমাদের সঙ্গে আলাপ করিলেন। তিনি পরিশেষে যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে,—আপনারা কিছু আগে আসিয়া পড়িয়াছেন সেইজন্য,—এখান হইতে গারবিয়াং যাইয়া কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে। কারণ এখন এদিকে হৈজাকী বিমারী চলিতেছে। পাছে এদিককার রোগ ওদিকে যাইয়া মহামারী উপস্থিত করে সেইজন্য তাঁহারা বিশেষ সতর্ক; নিরাময় সংবাদ না পাইলে ওদেশে প্রবেশ অধিকার দিবেন না। তবে সেজন্য আপনাদের চিন্তা নাই, গারবিয়াংএ আমার মাসি রুমা দেবী আছেন, আপনারা তাঁহার আশ্রয়ে স্থখে কিছু দিন থাকবেন, কোন কষ্ট হইবে না। তাঁহার সাধুসজ্জন ও অতিথি সেবার কথা এ অঞ্চলে বিখ্যাত।

রুমার পরিচয় যাহা শুনিলাম তাহা এইরূপ:—

গারবিয়াংএ জুনিয়া সিং নামক একজন অবস্থাপন্ন ভোটিয়া সওদাগর চারিটি কন্যা রাখিয়া একদিনে স্ত্রীপুরুষে হৈজাকী বীমারীতে মারা যায়। রুমা তাহাদের কনিষ্ঠা কন্যা, শৈশবেই পিতৃমাতৃহীনা। তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী তিনটিই বিবাহিতা এবং রুমাকে তাহারা মানুষ করে। পনর বৎসরের সময় তাহার বিবাহ দেয়। তাহার স্বামী দুর্দ্দান্ত মাতাল এবং দুষ্টপ্রকৃতির লোক বলিয়া তাহার সহিত প্রথম হইতেই ভালবাসা জন্মে নাই। রুমা পিত্রালয়েই থাকিত, যাইতে চাহিত না; তাহাতে সে পুনরায় বিবাহ করে। প্রথম হইতেই রুমার ধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল গভীর—ধর্ম্মার্থেই জীবনযাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়া প্রথমে সে লোকমণিজীর শরণাপন্ন হয়। তিনি তাহাকে ভগবানের নাম ও সাধুসেবা করিতে উপদেশ দেন।

ব্যবসায়ীর কন্যা ব্যবসায় বোঝে। কিছুদিন মৃগনাভির ব্যবসায় চালাইয়াছিল, কিন্তু অনেকে এই সূত্রে তাহাকে প্রবঞ্চনা করিয়া অনেক টাকা আত্মসাৎ করে। স্বাধীনভাবে থাকাই তাহার অভ্যাস, ব্যবসায়ে লোকসান হওয়ায় তাহার ভগিনীরা তাহাকে আর কারবার না করিয়া বাপের ঘরেই থাকিতে বলে। সেই অবধি সংসারের সকল স্থখে জলাঞ্জলি দিয়া সাধুসঙ্গে পূজা-উপাসনায় জীবন কাটাইতেছে।

সঙ্গী-মহাশয় যখন বুঝিলেন যে, লালসিং পাতিয়ালের সাহায্যই

আমাদের বেশী ভরসা, তখন নিভৃতে ঘরের মধ্যে তাহাকে ডাকিয়া তাঁর নিজের সঙ্গে যে পঞ্চাশটি রূপার টাকা ছিল, তাহা গচ্ছিতস্বরূপ তাহার কাছে রাখিয়া দিলেন, বলিলেন, এ টাকাটা আপনার কাছেই থাকুক, যখন তিব্বতে যাইবেন লইয়া যাইবেন, কারণ ওদিকে ত আপনাদের কাছেই থাকিতে হইবে, তখনই টাকাটা লওয়া যাইবে। এদিকে আমাদের এখন এত টাকার প্রয়োজন নাই। তিনি স্বীকার করিলেন এবং মুদ্রাগুলি গণিয়া পকেটে রাখিয়া দিলেন তারপর, দোক্তা ও চুন বাহির করিয়া খৈনি তৈরী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শীতের জন্য আমাদের গরম কাপড়-চোপড় সংগ্রহ দেখিয়া,—ওখানকার শীতে এই সামান্য জিনিষে হইবে না, গারবিয়াংএ রূমার নিকট হইতে আরও কিছু সংগ্রহ কারতে হইবে,—অবশ্য তাহার কাছেই সব কিছু পাওয়া যাইবে, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, বলিয়া আজকের মত 'রাম রাম' করিয়া বিদায় লইলেন।

সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন, আঃ বাঁচা গেল, ঐ টাকার বোঝা আমার পক্ষে অসহ্য হয়েছিল, সামলাতে যে কি কষ্ট, আধসের তিনপো একটা ভার দিনরাত শরীরের সঙ্গে। আমি আশ্চর্য্য মানি তুমি কি করে যে তোমার ঐ রেজকীর বোঝাটি ম্যানেজ করছ—কখনও ত তোমায় অসামাল হতে দেখলাম না, যেন সঙ্গে কিছুই নাই। শুনিয়া আমি মনে মনে হাসিলাম, মুখে বলিলাম, অন্তরাত্মাই জানেন কিভাবে সামলাচ্চি। বেশী আর কিছু ভাঙ্গিলাম না।

যাহা হউক, পরদিন প্রাতে 'তীর্থযাত্রা সফল হউক' এই কামনা করিয়া লালসিং পাতিয়াল ও লোকমণিজী আমাদের বিদায় দিলেন। আমরা এই যে দুইটি বন্ধু পাইলাম, যাত্রাশেষ পর্য্যন্ত ইহাদের সাহায্য আমাদের সম্বলরূপে কৃতার্থ করিয়াছে।

এখন আমরা খেলার দিকে যাত্রা করিলাম যাহা এখান হইতে নয় মাইল।

এই পথে দুইটি প্রবল এবং বিস্তৃত, আর ছোট ছোট দুই তিনটি ঝরনা পাইয়াছিলাম, সকলগুলিই কালীগঙ্গায় মিশিয়াছে। সেই সঙ্গম দেখিবার বস্তু। সে গর্জ্জন কর্ণগোচর হইলে অনির্ব্বচনীয় ভাবের প্রেরণা আনে, তাহার সঙ্গে সেই চঞ্চল জলোচ্ছ্বাসের দৃশ্য মিলিয়া গভীর আনন্দরসে প্রাণকে চঞ্চলতার পরিবর্ত্তে গাম্ভীর্য্যে স্থির করিয়া দেয়। উহা দেশ কালের

জ্ঞানবৰ্জ্জিত জীবন দিয়াই ভোগ করিতে হয় আমরা তাহার কতটুকু ভোগ করিতে পারি ?

এখান হইতেই বন্ধুর পথ আরম্ভ। খেলায় পৌঁছিবার পূর্ব্বে অনেকটাই খাড়া চড়াই আছে, এক মাইলের উপর হইবে। যে পর্ব্বতটির উচ্চ শিখরদেশে খেলাগ্রাম, তাহার নিম্নে পাদমূলে কালীনদী উত্তরে বাঁকিয়া গিয়াছে, আর নৈঋৎ কোণ হইতে ধৌলী আসিয়া মিলিয়াছে। সেই সঙ্গম অপূর্ব্ব, যেন গঙ্গা-যমুনার মিলনের মত। এই খেলা হইতে দারমা এবং মিলাম হইয়া উটাধুরা গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়াও তিব্বতে যাওয়া যায়, তবে সেদিকে মানস-সরোবর ও কৈলাস নয়, অনেকটা দূর পড়ে।

এবার আমরা হিমালয়ের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছি।

ভাগ্যক্রমে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের একজন ওভারসিয়ার কর্ম্মোপলক্ষে খেলার

খেলার শ্রমজীবী

পুরাতন ডাকঘরে আড্ডা করিয়াছিলেন। আমাদের বহুদূর হইতে আগত মন এবং কৈলাস-যাত্রী জানিয়া পরম আদরে অতিথি হইবার নিমন্ত্রণ

করিলেন। ভগবানেরই কৃপা মনে করিয়া তাহা আমরা আনন্দে গ্রহণ করিলাম। সেই সহৃদয় ভদ্রব্যক্তি আলমোড়া-নিবাসী, জাতিতে ক্ষত্রিয় এবং শিক্ষিত।

খেলায় আমরা একদিন ও একরাত্রি ছিলাম। এই খেলা অবধি আসকোট রাজওয়াড়ার জমিদারী বা রাজ্য। এখানে একটি ডাকঘরও আছে। হিন্দু বলিতে যে জাতিটি বুঝায় তাহা খেলা অবধিই, পরে, উপরে আর হিন্দু নাই। উপরে যাহারা থাকে তাহাদিগকে এ অঞ্চলের হিন্দুরা ভোটিয়া বলে। ধৌলীর ও-পার হইতেই ভোটিয়া পরগণা।

খেলাতে দেখিলাম, এ অঞ্চলের স্ত্রীপুরুষ বালক-বলিকা,—যত লোক চক্ষের সম্মুখে আসিয়াছে, সকলেই যেন শীর্ণ ও দূর্ব্বল। এ অঞ্চলের অধিবাসীরা বড়ই গরীব। রোগের প্রাদুর্ভাবও কম নয়, বিশেষতঃ গলগণ্ড রোগটা সেই বালুয়াকোট হইতেই দেখিতেছি। উহা জলের দোষেই হয় বলিয়াই শুনিয়াছি।

শস্যের, চাষ আবাদও আছে;—ধান ও গম, ডাল, কড়াই এখানে হয়, কিছু সামান্য ফলমূলও ও হয়। গরীব শ্রমজীবীদের মধ্যে সাধারণতঃ পুরুষেরা কৌপীন পরে, আর স্ত্রীলোকেরা বক্ষে একপ্রস্থ কাপড় জড়াইয়া পৃষ্ঠে গাঁট বাঁধে আর কটিদেশে কাল কম্বল জড়াইয়া তাহাতে কোমরবন্ধ বা পটি আঁটে। স্ত্রী-মূর্ত্তিগুলি এদিকের কুশ্রী নয়, দারিদ্র্যদোষেই কেবল লাবণ্য-হীনা। বাঙ্গলা দেশে শস্যোৎপন্নকারী চাষাদের যে কষ্ট, যে দারিদ্র্য এদিকেও ঠিক সেই মতই; পার্থক্যের মধ্যে আমাদের দেশে বিলাসিতা বা বিলাস-দ্রব্য গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, এ দিকে সে সকলের লেশমাত্র নাই।

ওভারসিয়ার মহাশয় বলিয়া দিলেন যে, আপনারা যত শীঘ্র পারেন এদিক হইতে চলিয়া যান, কারণ মধ্যপথে, এখান হইতে তিন পড়াও পরে একটি সেতু আছে, সেই সেতুটি পার হইতে হইবে। এই সময়ই জলস্রোত বাড়িয়া পুলটি ভাঙ্গিয়া যায়। যদি ভাঙ্গে তাহা হইলে পাঁচ মাইলের ফেরে পড়িতে হইবে। কারণ পুল ভাঙ্গিলে সে পথ ছাড়া আর গতি নাই। তাহাতে চারি মাইলব্যাপী এক বিশাল চড়াই, তাহা ছাড়া সে রাস্তার কোথাও জল নাই, সেইজন্য তাহাকে নির্পানিকী সড়ক বলে। যদি উপরে বৃষ্টি বেশী হয় তাহা হইলেও জলস্রোত বাড়িয়া পুল টুটিবে,

আর যদি খররৌদ্র হয় তাহা হইলেও বেশী বরফ গলিয়া স্রোত বাড়িবে এবং পুল টুটিবে। এখান হইতে পাঙ্গু দিয়া শোঁসা চৌদাস, তাহার পর সাংখোলা, তাহার পর মালপার পথেই সেই পুল। সুতরাং আমাদের ত্বরা করাই কর্ত্তব্য।

আমরা পরদিন প্রভাতেই খেলা হইতে নামিয়া, ধৌলী গঙ্গার পুলটি পার হইলাম এবং ভোটিয়া পরগণার মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমে পাঙ্গুতে পদার্পণ করিলাম।

বলিতে হইবে না, আমরা ওভারসিয়ার মহাশয়ের অতিথিসৎকারে যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিলাম।

একটি কথা এখানে বলিয়া রাখি, আলমোড়া হইতে আমরা যতগুলি চড়াই উত্তীর্ণ হইয়াছি, এই খেলার চড়াইই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ এবং কষ্টসাধ্য। মধ্যে আসকোটের পথে একজন ভয় দেখাইয়াছিল। তাহার হাতে একটি লাঠি ছিল। ঠিক সোজা ভাবে না ধরিয়া, একটু কাত্ করিয়া সে দেখাইল এবং বলিল, খেলার চড়াই এই রকম, ঠিক এই লাঠির মতই খাড়া,—চড়াই সহজ নয়। আমাদের ভয় হইয়াছিল। এখন দেখিলাম —মধ্য হিমালয় পার হইতে এইটিই সর্ব্বোচ্চ চড়াই তবে ভয় পাইবার মত নয়।

এখান হইতে আমরা হিমালয়ের উচ্চতর প্রদেশের পথ ধরিলাম ;—তাহার শোভা যেমন অপূর্ব্ব, পথ তেমনই বন্ধুর।

॥ ৬ ॥

ব্যাসের পথে। চৌদাস, সাংখোলা মালপা ও বুদি

খেলা হইতে নামিয়া নীচে ধৌলী গঙ্গার সুদৃঢ় সেতু পার হইয়া আবার যে পর্ব্বতটি সুরু হইল, সেখান হইতে বরাবর ব্রিটীশ ভারতের উত্তর সীমার শেষ পর্য্যন্ত যে একটি জাতির বাস দেখা যায়, উহারা বহুকাল হইতে পাহাড়ী ভোটিয়া বলিয়াই এ অঞ্চলে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। ধৌলীর পরেই এই সকল স্থান 'ভোটিয়া পরগণা' নামেই খ্যাত তাহা বলিয়াছি।

যাঁহারা ভারত ইতিহাসের সহিত পরিচিত তাঁহারা জানেন যে কুশান বংশীয় শকেরা এক সময় পশ্চিমোত্তর ভারতে প্রবল ছিল। শুধু প্রবল থাকা নয়, এক সময়ে পশ্চিমোত্তর ভারতে একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল; তাহাদের রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা পিশাওয়ার। সেই শকেরা কালে হিন্দুগণকর্ত্তৃক পরাভূত ও হীনবল হইয়া পড়িলে, কতক ভারতের বাহিরে পলাইয়া গেল, কতক দাসত্ব স্বীকার করিয়া হিন্দুদের সহিত মিশিয়া গেল। তাহাদের একটি শাখা হিমালয়ের এই প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল;—এই ভোটিয়ারা তাহাদেরই মুষ্টিমেয় বংশধরগণ। হিন্দুরা ইহাদের ভোটিয়া বলে, কিন্তু ইহারা নিজেদের শক বা শোক বলিয়া জানে এবং পরিচয় দেয়। ইহারা তিব্বতীয়দের ভোটিয়া বা হুনিয়া বলিয়া থাকে। বাঙ্গালী আমরা কিন্তু ভুটানের অধিবাসীদেরই ভোটিয়া বলিয়া জানিতাম।

এখানকার এই ভোটিয়াগণ স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিচারে নাক থাঁদা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অল্পায়ত চক্ষু, বর্ণ লোহিত, ঘন কৃষ্ণ সরল কেশ, খর্ব্বাকৃতি। সকলেরই সুস্থ দৃঢ় শরীর, গালে লালের আভা। ইহারা স্ত্রী-পুরুষে মদ্যমাংসপ্রিয়, মাখন সংযোগে অতি লবণাক্ত চা ও হুক্কা ছিলিম সংযোগে তামাকু-পরায়ণ। পুরুষেরা সাধারণতঃ পাতলুন, কামিজ, ফতুয়া, কোট ও

টুপীধারী। শয়নকাল ব্যতীত টুপী কখনও তাহাদের মস্তকচ্যুত হয় না। স্ত্রীলোকদের মোটা পশমী লুঙ্গী—তাহার উপর কালো পশমী আলখাল্লা, তাহার উপর কটিতে মোটা সাদা চাদর জড়িত; মস্তকে মোটা সূতির লাল ফুলদার আবরণ, তাহা সময় সময় কতকটা অবগুণ্ঠনের কাজও করে। এটা বিবাহিতা নারীগণের মাথায়ই দেখা যায়। কুমারীগণের মাথায় বস্ত্র নাই। ঘন কেশ মাথায়, পৃষ্ঠে বেণী বিলম্বিত। চরণে হূন দেশীয় উনি বুট, দুকচা অথবা সোম্বাধারিণী। পুরুষেরা সাধারণ বিলাতি ধরণের জুতাই পরিয়া থাকে। নারীগণের বর্ণ পুরুষাপেক্ষা কিছু উজ্জ্বল এবং কতকটা স্বচ্ছ।

এখান হইতে আরম্ভ করিয়া চৌদাস এবং ব্যাসক্ষেত্রের সীমান্ত কুটি দারমা, প্রভৃতি স্থান পর্য্যন্ত এই যে সিং উপাধিধারী পাহাড়ী জাতি, ইহারাই হিমালয় পর্ব্বতের প্রাচীন অধিবাসী। কাটগুদামের পর অর্থাৎ হিমালয়ের আরম্ভে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরের পর্ব্বতশ্রেণীর শেষ পর্যন্ত যে হিন্দুরা বাস করে তাহারা পর্ব্বতাশ্রয় করিবার পূর্ব্ব হইতে ইহারা বাস করিতেছে। হিন্দুরা যেমন শিকারী, ভোটিয়ারা তাহা অপেক্ষা কম নহে। কিন্তু বহুকাল হইতে নিরুপদ্রব এবং শান্তি উপভোগ করিয়া এবং শাসন কর্ত্তৃপক্ষ হইতে অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের শক্তি সীমাবদ্ধ হওয়ায় ভারতের সর্ব্বত্রই ক্ষত্রিয়গণের যে দশা হইয়াছে ইহাদেরও সেইরূপ। ইহাদের এ কালের আসল বৃত্তি দাঁড়াইয়াছে বাণিজ্য ব্যবসা, বণিক বৃত্তি ইহারা সকলেই পিতাপুত্র, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ নির্ব্বিশেষে পৃথক্ পৃথক্ ব্যবসায়ী, সকলেই স্বাধীন, কর্ম্মে মন্থর প্রকৃতি এবং সকলেই শিকারপ্রিয়। পরে ক্রমে ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ বলিবার অবকাশ হইবে, এখন পথের কথাটুকুই বলিব।

আমরা যখন পর্ব্বতের মাঝামাঝি উঠিতেছি, তখন লালগীর আমাদের অতিক্রম করিয়া গেল। সে বেশ দ্রুতই চলে। পরে আমরা শিখরে উঠিতে উঠিতে লালগীরের গান শুনিতে পাইলাম। দেখিলাম শিখরে একটি বৃক্ষের তলে আসনে বসিয়া লালগীর মনের আনন্দে গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। নিকটে যাইতেই আমার দিকে চাহিয়া সরল প্রাণে মৃদু হাসিয়া বলিল, হামতো জলদি চলনে ওয়ালা ঠারা, আপলোক তো ধীরে চলনে ওয়ালা বাঙ্গালীবাবু লোক, হ্যায় কি নহি? বলিয়া সে

উঠিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। যাইবার সময় আবার হাসিয়া গেল। তাহার ভাব দেখিয়া আমিও হাসিয়া ফেলিলাম।

যাহা হউক, পাঙ্গুতে পৌঁছাইয়া আমরা বরাবর পাঠশালায় উঠিলাম। সেখানে গিয়া দেখি লালগীর বসিয়া আছে। আমাদের সঙ্গে থাকিলে পাছে তাহাকে খাওয়াইতে সঙ্কোচ বোধ করি সেজন্য,—হাম আগাড়ী চলতা হৈ আপলোক ইহাঁ রহ যা না,—বলিয়া আবার উঠিয়া চলিয়া গেল।

পাঠশালাটি গ্রামের বাহিরে—কিছু দূরে, পথের ধারেই। এই গ্রামের অধিবাসী সকলে মিলিয়া তাহাদের বালকদিগের শিক্ষার জন্য একটি ছোট নিম্নপ্রাথমিক পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং শিক্ষকতার জন্য একজনকে আনাইয়া দশ টাকা বেতন এবং গ্রামে স্থান দিয়া রাখিয়াছে। এই পাঠশালায় ত্রিশটি বালক পড়ে, তখনও পাঠশালার ছুটি হয় নাই। এখানে এই প্রথম ভোটিয়া বালক দেখিলাম। আমাদের দেখিয়া বালকেরা মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। গুরুমহাশয়টি একজন গাড়ওয়ালী ব্রাহ্মণ যুবক। পাঠশালার ছেলেদের মধ্যে কাহারও দ্বারা চাল, ডাল, কাহারও দ্বারা কাঠ প্রভৃতি আমাদের জন্য আনাইয়া দিলেন। তাঁহার বুঝিতে বাকী ছিল না যে কি জন্য এইস্থানে আমাদের শুভাগমন হইয়াছে।

বালকেরাও কিছু কিছু হিন্দি জানে। তাহাদের পিতৃপিতামহগণ পরিষ্কার হিন্দি তো জানেই। ব্যবসায় উপলক্ষে তাহাদের প্রতি বৎসরেই কানপুর, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যাইতে হয়, আবার তিব্বতে তাহাদের সঙ্গেও ব্যবসায় উপলক্ষে ঘনিষ্ঠতা রাখিতে হয় সুতরাং তাহারা তিব্বতী ভাষাও বেশ জানে। নিজেদের ভাষা, তাহার উপর হিন্দি ও তিব্বতী এই তিনটি ভাষা তাহাদের প্রায় সকলকারই জানা থাকে, সেই কারণে উদ্দেশ্য বুঝাইতে আমাদের পক্ষে কিছুমাত্র অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আস্‌কোট প্রভৃতি স্থানে হৈজাকী বিমার হইতেছে। সে সংবাদ এদিকে আসিতে বিলম্ব হয় নাই। সেই কারণে ইহারা সেদিকের কাহাকেও গ্রামের মধ্যে স্থান দিবে না, এমন কি ওদিক দিয়া যাহারা আসিতেছে তাহাদের জন্য গ্রামের প্রত্যেক

গৃহস্থের দ্বার বন্ধ। ইহারা কিরূপ বিচক্ষণ আমরা সে পরিচয়ও পাইয়াছিলাম। লালগীর বেচারাও গ্রামে থাকিতে পাইল না, আরও আগে চলিয়া গেল। কারণ সে খাস আস্‌কোটের লোক আর ঐ আস্‌কোটেই হৈজাকী বিমারী ফৈলরহা হৈ। এসব খবর এখানে যথাকালেই আসিয়া পৌছিয়াছিল।

নাথজীও আমাদের আগেই চৌদাসে পৌছিয়াছেন। পাঙ্গু হইতে

ভোটিয়া বালক

বেলা প্রায় দুইটার সময় আহারাদি শেষ করিয়া বাহির হইলাম। একটি নদী পার হইয়া প্রায় আধ মাইল চড়াই উঠিয়া বৈকালে বেলা সাড়ে তিনটা নাগাদ চৌদাসের অন্তর্গত শোঁসায় পৌছিলাম। এখন হইতে চৌদাস নামক বিস্তৃত পর্ব্বত রাজ্যেই আমরা রহিলাম।

এখন এ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে চারিখানি বৃহৎ গ্রাম লইয়াই চৌদাস নামক বিস্তৃত জনপদ। সে যাহা হউক, এই শোঁসা, চৌদাসের অন্তর্গত একখানি গ্রাম। সেই গ্রামের দিলীপ সিং পাটোয়ারীর নামে রোকা ছিল; আমরা সেইখানে গিয়া উঠিলাম। রোকা অর্থাৎ পরিচয়

পত্র। আমাদের সহিত দুইখানি রোকা ছিল। একখানি আস্কোটের পাটোয়ারী কুমার বিক্রমের আর একখানি আলমোড়ার অন্তিরাম সাজীর নিকট হইতে প্রাপ্ত। এই দিলীপ সিং আগে বিয়াসের অন্তর্গত গারবিয়াং-এর পাটোয়ারী ছিলেন; এখন নিজগ্রামের মধ্যেই আছেন।

মাঘ মাসে প্রয়াগে কল্পবাস করিবার জন্য যেমন ছাপ্পর, শুষ্ক তৃণ নির্ম্মিত একপ্রকার পর্ণকুটীর বিশেষ নির্ম্মিত হয়, দিলীপ সিংএর বাড়ী হইতে কতকটা অন্তরে পাহাড়ের ধারে সেইরূপ দুই তিনখানি ছাপ্পর খাড়া রহিয়াছে—সেই গুলিই এখন এখানকার অতিথিশালা। যেহেতু গ্রামের মধ্যে গৃহস্থের ঘরে ত আমাদের মত বিদেশীদের স্থান নাই তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমরা আসিবামাত্র দিলীপ সিং তৎক্ষণাৎ আমাদের ঐস্থান দেখাইয়া দিল এবং মোটঘাট তাহাদের লোক দ্বারা সেইখানেই পাঠাইয়া দিল। সে যেন আমাদের জন্য প্রস্তুত হইয়াই অপেক্ষা করিতেছিল। খেলা হইতে দুইটি কুলী আমাদের মালপত্র আনিয়া এই শোঁসায় পৌছাইয়া দিয়া গিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেককে ছয় আনা করিয়া বারো আনা দেওয়া হইল। লোকমণিজীর ব্যবস্থামত, অবশ্য পরে শুনিয়াছিলাম,—এখানে আমাদের জন্য আগে হইতেই সব প্রস্তুত ছিল। তা ছাড়া এখানকার পাটোয়ারী অপূর্ব্ব কর্ম্মতৎপর ব্যক্তি,—দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন যুবা।

যাহা হউক, আমরা সেই পর্ণকুটীরে আশ্রয় লইবার পূর্ব্বেই নাথজী ও লালগীর ঐখানে আশ্রয় লইয়াছিল। তাহারা এক পাশে রহিল আর আমরা অপর পাশে রহিলাম। উপরে খড়ের চাল, তাহাও জীর্ণ আর একদিকে মাত্র মাটির দেওয়াল, তাহারও উপর দিকে অনেকটাই খোলা। তাহার উপর চৌদাসে শীতও বেশী, যেহেতু চৌদাস আস্কোট হইতে অনেক উচ্চ, সমুদ্রতল হিসাবে সাড়ে ছয় হাজার ফুট।

আমরা তথায় স্থান ঠিক করিয়া লইবার পর দিলীপ সিংএর ভাই কিষণ সিং আটা, ডাল, ঘি, শাক, লবণ ইত্যাদি পাঠাইয়া দিল, কাঠ দিল, এক ঘড়া জলও পাঠাইয়া দিল, কেবল হাতে প্রস্তুত করিয়া খাইবার ওয়াস্তা। সুন্দর বন্দোবস্ত, দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। উচ্চশিক্ষিত না হইলেও পাহাড়ীরা যে যথার্থই সভ্য, অতিথিবৎসল,—এবং ভদ্র তাহা বুঝিতে আমাদের বিলম্ব হইল না।

সঙ্গী-মহাশয় প্রথমেই দিলীপ সিংএর সঙ্গে,—তোম্ বহুত আচ্ছা

আদমী হ্যায়, হাম তোমরা নাম বহুত শুনা হ্যায়, তোম মেরা বাচ্চা হ্যায়, ইত্যাদি—মধুর সম্ভাষণ করিয়া তাহার দিকে চাহিলেন, কিন্তু লোকটি প্রশংসায় বড় কান দিল না, আপন মনে তামাক টানিতে টানিতে সে তাহার নিকটস্থ এক ব্যক্তিকে কর্ম্মের নির্দ্দেশ দিতে লাগিল। তাহার পর সেখানে তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট ফাঁকা তৃণ-নির্ম্মিত অতিথিশালাটি দেখিলেন, তাহাতে আবার নাথজী এবং লালগীরের সঙ্গে থাকিতে হইবে যেহেতু সকলেই তো তাহার অতিথি, সবার উপর যখন দেখিলেন সেখানে একখানা খাটিয়াও নাই তখন তিনি মনে মনে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইলেন। সন্ধ্যার পর আমি সরল ভাবেই প্রস্তাব করিলাম যে রুটি কি পরটা আমাদের দ্বারা ত সুবিধা হইবে না, নাথজী সব একসঙ্গে তৈরী করুন না কেন, তাহাতে ক্ষতি কি, সেও ত ব্রাহ্মণসন্তান। শুনিবামাত্র একেবারে বিরক্ত হইয়াই বলিলেন,—

ওদের হাতে কেন খাব, আমরা নিজে রেঁধেই খাব। তুমি না পার বল, আমি তৈরী করছি ইত্যাদি। আমি বলিলাম, হাতে চাপড়ে রুটি তৈরী করবার বিদ্যা ত আমাদের উভয়েরই সমান। যাহা হউক, আর বেশী কথা না কহিয়া উপস্থিত মনোযোগী হইয়া আমাদের জাতিগত পবিত্রতা রক্ষা করিতে লাগিয়া গেলাম।

একমাত্র চুলা, বলিতে হইবে না আগে আমরাই দখল করিলাম। নির্ব্বিরোধী নাথজী ও লালগীর উভয়ই বলিলেন—আপলোক পহলা বানায় লিজিয়ে, পিছে হামলোক বানায়েগা। রাত্রি এগোরটার পর আমাদের কর্ম্ম শেষ হইল, তখন তাহাতে নাথজী ও লালগীর খাওয়া পাকাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ দক্ষ, অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ সুন্দর বানাইল, আর আমাদের অদৃষ্টে প্রায় তিন ঘণ্টা ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া কোনটি অতিপক্ক, কোনটি অর্দ্ধপক্ক কদাচিৎ সুপক্ক সঘৃত কয়েকখানি শক্ত রুটি পাকিয়া উঠিল।

আস্‌কোট হইতে বরাবর ধারচুলা পর্য্যন্ত আমাদের মালপত্র গাঁওসেরায় আসিয়াছিল, তারপর এই শোসা পর্য্যন্ত নগদ কুলী মাল আনিয়াছে। এইরূপে মাল আনা-লওয়ার যত সুবিধা তাহা আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেও ইহাতে আমাদের বিশেষ কোন হাত ছিল না। কারণ আস্‌কোটে বিমার বলিয়া ওখানকার কুলী বেশীদূর যাইবে না। তাহার পর আসকোটের

দিকে গরম, ওদিকের কুলী খেলা পার হইবে না, যেহেতু এদিকে ঠাণ্ডা। গরমের মানুষ ঠাণ্ডায় যাইলে পাছে বিমার এবং মৃত্যু ঘটে—ইহাও তাহাদের সংস্কারগত একটি প্রধান আশঙ্কা।

এই মাল গারবিয়াং পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবার জন্য কুলী দেখিয়া দিতে দিলীপ সিংকে অনুরোধ করায় সে বলিল,—যদিও আপনাদের মাল কিছু বেশী মনে হয়, তা হলেও আমি জানি উহা একজনেই নিয়ে যেতে পারবে। তা ছাড়া এখানে একাধিক কুলী পাওয়াও মুস্কিল। কাল সকালেই আপনার মাল ঠিক যাবে, কোন চিন্তা নেই। সে যখন বলিল—একটা লোকেই চলিবে, তখন আমরা ভাবিলাম, মন্দ কি? যেহেতু তাহাতে কতকটা আর্থিক সুবিধা ত হইবে।

প্রাতেই আমরা সাংখোলা যাত্রা করিলাম। প্রথমে প্রায় চারি মাইল বেশ ময়দান, সুন্দর, দেওদার বৃক্ষবহুল রাস্তা, তাহার মধ্যে দুই তিনখানি গ্রাম আছে, সকলগুলিতেই ভোটিয়াদের বাস। একখানি গ্রামের নাম তীজা, সেইখানিই আমাদের মুরুব্বি সেই লাল সিং পাতিয়ালের নিজগ্রাম। ধারচুলায়ও তাহার আর একখানি বাড়ী আছে, সেখানে তাহার দোকান, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ সকল গ্রাম পার হইলে তাহার পর প্রায় দুই মাইলের উপর একটি চড়াই। পাহাড়টি আপাদশীর্ষ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। চড়াইয়ের উপর উঠিতে আমাদের প্রায় একটা বাজিল, তাহার পর উৎরাই। বলিতে হইবে না তাহাও ঐরূপ জঙ্গলাকীর্ণ পথ। সেই উৎরাইয়ের মুখে কোথায় সাংখোলা যাইবার একটি পথ, বনপথ বা পাকদণ্ডি আছে—সেটি আমরা জানিতাম না। বিজন জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইতেছি,—পথ জিজ্ঞাসা করিবারও কেহই ছিল না, আর আমাদের বাহক যে কতটা পশ্চাতে রহিয়াছেন তাহাও জানা নাই। তিনি আবার দুজনের বোঝা লইয়া আসিতেছেন। শুনিয়াছিলাম সাংখোলা একটি জঙ্গলি পড়াও। জঙ্গলি পড়াও তাহাকেই বলে যেটি জঙ্গলের মধ্যে। এ অঞ্চলে হচ্ছে সাংখোলা, গলা, মালপা প্রভৃতি জঙ্গল পড়াও।

আমরা সোজা নামিয়া যখন নদী পার হইলাম তখন প্রায় দুইটা হইবে। কল্যকার সেই চারিখানি স্বহস্তপক্ক রুটি ছিল, তাহা আমরা দুইজনে লইয়া বাহির হইয়াছিলাম আর সঙ্গে কিছু মিষ্টান্ন ছিল প্রাতে তাহাই আহার করিয়া তাহার উপর দুই অঞ্জলি জলযোগ করা হইয়াছিল। ক্ষুধায় তৃষ্ণায়

আমরা কাতর হইয়া এখন যত শীঘ্র সাংখোলা পৌঁছিতে চেষ্টা করিলাম, বিধাতার বিধানে ততই বিলম্ব হইতে লাগিল।

আশ্চর্য্য নির্জ্জনতা, পথে জনপ্রাণী দেখা গেল না। এ অরণ্যে কাহাকে পথ জিজ্ঞাসা করিব? আমরা নদী-সৈকত ধরিয়া কিছুক্ষণ চলিয়া তাহার পর পথে উঠিলাম। উঠিয়া বুঝিলাম যে ঠিক যাওয়া হইতেছে না, কারণ শুনিয়াছিলাম বালুঘাকোটের মত সাংখোলা ঠিক সদর রাস্তার উপরেই নহে। বড় রাস্তা হইতে খানিকটা চড়াই উঠিতে হয়। পথের সন্ধানে চারিদিকেই

ভোটিয়া সুন্দরী

বিশেষ লক্ষ্য করিতেছি। দেখিলাম, কিছু দূরে একটি ভোটিয়া নারী পৃষ্ঠে কাষ্ঠ সংগ্রহের বাজরা বাঁধিয়া জঙ্গল হইতে বাহির হইতেছে। দেখিয়া যেন একটু আশা হইল।

কিন্তু কথা ত সেও বুঝিবে না আমিও বুঝিব না, তা সত্ত্বেও খানিকটা অগ্রসর হইয়া আকার ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলাম,—সাংখোলা কোথায়, কোন্‌দিকে? সে দূর হইতেই হাত দিয়া দেখাইয়া দিল,—ঐদিকে। সেদিকে কিন্তু যাইবার পথ দেখা যাইতেছে না।

সঙ্গী-মহাশয়কে বলিলাম,—চলুন ঐদিকে যাওয়া যাক। পরে ঐ দিকে যাইবার রাস্তাটা যে কোন্‌দিকে, জিজ্ঞাসা করিবার জন্য সেই ভোটিয়া নারীর দিকে অগ্রসর হইয়া আমি যত যাইতে লাগিলাম সে ততই দ্রুত চলিতে লাগিল, আর এক একবার পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিতে লাগিল। আমি যত দ্রুত তাহার নিকট পৌঁছিব বলিয়া চলিতে লাগিলাম, সে ততই দ্রুত চলিতে লাগিল, এবং ক্রমে সে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। বুঝিলাম, বিদেশী দেখিয়া সে ভয় পাইয়াছে। আমি হাত নাড়িয়া বলিলাম—ভয় নাই। কিন্তু সে, কথা ত বুঝে না, তাহার উপর এরূপ অবস্থায় ভয় নাই বলাতে সে যেন আরও ভয় পাইয়া গেল। শেষে আমার দিকে চাহিয়া হাত দিয়া তাহার পশ্চাতে আসিতে ইঙ্গিত করিয়া কোথায় বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল, তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না। আমি এটুকু বেশ বুঝিতে পারিলাম যে সে পশ্চাতে আসিতে ইঙ্গিত করিল।

দেখিলাম, ওদিকে আর পথ নাই, সুতরাং যাওয়া বৃথা; তখন সঙ্গী-মহাশয় যেখানে ছিলেন সেইখানে আসিয়া তাঁহাকে সকল কথাই বলিলাম। যে পুলটি দেখা যাইতেছিল তাহা পার হইয়া দুজনেই একটি সরু রাস্তা ধরিয়া যেদিকে সে দেখাইয়াছিল সে দিকটি লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলাম। কিছুদূর গিয়া দেখিলাম, জঙ্গলের মধ্যে সে পথটি মিলাইয়া গিয়াছে। তখন দুইজনেই বোকার মতই কিছুক্ষণ দেখিয়া শুনিয়া শেষে ফিরিয়া আবার সেই সেতুর নিকটে আসিলাম। একটি প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডের উপর উঠিয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিলাম পথের চিহ্ন দেখা যায় কি না। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাইলাম, আন্দাজ একপোয়া দূরে বেশ একটি প্রশস্ত রাস্তা পাহাড়ের উপর উঠিয়া গিয়াছে। সেটি দূরে, বড় বড় দেওদার গাছের ফাঁকের মধ্য দিয়া অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল, কিন্তু কোন্ পথ দিয়া গিয়া ঐ পথ ধরিব সে পথটি দেখিতে পাইলাম না, চারিদিকেই এতটা ঘন কাঁটা ঝোপ ও বিছুটির জঙ্গল।

পথশ্রমে ক্লান্ত, তাহাতে পথ খুঁজিতে খুঁজিতে বিরক্ত এবং অধৈর্য্য হইয়া সঙ্গী-মহাশয়ের আর মাথার ঠিক রইল না। আর কোন কথা না বলিয়া গোঁ ভরে তিনি এক ঘন জলবিছুটির জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সেই জঙ্গল ভেদ করিয়া ঐ পথের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

তাঁহার পায়ে ছিল জুতা, তাহার উপর সেই মোটা কম্বলের সিপাহীদের পায়ে বাঁধিবার পটি হাঁটু অবধি জড়ানো আর আঁটিয়া বাঁধা, তাহার উপর আজানুলম্বিত জামা সুতরাং তিনি অবাধে যাইতে লাগিলেন; আর আমার আল্লা, খালি পা, তাহার উপর পথে তীক্ষ্ণ পাথরের খোঁচা লাগিয়া দুই তিন স্থানে কাটিয়া গিয়াছে, ইহার উপর সেই পাহাড়ে বিছুটির জঙ্গল, পায়ে লাগিবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে তাহার কার্য্য আরম্ভ করিল।

সঙ্গী-মহাশয়ের আসল উদ্দেশ্য কি ছিল তাহা ঠিক জানি না, কিন্তু আমি যতই বলিতে লাগিলাম, পথ ঐদিকে নয়, তিনি ততই সেই দিকে চলিতে লাগিলেন। শেষে কিছুদূর আসিয়া আবার উভয়ে এক খরস্রোতের নিকট উপস্থিত হইলাম। তাহার ওপার দিয়া যেন খানিকটা পথের রেখা দেখিতে পাওয়া গেল। সেই পথেই চলিলাম—আবার কতকটা প্রবল স্রোত পড়িল,—তাহা অতিক্রম করিয়া শেষে আমরা ঠিক রাস্তাটি পাইলাম। বেলা প্রায় তিনটার সময় সাংখোলায় পৌছিলাম এবং খোঁজ করিয়া নয়ন সিং প্রধানের আস্তানায় উঠিলাম। মাত্র তিন চার ঘর লোকের বাস লইয়া এই পড়াওটি।

গিয়া দেখি, সেই মেয়েটি উঁচু মাচানের উপর বসিয়া মায়ে-ঝিয়ে ক্ষুদ্র কুলায় গম ঝাড়িতেছে। শুনিলাম, প্রধান মহাশয় ক্ষেত্রে গিয়েছেন, সন্ধ্যার সময় ফিরিবেন, তখন দেখা হইবে। শোঁসাতে যেমন ছাপ্পর ছিল, এখানেও সেইরূপ ছাপ্পর আছে। প্রধানের ঘর হইতে কিছুদূরে জলের একটা মোটা ধারা আছে, তাহারই নিকটে সেই পর্ণকুটীর, বেশ বড়। তাহার একদিকে ছিটের বেড়া আর তিনদিক গোলা, উপরে খড়ের ঢালু ছাদ। ইহাই ভোটিয়াদের খামার, অর্থাৎ আঝাড়া ধান, গম প্রভৃতি জমা করিবার স্থান। তাহার ঠিক পশ্চাতেই তিন চারি বিঘা প্রায় সমতলভূমির স্তর, উহাতে গম এবং অন্যান্য ফসলও হয়।

সঙ্গী-মহাশয় সেইখানে বসিলেন। আমি যখন দেখিলাম যে মালপত্রসহ বাহক এখনও আসে নাই, আমি প্রধানের সন্ধানে ক্ষেত্রের দিকে গেলাম। প্রধানের একটি বালক-পুত্রকে সঙ্গে লইয়া কতকটা উঠিয়া এদিক ওদিক জঙ্গলের মধ্য দিয়া সেখানে উঠিলাম—যেখানে স্বপুত্র নয়ন সিং মস্থরের গাছ কাটিতেছিলেন। ব্যাপার ত সব বলিলাম যে, আমাদের কুলী এখনও আসে নাই, তাহা ছাড়া খাওয়া হয় নাই। সে বলিল যে আপনারা আসিলেন কোন্ পথে, পথ যে এইখান দিয়া। তাহাকে বলিলাম,—জিজ্ঞাসা করিবার লোক ত পাই নাই, সেই কারণ কতকটা ঘুরিয়া আসিয়াছি। যাহা হউক, জানা গেল যে প্রধান এখন ক্ষেত্রের কর্ম্ম ছাড়িয়া নামিবেন না, সন্ধ্যার পূর্ব্বে নামিবেন এবং তখন আমাদের গতি করিতে পারিবেন। আরও বলিলেন যে, কুলী আসে ত এই দিক দিয়াই যাইবে, তাহারা এপথ জানে। আপনারা বিদেশী বলিয়াই ঘুরিয়া আসিয়াছেন।

ওখান হইতে নামিয়া সঙ্গী-মহাশয়ের নিকট আসিয়া ত সকল খুলিয়া বলিলাম। তিনি বলিলেন, চল, এখান থেকে যাওয়া যাক।

যেখানে বসিয়া আমরা কথা কহিতেছিলাম, সেখান হইতে সোজা সদর রাস্তা, যদিও উহা প্রায় আধ মাইল দূরে, তাহা হইলেও বেশ পরিষ্কার দেখা যায়, তবে ছোট দেখায়। এই সাংখোলা আর ঐ সদর রাস্তা, ইহার মধ্যে ব্যবধান পৃথক্ পৃথক্ তিন চারিটি ধারে মিলিত একটি প্রশস্ত জলস্রোত, তাহা ক্রমে নিম্নমুখী হইয়া আরও দুই মাইল যাইয়া কালীর অঙ্গে মিশিয়াছে। তাহার দুইপার্শ্বে পূর্ব্বদিকে অসংখ্য প্রস্তর-বিক্ষিপ্ত ঢালু জমি, দুই দিক হইতেই নামিয়া সেই ধারা পর্য্যন্ত আসিয়াছে। তাহাতে বড় বড় গাছও আছে, আবার বিছুটির জঙ্গলও আছে। মধ্যের ব্যবধান ঢালু ও নিম্ন থাকায় সে স্থান হইতে সদর রাস্তার দিকে বেশ অবাধ দৃষ্টি চলে, যেহেতু মধ্যে বড় একটা কিছু প্রতিবন্ধক নাই।

আমি বলিলাম, আমাদের কুলী যদি গলাগড়ে গিয়া থাকে—একবার সেদিকে গেলে হয় না? সাংখোলাকে দক্ষিণে ফেলিয়া আরও প্রায় দুই মাইল সদর রাস্তা ধরিয়া গেলে গলাগড় যাওয়া যায়। গলাও একটি জঙ্গলি পড়াও। আর ডাকপিয়ন বদলের আড্ডা।

আমরা মনে করিলাম, সাংখোলায় না গিয়া সে যদি গলায় গিয়া

থাকে, আমরা গেলে হয়ত দেখা পাইব। আমাদের তখন উভয়েরই মাথার ঠিক ছিল না—সেটা উহ্য থাকাই ভাল, না হইলে গলাগড়ের কথা ভাবিতে যাইব কেন,—সেটা মোটেই গন্তব্য স্থান নয়। এই সকল আলোচনা চলিতেছে, এমন সময় দূরে দেখা গেল একটি বাহক সেই সদর রাস্তায় মোট পিঠে লইয়া উঠিতেছে, বেশ বড় মোটা। বোঝার ভারে সে অতি ধীরে ধীরে উঠিতেছে। আমি বলিলাম, দেখুন দেখি, আমাদের সেই বোঝা নয় কি? ঐ দেখুন সে গলার দিকেই যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে সে বোঝাটি একটা স্থানে ঠেকা দিয়া খানিকটা দাঁড়াইল; যেন বিশ্রাম করিতেছে এইরূপ বোধ হইল।

সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন, চল দেখা যাক,—আবার আমরা উঠিলাম। তখন বেলা প্রায় চারিটা হইবে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়া আবার সেই প্রবল স্রোতগুলি পার হইয়া পাকডাণ্ডি দিয়া আমরা সেই সেতুটির নিকট আসিলাম। এবারে বেশ পথ দেখা গেল। সরু পথ, তাহা স্থানে স্থানে অস্পষ্ট হইলেও আমাদের আর ভুল হইল না। রাস্তায় উঠিয়া অনেকটা গেলে পর দেখিলাম, যে-লোকটিকে আমাদের বাহক ভাবিয়াছিলাম সে অন্য একটি পাহাড়ী লোক, অবশ্য সেও প্রকাণ্ড বোঝা লইয়া যাইতেছে। দেখিলাম, রাস্তার ধারে মোটটি রাখিয়া সে উপরে কাঠ খুঁজিতে চলিয়া গেল।

আর আমরা সাংখোলার দিকে ফিরিলাম না, গলাগড়ের দিকেই চলিতে লাগিলাম। রাস্তার দক্ষিণে ঢাল নামিয়া বহুদূর গিয়াছে। আর বাঁদিকে খাড়া পাহাড়, তবে বেশী জঙ্গল নাই; সেদিকে মাঝে মাঝে এক এক খণ্ড বেশ কতকটা সমান জমিও দেখা যাইতেছিল। এমন একটি প্রায় সমতল ভূমির উপর এক ভোটিয়া ব্যবসায়ীর তাঁবু পড়িয়াছে, তাহার পার্শ্বে মাল বোঝাই, অর্দ্ধ চাম আর অর্দ্ধ পশমের থলি গাদা দেওয়া আছে। তাঁবুর মধ্যে কতক মাল আছে, আবার পার্শ্বে রান্না চড়িয়াছে, ধোঁয়া বাহির হইতেছে। তাহার কিছুদূরে উচ্চ পাহাড়ের উপর তাহাদের ভেড়া ও ছাগলের পাল চরিতে উঠিয়াছে দেখা গেল।

এই ভোটিয়ারা যে ব্যবসায়জীবী তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহারা বহু পরিমাণ মাল বহনের কর্ম্মে ভেড়ার পাল কি ভাবে ব্যবহার করে দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এক একটি ভেড়া দশ সের, কোন কোনটি

আবার পনের সের অবধি বোঝা লইয়া বেশ উঠিতে পারে। সেই দশ সের মাল, এধার-ওধার করিয়া মধ্যে দুইটি যোড়া থলিতে পাঁচ পাঁচ সের করিয়া মেরুদণ্ডের দুইদিকে বোঝাই দেওয়া হয়, আর গলার সঙ্গে কাঁচা উলের একটি দড়ি দিয়া তাহা আটকান থাকে, পড়িয়া না যায়। সেই ভেড়ার পাল যখন যায়, তাহার সম্মুখে একটি লোক ও একটি তিব্বতী কুকুর, পশ্চাতেও ঐরূপ থাকে,—উহারাই রক্ষক। আবার কখনও কখনও দেখিয়াছি, সম্মুখে কেবলমাত্র একটি কুকুর যাইতেছে, আর সর্ব্বপশ্চাতে একটি লোক, সেও পিঠে বোঝা লইয়া চলিয়াছে।

মাল-বোঝাই ভেড়া-ছাগলের পাল যখন পর্ব্বতের পথে চলে তখন
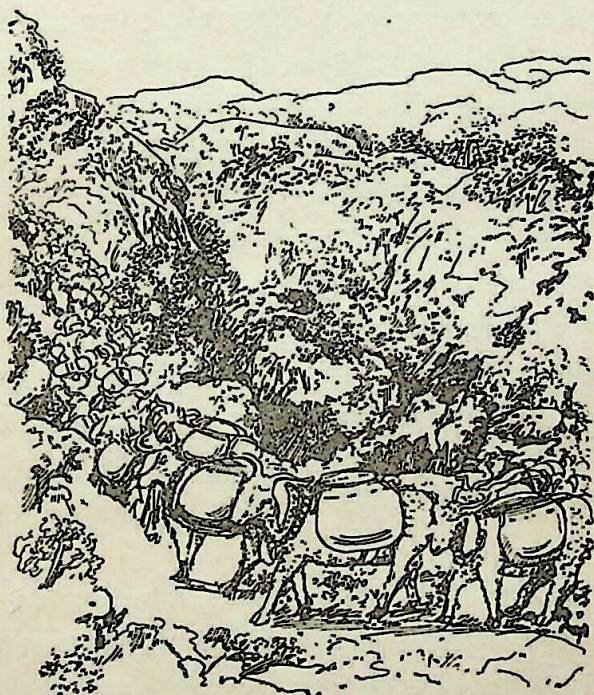
মালবাহী ভেড়াপাল

দেখিতে ভাল, কিন্তু তাহা অতিক্রম করিতে বিপদ গণিতে হয়। এক এক পালে পঞ্চাশ, ষাট হইতে দেড়শত, কখনও দুইশত পর্য্যন্ত পশু থাকে।

প্রায় আধ মাইল ধরিয়া ভেড়াই চলিতেছে যেন আর ফুরায় না। পথে মানুষ দেখিলে ভয় পাইয়া চারি পাঁচটা একত্র গুঁতাগুঁতি করিয়া

দাঁড়ায়, তখন আর চলিবার জো থাকে না। তাহার উপর যদি পথের পাশেই খড্ থাকে তাহা হইলে বিষম বিপদ,—কারণ তাহাতে লোক যাতায়াতের অসুবিধা ত আছেই, তাহার উপর ভেড়ারা ভয় পায় বলিয়া সঙ্গের লোকেরা প্রায়ই একধার দিয়া লইয়া যায়। ভয় পাইলে ইহারা মালসুদ্ধ খড়ের মধ্যে পড়িয়া প্রাণ হারায়। এরূপ প্রায়ই ঘটে।

আমরা বালুয়াকোটের পর হইতেই এইরূপ পিঠে মাল-বোঝাই ভেড়ার এক-আধটা দল দেখিতে দেখিতে আসিতেছিলাম। কিন্তু খেলা পার হইয়া কিছু বেশী মাত্রায় দেখিতে লাগিলাম, কারণ, ব্যবসা-হেতু তিব্বত যাইবার সময় ঘনাইয়া আসিতেছে।

এখন, প্রায় পাঁচটার সময় গলায় পৌঁছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখিলাম ভোঁভাঁ, কেহ কোথাও নাই। দুইজন ভোটিয়া বলবান যুবক মদ্যপান করিয়া মৃদুস্বরে গান গাহিতেছে আর তাহাদের সম্মুখে বৃষ্টি হইতে বাঁচাইবার জন্য প্রাঙ্গণে মোটা ত্রিপল-ঢাকা মালের গাদা রহিয়াছে। পরিচয়ে জানিলাম তাহারা বুদিয়াল অর্থাৎ বুদিনিবাসী।

মালাপার পর বুদি নামক একখানি গ্রাম, তাহার কথা পরে বলিব। পাথরের কাঁড়ি আর মাটি দিয়া প্রস্তুত দেওয়াল, উপরে শ্লেটের ছাদ, ভিতরটা ধোঁয়ার ঝুলে কৃষ্ণবর্ণ, আবর্জ্জনা-পরিপূর্ণ এবং মেষ-ছাগলাদির মল স্তূপীকৃত কৃষ্ণবর্ণ গৃহবিশেষকেই এদিকের পান্থশালা বলিয়া বুঝিতে হইবে। তাহাকে পান্থশালা না বলিয়া পশুশালা বলিলেই যেন ঠিক বলা হয়। এই গলাতেও এইরূপ পান্থশালা। এহেন স্থানে যে দুইটি ভোটিয়া যুবক বসিয়া বেশ মনের আনন্দে পান ও গান করিতেছিল, আমাদের যাওয়াতে তাহা ভঙ্গ হইল।

গলা কোন গড় নহে বা কোন গ্রামও নহে, অন্ততঃ এখন নাই। সেই স্থান এখন ডাকপিয়ন-বদলীর একটি আড্ডা, আর ব্যবসায়ীদের ছাগল ভেড়া প্রভৃতি লইয়া রাত্রিবাসের উপযুক্ত একটি জঙ্গলময় পড়াও মাত্র। সেটি রাস্তার ঠিক উপরেই। আর ডাকপিয়নের আড্ডাটি আরও খানিক উপরে, ঘন বিছুটির জঙ্গল ভাঙ্গিয়া উঠিতে হয়।

তাহাদের আনন্দে ব্যাঘাত ঘটানো ছাড়া আর উপায়ও ছিল না! সেই নবীন বুদিয়াল মহাশয়দ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, পিয়ন কোথায়? তাহাদের মধ্যে একজন বিকৃত হিন্দীতে,—উপরে আছে, বলিয়া, উচ্চৈঃস্বরে

একটি ডাক দিল। দূর উপর হইতে যেন একজন সাড়াও দিল বটে, কিন্তু নামিল না। শেষে তিন-চারিবার ডাকিবার পর যখন কেহ আসিল না, তখন সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন, তুমি এখানে থাক, দেখ যদি আমাদের লোক আসে, আমি উপরে গিয়ে দেখি, কি হয়।

আমাদের সঙ্গে যাহা কিছু চাল, ডাল, আটা ইত্যাদি রসদ তাহা ত পশ্চাৎপথে সেই নিরুদ্দিষ্ট বাহকের পিঠেই রহিয়াছে। এখন ঐ বুদিয়াল ভোটিয়াদের নিকট হইতে ভাগ্যক্রমে অধিক মূল্যে দুইজনের মতো আটা কিনিতে পাওয়া গেল। সঙ্গী-মহাশয়,—ছত্রী পিয়নের সঙ্গে কিছু পারিশ্রমিকের বন্দোবস্ত করিয়া তাহার হাতে রুটি আর উরুদ্‌কি ডালের চট্‌পট্ যোগাড় করিয়া ফেলিলেন,—পরে, নিজে আহার করিয়া নীচে আসিয়া আমাকে যাইতে বলিলেন। পূর্ব্ব রাত্রে শোঁসাতে পণ্ডিতজীর, সন্ন্যাসী নাথজীর হাতে রুটি খাইতে প্রবৃত্তি হইল না,—কিন্তু ডাকপিয়নের হাতের প্রস্তুত ডাল রুটিতে এখানে আজ অপরাহ্নে জাতিগত পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইল। অবশ্য তাঁর এই ভাব লইয়া একটু চিন্তা করিয়াছিলাম; দেখিলাম নাথজীর একটি দোষ লইয়াই তাঁর এই বৈষম্য, সেটা তাঁর ধূমপান স্বভাব—যা তিনি ক্ষমা করিতে পারেন না।

এদিকে খেলার পর গারবিয়াংই শেষ ডাকখানা। খেলা হইতে একজন বাহক ডাক লইয়া চৌদাস পৌছাইয়া দেয়, আবার সেইখান হইতে আর একজন এই গলাগড়ে লইয়া আসে। তারপর এখান হইতে মালপা অবধি অপর একজনের অধিকার, তারপর মালপা হইতে ডাক আর একজন গারবিয়াং পৌছাইয়া দেয় এবং সেই ব্যক্তিই গারবিয়াং হইতে ডাক লইয়া মালপা অবধি রাখিয়া যায়। এই ভাবেই এদিকের ডাক লইয়া যাতায়াতের ব্যাপার চলে। আমাদের এই যে অস্থায়ী পাচক মহাশয়, ইহার এলাকা গলা হইতে মালপা ডাক লইয়া আনাগোনা করা।

আমরা কাল যখন মালপায় যাইব, সে তখন মালপাতেই থাকিবে। সে মালপার লোক আসিলেই লইয়া তখনই চলিয়া যাইবে। তাহাকে বলিয়া রাখা হইল যে, আমরা কাল মালপায় গিয়া তোমার ওখানেই উঠিব। কারণ সেখানে বাহকদের ঐ ডাক বদলের আড্ডাই পথিকের একমাত্র আশ্রয়স্থান। তাহার সেই কুঁড়ে ছাড়া আর কোন গ্রাম বা

থাকিবার স্থান নাই। সে বলিল, বহুৎ আচ্ছা; সামান্য দুই-এক আনা পাইবে—সেই আশায় সে আনন্দেই রাজি হইল।

আহারাদি করিয়া নামিলাম, দেখিলাম আমাদের মোট ত আসে নাই; এদিকে অন্ধকারও ঘনাইয়া আসিতেছে। আজ সেইখানেই রাত্রি কাটাইতে হইবে ভাবিয়া আমি কিছু কাঠকুটা যোগাড় করিয়া পান্থশালার পার্শ্বস্থ দ্বারহীন একটি কামরা দখল করিয়া তাহার মধ্যে আগুন জ্বালাইবার যোগাড় করিলাম। বেশ শীত ছিল।

সঙ্গী-মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—এখানে কোথায় থাকা যাবে, এখানে থাকা কি সুবিধাজনক? আমি বলিলাম,—তবে কোথায় থাকা হবে? কোন রকমে এইখানেই রাত্রিটা কাটিয়ে প্রভাতে মাল এলে মালপার দিকে যাওয়া যাবে। মাল আমাদের অবশ্যই সাংখোলায় এসেছে, কাল সকালেই আমরা পাব।

সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন,—না, এখানে থাকা সুবিধা নয়। আর সাংখোলা যেতে ত মোটে দুই মাইল পথ, আমরা দেখতে দেখতে চলে যাব। চল, ওঠো,—

মোটের উপর তিনি একটু ভয় পাইলেন। দুইজন জোয়ান ভোটিয়া মণ্ডপ রহিয়াছে আর কাছে বড় কেহ নাই, যদি পয়সার লোভে কিছু দুর্ঘটনা ঘটায়।

কিন্তু সাংখোলায় ফিরিয়া যাইবার অসুবিধাও কম নয়। মনে কর, সদর রাস্তা হইতে নামিয়া সেই ক্ষুদ্রবৃহৎ বিচিত্র এবং বিশৃঙ্খল প্রস্তরখণ্ডের উপর দিয়া তিন চারিটি জলস্রোত পার হইয়া, আবার জঙ্গলের মধ্যে সেই ক্ষীণ রেখা ধরিয়া তবে সাংখোলায় পৌছিতে হইবে।

যদি দিনমান হইত তাহা হইলে উপরোধ অনুরোধের পরিবর্ত্তে তিনি আমায় বলিতেন,—তুমি থাক আমি চললাম। কিন্তু এটা রাত্রি। এ সকল স্থান দিনমানেই গভীর নিস্তব্ধ ও নির্জ্জন, তাহার উপর এখন যখন রাত্রি, একলা যাইতেও তাঁহার সাহস হইতেছে না।

কিন্তু এদিকে,—একে আমার পায়ের তলে দুই স্থানে কাটিয়া তাহাতে বালি কাঁকর ঢুকিয়া বেশ টাটাইয়া রহিয়াছে, তাহার উপর সমস্ত দিনের পর আহার করিয়া এত ক্লান্ত হইয়াছিলাম যে, আর এক-পাও নড়িবার ইচ্ছা ছিল না। তাহার উপর, এখানেই থাকা সিদ্ধান্ত করিয়াই কিছু খড়

সংগ্রহ করিয়া বিছাইয়াছি, তাহার উপর বসিয়া সবে অগ্নি জ্বালাইবার যোগাড় করিতেছি; সুতরাং আমার যাইতে যে একান্তই অনিচ্ছা তাহা আর বলিতে হইবে না। তিনি কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে শেষে উঠিতেই হইল। অন্ধকার তেমন ছিল না, শুক্লপক্ষের চাঁদ, কিন্তু আমাদের অদৃষ্টের মত তিনিও মেঘে ঢাকাই ছিলেন। তবে তাঁহার ক্ষীণ আলোকে পথটি কোন প্রকারে দেখা যাইতেছিল। তাহাতেই আমরা পথ দেখিয়া প্রায় নয়টার সময় আবার সাংখোলায় আসিয়া নয়ান সিং প্রধানের গৃহের সম্মুখে ডাকাডাকি আরম্ভ করিলাম।

একখানি খাটিয়াতে তিনি আপাদমস্তক ঢাকিয়া শবের মত পড়িয়া ঘুমাইতেছিলেন, ডাকাডাকিতে চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। আমরা ততক্ষণ পূর্ব্ববর্ণিত সেই ছাপ্পরে গিয়া বসিলাম। তিনি আসিয়া বলিলেন,—আপনাদের মাল এসেছে, একটা লোক, অতটা বোঝা একজনে পারবে কেন? তার অত্যন্ত কষ্ট হয়েচে।

ক্রমে ক্রমে সেই বাহক মহাশয়ও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যে অতিকষ্টে উহা আনিয়াছেন, জোড় হাতে জিভ্ কাটিয়া কেবল তাহাই জানাইতে লাগিলেন। দাঁতে জিভ্ কাটা অতিশয় শ্রদ্ধার লক্ষণ। আমরা আমাদের মোটঘাট, তিনি যাহা এত কষ্টে আনিয়া পৌছাইয়া দিয়াছেন সেগুলি আনাইয়া লইলাম।

বাঁধন খুলিয়া নিজ বিছানাদি দেখিয়া বিছানা লইলাম। মাল আসলে ঠিকই ছিল। অর্থাৎ তহবিল ঠিক স্থানেই আছে। তারপর পায়ের সেই ক্ষত স্থানটি ধারার স্নিগ্ধ জলে বেশ করিয়া ধুইয়া মুছিয়া আরামে বিছানায় বসিলাম।

কথা ঠিক হইয়া গেল যে, আমাদের জন্য আর একটি কুলী প্রধান মহাশয় কাল প্রাতেই যোগাড় করিয়া দিবেন, গারবিয়াং অবধি যাইতে তাহাকে সাড়ে তিন টাকা দিতে হইবে। আর চৌদাসের কুলী মহাশয়কে দুইজনের মাল আনার জন্য অতিরিক্ত পারিশ্রমিক এক টাকা দিতে হইবে। আর এই রাত্রের বিশ্রামের ব্যাঘাতের জন্য; আমাদের সঙ্গে যে মিষ্টান্ন ছিল, প্রসাদ বলিয়া বাহকের হাতে দেওয়া হইল এই প্রসাদেই সে দুঃখ দূর করিবে। তাহার পর কিন্তু বড়ই আরামে নিশ্চিন্ত মনে দেবতাকে স্মরণ করিয়া শয়ন করিলাম।

সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন—দেখলে হ্যা! এ কম্‌ফার্টটা কি ওখানে পাওয়া যেত, এখানে এসে ভাল হল কি না? আমি বলিলাম,—যখন আসা হল তখন নিশ্চয় ভাল হইয়াছে।

সঙ্গী-মহাশয় তখন—বুঝলে হ্যা! আমার কথা শুনো, বলিয়া কম্বলখানি ভাল করিয়া মুড়ি দিলেন। আমি বলিলাম,—আপনার কোন্ কথাটা শুনচি না?

বাহকের অসুবিধা আর আমাদের রহিল না। প্রভাতে কতকটা গোদুগ্ধ পাওয়া গেল, তাহাই পান করিয়া আমরা মালপার দিকে যাত্রা করিলাম, মাল আমাদের সঙ্গেই চলিল। এই পথেই সেই টুটনেওয়ালা পুল। পথে আমরা শুনিলাম যে, সে পুল ঠিকই আছে, ভাঙ্গে নাই। নির্ব্বিঘ্নে যাওয়া যাইবে ভাবিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম।

এদিক হইতে গারবিয়াং যাইতে এবং গারবিয়াং হইতে এদিকে আসিতে এই রাস্তাটি স্মরণীয়। এরূপ ভয়ানক বিপদসঙ্কুল রাস্তা আর নাই;—আবার ইহার তুল্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও বুঝি আর কোন রাস্তায় নাই। আস-কোটের পর হইতে সব রাস্তাই বিজন,—কেবল মাঝে মাঝে মালবাহী মেষপাল ও সম্মুখে পশ্চাতে কুকুরওয়ালা রক্ষক চলিয়াছে, আর মাঝে মাঝে পাখীর ডাক। এ-রাস্তায় আর জঙ্গল বেশী নাই, এখানেই জঙ্গলের শেষ। হিমালয়ের যে অংশে জঙ্গলের শেষ হইয়াছে,—সেইখান হইতেই হিমালয়ের মহোচ্চ স্তর অর্থাৎ গ্রেট হিমালয়ান রেঞ্জএর আরম্ভ। ইহার উপরেই বরফান মুলুক, অর্থাৎ তুষার রাজ্য।

কালীর তীর দিয়া বরাবর পথ। এপারে তত গাছপালা নাই, কেবল রুক্ষ বিশালকায় অভ্রভেদী। ওপারে নেপালের সীমানায় চীড় এবং দেওদারের বেশ ঘন জঙ্গল। আশীর্ষমূলাবধি সুদীর্ঘ কত নয়নাভিরাম জলধারা অবিরাম চলিতেছে, দুইদিকই দেখা যাইতে লাগিল।

রাস্তাটি প্রথম কতকটা বেশ। তাহার পর উৎরাই-এর পালা, সে বড় সঙ্কটময় বন্ধুর পথ। কোথাও এক হাত, কোথাও দেড় হাত প্রশস্ত রাস্তা। কোথাও সিঁড়ির মত ধাপ, আবার কোথাও একেবারে খাড়া উপর্য্যুপরি ন্যস্ত প্রস্তরখণ্ডের উপর পা দিয়া সন্তর্পণে নামিতে হয়। কোন স্থান এত মসৃণ যে পিছলাইয়া যাইবার সম্ভাবনাও কম নহে। বামে খাড়া বৃক্ষলতাশূন্য নগ্ন পর্ব্বত প্রায় দুই শত ফিট উচ্চ, তাহারই গা দিয়া হাত দেড় হাত এক

বিপদসঙ্কুল পথ

প্রস্থ রাস্তা নামিয়া গিয়াছে, তাহার দক্ষিণেও ঐরূপ বিরল বৃক্ষলতা কেবলই বহুধা খণ্ডিত প্রস্তর সমষ্টির ঢাল একেবারে প্রায় সোজা দুইশত ফিট নামিয়া কালী নদীর উপর গিয়া পড়িয়াছে। নদীর তীরে কিছু বৃক্ষলতাদি আছে। উৎরাই-এর মুখে পথটি যথার্থই বন্ধুর। সেই অবরোহণের প্রতি পদে নিজেকে বিশেষ সাম্‌লাইয়া চলিতে হয়।

আমরা এতদিন হাতে দীর্ঘ পাহাড়ে লাঠি ধরিয়া—পায়ে হাঁটিয়া আসিতেছিলাম। এখন কিন্তু এ রাস্তা শুধু পায়ে হাঁটিয়া উত্তীর্ণ হইবার নয়। দুইটি হাত,—এক হাতে লাঠি ধরিয়া আর একহাত প্রস্তর অবলম্বনে। এমনই এ পথের মহিমা কোথাও দুই তিন ফুট খাড়া,—বসিয়া পা দুটি বাড়াইলাম, পরে লাঠিটি হাতের জোরে যতটা শক্ত ধরা যায় ধরিয়া আবার পা বাড়াইলাম। তারপরই গড়ান জমি, সেখানে বসিয়া দুটি হাতের ভারে শরীরকে কতকটা অগ্রসর করিয়া দিলাম। এইভাবেই এ পথের কতকটা অতিক্রম করিতে হইয়াছে।

অনুমান করিতে পারা যায় এ রাস্তা এতটা বন্ধুর ছিল না। খুব সম্ভব সম্প্রতি একটা বড়-গোছের ধস্ নামিয়া এই ভূধরের অধিক অংশই ওলটপালট করিয়া দিয়াছে। ভূকম্প বা ধস্ নামা ব্যতীত এমনটি হওয়া সম্ভব নয়।

এইরূপ একটা বিপ্লব যে সম্প্রতি ঘটিয়াছে তাহার প্রমাণও সম্মুখেই রহিয়াছে। গাছপালা যাহা কিছু ছিল স্থানভ্রষ্ট প্রস্তরখণ্ডের সঙ্গে সেগুলি গড়াইয়া নীচে একেবারে কালীর বক্ষের উপর গিয়া পড়িয়াছে। উপরে এখন গাছপালার চিহ্নমাত্র নাই। এখানে একগাছি তৃণ পর্য্যন্ত এখনও জন্মায় নাই। যাহা হউক, এক্ষেত্রে আমাদের জানুদ্বয়ও চালাইতে হইয়াছিল, হামাগুড়ি দিয়া, কোথাও কোথাও বসিয়া, পা বাড়াইয়া—মোট কথা সর্ব্বশরীর দিয়াই এ পথটুকু উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে।

আশ্চর্য্য, এই ভোটিয়া বাহকদ্বয় পিঠে বোঝা লইয়া এ পথ দিয়া অতি সহজেই চলিয়া যাইতে লাগিল। আবার মধ্যে মধ্যে দুর্গমে তাহারা সঙ্গী মহাশয়ের হাত ধরিয়া অনেকবার সাহায্যও করিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রাণে ভয়ের পরিবর্ত্তে একটি গুরুগম্ভীর আনন্দের নেশায় অতি সহজেই এসকল স্থান উত্তীর্ণ হইয়া আমরা গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বিস্ময় ও আনন্দের চাপে ভয় যেন আর মাথা তুলিতে পারিল না।

আরও একটি বিশেষ ব্যাপার, এপথে ক্লান্তি বা অবসাদের কথা একবারও মনে উঠিতে পারে নাই। যেদিকে চক্ষু পড়িয়াছে সেই দিকেই একটি না একটি নয়নাভিরাম দৃশ্য আনন্দে পরিসমাপ্ত হইয়া প্রতি পাদক্ষেপেই হৃদয়ে যেন নূতন বলের সঞ্চার করিতেছিল। প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলাম যে,—আমার চারিদিকের দৃশ্য মাত্রেই আর জড় নয়,—উহারা যেন জীবন্ত, সর্ব্বাংশেই প্রাণপূর্ণ। আমার প্রাণের সঙ্গে অতি নিকট সম্বন্ধ বলিয়াই নয়নপথে প্রসারিত হইয়া তীব্র আকর্ষণ করিতেছে তাহার সঙ্গে মহা প্রাণকে মিশাইবার জন্য। সে জীবন্ত আহ্বানের টানে আমি যেন ক্ষণেকের জন্য মিশিয়াই গেলাম। আবার পর মুহূর্ত্তেই যেন কতকটা পৃথক হইলাম। কিন্তু একেবারে সম্বন্ধশূন্য হইল না। চৈতন্যের উপর যেন একটি অস্পষ্ট আবরণ গড়িয়া কতকটা ভেদ রাখিয়া দিল। প্রাণ দিয়া কোন একটি আনন্দময় পদার্থ যেন স্পর্শ করিয়াও করিতে পারিলাম না, তাহাতে একটি ক্রমিক অনুসন্ধানের বেগ রহিয়াই গেল। মধ্যে মধ্যে পথে চলিতে চলিতে পাও চলিতেছিল, আবার অন্তঃকরণের মধ্যে এই সকলও চলিতেছিল।

প্রথমে দুই মাইল ময়দান, তারপর দুই মাইল উৎরাই, তাহা বলিয়াছি। উৎরাইয়ের পরেই সেই টুটনেওয়ালা পুল—কাঠ পাথরে তৈরি একটি হালকা সেতু। এই স্থানে কালীর বিস্তার প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ হাত হইবে। কি ভয়ানক তাহার গর্জ্জন এবং স্রোতের কি প্রবল খরতর বেগ, সে যেন পর্ব্বতকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া নিজ অঙ্গে মিশাইয়া লইতে চাহিতেছে। কিন্তু তাহা ত সহ্য সহ্য হইবার নয়, উভয়েরই প্রকৃতি এবং ধর্ম্ম যে বিপরীত। অচল অটল স্থির থাকিয়াই যাইতেছে, তাহাতে নিষ্ফল প্রয়াস, অপমানে দর্পিতা প্রবাহিনী, ভীষণামূর্ত্তি ধরিয়া বিদ্যুৎগতিতে উন্মাদিনীর মতই ছুটিয়াছে,—কোথায়? নম্র ধরার বুকে!

যখন হিমালয় প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য হয় নাই তখন পুস্তকে নানারূপ বর্ণনা পাঠ করিতাম, না হয় চিত্রে দেখিতাম। তাহাতেই উন্মত্ত হইতাম। কিন্তু যখন এই বিশাল হিমাদ্রীবক্ষে বিচরণ করিবার প্রথম সুযোগ হইল, ইহার পূর্ব্বে দুইবার হইয়াছিল—তখন, যাহা কিছু পূর্ব্ব-সঞ্চিত কল্পনা কোথায় ভাসিয়া গেল, স্পষ্টই অনুভব করিলাম যে, এ জীবন্ত দৃশ্যের স   সাহিত্যে বা চিত্রশিল্পে ইহার বর্ণনা, কিরূপ অকিঞ্চিৎকর।

এই রাস্তায় অনেকগুলি জলপ্রপাত আছে। এমন কতকগুলি স্থান দিয়া পথটি গিয়াছে—সে পথে পথিককে প্রপাতের জলে ভিজিয়া যাইতে হয়, যেন সহস্র ধারায় জল পড়িতেছে। চন্দ্রনাথের নিকট যে সহস্র ধারা আছে এ পথে সেই ধরনের একটি স্থান আছে। দক্ষিণে, পথের নিম্নে কালী গর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিয়া চলিয়াছে, আর বামে,—কঠিন প্রস্তরের দুর্ভেদ্য শিখর, তাহার উপর দিয়াই জলধারা নামিতেছে। বায়ু চালিত হইয়া সেই ধারা আবার অনেকদূর অবধি ছড়াইয়া বৃষ্টির মত পড়িতেছে। কি সুন্দর!

এমন একটি স্থানে নেপালের অধিকারে যাইবার সেতুটির নিকটে দেখা গেল,—এক প্রকাণ্ড মসৃণ শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া কয়েকজন ভোটিয়া যাত্রী। মোটঘাট নামাইয়া বিশ্রাম করিতে করিতে নিজেরাই পরস্পর বাক্যালাপ করিতেছিল, আমরাও গিয়া সেখানে বসিলাম।

ছোট একদল যাত্রী এই পথে যাইতেছিল,—পথের মধ্যেই তাহাদের একজন বিমারে পড়ে, তাহার অবস্থা দেখিয়া অপর সঙ্গীরা তাহাকে সেই অবস্থায় ফেলিয়া পলাইয়াছে। খানিকটা আগে পথের ধারে সে মরিয়া পড়িয়া আছে, এই কথাই তাহারা ভয়ে ভয়ে আপনাদের মধ্যে বলাবলি করিতেছিল।

তাহাদের কথাবার্ত্তা আমি ততটা মন দিয়া শুনি নাই, সঙ্গী-মহাশয় শুনিয়াছিলেন, বলিলেন, শুনছ হ্যা! এদিকের লোকের ব্যবহার! ঐখানে একটা লোক মরে পড়ে আছে।

তাহাদের মধ্যে একজন তখন বলিল যে,—আপনারা সাবধানে যাইবেন, রিমারওয়ালা একটা লোক ঐখানে পড়িয়া আছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—তাহার সঙ্গীরা কোথায়!

তাহারা বলিল যে,—সে বাঁচিবে না দেখিয়া চলিয়া গিয়াছে।

তাহার সৎকার কিরূপে হইবে?

পথে মরিলে যেরূপে সৎকার হয় সেইরূপেই হইবে; পশুপক্ষী কিংবা জন্তুতে খাইবে। কিংবা যদি এদিকের লোক হয়, আত্মীয়স্বজন খবর পাইলে আসিয়া, কাঠকুটা আনিয়া পোড়াইয়া দিবে, কিংবা উহার উপর একটি পাথর চাপা দিবে, না হইলে ঐরূপই রহিল।

আর বেশী কিছু তাহাদের সঙ্গে ও-সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া আমরা

উঠিয়া তাহাদের কথাগুলি ভাবিতে ভাবিতে অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম সেই নেপালের এলাকায় যাইবার সেতুটি সম্মুখেই।

যে স্থানে রোগে মৃতপ্রায় অথবা সেই মৃত ব্যক্তিটি পড়িয়া আছে তাহারা বলিয়াছিল, সে স্থান দিয়া যাইবার সময় আমি লক্ষ্য করি নাই, অন্যদিকেই নজর ছিল; কিন্তু সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন, আমি দেখেছি পথের ধারে জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছে;—পথ হতে দেখা যায়।

রোগের সেবা ত দূরের কথা, রোগ হইলে মৃত্যু নিশ্চয় এই ধারণা, শুধু যে এই পাহাড়ী ভোটিয়াগণেরই একচেটিয়া তাহা নহে, উহা তিব্বতীয় সাধারণ জনগণেরও একটি বিশেষত্ব।

আগে বলিয়াছি যে কালীগঙ্গাই ব্রিটিশ এবং নেপালের সীমানা। এখন মালপার রাস্তাটি এপারে উৎরাইয়ের পরে বন্ধ হইয়া গেল। সম্মুখেই দুর্দ্দান্ত বেগে উন্মাদিনী কালী—ব্রিটিশ এলাকায় আর পথ নাই। যাতায়াতের সুবিধার জন্য একটি সেতু আছে, তাহা পার হইয়া প্রায় আধ মাইল রাস্তা নেপালের এলাকা দিয়া যাইতে হয়। তারপর আর একটি সেতু দিয়া পুনরায় ব্রিটিশ এলাকায় আসিয়া আবার পথ ধরিতে হয়। পুল দুইটিই প্রতি বৎসরের আষাঢ় কিংবা শ্রাবণ মাসে ভাঙ্গিয়া যায়, আবার কার্ত্তিক মাসে উপরে বরফ জমিতে আরম্ভ হইয়া জলের বেগ মন্দীভূত হইলে পুনরায় উহা নির্ম্মিত হয়। যতদিন পুল টুটিয়া এই নেপাল এলাকার রাস্তাটি বন্ধ থাকে, ততদিন সাধারণের যাতায়াতের বড়ই কষ্ট। সে যে কি ভীষণ বন্ধুর এবং বিপদসঙ্কুল পথ দিয়া আনাগোনা করিতে হয় তাহার কথা পরে বলিব, কারণ দুর্ভাগ্যক্রমে আসিবার সময়ে আমাদের সেই পথেই আসিতে হইয়াছিল।

এখন যাইতে যাইতে সেই পুলটি আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। সেতুটির অনতিদূরে একটি অতি উচ্চ মন্দির আকৃতি,—উহা বাহির হইতে যেন পর্ব্বতগাত্রে মিলিয়া আছে। তাহার অনেক উপরে শৃঙ্গ, সেটি যেন ঐ বিশাল মন্দিরেরই চূড়া। নীচের দিকে সেই মন্দিরের গায়েই প্রায় দশ হাত দীর্ঘ কতকটা ফাঁক আছে। তাহার উপরটা প্রকৃতি রচিত অবিকল চ্যাপেলের খিলান, ঠিক কপাট-হীন দ্বারের মত দেখাইতেছে। আমরা এপার হইতেই দেখিতেছি, মন্দিরের ভিতরটি যেন শ্বেতমর্ম্মরময়, উহা ক্রমশঃ উচ্চ গম্বুজের মত হইয়া

দৃষ্টির অন্তরালে রহিয়াছে, আর সেখান হইতে হুহুঙ্কারে সফেন জলস্রোত বিদ্যুৎ গতিতে সেই দ্বার পথে অবিরাম বাহির হইতেছে। নির্ঝরিণীর সেই দূরাবগাহ, অতি প্রবলা ধারাটি কালীর অঙ্গে মিশিয়া এক বিস্তৃত ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ গর্জ্জন শুনিলে কান বধির হয়। উপরে যতদূর দৃষ্টি চলে কোথাও জলধারার লেশমাত্র দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। যাহা কিছু সেই ভিতরের অদৃশ্য গহ্বর মধ্য হইতেই খরধারে ছুটিয়া বাহির হইতেছে। মুগ্ধনেত্রে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিলাম।

তারপর আমরা ক্রমে প্রথম সেতুটি পার হইয়া নেপালের অধিকার দিয়া কতকটা চলিলাম; পরে অপর একটি সেতু পার হইয়া আবার ব্রিটিশ এলাকায় আসিলাম এবং মালপার পথ ধরিলাম। এই উভয় সেতুর ব্যবধানে নেপালের সীমানা দিয়া যে পথ,—উহা পাহাড়-ভাঙ্গা বিশালায়ত প্রস্তরখণ্ডের উপর দিয়াই। বড় গম্ভীর পথটি। সেতুটি পার হইয়া ব্রিটিশ সীমানায় ক্রমশঃ একটি চড়াই আরম্ভ হইল, ইহাই মালপার চড়াই। যেদিকে চড়াই আরম্ভ হইল তাহার অপর পৃষ্ঠে উৎরাইয়ের শেষেই মালপা নামক পড়াও।

অল্প উঠিয়াই সম্মুখে আবার একটি নয়নবিমোহন দৃশ্য,—একটি মুক্ত জলপ্রপাত। প্রশস্ত নীল জলের ধারা, অনেকটা উপর হইতে ভীষণ বেগে পড়িতেছে আর তিন চারিটি ফেনিল ধারায় বিভক্ত হইয়া বিদ্যুৎগতিতে নামিয়া কালীর সঙ্গে মিশিয়াছে। প্রপাতের তলদেশ হইতে সঙ্গম পর্য্যন্ত এক বিস্তীর্ণ, ঘন এবং গতিশীল কুজ্ঝটিকার আবরণ। ঘন হইলেও কতকটা যেন স্বচ্ছ,—তাহার অভ্যন্তরে বিক্ষিপ্ত জলরাশির ক্ষিপ্র গতিশীলা দেখা যায়। রূপমাধুর্য্যের বর্ণনা প্রয়াস অকিঞ্চিৎকর দেখাতেই একমাত্র সার্থকতা। সঙ্গমের মুখে, সমস্ত বিক্ষিপ্ত ধারা এক হইয়া প্রবলবেগে পর্ব্বত কাঁপাইয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিয়া চলিয়াছে, যেন মূর্ত্তিমান প্রবলতা। কালীর জল গঙ্গাজলের মত অল্প ঘোলা আর ঐ প্রপাতের জলটি স্বচ্ছ নীল। মিশিয়া যাইবার পূর্ব্বে জলের পার্থক্য দূর অবধি দেখা যায়—তাহা গঙ্গাযমুনা সঙ্গমের মতই। বদরী কেদারের পথে, প্রতি বৎসর যেরূপ ঘন যাত্রীর আনাগোনা এদিকে সেরূপ লোকসমাগম নাই, না হইলে এদিকেও অনেকগুলি প্রয়াগ আছে। ওদিকে পঞ্চ প্রয়াগ; এদিকে ষষ্ঠ কি সপ্ত

প্রয়াগ হইবে। আসকোটের নীচে কালী ও গৌরীর সঙ্গম হইতে সুরু করিয়া এপথে অনেকগুলি প্রয়াগ দেখিয়াছিলাম।

নয়ন মনোমুগ্ধকর জলপ্রপাত,—এই অপূর্ব্ব দৃশ্যের মধ্যে এমনই কি শক্তি নিহিত আছে যাহাতে পথশ্রম বা কোনও প্রকার ক্লেশ মনে আসিতে দেয় না, তাহার পরিবর্ত্তে প্রাণে আনন্দ এবং শক্তি আনিয়া দেয়। হিমালয়ের আনন্দময়ী অধিষ্ঠাত্রীর নৈসর্গিক রূপের এমনই প্রভাব, সর্ব্বত্রই দেখিয়াছি যেইমাত্র নয়নের পথে অন্তরে প্রবেশ করিল অমনি যেন সকল বৃত্তি তাহার মধ্যে ডুবিয়া গেল। তখন অন্তর ক্ষেত্রে যে আনন্দময় রূপের অনুভূতি তাহা আর প্রকাশ করিবার উপায় রহিল না।

চড়াইটি প্রায় দেড় মাইল হইবে। যখন শৃঙ্গে উঠিয়া আবার ওপিঠ দিয়া নামিতে আরম্ভ করিলাম, তখন প্রায় দুইটা হইবে, সঙ্গী-মহাশয় ও কুলীরা কতটা দূর পশ্চাতে ছিলেন।

নামিতে নামিতে একস্থানে দেখিলাম—অনেকগুলি ভোটিয়া মহাজন একত্র হইয়া, উপরে আচ্ছাদনের মত প্রস্তরের তল, যাহা দেখিতে অনেকটা গুহার মত, এমন এক স্থান দেখিয়া রান্না চড়াইয়াছে, আর তাহাদের ভেড়বকরী আহারান্বেষণে উচ্চ শিখরে উঠিয়াছে। ভেড়বকরী রাখিতে ত খরচ নাই, আপনারাই চরিয়া খায়। এদেশে পশুপালনের ইহাই সনাতন প্রথা।

গতকাল গলাগড়ে যাহারা ছিল, এখানে দেখি, সেই বুদিয়াল যুবক দুইটি, একটি ছায়াযুক্ত স্থান দেখিয়া ভোজনের যোগাড় করিতেছে। তাহাদের দেখিয়াই আমার মনে পড়িয়া গেল যে, আমাদের ত চাল নাই, এই বিজন মালপায় উহা ত খরিদ করিতেও পারা যাইবে না, উহাদের নিকট হইতে কিছু চাল সংগ্রহ করা প্রয়োজন। ঘোর লাল সেই চাল, যার নাম বোগ্‌ড়া, তাহাই আমাদের একমাত্র উপায়,—পাঁচ আনায় এক সের সংগ্রহ করিয়া কাপড়ের খোঁটে বাঁধিয়া লইলাম, পরে নামিলাম। মালপার অতি নিকটে ঝুপি জঙ্গলের ধারে কতকগুলি প্রকাণ্ড গুহা আছে; তাহার মধ্যে রন্ধনের চিহ্ন, যথা—দগ্ধ কাষ্ঠাদি ইতস্ততঃ বর্ত্তমান দেখিলাম, তাহার সম্মুখে অনেক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাস্তূপ, মধ্যে পথ চলিয়া গিয়াছে। এত বৃহদায়তন প্রস্তরখণ্ড (বোলডার) পূর্ব্বে দেখি নাই। এ পথের সবটুকুই অপূর্ব্ব।

এখানেও এই শিলাস্তূপের আশেপাশে ফাঁকে বিছুটির জঙ্গল রহিয়াছে। তাহার নীচেই গর্জ্জন করিতে করিতে কল্লোলিনী কালী ছুটিয়াছে, এমন স্থানে একটি শিলার উপর ছায়া দেখিয়া একেবারে শুইয়া পড়িলাম। পাশে আর একটি পাথরে লাঠিটি ঠেস দিয়া রাখিলাম।

কিছুক্ষণ পরে সঙ্গী-মহাশয় আসিলেন। হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলাম,—কেমন রাস্তা, বলুন তো?

তিনি বলিলেন আঃ,—সে কথায় আর কাজ কি? পিতৃপিতামহের পুণ্যের জোরেই এই পথে প্রাণ নিয়ে চলতে পারছি। উঃ—কি ভয়ানক, বুঝলে হ্যা? বলিয়া তিনি ঘর্ম্মসিক্ত জামাটি খুলিয়া পাথরের উপর ছড়াইয়া দিলেন এবং বসিলেন। আমি বলিলাম,—আর এই ত এসে পড়েছি। ঐ যে মালপা দেখা যাচ্ছে।

অল্পদূরে সম্মুখে বাঁদিক হতে একটি প্রবাহ কালীর সঙ্গে মিলিয়াছে,—সেই ধারার উপর একটি ক্ষুদ্র সেতু আছে, উহা পার হইয়া কালীর কোল দিয়া বরাবর পথটি চলিয়া গিয়াছে। সেই পথের ধারেই একটি উচ্চ ভূমির উপর একখানি গবাক্ষশূন্য খড়ের ঘর দেখা যাইতেছিল, উহাই মালপা পড়াও। যাত্রিগণ আসিয়া সেইখানেই আড্ডা করে, রোটি পাকায় আর নীচের ওড়িয়ারেই থাকে।

এদিকে গুফা বা গুহাকেই ওড়িয়ার বলে। আবার কোন সাধুর আশ্রম বা মঠকেও লোকে গুফা বলে। কারণ পার্ব্বত্য রাজ্যে এইরূপ প্রস্তরসমষ্টি রচিত স্বাভাবিক আচ্ছাদিত স্থান ব্যতীত সাধুদের আর বড় উপায়ও নাই।

ডাকপিয়নের আশ্রমখানি নদীসঙ্গম হইতে প্রায় ষাট ফুট উচ্চে। উঠিবার চড়াই-পথের ধারেই দুইটি গুহা আছে। একটি নীচে, আর একটি তাহার কিছু উপরে।

আমরা উঠিলাম, এবং চড়াই ভাঙ্গিয়া উপরের ঐ কুঠীতেই আড্ডা করিলাম। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া রন্ধন শেষে ভোজনের পর নীচের গুহায় নামিয়া যথাস্থানে বিছানা বিছাইলাম। আমাদের বাহকদ্বয় উপরে কুঠীর সম্মুখেই নিজস্থান নির্ব্বাচন করিয়া লইল।

গুহার মধ্যে তিনটি লোক কষ্টে থাকিতে পারে। খাটিয়ার মত একখানি উচ্চ লম্বা পাথর ছিল, তাহার উপর সঙ্গী-মহাশয় কম্বলাদি

মালপার ওড়িয়ার

বিছাইয়া বসিলেন, আর নীচে তাঁহার পায়ের দিকে আমি কম্বল বিছাইলাম। জমিটি সমতল নয়, উঁচুনীচু বিষম; কিন্তু উপায় ছিল না।

হঠাৎ আমার মনে হইল পথে খুচরা খরচের জন্য যে টাকার থলিটা বাহিরে থাকিত সেটা পিয়নের ঘরের চালে, লাঠিতে ঠেস দিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। তাড়াতাড়ি উঠিয়া সেখানে গিয়া দেখিলাম লাঠিটা ঠিকই আছে, কিন্তু টাকার থলিটি নাই। আমার অসাবধান স্বভাব, তাহা আমি জানিতাম, ভাবিলাম আর কোথাও ফেলিয়াছি। যেখানে যেখানে বসিয়াছিলাম সব স্থান খুঁজিয়া কোথাও পাইলাম না, মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল। সঙ্গী-মহাশয় এই অসাবধানতার প্রতি কটাক্ষ করিয়া অনেক বার বলিয়াছেন, কারণ ঐ থলিটি আমি অনেক স্থানেই ফেলিয়াছি, তুলিতে মনে হয় নাই। তিনি উহা লক্ষ্য করিয়া তুলিয়া আমায় দিয়াছেন। এখন সেইটি হারাইয়া তাঁহার কাছে যাইতে আমার বড়ই লজ্জা হইতে লাগিল। কি করি? অসাবধানতার জন্য পূর্ব্বে তিনি আমায় অনেকবারই মিষ্ট তিরস্কার দ্বারা সতর্ক হইতে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, এখন তাহাই মনে হইতে লাগিল।

আমাদের বাহকেরা নিকট জঙ্গলে কাঠ আনিতে গিয়াছিল, তাহাদের উপর কিন্তু আমার সন্দেহ ছিল না, তথাপি তাহারা আসিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। শুনিবামাত্র তাহারা আমাকে ভগবানের নামে শপথ করিয়া বলিল যে, তাহারা কিছুই জানে না। তাহাদের কিছুটা বকসিস কবুল করিলাম, তাহারা কিছুতেই স্বীকার করিল না। পিয়নকেও অনেক বলিলাম যে, আমরা তীর্থযাত্রী, গরীব ব্রাহ্মণ, আমাদের পয়সা লইলে পাপ হইবে ইত্যাদি; কিন্তু কেহই স্বীকার করিল না।

তাহাতে আন্দাজ তেরটি টাকা আর কিছু খরচা ছিল। কিন্তু যার চুরি যায়, তাহার অসংযত মনে নানারূপ সন্দেহ আসিয়া থাকে। আমার মাঝে মাঝে মনে হইতে লাগিল যে, সঙ্গী-মহাশয় আমায় একটু বেশী রকমের শিক্ষা দিবার জন্যই হয়ত উহা পাইয়া নিজেই লুকাইয়া রাখিয়াছেন। যাহা হউক, ঠিক করিলাম যে, তাঁহার নিকট গিয়া সকল কথা বলাই ভাল, যদি তিনি রাখিয়া থাকেন তাহা হইলে নিশ্চয় বলিবেন, বড় জোর তাহার জন্য না হয় আর একটু ভর্ৎসনা করিবেন।

আমি যখন বলিলাম যে, আমার থলিটি দেখিতে পাইতেছি না, কোথায় গিয়াছে,—শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথায় রেখেছিলে ?

সকল বৃত্তান্তই বলিলাম। শুনিয়া তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কেবল বলিলেন,—যাক, ওজন্য আর বেশী ভেবো না, কুলীদের একটু ভাল করে জিজ্ঞাসা করেছিলে? সব কথা শুনিয়া, তিনি চুপ করিয়া অনেকক্ষণই বসিয়া রহিলেন, আর আমি উদ্বেগে মরিতে লাগিলাম। কত রকমের কত কথাই যে মনে হইতে লাগিল সে-সব লিখিতে সাহস হয় না। কিছু হারানো যে চুরি করার চেয়ে বেশী পাপ তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। এই ভাবেই বেলাটুকু কাটিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর চাঁদ উঠিল। আমি রুটি প্রস্তুত করিবার জন্য উপরে গেলাম। তখন আমাদের বাহকের মধ্যে একজন আমায় ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আপনার থলিতে কত ছিল। আমি স্মরণ করিয়া বলিলাম, আন্দাজ তের কি চৌদ্দ টাকা হবে। তখন সে থলিটি বাহির করিয়া গণিতে আরম্ভ করিল। দেখা গেল বার টাকা পনের আনা। তখন সে বলিল,—আপকো বাত ঠিক নেহি।

আমি বলিলাম,—আন্দাজ বলেছিলাম, ঠিক মনে ছিল না। তা কোথায় পাওয়া গেল ?

সে বলিল যে,—ঐ ডাকপিয়নই লইয়াছিল। পরে ব্যাপারটি খুলিয়া বলিল।

প্রথমে যখন জিজ্ঞাসা করি তখন তাহারা ভাবিয়াছিল যে, আমি তাহাদের উপরেই সন্দেহ করিয়াছি আর তখনই তাহারা মনে করিল,—যখন এখানে আর কেহ নাই তখন নিশ্চয়ই পিয়নের কাজ। এই স্থির করিয়া পিয়নকে ধরিয়া বসিল এবং অনেক রকমে তাহাকে বলিয়া থলিটি বাহির করিয়াছে, দেখিলাম বেচারার মুখ এতটুকু হইয়া গিয়াছে।

শেষে আমাদের বাহকটি বলিল,—আপনি বৃথা আমাদের উপরই সন্দেহ করেছিলেন, না খেয়ে মরে গেলেও আমরা কখনও কারো ধন স্পর্শ করি না, ইত্যাদি।

সঙ্গী-মহাশয়কে যখন বলিলাম সেটি পাওয়া গিয়াছে, পিয়ন বেচারা লইয়াছিল, তখন তিনি বসিয়াছিলেন, বলিলেন,—ওর জন্যে আমি কতক্ষণ জপ করেছি জান? যাক, ভালই হয়েছে।

বড় লোভ করিয়াছিল, তাহার পর আবার যখন বাহির করিয়া দিয়াছে, ভাবিয়া পিয়নকে আট আনা বকসিস দেওয়া গেল। সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন,—ও কাজটা ভাল হইল না। আমিও শেষে বুঝিলাম যে কাজটা ভুল হইয়াছে; বকসিস যথার্থ পাওনা ঐ বাহকেরই যে ব্যক্তি পিয়নের নিকট হইতে উহা বাহির করিয়াছে; শেষে তাহাকেও কিছু দেওয়া হইল।

রাত্রি এক প্রহর হইয়া গেলে আমরা আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম। আন্দাজ মধ্য রাত্রে এখানে প্রবলবেগে ঝড় ও জল আরম্ভ হইল। প্রথমে গুহার মধ্যে জল ছিল না, কিছুক্ষণ বৃষ্টি হইবার পর চারিধার হইতে টপ্ টপ্ জল পড়িতে লাগিল, তাহার পর গড়াইতে লাগিল। আমাকে কম্বলাদি তুলিয়া ফেলিতে হইল, তাহার পর এক-পার্শ্বে জড়সড় হইয়া পুঁটুলী পাকান বিছানার উপর, হাতের মধ্যে হাত তাহার উপর মাথা রাখিয়া কতক্ষণ বসিয়া রহিলাম। সঙ্গী-মহাশয়ের বিশেষ কষ্ট হয় নাই, তিনি উপরে ছিলেন, তাঁহার দিকে জল পড়ে নাই। এইরূপ জলের পরেই প্রায় ধস্ নামে। আমার বুকের ভিতর গুরু গুরু করিতে লাগিল। যদি উপর হইতে ছাদ ধসিয়া আমাদের চাপা দেয়। ত্রাহি মধুসূদন!

প্রায় দুই ঘণ্টা পর বৃষ্টির বেগ মন্দীভূত হইয়া আসল। তখন চারি-দিক জলে ভিজিয়া গিয়াছে। আমার কম্বলের বিছানার তলায় একখানি হরিণের ছাল ছিল, সেখানি তালায় থাকাতে ঠাণ্ডা আর তত অনুভব হইল না। ঘুমে চক্ষু জড়াইয়া আসিতেছিল। আবার শুইলাম এবং তৎক্ষণাৎ ঘুমাইয়া পড়িলাম, জাগিলাম যখন ভোর হইয়া গিয়াছে। এ যাত্রায় যাইবার ও আসিবার সময় এই দুই রাত্রি এখানে ওড়িয়ারেই কাটাইতে হইয়াছিল। এই রাস্তায় অনেকগুলি গুহা, অনেকগুলি জল-প্রপাত এবং অনেকগুলি প্রখর বেগবতী নদীসঙ্গম আমরা পাইয়াছিলাম।

মালপা হইতে বুদি প্রায় দশ মাইল। এ পথটিতে বিশেষ চড়াই-উৎরাই নাই, তবে ঐরূপ নগ্ন পর্ব্বতের গা দিয়া সঙ্কীর্ণ রাস্তা। মধ্যে আবার নদী-তটের উপরের কতকটা পথ ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে কালীর জলের উপর দিয়া খানিকটা যাইতে হয়। সে জল হাঁটুর কিছু উপর, তবে সেটুকু বেশী নহে, এক রশি হইবে।

বেলা একটার সময় বুদিতে পৌঁছিলাম এবং সেখানকার পাঠশালা গৃহেই মোটঘাট রাখিয়া নিজ নিজ আসন বিছাইলাম। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর স্নান এবং চালে ডালে রাঁধিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি।

জল, কাঠকুটা প্রভৃতি বাহকেরাই সংগ্রহ করিয়া দিল। আমরা স্নানাহার সারিয়া নিশ্চিন্ত হইলে পর তাহারা নিজেদের জন্য পাকাইয়া লইল। শেষে আমাদের বাসনগুলি বেশ যত্ন করিয়াই মাজিয়া দিল। মোট কথা, ইহারা শুধু বাহক নয় চাকরের কাজও করে এবং তাহার জন্য কিছু আশাও করে না, বরং কর্ত্তব্য মনে করিয়াই অতি যত্নপূর্ব্বক করিয়া থাকে।

বুদিতে বড় জলকষ্ট, তাহা এখানকার অধিবাসীরা বড় অপরিষ্কার, যথেচ্ছাচারী মদ্যপ্রিয় এবং অলস। আমাদের দুগ্ধের আবশ্যক হওয়ায় গ্রামের মধ্যে অনুসন্ধান করায় একজন প্রায় দেড় পোয়া দুগ্ধ আনিল এবং আমাদের ধনবান মনে করিয়া আট আনা মূল্য চাহিল। পণ্ডিতজী অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন, সুতরাং উহা ফেরৎ দেওয়া হইল।

বেলা যখন তিনটা আমাদের আহারাদি শেষ হইল।

গারবিয়াং এখান হইতে মোট চারি মাইল। তাহার মধ্যে প্রায় দুই মাইল একটি কঠিন চড়াই, বাকী দুই মাইল ময়দান পথ। বাহকগণের ইচ্ছা আজই যাহাতে আমরা যাই, কিন্তু আমরা এই পরিশ্রমের পর আর চড়াই ভাঙ্গিতে পারিব না, কাল প্রাতেই যাওয়া হইবে, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে তাহারা আর কিছু বলিল না।

পাঙ্গু হইতে এই গারবিয়াং পৌঁছানোটুকু যা পথের কষ্ট এবং স্থানের অসুবিধা আমাদের ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহার পর গারবিয়াং হইতে পথের অসুবিধাটা আর বড় নাই। পরে আবার অনুরূপ পথের কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, সে কথা যথা সময়েই বলিব।

প্রভাতে আমরা উঠিলাম, ভয়ানক শীত, আমাদের যাহা কিছু ছিল জড়ান হইল। খাড়া চড়াই, বড় কঠিন এবং বিষম। চড়াইটুকু উঠিলেই আমরা ব্যাসক্ষেত্রে গিয়া পড়িব। সেইটুকু উঠিতে বোধ হয় তিন চারিবার বসিতে হইয়াছিল। শৃঙ্গে উঠিয়া পথের সকল কষ্ট আনন্দেই পরিসমাপ্ত হইল; এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করিলাম। জীবন আমাদের সার্থক হইল।

এখন আমরা দশ হাজার ফুটের উপর রহিয়াছি। কি সুন্দর দৃশ্য,

চারিদিকে আনন্দ খেলা করিতেছে। পাহাড়ী ঝাউ আর দেউদার ছাড়া অন্য কোন বড় গাছ নাই। আর যেদিকেই দেখিতেছি সেই দিকেই তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গগুলি প্রভাতের সূর্য্যকিরণে ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। সম্মুখেই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, প্রায় সমতল, নানা বর্ণের বিচিত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতা পুষ্পে সমাচ্ছন্ন। ইতস্ততঃ গরু, ঘোড়া চরিতেছে। প্রায় দুই মাইল দূরে ক্ষুদ্র গারবিয়াং গ্রামখানি দেখা যাইতেছে। এইস্থান হইতে উত্তরে যতটুকু স্থান ব্রিটিশ সীমানার মধ্যে আছে তাহা ব্যাসক্ষেত্রে বলিয়াই এ-অঞ্চলে পরিচিত। এস্থানে যাহারা থাকে তাহাদের ব্যাসী বলে না। এই গারবিয়াং হইতে ব্যাসক্ষেত্রের আরম্ভ।

সঙ্গী-মহাশয় পশ্চাতে ছিলেন তিনি আসিলে আমরা কথা কহিতে কহিতে চলিতে লাগিলাম। এই চড়াইটিতে উঠিতে তাঁহার বড়ই কষ্ট হইয়াছে। তিনি বলিলেন, দেখ—চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থা না হলে আমরা বাড়ী হতে বার হইনি। ঘরে শান্তি থাকতেও দুর্গম পথের কষ্টটা আমরা সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছি, বুঝলে হ্যা?

বুঝিলাম—পথের কষ্ট তাঁহাকে বড়ই লাগিয়াছে। বলিলাম, একটি বিশেষ আনন্দ লক্ষ্য করেই ত বেরিয়েছি,—আমরা অহেতুক ত বার হইনি। আর এর সঙ্গে আমাদের জীবন গতিরও একটা সম্বন্ধ নিশ্চয়ই আছে। অন্তরের মধ্যে একটা আনন্দের আস্বাদন আমরা প্রত্যেক কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে তো পেতে পেতেই চলেচি।

তিনি বলিলেন, আমি হিমালয়ে অনেক বেড়িয়েছি, এত কষ্ট কখনও সহ্য করিনি। কাশ্মীরে গিয়েছিলাম, সে ত সুখের পথ, তারপর বদরীকাশ্রমে —সেও লোকের কাঁধে চড়ে,—তা ছাড়া সে রাস্তাও ভাল ছিল, এ রাস্তার সঙ্গে তুলনাই হয় না। সে পথে অনেক অসুবিধা আছে, বুঝলে হ্যা! আমিও উহা জানিতাম,—তবে আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত তাঁহাকে কিছুই বলি নাই।

অতি কষ্টে ব্যাসের এই চড়াই উঠিয়া সঙ্গী-মহাশয় একটু দাঁড়াইয়া চারিদিকে দেখিলেন। তারপর আমরা দুজনে ধীরে ধীরে আসিতেছিলাম; কথায় কথায় আমরা একটি প্রকাণ্ড ঝরণার ধারে আসিয়া পৌছিলাম। সেখানে কিছুক্ষণ বসিয়া পথশ্রম সম্পূর্ণ অপগত হইলে আমরা উঠিলাম এবং প্রায় দেড় মাইল উঠানামা করিয়া বেলা আন্দাজ নয়টার সময় গারবিয়াং প্রবেশ করিলাম।

গ্রামের মধ্যে প্রবেশপথে একজন ভোটিয়া যুবকের সঙ্গে দেখা হইল; সে ইংরাজীতেই কথা কহিল। আগে আমিই ছিলাম, আমায় জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কি কৈলাস মানসসরোবর যাবেন বলেই কলকাতা হতে আসছেন? আমরা খবর পেয়েছি এবং আপনাদের আনবার জন্যই যাচ্ছি। ততক্ষণে সঙ্গী-মহাশয়ও আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অতঃপর সে বলিল যে,—আমার নাম দিলাপ সিং,—আমাদের কারবার আছে। লোকমনিজী ধানচুলা হইতে আপনাদের কথা

দিলীপ সিং

লিখিয়াছেন। আমরা প্রত্যহই আপনাদের অপেক্ষা করিতেছি। মালপত্র সব ডাকখানায় রাখা আছে, চলুন আপনারা আগে ওখানে গিয়ে সব দেখবেন, পরে রুমা দেবীর গৃহেই উঠবেন, সেখানেই আপনাদের সুবিধা হবে, ডাকখানায় থাকা সুবিধাজনক নহে।

আমরা পোষ্ট অফিসে গিয়া আমাদের সমস্ত মাল পাইলাম। প্রশস্ত প্রাঙ্গণে পাঠশালা বসিয়াছে, পোষ্টমাষ্টার অথবা ডাকমুন্সীজী একজন গাড়োয়ালের ব্রাহ্মণ, তিনি এদিকে আবার পাঠশালার পণ্ডিতও বটেন। তিনি আমাদের দুইখানি পত্র দিলেন, তাহা লইয়া পরে মাষ্টারজীর সঙ্গে কিছুক্ষণ

আলাপ করিয়া আমরা দিলীপের সঙ্গেই রুমা দেবীর গৃহেই উপস্থিত হইলাম।

তখন রুমা, কাদা ও গোময় দিয়া ঘর নিকাইতেছিল। দিলীপ সংবাদ দিবামাত্র সে আসিয়া কাদামাখা হাতটি কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার করিল এবং আমাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া তাহার নিজের ঘরের মধ্যে স্থান দিল। অতি যত্নে এখানে রুমার আশ্রমে আমরা থাকিবার স্থান পাইলাম। অপূর্ব্ব তাহার স্বভাবটি। এমনই তার আবাহন, আমরা তাহার সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই মনে করিলাম যেন প্রবাস হইতে নিজগৃহে প্রবেশ করিলাম, অথচ সে যে আমাদের সঙ্গে অনেক কথা কহিল তাহা নয়। মোটেই সে বেশী কথার মানুষ নয়। পরে তাহার কথা বলিব।

॥ ৭ ॥

ব্যাসক্ষেত্র, গারবিয়াং
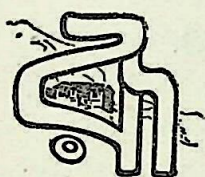
আমার গৃহখানি দ্বিতল, পাহাড়ী মকান মাটি কাঠ ও পাথরের তৈরি, এদিকে যেমন হয় সেইরূপ। দ্বিতলের ঘরে সম্মুখ দিকে ত্রিধা বিভক্ত বাতায়ন। আমাদের জন্য যে ঘরখানি সে ছাড়িয়া দিয়াছিল সেখান তাহার শয়নের ঘরও বটে, আবার ঠাকুরঘরও বটে। মাটির দেওয়াল, চারিদিকেই দেবদেবীর চিত্র আঁকা আছে। রাধাকৃষ্ণ, মহাবীর, রামচন্দ্র, শিব,—তাঁহার

রূমা দেবী

জটা দিয়া গঙ্গা নামিয়াছে তাহাতে মাছ খেলিয়া বেড়াইতেছে, ইত্যাদি মাঝে মাঝে আবার নীতিকথা সকল বড় বড় দেবনাগর অক্ষরে লেখা,

মোটা কাগজে লাগাইয়া ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। তাহার মধ্যে এক-খানিতে তুলসীদাসের একটি বচন, তাহা এইরূপ :

দশরথনন্দন রাম ভজরে,
রাম জপ অভিমান ত্যজরে।
করো মত কৈর, ঝুঠ মত ভাখই,
মত পর ধন হর, মদ মত চাখই,
জী মত মারো, জুয়া মত খেলো,
মত পর-তিরিয়া লখরে।
ঘড়ি ঘড়ি পল ছন অবোধ জীব তুঁহ
সো প্রভুকে গুণ গাবোরে।
বহুরিন ঐসো দাব মিলেগো,
রাম চরণ নিত চিত তু ধরবে।

ঘরের কোণে একখানি খাটিয়া ছিল, সঙ্গী-মহাশয় রাত্রে সেইখানি দখল করিতেন, আর আমি মেঝেতে আসন পাতিয়াছিলাম। ভগবৎ কৃপায় আমরা অতীব সুন্দর স্থান পাইয়াছিলাম। আমরা আসিবার দুইদিন পর নাথজী ও লালগীর আসিয়া ডাকঘরেই বাসা লইলেন। লালগীর এখানে সর্ব্বজনপরিচিত। ক্রমে পথের খবর এই একটু পাওয়া গেল যে, এখনও তিব্বতের রাস্তা খুলে নাই।

রাস্তা খুলে নাই অর্থে রাস্তাটি যে আগড় দিয়া বন্ধ আছে তা নয়। এখনও ভোটিয়া ব্যবসায়ীদের অর্থাৎ যাহারা ব্রিটিশ অধিকারে বাস করে এবং প্রতি বৎসর তিব্বতে তাকলাখার মণ্ডিতে দোকান পাতে, তাহাদের ওদিকে যাইবার হুকুম হয় নাই। প্রতি বৎসর আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত যে হাট বসে, তাহার পূর্ব্বে এদিককার কয়েকটি মাতব্বর ভোটিয়া মহাজন আগে গিয়া পুরাংয়ে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এই মর্ম্মে একটি মুচলেখা বা স্বীকারপত্র লিখিয়া দেয় যে, এ অঞ্চলে কোনো প্রকার রোগ, মারী বা অশান্তি নাই। তাহারা ঐরূপ লিখিয়া দিলে তিব্বত রাজসরকার হইতে ব্রিটিশ প্রজাদের পুরাংয়ে যাইবার এবং হাট বসাইবার হুকুম হয়। এবারে এখনও হুকুম হয় নাই, কারণ আসকোট অঞ্চলে 'হৈজাকী বীমার' চলিতে-ছিল, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সকল মহাজনই লোক-লস্কর, মালপত্র, ভেড়া-বকরী লইয়া পথে অপেক্ষা করিতেছে, খুব সম্ভব দশ হইতে পনের দিনের

মধ্যেই পথ খুলিবে। কাজেই আমরাও অপেক্ষা করিতে বাধ্য। এদিক হইতে এইসব মহাজন সেখানে গিয়া দোকান না পাতিলে এবং থাকিবার স্থান ঠিক না করিলে আমরা গিয়া উঠিব কোথায়? আমাদের আশ্রয় ত এই ভোটিয়া মহারাজগণই! পথ খুলিতে যখন দেরী আছে তখন এই অবসরে ইহাদের আচার ব্যবহার এবং সমাজ সম্বন্ধে যাহা কিছু সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা করিব।

দিলীপ সিং নামক যে যুবকটি আমাদের প্রথমে রুমার গৃহে আনিয়াছিল সে প্রায়ই কর্ম্মাবকাশে আমাদের নিকট আসিত, বসিত এবং নানা বিষয়ে আলাপ ও আলোচনা করিত। এখানে তাহারা চারিটি ভাই-ই শ্রেষ্ঠ বণিক ও ধনবান। দিলীপ আলমোড়ায় ইংরেজী ম্যাট্রিক পড়িয়া এখন এখানে আসিয়া কারবারে মন দিয়াছে। অতীব তীক্ষ্ণবুদ্ধি, পুরুষেরা জনে জনে বোধ হয় শতকরা অষ্টনব্বই জন অলস, মদ্যপায়ী, ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষী এবং তামাকু-বিলাসী। সে এ সকলের কিছুতেই বশীভূত নয়।

এ দেশের পুরুষেরা ক্ষেতকর্ম্মের মধ্যে শুধু হলচালনাটুকুই করে, বাকী সমস্ত কাজ স্ত্রীলোকেরাই করিয়া থাকে। বীজ বপন, জমির পাট, আগাছা তোলা, কাঠ কুড়ানো, কাপড় কাচা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তামার ঘড়া করিয়া জল আনা প্রভৃতি ঘর-সংসারের যাবতীয় কাজ তাহারাই করে। আর রান্না-বান্নার কথা, নাই বা বলিলাম।

এখানকার মেয়েরা ভোরে উঠিয়া কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে প্রথমেই চা প্রস্তুত করে। তাহা আমাদের দেশের লিপ্টনের চা-ও নয়, আর তাহার প্রস্তুত-প্রণালীও সাধারণ নহে। এই চা, চাল-ডাল যেমন সিদ্ধ করা হয় সেইরূপ সিদ্ধ করিতে হয়। জল চাপাইয়া প্রথমে লবণ ও চায়ের পাতা তাহাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পরে সুসিদ্ধ হইলে যখন উহা রক্তবর্ণ হয় তখন নামায়। তিন চার ইঞ্চি মোটা, দুই হইতে তিন ফুট লম্বা, আগা হইতে গোড়া পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে পিতলের তার দিয়া বাঁধানো একটি কাঠের চোঙ আছে। তাহার মধ্যে চা ঢালিয়া দেয়। তারপর এক তাল মাখনও তাহাতে দেওয়া হয়। তাহার মধ্যে একটি কাঠের দণ্ড আছে, সেইটির সাহায্যে পিচকারিতে জল টানা ও ছাড়ার মত অনবরত কিছুক্ষণ মন্থন করিতে হয়। মাখনের তালটি যখন গলিয়া চায়ের সঙ্গে মিশিয়া যায় তখন একটি প্রকাণ্ড তামার ডেকচিতে উহা ঢালিয়া দেয়। পরে

সেই চায়ের গামলা এবং একথালা ভাজা গমের ছাতু মধ্যে রাখিয়া সকলে মণ্ডলাকারে বসিয়া এক একটি চিনামাটির কিংবা রূপা দিয়া বাঁধানো নেপালী কাঠের বাটিতে লইয়া, কখনও চুমুক দিয়া কখনও ছাতুর সঙ্গে ঢেলা করিয়া

জল আনা

গলাধঃকরণ করে। এই প্রকারেই ভোটিয়ারা চা খায়। ইহা সর্ব্বাংশেই তিব্বতীয়দিগের অনুকরণ।

চা খাওয়া শেষ হইলে স্ত্রীলোকেরা সকলে একবার ক্ষেতে কাজ করিতে যায়, তাহার পর আসিয়া অনেক বেলায় রান্না করে। তাহার পর সকলকে

খাওয়াইয়া নিজেরা ভোজন করে। পরে ঝুড়ি পিঠে জঙ্গলে কাঠ কুড়াইতে কিংবা নদীতে বা ঝরনায় কাপড় কাচিতে যায়। এখানে ধোপা নাপিত নাই। ক্ষৌরকর্ম্ম এবং কাপড় কাচা প্রত্যেক সংসারে নিজেদেরই করিতে হয়। খেলার পর হইতেই এই যে ভোটিয়া পরগনা, ইহা যথার্থই ধোপা-নাপিত বর্জ্জিত দেশ। যাহা হউক, কাঠ কুড়ানো বা কাপড় কাচা শেষ হইলে, গৃহে ফিরিয়া সেগুলি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আবার তাহারা ক্ষেতে যায়। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরিয়া খাদ্যাদি প্রস্তুত করে এবং সকলকে খাওয়াইয়া নিজের খাওয়া হইলে ছেলেদের ঘুম পাড়ায়। তারপর নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁতে বসে। আসন, গালিচা এবং পশমের নানাপ্রকার বস্ত্র বয়ন করিতে উহাদের এইটিই প্রকৃষ্ট সময়। এইরূপে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কাজ করিয়া পরে শয়ন করে।

এদেশের নারীরা সাধারণতঃ এইভাবেই জীবনযাপন করে। ইহারা সদাই সুখী, সুস্থ, হাস্যমুখী, সর্ব্বদাই প্রফুল্ল ;—পরদা ত নাই-ই,—কিন্তু নির্লজ্জ কোনো প্রকারেই নয়, ইহারা সভ্য, ভব্য এবং সর্ব্বদাই পুরুষের সেবাপরায়ণা।

এই ভোটিয়ারা তিব্বতী ধরনের; তাদের পদ্ধতি অনুকরণ করিয়াই গালিচা বয়ন করে। তিব্বতী গালিচাই উৎকৃষ্ট এবং বহুমূল্য। একবার নিজ দেশের প্রদর্শনীতে এই তিব্বতী গালিচা বয়নপদ্ধতি দেখাইবার জন্য প্রথমে ভারতসরকার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিব্বতেও এ সকল কাজ মেয়েরাই করিয়া থাকে। তাহার উপর সেটা স্বাধীন দেশ। সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষ ভারতসরকারের এ প্রস্তাবে রাজী হইলেন না। বিলাতে কার্পেট বুনিয়া দেখাইবার জন্য দেশীয় কারিগর পাঠাইতে তাঁহাদের নারাজ হইবার অন্য কারণ ছিল; তাহা এখানে আলোচনার প্রয়োজন নাই। তিব্বতে বিফলকাম হইয়াই সরকার এই ভোটিয়াদের মধ্যে বাছিয়া একজন উৎকৃষ্ট কারিগর পাঠাইতে মনস্থ করিলেন।

এখানকার কারিগর বলিতে স্ত্রীলোকই বুঝায়। কারণ একাজ ত এখানে পুরুষের দ্বারা সম্পন্ন হইবার নহে, সেকথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তারপর ভারতের নারী ত চিরদুর্ব্বল, সমুদ্রপারে অতদূর বিদেশে যাওয়ার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। ফুলের অনুরোধে কলার ছোটা গলায় পরার মত ভারতসরকার স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীকেও বিলাত গিয়া তাঁহাদের দেশে

একাজ দেখাইবার সুযোগ দিয়া অনুগৃহীত করিলেন। এই গৌরবের কথা ভোটিয়ারা সকলের কাছে গল্প করে।

এখানকার গালিচা বুনিবার প্রণালী দেখাইতে সরকার বাহাদুরের খরচায় গারবিয়াং-এর যে একঘর ভোটিয়া পরিবার বিলাত গিয়াছিল,—সেখানে তাহারা আঠারো মাস কাল বাস করিয়াছিল এবং উইম্লিডন প্রদর্শনীতে ব্রিটিশ এম্পায়ার একজিবিসানে হাতে-নাতে কাজ করিয়া দেখাইতে হইয়াছিল। তাহার পর প্যারীতে যে বিরাট প্রদর্শনী হয়, সেখানেও ইহারা কাজ দেখাইতে যায়। এ কাজের জন্য সরকার হইতে ইহাদের কিছু ইনাম মিলিয়াছিল। বিলাতে অবস্থানকালে ইহাদের একটি পুত্র হয়। ব্রিটিশবর্ণ বলিয়া সরকার তাহাকে বিশেষভাবেই গণ্য করিয়াছেন। কুমার বাড়ীতে তাহারা মধ্যে মধ্যে আসিত, আমাদের সঙ্গে তাহাদের পরিচয় হইয়াছিল। তাহাদের বিলাতী পুত্রটির নাম রাখিয়াছে জর্জ্জ। এখন তাহার বয়স আট বৎসর হইবে।

এই ভোটিয়া পুরুষ মহাশয়েরা যতটা সময় দেশে থাকেন, ততক্ষণ মদ্যপান, তাসখেলা ও তামাকু টানাই তাঁহাদের কাজ। পিতলের হুঁকা—তাহার মুখে লম্বা একটি কাঠের নল, তাহা বোধ হয়, কখনও ওষ্ঠাধরের সম্বন্ধচ্যুত হয় না, উহা নেপাল হইতে আমদানী এবং সেদেশেরই অনুকরণ। হুঁকার মাথায় একটি করিয়া ধুনুচি সর্ব্বদাই জ্বলিতেছে।

ইহারা তিব্বতী এবং নেপালী হিন্দু, এই উভয় সভ্যতার ধুয়া ধরিয়াই চলিতেছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। সদর রাস্তার ধারে কতকটা প্রস্তর-প্রাচীরবেষ্টিত বসিবার স্থান আছে, সকালে বিকালে সেইখানেই গ্রামের বৈঠক বসে। সেখানে পাঁচ সাতজন, কেহ বা প্রাচীর হেলান দিয়া, কেহ কাত হইয়া, কেহ দাঁড়াইয়া, কথা কহিতে কহিতে তামাকু টানিতেছে প্রায় সকল সময়েই দেখিতে পাওয়া যাইত। সকাল সন্ধ্যায় প্রায় সকল গ্রামবাসী সমবেত হইয়া গ্রাম্য কথা, রাজনীতি, সাংসারিক কথা, হাস্যপরিহাস, আমোদ, ঠেলাঠেলি, হুড়াহুড়ি, মাতাল হইয়া স্ত্রীলোক লইয়া টানাটানি, এই সকল কাজে দিনযাপনই এখানকার পুরুষদের নিত্যকর্ম্ম। যখন ইহারা কলিকাতা বা কানপুরে মাল সওদা করিতে যায় তখন বাধ্য হইয়াই একটু শরীর চালনা করিতে হয়, না করিলে উপায় নাই। পরে দেশে আসিলে পরিশ্রমের পাট ইহাদের নাই বাললেই

হয়। আবার যখন তিব্বতে যায়, গাধা বা ভেড়া-বকরীর পিঠে মাল বোঝাই দিয়া লোকজন লইয়া রাস্তাটুকু ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে যেটুকু পরিশ্রম; নচেৎ সেখানে গিয়া দোকান পাতিয়া বসিলে বালিশে হেলান দিয়া তামাকু টানিতে টানিতে ছনিয়াদের সঙ্গে বাক্যালাপই প্রধান কর্ম্ম।

আড্ডা

এই ভোটিয়াদের মধ্যে বৃদ্ধ খুব কমই দেখিয়াছি। ইহারা বেশীর ভাগ পঞ্চাশ বৎসর বয়স পাইবার পূর্ব্বেই গতায়ু হয়;—আর হৈজাকী বীমারই ইহাদের যম। নরনারী এখানকার কেন যে বেশী দিন বাঁচে না সেটি একটু ভাবিবার কথা। একটি মাত্র বৃদ্ধ ভোটিয়া নারী এ যাত্রায় আমরা দেখিয়াছিলাম, তিনি লালসিং পাতিয়ালের মা। কিন্তু আশি বৎসর

বয়সে একটি চুলও পাকে নাই। না শুনিলে বিশ্বাস করা যায় না যে তাঁর আশি বৎসর বয়স হইয়াছে।

যাহা হউক, এই ভোটিয়া পুরুষের কথা যাহা বলিতেছিলাম—কার্ত্তিক মাসের শেষে ইহারা নামিয়া ধারচুলায় যায়। তখনও পুরুষেরা বিশেষ কিছু করে না, স্ত্রীলোকেরাই চরকা কাটিয়া পশমের সূতা বা দড়ি বাহির করে। সুদৃশ্য পুরু গালিচার আসন তিব্বতীয় শিল্পের অনুকরণে বয়ন করিতেও ইহারা সুপটু। তাহাতে দুজনের বেশী বসা যায় না, বড়জোর একজন একটু পা ছড়াইয়া বসিতে পারে।

কন্যাগণের যৌবনেই বিবাহ হওয়ার নিয়ম, কিন্তু বিবাহের প্রণালী অনেকটা রাক্ষস ও কতকটা গান্ধর্ব্ব মতেরই মিশ্রণ। 'কোর্টশিপ' বা পূর্ব্বপরিচয় ও প্রণয় হইয়া ইহাদের বিবাহ হয়। গ্রামের মধ্যে একখানি নিভৃত গৃহ আছে তাহার নাম রাম বাং। সেখানে সন্ধ্যার পর আড্ডা বসে। গ্রামের অপ্রাপ্ত প্রায়-প্রাপ্ত ও প্রাপ্তযৌবন কুমার এবং কুমারীগণ রাত্রে বেশভূষা করিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া মদ্যপান, নৃত্যগীত ও হাস্য-পরিহাসে আনন্দের হাট বসায়। রজনী গভীর হইলে যে যাহার মনোমত সঙ্গিনীকে লইয়া রাত্রি যাপন করে;—পরে প্রাতে উঠিয়া যে যাহার স্থানে যায়। ভিন্ন গ্রামের কোনও অবিবাহিত যুবক গ্রামে আসিলে এবং তাহাকে সেখানে রাত্রি যাপন করিতে হইলে, রাম বাং-ই তাহার প্রশস্ত স্থান। বুদিতে পৌছিয়া আমাদের যুবক বাহকদ্বয় এই রাম বাং-এ রাত্রি যাপনের লোভেই সেই বৈকালেই গারবিয়াংএ আসিবার জন্যই ঝুঁকিয়াছিল, এখানে তাহাদের কুটুম্বাদি আছে। মায়েরা সন্ধ্যার পর কুমারীদের বেশভূষা করিয়া সাজাইয়া রাম বাং-এ পাঠাইয়া দেয়। ইহাদের বিবাহে পুরোহিত নাই, মন্ত্র নাই, শালগ্রাম নাই, বেদী নাই, রেজেষ্ট্রি নাই, কোনোরূপ অপ্রাকৃত নিয়মের বশে ইহারা মোটেই চলিতে শিখে নাই। যাহার সঙ্গে যাহার ভালবাসা হয় সেই তাহার বর বা কন্যা। কেবল মনোমত বর সেই কন্যাকে আংটি গড়াইতে উনিশ কি একুশটি টাকা উপহার দেয়, তখন সে তাহার পিতামাতাকে জানায়। তারপর পাত্র সুবিধামত একরাত্রে রাম বাং হইতে পাত্রীকে লইয়া নিজ গৃহে পলায়ন করে। পরে সেখানে সাধ্যমত দুই চারিটি ভেড়া-বকরী মারিয়া ভোজ হয়। তাহার পর হইতে রীতিমত

ঘর-সংসার আরম্ভ। এখন কোথাও কোথাও এ প্রথার ব্যতিক্রম হইতেছে, পিতামাতার অনুমতি লইয়া বিবাহ চলন করিবার কেহ কেহ পক্ষপাতী। যেমন হিন্দু সভ্যসমাজে হয়, ইহারা এখন সেইভাবেই সমাজ গড়িতে চাহে।

ভোটিয়া বালিকা

এখানকার নারীগণ বড়ই অলঙ্কারপ্রিয়। অলঙ্কার অধিকাংশই রৌপ্যনির্ম্মিত। তাহার মধ্যে ক্বচিৎ স্বর্ণালঙ্কারও দেখা যায়। কণ্ঠালঙ্কারের সঙ্গে প্রবালের ব্যবহারই বেশী। প্রবাল ইহাদের শোভা ও বিশেষ আদরের বস্তু। চুল বাঁধিবার বিষয়ে ইহাদের পারিপাট্য কম নহে। সম্মুখের সিঁথির দুই পার্শ্বে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিনুনি করিয়া দুই পার্শ্বে কপালটি পুরা ঢাকিয়া সাজাইয়া দেয়। সম্মুখের সেই চুলের সূক্ষ্ম বিনুনি করিতে চুলবাঁধুনীর অনেকখানি নিষ্ঠীবন খরচ করিতে হয়। এক একবার থুথু দিয়া খানিকটা ভিজাইয়া পরে বিনাইতে থাকে, তাহা শুকাইলে কসমেটিকের কাজ করে। ইহাতে বদনের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে

বলিয়াই তাহাদের ধারণা। ক্রমার তিনটি ভগিনী,—আমাদের সম্মুখেই ঐপ্রকারে চুল বাঁধিত, উহারা নিঃসঙ্কোচ। নাসিকায় অলঙ্কার তত বড় নয় যতটা কণ্ঠালঙ্কারের আকৃতি। বালিকারা গলা হইতে পা পর্য্যন্ত টাকা, আধুলি, সিকির মালা, সব নিচে অবশ্য টাকা তারপর আধুলি আয়তন অনুসারে সারি সারি সাজাইয়া সুচারুরূপে গাঁথিয়া পরে।

তিন ভগিনী

এদেশে অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে, এই শক জাতি আসিবার পূর্ব্বে এখানে অনেক মুনি-ঋষি বাস করিতেন। সংসারসম্পর্কশূন্য, ভোগবিলাস-বর্জ্জিত সেই তপস্বী মহাত্মারা এ স্থানে যে অমৃতের আস্বাদন পাইতেন,—এই মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্যের অন্তরালে অনন্তমুখী যে প্রেরণা নিত্যকাল ব্যাপিয়া রহিয়াছে, এস্থানে আসিয়া না দাঁড়াইলে তাহা অনুভূত হয় না। ক্রমশঃ জনসমাগম বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহারা ধীরে ধীরে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

আমরা এখানকার জলবায়ু বিশেষরূপেই উপভোগ করিয়াছিলাম। ল্যানডন বলেন, এখানকার আবহাওয়া তাঁহার দেশের মতই। প্রায়

আষাঢ়ের আরম্ভেই আমরা এখানে ছিলাম। এ সময়ে সকাল সন্ধ্যায় আমাদের বাঙ্গলায় পল্লীগ্রামের পৌষ মাস। দুপুরবেলায় না চলিলে ততটা শীত বোধ হইত না। এখানকার হাওয়া যেমন শীতল তেমনই রুক্ষ। সেই রুক্ষ বাতাসে শরীর শুকাইয়া যায়। সমুদ্রতল হিসাবে গারবিয়াং ১০,০০০ ফুটের উপর, সুতরাং এখানকার বায়ু যত তরল ততই রুক্ষ। সেই কারণে বোধ হয় নিরামিষাশী যারা তাহাদের পক্ষে কষ্টকর, আমিষ আহারেই এখানে শরীর ভাল থাকে। দেশের জলবায়ু হিসাবেই খাদ্যের ব্যবস্থা, সেই জন্য এ অঞ্চলে আমিষ, বিশেষতঃ মাংসাহারই, এখানকার জনসমাজে একান্ত উপযোগী। লালগীরকে আমরা সন্ন্যাসী বলিয়া জানি, সেও বলে এখানে শিকার অর্থাৎ মাংস না খাইলে চলে না। সে ভিক্ষা করিয়া রুটি পাকাইয়া খাইত বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাহার পরিচিত ভোটিয়া মহাজন বন্ধুবান্ধবের গৃহে শিকার খাইবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া মুখ বদলাইয়া লইত। এ অঞ্চলে সে সকলের সঙ্গে বিশেষরূপেই পরিচিত, সকলের ঘরেই তাহার অবাধগতি। সন্ন্যাসীর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ, একথা বলিলে সে অম্লান বদনে বলিত আমরা ছত্রী লোক, মাংস না হইলে আমাদের চলে না, তাই মাঝে মাঝে খাই, এতে কোন দোষ নাই।

প্রথম দিন আমরা ডাকমুন্সীজীর ওখানেই দিনমানে অন্নাহার করিয়াছিলাম। তবে রুমাই সিধা পাঠাইয়াছিল, উপকরণ সবই তাহার। রাত্রে রুমা রুটি পাকাইল। দ্বিতীয় দিন রুমার ঘরে দুবেলাই রুটি। সে পাকাইল যাহা আমাদের শরীরের সঙ্গে বনিল না। তৃতীয় দিন সকাল হইতেই সঙ্গী-মহাশয় বিশেষ অসুস্থ হইলেন। ক্রমশঃ পেটের বেদনায় তিনি এত ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন তাহাতে আমি ভয় পাইয়া গেলাম। দেখিলাম তাঁহার শ্বাস ঘন ঘন এত জোরে জোরে পড়িতে লাগিল, যন্ত্রণায় তিনি অস্থির এবং অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। গণনাথ কবিরাজ প্রদত্ত সুখবিরেচন নামক বটিকা একটি সেবন করিয়া তিনি সারাদিন মুড়ি দিয়া পড়িয়া রহিলেন। বৈকালে উপশম হইল। সেদিন তিনি আর কিছুই খাইলেন না। সেদিন আমার অদৃষ্টেও দুবেলাই রুটি জুটিল। বাঙ্গালী শরীরে বিনাশ্রমে দুবেলা রুটি হজম করা ত সহজ নয়, কাজেই পরদিন হইতে সকালে একবেলা ভাতের জোগাড় করিতে হইল।

আমরা রুমার আশ্রয়ে যথার্থই সুখে দিন কাটাইতেছিলাম। কোনো অসুবিধা বা অভাব ছিল না। প্রাতে আমাদের দুজনের মধ্যে যে কেহ ডাল-ভাত রাঁধিয়া লইতাম তাহাতে রুমারও আহার হইত। রাত্রে রুমা রুটি পাকাইত। এখানে চাকি-ব্যালন লইয়া রুটি গড়ার রেওয়াজ নাই, হাতে চাপড়াইয়া রুটি পাকাইতে হয়। রুমা এত পাৎলা রুটি তৈরী করিত যাহা চাকিতে গড়া সহজ নয়। ইহাতে অবশ্য তাহার অনেকটা সময়ই যাইত।

এখানে সকলেই মাংসাশী। আমরা নিরামিষাশী, রুমাও তাই। শীতে যখন ফুলকপি, মূলা প্রভৃতি প্রচুর পাওয়া যায় তখন ঐ সব তরকারি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কুটিয়া শুকাইয়া রাখা হয়। শীতের সময় ধারচুলায় থাকে, সেখান হইতেই এ সকল শুষ্ক তরকারি সংগ্রহ করিয়া আনিতে হয়। আমরা রাত্রে এই শুষ্ক মূলা ও কপির তরকারি পাইতাম, তিব্বতী জিম্বু ঘাসের ফোড়ন দিয়া রুমা উহা প্রত্যহই প্রস্তুত করিত। শেষে তেঁতুল আম অথবা কোনো প্রকার খাট্টা, আচার পাওয়া যাইত। কাজেই এমন দূর প্রবাসেও তাহার আশ্রয়ে যথার্থই আমরা নিজ গৃহের আরাম পাইতাম। দুবেলাই রুমা সকল দ্রব্যই সরবরাহ করিত;—কোনদিন আমাদের কিছুই ব্যয় করিতে দেয় নাই। তাহার ইচ্ছা ছিল সকালেও সে নিজ হাতে আমাদের জন্য পাক করে, কিন্তু সঙ্গী-মহাশয় তাহাতে রাজী হইলেন না। জাতিগত পবিত্রতা রক্ষা করিতে, যার-তার হাতে ত ভাতটা খাওয়া চলে না, আর সব খাওয়া চলিতে পারে।

আমরা কিসে সুখে থাকিব, কি হইলে আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধা হয়, রুমা অনেক সময় তাহার তদ্বিরেই ব্যস্ত থাকিত। প্রাতে দ্বিপ্রহরের পর তাহার ভোজন শেষ হইলে প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে সাজসরঞ্জাম লইয়া সে আসন বা গালিচা বুনিতে বসিত। তখন সে একখানি গালিচার আসন বুনিতেছিল। তাহার যন্ত্রগুলি বেশ। তাঁতের কাজে যে সরঞ্জাম লইয়া বসিত তাহার প্রত্যেকটি দেখিবার জিনিস, সহজভাবেই প্রস্তুত দেশীয় যন্ত্র, আমাদের চক্ষে নূতন লাগিত। কাঁচিটি তাহার অপূর্ব্ব। বিলাতী ধরনের যে কাঁচি দেখিতে আমরা অভ্যস্ত এটি তাহার বিপরীত। কাঁচিটি একখণ্ড পাতলা ইস্পাত-নির্ম্মিত, মধ্যে প্রায় দু-ইঞ্চি চওড়া আর দুদিকে দুখানি এক বিঘৎ লম্বা ফলা। উহার ঠিক মধ্যস্থল এমনভাবে মুড়িয়া দেওয়া যাহাতে

তাঁত বোনা

হাতের মুঠার চাপ দিলে স্প্রিংএর সাহায্যে ঠিক কাঁচির কাজ করে। বয়ন-কালে পশম ছাঁটিয়া চোস্ত করিবার জন্যই ইহা কাজে লাগে। আঙুলের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ নাই, মুঠার চাপেই কাজ হয়। আমাদের দেশেও প্রাচীন-কালে এরূপ কাত্‌রি ব্যবহার ছিল, বিলাতী কাঁচির আমদানির সঙ্গে সঙ্গে উহা লোপ পাইয়াছে।

সে কাজ করিতে করিতে তাহাদের দেশের কথা, মধ্যে মধ্যে তাহার নিজের কথা বলিত। দেশবাসিগণের আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সে এমন

সুন্দর হিন্দীতে বলিত যে, তাহাতে তাহার বিচক্ষণতা, গভীর ধর্ম্মপিপাসা এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইত। মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রমের কয়েকজন সন্ন্যাসী একবার কৈলাসাদি তীর্থস্থানে গিয়াছিলেন, রূমা তাঁহাদেরও এইরূপ সেবা করিয়াছিল। তাহা ছাড়া প্রতি বৎসর কোনো-না কোনও সাধু-মহাত্মা এ অঞ্চলে আসিলে রূমার অতিথি হইয়া, তাহার সেবা লইয়া পরে কৈলাসাদি স্থানে গিয়া থাকেন। ঘরে বসিয়া এইরূপে অনেক সাধু মহাত্মার সঙ্গ পাইয়া তাহার ধর্ম্মজীবনে প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। আমরা যে শ্রেণীর সাধু অবশ্য অন্যান্য তীর্থকামী মহাত্মারা সেরূপ নহেন, তাঁহারা যথার্থই সাধু বা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। আমরা গৃহী হইলেও রূমার কাছে সেবা বোধ হয় যথার্থ সাধু, ত্যাগী সন্ন্যাসী, অপেক্ষা কিছুমাত্র কম পাই নাই। তাহার সঙ্গলাভ করিয়া এটুকু বুঝিয়াছিলাম যে, শ্রীরামকৃষ্ণের উপর তাহার ভক্তি ও শ্রদ্ধার সীমা নাই। তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীর নিকট দীক্ষা লইবার জন্য রূমা ব্যাকুল হইয়া দিন গণিতেছে। সেই কারণেই বাঙ্গালী মাত্রেই রূমার এতই আপনার।

রাত্রেও আহারাদির পর সে ঐরূপ আমাদের কাছে বসিয়া সৎপ্রসঙ্গ আলোচনা করিত। বেশী কথা ঐ রামকৃষ্ণের সম্বন্ধেই, এই মহাপুরুষের জীবনীকথা শুনিতে শুনিতে সে তন্ময় হইয়া যাইত। সাধুসঙ্গ এবং ভক্তিপথে বিশেষ লাভ তাহার এই হইয়াছিল যে, লোক দেখিলে বা অল্প ব্যবহারেই সে মানুষ চিনিতে পারিত। যখন সে কাহারও দিকে চাহিত সে তাহার ভিতর, মর্ম্মস্থল অবধি দেখিতে পাইত। সঙ্গী-মহাশয়কে রূমা পণ্ডিতজী এবং আমাকে পিতাজী সম্বোধন করিত।

এইবার ক্রমে ক্রমে আরও দুই একজন কৈলাসযাত্রী আসিয়া গারবিয়াংএ জমিতে আরম্ভ করিল। রূমা প্রত্যহ সকল খবর আনিয়া দিত। আমরাও সকাল-বিকালে বাহির হইয়া খবর পাইতাম। রাস্তা খুলিতে আর কত দেরী। কিন্তু সঙ্গী-মহাশয় মহাব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, তিনি আর এখানে থাকিতে পারিতেছেন না, প্রত্যহই তাঁহার তাগিদ। একে তিনি সকল কর্ম্মেই ব্যস্তবাগীশ তাহার উপর এক সপ্তাহ যাইতে-না-যাইতেই তাঁহার শীঘ্র শীঘ্র বাড়ী ফিরিবার জন্য মন কেমন করিয়া উঠিল। মাত্র দুই একজন যাত্রীর ও-পথে যাওয়ার কত বিঘ্ন তাহা তিনি জানিতেন না। বারবার তাঁহাকে যাইবার কথা বলিতে শুনিয়া একদিন রূমা তাঁহার ভ্রম ভাঙ্গিয়া দিল।

সে বলিল যে,—আপনি যে যাইবেন বলিতেছেন, যাইবেন কোথায়? এখানকার মহাজন সকলে গিয়া সেথায় তাঁবু, ঘর প্রভৃতি না বানাইলে আপনারা উঠিবেন কোথা;—কে আপনাদের স্থান দিবে? আপনাদের ও-অঞ্চলের মত তীর্থ যে এ নয়, তিব্বত বড় ভয়ঙ্কর স্থান। আর দুই চারিদিনেই পথ খুলিবে; আমাদের ব্যবসায়ী লোক সেখানে গিয়া বসিলে পরে আপনারা যাইবেন। মায়াবতী হইতে যদি কোনো স্বামিজী আসেন তাঁহাদের সঙ্গে আপনাদের মিলাইয়া দিব এবং আমিও যাইব; আপনাদের সেবা করিব। সকলে মিলিয়া একত্রে যাত্রায় অনেক সুবিধা আছে আর তাহা বড়ই আনন্দের এবং যাত্রাও নিরাপদ হইবে। আপনি ব্যস্ত হইবেন না। আপনারা এখন এখানে রহিয়াছেন, আপনাদের সেবা করিতে পাইতেছি, সৎসঙ্গে দিন কাটাইতেছি, ইহাতে আমার কত আনন্দ! যতদিন পথ না খুলে আপনি আর নিত্য নিত্য যাইবার কথা বলিয়া দুঃখ দিবেন না।

আমরা তাহার আশ্রয়ে তাহার সেবা লইতে পাছে কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ করি, তাই রুমা যখনই আমাদের যাইবার কথা হইত তখনই এমন ভাব দেখাইত যেন আমরা তাহার আশ্রয়ে থাকিয়া মহা উপকার করিতেছি, স্বার্থটা যেন তাহার দিকেই বেশী, আমরা তাহার সেবা লইয়া মহা ত্যাগস্বীকার করিতেছি।

আমরা যে কয়দিন ছিলাম, প্রায় আঠারো দিন হইবে তাহার মধ্যে প্রথম কয়দিন প্রায় সপ্তাহখানেক হইবে অপর কোনও যাত্রী দেখা যায় নাই। তখন কৈলাসযাত্রীদের মধ্যে আমরা দুজন, নাথজী ও লালগীর। তখন আমাদের কাজের মধ্যে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও বৈকালে বেড়ানো। সঙ্গী-মহাশয় দিবাভাগে একটু সুখনিদ্রা দিতেন, কাজ ছিল না, কি-ই বা করিবেন।

এই যে কয়দিন গারবিয়াং-এ অবস্থিতি তাহা অনেক পুণ্যের ফলে ঘটিয়াছিল বলিয়াই আমি মনে করি। কারণ এরূপ সুন্দর স্থান-বৈচিত্র্য পূর্ব্বে কখনও উপভোগ করি নাই। আমার অন্তরে একটি বিষম আক্ষেপ এই রহিয়া গিয়াছে যে, চিত্রের সরঞ্জাম সঙ্গে আনিতে পারি নাই। এমন পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না। হিমালয়ে যে সকল প্রসিদ্ধ স্থানের পরিচয় আমাদের বঙ্গবাসী সাধারণে পাইয়া থাকেন,—

অবশ্য সে-সব স্থান দৃশ্য-মাধুর্য্যেও অতুলনীয়। তাহাদের যে-কোনও এক দিকের দৃশ্যই মনোরম, বড় জোর দুই দিক হইতে সুন্দর। কিন্তু এই গারবিয়াং-এর চারিদিকের দৃশ্যই মধুর, অপূর্ব্ব এবং যথার্থই মনোহর। ইহার চারিদিকের সেই দৃশ্যগুলি অবলম্বন করিয়া চারিখানি জগদ্বিখ্যাত নৈসর্গিক চিত্র আঁকা যায়।

গারবিয়াং-এর সৌন্দর্য্য অপরিসীম। পূর্ব্বে ও দক্ষিণে চিরতুষারাবৃত শৈলশিখর, বিচিত্র তাহার রেখায়তনভঙ্গী, আর কোথাও এমনটি নাই। গ্রামখানি পশ্চাতে ও অপর পার্শ্বে অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিমে, অতীব বিশাল, রুক্ষ, তৃণলতাবৃক্ষাদি চিহ্নবিবর্জ্জিত শ্রেণীবদ্ধ অভ্রভেদী তাহার বিশালতা অনুভবের বিষয়। দূর হইতে মনে হয় একেবারেই খাড়া, যদিও ঠিক তাহা নয় তথাপি উহার ঋজুতা দুরতিক্রম্য। উহাতে আরোহণ-কল্পনাও সম্ভব নয়। মধ্যে মধ্যে বহুতর গভীর রেখা, ঊর্দ্ধ-অধঃ বহুদূর বিস্তৃত। সে দৃশ্য বড়ই অদ্ভুত, বড়ই গম্ভীর।

এই ব্যাসক্ষেত্রে জন্ম, কর্ম্ম ও মরণ, মহা পুণ্যের ফলে হয় বলিয়াই ইহাদের ধারণা।

এক-এক দিন ঘুরিতে ঘুরিতে পর্ব্বতের নিম্নতম প্রদেশে চলিয়া যাইতাম, সেখানে কালী কুলু কুলু শব্দে খরবেগে ছুটিয়াছে; গারবিয়াং গ্রামখানি হইতে প্রায় পাঁচ শত ফুট নীচে। নদীর খরস্রোতের সুবিধা লইতেও ইহারা ছাড়ে নাই। জলের ধারেই দুইখানি ঘরে দুইটি পানচাক্কি। স্রোতের বেগে জাঁতা ঘুরিয়া গম হইতে আটা বাহির হইতেছে। সকালে একজন লোক, পরিমিত গম চাকীর মধ্যে দিয়া যায়, সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসিয়া আটা লইয়া যায়, আবার চাক্কিকে সমস্ত রাত্রির মত কাজ দিয়া যায়। স্রোতের বেগ সকল সময় সমান থাকে না, বেগ বেশী থাকিলে মালও বেশী উৎপন্ন হয়।

কালীগঙ্গার তীর হইতে গারবিয়াং গ্রামের প্রাচীরসংযুক্ত রাস্তা পর্য্যন্ত স্তরে স্তরে অনেকগুলি কৃষিক্ষেত্র। নীচে নদীতীর হইতে কৃষিক্ষেত্রের স্তরগুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর। যেন দীর্ঘায়ত সোপানশ্রেণী যাহা অতিক্রম করিয়া উচ্চে অবস্থিত গারবিয়াংরূপ-দেবলোকে পৌঁছাইতে হয়।

কালীর শরীর এখানে তত প্রশস্ত নয়; কিন্তু তাহার গতি অতীব খর এবং শব্দময়ী। কালীর ওপারে নেপাল। ঐদিকে দেখিলে নেপাল

সীমানার মধ্যে স্থানে স্থানে ঘন এবং কোথাও কোথাও বিরল দেওদারের জঙ্গল, নদীতীর হইতে ক্রমশঃ উচ্চতর পর্ব্বতের স্কন্ধদেশে উঠিয়া গিয়াছে। গারবিয়াং-বাসিগণের নিকট এ জঙ্গলের নাম কালীপারের জঙ্গল; এখানে তাহাদের পালিত পশুসকল অবাধে চলিয়া বেড়ায়। কোথাও বহুবিধ আকারের শিলাসমষ্টি তীরভূমির চারিদিকে ছড়াইয়া আছে, তাহা ছাড়াইয়া দেওদার জঙ্গলের আরম্ভ; সে জঙ্গলও অনেক দূর উচ্চে উঠিয়াছে। তাহারও উপর কতকটা স্থান জুড়িয়া আর তরুলতার লেশমাত্র নাই, উহা কেবল জরাজীর্ণ কঙ্কালসার নগ্ন প্রস্তরের স্তূপ। উহার বর্ণ কৃষ্ণাভ ধূসর, তাহার উপর ক্রমবিস্তৃত শুভ্র তুষারপথ দেখা যায়, যাহা ক্রমোচ্চ উঠিয়া গিয়াছে। উহার মধ্যে মধ্যে বিশালকায় কৃষ্ণশরীর এক এক খণ্ড জীর্ণ প্রস্তর লম্বমান পড়িয়া আছে। শেষে চিরতুষারমণ্ডিত শৃঙ্গধর, বিচিত্র তাহার আকৃতি। উহার পূর্ব্বদিকটি সূর্য্যকিরণে দীপ্ত হইয়া দৃষ্টিকে প্রতিহত করিতেছে, অপর দিকটুকু ক্ষীণ নীলাভ ধূসর ছায়ামণ্ডিত।

গারবিয়াং-এর প্রত্যেক দৃশ্যের মধ্যে একটা মোহ আমায় পাইয়া বসিয়াছিল। কোনো কোনো দিন সেই দিকে যাইতাম যে দিক দিয়া আমরা প্রথম দিন বুদি হইতে খাড়া চড়াই উঠিয়া ব্যাস-ক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম। সেদিকেও উচ্চ দেশে ঘনসন্নিবিষ্ট দেওদারের বন। তাহার মধ্যে কোথাও সমতল ভূমি, তাহার উপর প্রকৃতিরচিত নানা বর্ণের পুষ্পগুচ্ছ নয়নবিমোহন বর্ণের প্রলেপ লাগানো, যেন একখানি বিশালায়ত গালিচা বিছানো আছে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে ঐ সুন্দরতম বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত পুষ্পগুচ্ছ বিস্তৃত ভূমির বর্ণনায়, গালিচা ব্যতীত আর কিছু নাই তুলনা দিবার। সৌন্দর্য্যের আকর সেই ফুল ও বর্ণসমাবেশের অপূর্ব্ব কৌশল নিরীক্ষণের বিষয়, বর্ণনা তাহার অসম্ভব; একটি দেওদারের তলে বসিয়া দেখিতে থাক, বেলা ফুরাইয়া আসিবে, তোমার দেখা ফুরাইবে না।

এক-এক দিন সেখান হইতে নীচে নামিতাম। পথ বিষম এবং বন্ধুর, কিন্তু দৃষ্টির মধ্যে সুধার নেশায় পথের কষ্ট লাগিত না। এক স্থানে একটি ঝরণা, বহু উচ্চ, বোধ হয় শিখর হইতেই নামিতেছে। যেন আনন্দের ধারা। দূর হইতে মনে হয় যেন তরল রজতস্রোত,—গতির কি মনোহর বিশৃঙ্খলতা, ক্ষীণ হইতে ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে যতই নীচের দিকে আসিতেছে। তারপর,—যখন সেই নির্ঝরিণী এমন একটি স্থানে আসিয়া পড়িলেন, সেখান

হইতে আর সহজ পথে নীচে নামিবার উপায় নাই, তখন ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া আর কি গতি থাকিতে পারে? শেষে তাঁহাকে মহানন্দে লক্ষ্যশূন্য উন্মাদের মতই ঝাঁপাইয়া পাড়তে হইল। যিনি পড়িলেন তিনি যে আনন্দে উন্মত্ত হইয়াই পড়িলেন তাহার সহজ সত্য এবং নির্ঘাত প্রমাণ আছে। কোথায়? ঐ দৃশ্যের দ্রষ্টা যিনি তাঁর অন্তরে লক্ষ্য করিলেই হইবে। বাহ্য দৃশ্যের সকল প্রমাণই ত আমাদের অন্তরে, সেকথা কি আবার কাহাকেও বলিয়া দিতে হয়?

গারবিয়াং-এর প্রত্যেকটি দৃশ্যের মাধুর্য্য বর্ণনাতীত।

এখন আর এক কথা :—

শেষের দিকে ক্রমশঃ বহুতর স্ত্রীপুরুষ, বেশীর ভাগই গৈরিকধারী আসিয়া জুটিলেন। কথা এই, যাত্রার পথ খুলিবে কবে, কতদিনে যাওয়া যাইবে। অনেকেই রুমার ঘরে ভিক্ষায় আসিত, সেই সুযোগে অনেককেই দেখিতাম। একদিন একজনকে দেখিলাম, অতীব ভয়ঙ্কর অবস্থা তাঁহার—যেন প্রেতমূর্ত্তি।

তাঁহার শরীর এত দুর্ব্বল যে, ঘরের দেওয়াল ধরিয়া আসিলেন। চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট ও জ্যোতিহীন, মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছিল না। কিছুক্ষণ বসিবার পর ধীরে ধীরে ক্ষীণকণ্ঠে ব্যাপার যাহা বলিলেন তাহা এইরূপ,—বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই একজন উড়িষ্যাবাসী তিনি, পুরী হইতে কৈলাস মানসসরোবর যাইবেন বলিয়া আসিয়াছিলেন, সঙ্গে তাঁহার সম্বলের মধ্যে কৌপীন আর একখানি কালো কম্বল। তিনি কাহারও কথা না মানিয়া আপন মনে বরাবর অনেকদূর চলিয়া গিয়াছিলেন, তাহার পর লিপুধুরায়, বর্ফান মুলুকে পড়িয়া তাহার শরীর বিকল হইয়া গেল।

সেই ভয়াবহ শীত, রুক্ষবায়ু এবং তুষারক্ষেত্রের ব্যাপার তাঁহার কল্পনার অতীত। বরফের উপর দিয়া নগ্নপদে চলিতে চলিতে পদতল ফাটিয়া রুধিরস্রাব হইতে লাগিল। সঙ্গে আহার্য্য দ্রব্যাদি কিছুই ছিল না, তিনি একান্ত নির্ভর করিয়াই বাহির হইয়াছিলেন, কিছু সংগ্রহ করা তাঁহার ধর্ম্মবিরুদ্ধ। সেখান হইতে তিনি আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া অতি কষ্টে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখন কিছু গরম কাপড় পাইলে তিনি এখান হইতে নামিয়া যান। দেখিলাম, তাঁহার পদতল এমন ফাটিয়াছে যে, দেখিলে আর চর্ম্ম বলিয়া মনে হয় না, বড় বৃক্ষমূল যেমন

দুস্থ যাত্রী

ফাটিতে দেখা যায় সেইরূপ ফাটা। উপরের দিকে এতটা ফাঁক যে, দেখিলে ভয় হয়; রেখায় রেখায় ফাটিয়াছে।

না জানিয়া না বুঝিয়া, কাহারো কথা না মানিয়া তিতিক্ষায় অনভ্যস্ত, এরূপ অনেকেই বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন। শুনিয়াছি অনেকে মারাও গিয়াছেন। সমতলবাসী, রেলের ধারে তীর্থ করা যাঁহাদের অভ্যাস, তাঁহাদের ধারণা নাই যে, এ সকল তীর্থ পর্য্যটনে কি ভয়ানক বিরুদ্ধ-প্রকৃতির মধ্য দিয়া নরশরীর লইয়া চলিতে হয়, আবার প্রকৃতির অনুকূল যোগাযোগই বা কতটা লাভ করা যায়।

॥ ৮ ॥

গারবিয়াং-এর আরো কথা ;—ডুডুং

কদিন বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইব বলিয়া প্রস্তুত হইতেছি এমন সময়ে আমাদের দিলীপ সিং বিশেষ ব্যস্তভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং একত্র যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিল, যেন তাহার কিছু কথা আছে। সে সর্ব্বকালেই ব্যস্তবাগীশ, এক্ষেত্রে তাহাকে যেন একটু বিশেষরূপ ব্যস্তই দেখিলাম।

সে আমায় স্বামীজী বলিত। আলমোড়া হইতেই দেখিতেছি যে, এদেশবাসিগণের স্বামীজী সম্বোধনের কোনো হিসাব নাই। গৃহী হউক বা সাধু-সন্ন্যাসী হউক তীর্থযাত্রী বা বিদেশী ভদ্রলোক হইলেই স্বামীজী সম্বোধনের যোগ্য বলিয়াই তাহাদের ধারণা।

দুইজনেই বাহির হইলাম। গ্রাম ছাড়িয়া যখন আমরা ফাঁকায় পড়িলাম তখন ধীরে ধীরে দুই-এক কথার পর দিলীপ বলিল যে, আপনি ত জানেন আমাদের বিবাহপদ্ধতি কিরূপ, উহা আমি মোটেই পছন্দ করি না, আপনাকে তাহা আগেই বলিয়াছি। রামবাং-এর প্রথা কখনই ইহারা মন্দ চক্ষে দেখিবে না।

আমি বলিলাম,—আচ্ছা, তুমি যদি রামবাং-এ যাওয়া-আসা না কর তাহলে তোমার বিবাহ হবে কি করে? শুনছি ত রামবাং না হলে তোমাদের বরকন্যার প্রণয় অর্থাৎ কোর্টশিপই হয় না। এই রামবাং-ই একমাত্র স্থান যেখানে বরকন্যা প্রণয়ে আকৃষ্ট হইয়া পরে বিবাহিত হয়।

দিলীপ বলিল, ঐ বিষয়ের জন্যই ত আজ কয়েকটি বিশেষ গোপনীয় কথা বলিতে আপনার সঙ্গে আসিয়াছি। আমি জানি, এ বিষয়ে আপনার সাহায্য পাইলেই আমার অনেক উপকার হইবে, আমি জীবনটি সুখে কাটাইতে পারিব।

ব্যাপারটি কি শুনিতে চাহিলাম।

তখন সে বলিল—আপনি জানেন, রুমাদেবীকে আমি চাচী বলি, তিনিও আমায় যথেষ্ট স্নেহ করেন। তাঁর মত সাধুচরিত্রা তেজস্বিনী এবং ধার্ম্মিকা স্ত্রীলোক আমাদের দেশে নাই। সেইজন্যই আমরা তাঁকে দেবী বলি। আপনি বোধ হয় জানেন যে, দেবীর দুইটি বড় ভগিনী কুট্টিতে থাকেন আর একজন চৌদাসে থাকেন। তাঁহাদের স্বামী-ঘর ঐ স্থানেই।

কুট্টি গারবিয়াং হইতে দুই দিনের রাস্তা, আরও উত্তরে, বরকান মুল্লুকের নীচে, তাহার ওদিকে আর ভোটিয়ার বাস নাই। শুধু ভোটিয়া কেন অন্য কোনো লোকালয় নাই, কারণ তাহার পরেই চিরতুষারাবৃত শৃঙ্গমালা যাহাকে এদেশবাসিগণ বরকান-রাজ্য বলে। তাহার পরপারেই তিব্বত।

সে বলিল, সেই কুট্টিতে যে বড় ভগিনী থাকেন, তাঁহার একটি বিবাহ-যোগ্য কন্যা আছে। তাহার নাম লাঠি। সে তাহার মা ও আপনার ভায়ের সঙ্গে কাল এখানে রুমাদেবীর বাটিতেই আসিতেছে। দুই একদিন এখানে থাকিবে, পরে আবার চলিয়া যাইবে। সে দেখিতে বেশ। আমার বিশ্বাস আপনি আমার নাম না লইয়া রুমাদেবীকে যদি একটু বলেন তাহা হইলেই বড় ভাল হয়।

ব্যাপারটি তখন বিশেষ বুঝিলাম।

বলিলাম, আমি বাহিরের লোক, এ সম্বন্ধে হঠাৎ কি বলব বল দেখি?

সে বলিল—আপনি এরূপভাবে বলিবেন যে, আমি তাহার অনুপযুক্ত নহি, আমার কথা একটু ব্যাখ্যান করিয়া তাঁহাকে বলিবেন এবং ঐ কন্যাটির সহিত আমার বিবাহ হইলে যেন বেশ হয়, উভয়েই আমরা সুখে থাকিব এরূপ বলিবেন।

অবোধ যুবক আমার প্রশ্ন বুঝিল না।

আমি তাহাকে বলিলাম,—তুমিই ত অনায়াসে তাকে সকল কথা বলতে পার, কিংবা আপনার লোক দ্বারাও ত তার পিতামাতার কাছেও উত্থাপন করতে পার।

সে বলিল যে,—তার পিতামাতার কাছে একথাটা উত্থাপন করিবার জন্য আমার বড় ভাই কুট্টিতে যাইবেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে রুমাদেবীর কথাই

যে বলবৎ। তাঁহার অমতে কন্যার পিতামাতা কিছুই করিবেন না। আর আপনাকে এইজন্য বলিতেছি, আপনাদের প্রতি রুমার শ্রদ্ধা আছে। আপনারা যদি বলেন তাহা হইলে রুমাদেবী উহাতে রাজী হইতে পারেন;—তারপর আমাদের কেহ গিয়া কথাটা উত্থাপন করিতে পারে। আর দেখুন, এরূপভাবে পিতামাতার কাছে গিয়া কথা উত্থাপন করিয়া তাঁহাদের মতামত লইয়া বিবাহ এদেশের রীতি নয়, উহাতে ফল ভাল হয় না বরং বিপরীতই হয়। ইঁহারা তাহাতে নিজেদের অপমানিত বোধ করেন তবে রুমার ইচ্ছা থাকিলে আর কিছুতেই বাধিবে না।

এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া কাল বলিব বলিয়া কথাটা শেষ করিবার চেষ্টা করিলাম। তবে সে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল যে, আপনি আমার সম্বন্ধে কথাটা ভাল করিয়া বলিবেন। আমি বলিলাম, বেশ। তাহার পর নানা কথায় বেলাশেষে আমরা ঘরে ফিরিলাম।

রুমা তাহার নিজের দেশস্থ অধিবাসীগণের কথা হইলে বলিত, ইলোক সব বহুত খারাপ, আপলোকন্ কো মাফিক নেহি। ইহাঁ কইকো মগজ ঠিক নহি, আচার বিচার সব বুরা।—দেওঁতাকো উপর প্রেমভক্তি নহি। বহোত দুষ্ট্ রাচ্ছস সমঝিয়ে পিতাজী। আপলোক আয়া, ইলোককো অচ্ছি অচ্ছি উপদেশ দেনা গেয়ান্কীবাৎ আচ্ছি মতাবিক শুনাদেনা তব্ ইলোক আচ্ছা হো সক্তা। দিলীপের সম্বন্ধে বলিত—ও লেড়কা আচ্ছা হ্যায়। উন্‌কো স্বভাব আচ্ছা হ্যায়। হামারা বাত্ বহুত মানতা হৈ।

দিলীপকে সে ভাল বলিত বটে, কিন্তু যখন প্রসঙ্গক্রমে দিলীপের ব্যাপারটি উত্থাপন করিলাম, তখন সে কিন্তু আর একরকম হইয়া গেল। দেখিলাম তাহার এ বিবাহে ইচ্ছা নাই। ছেলেটি যে ভাল তাহা সে অস্বীকার করিল না। কিন্তু সে বলিল যে, উহারা বংশে তত উচ্চ নহে, সেইজন্য এই বিবাহ হইতে পারে না, উ লোক ছোটি বংশ হৈ।

অবাক হইলাম—এখানেও আবার বংশমর্য্যাদার মোহটি আছে, কি আশ্চর্য্য!

তখন আর একটু বলিলাম যে, উহারা বংশগৌরবে কে কিরূপ নীচু তাহা আমি জানি না আর তোমাদের এখানকার বংশগৌরবের গতিকও আমরা

বুঝি না, তবে উপস্থিত যেমন দেখিতেছি তাহাতে আমার ত কিছু খারাপ মনে হয় না। পাত্রটি নিজে ভাল, তাহার উপর তাহারা যে কয়টি ভাই আছে, প্রত্যেকেই সৎ এবং কৃতী। বেশী কথার প্রয়োজন নাই, এই গারবিয়াং-এর মধ্যে ধনেমানে কৃতিত্বে উহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রত্যেকেরই নিজের ব্যবসায় আছে, প্রত্যেকেরই ঘর-বাড়ী এবং সংস্থান আছে। এ বিবাহ যদি হয় আমার বোধ হয় ভালই হইবে। রুমা কিন্তু সেই কথাই পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল যে, উহারা আমাদের শ্রেণী অপেক্ষা নীচু, কন্যার পিতামাতা রাজী হইবে না।

আসল কথা এই যে, বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়া পাকাপাকি করাটাই এ দেশের নীতিবিরুদ্ধ, একথা মিথ্যা নহে।

যেমন ভিন্ন গ্রাম হইতে অবিবাহিত যুবক আসিলে সেই গ্রামের রামবাং-এ অর্থাৎ প্রমোদভবনে তাহার সম্ভাষণ হয়, সেইরূপ ভিন্নগ্রাম হইতে কোন কুমারী আসিলেও সেই গ্রামের রামবাং-ই তাহার রাত্রিযাপনের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র।

যদি সে এখানে আসিয়া ঐরূপ প্রমোদভবনে যায় আর দিলীপ সিং তাহার সঙ্গে সেইখানেই নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে হয়ত কাহারও কোনো আপত্তির কারণ হয় না। পাশ্চাত্ত্যে যেমন বিবাহ-ব্যাপারে বরকন্যার সম্পূর্ণ নিজেদের দায়িত্ব থাকে, এদেশেও তাহাই ; কেবল পার্থক্য এইটুকু যে, ইহাদের মধ্যে রামবাং নামক একটি স্থান, আর বিবাহটি কোনো ধর্ম্মমন্দিরের পুরোহিতের সম্মুখে রেজিষ্টারী না হওয়া। কিন্তু দলীপ ত রামবাং-এ যাইবে না। যাহা হউক, আমি তখন এ সম্বন্ধে কিছু বলিলাম না। এখন আর এক ব্যাপার বলি।

গারবিয়াং-এর প্রায় তিন মাইল পূর্ব্বে, কালীগঙ্গার পরপারে, শাংরু নামে অতীব সুন্দর একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। গারবিয়াং হইতে তাহার দৃশ্য একটি আকর্ষণের বস্তু। আমরা আসিবার প্রায় দিন দশ-বারো পরে একদিন শুনা গেল যে, সেখান হইতে একজন লোক আসিয়াছে, স্বামীজীদের ওখানে লইয়া যাইবে। ব্যাপার কি! রুমাকে জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল যে, সেখানকার একজন ব্যবসায়ী ধনীরাম তাহার একমাত্র বয়োপ্রাপ্ত পুত্রটি মারা যাওয়ায় শোকে বড়ই কাতর হইয়াছে। তাহারা শুনিয়াছে যে, কলিকাতা হইতে দুইজন জ্ঞানী মহাত্মা রুমার বাড়ীতে

আসিয়াছেন, সেইকারণেই তাঁহাদের লইয়া যাইবার জন্য এখানে লোক পাঠাইয়াছে।

সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন,—চল না যাওয়া যাক।

রুমা বলিল,—আমিও যাইব, ওখানে আমাদের কুটুম্ব আছে—তাহা ছাড়া ধনীরামের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও আছে।

আরও শুনা গেল যে, পুত্রশোকে ধনীরামের বিবাগী হইবার মত অবস্থা। তাহার বিষয়-সম্পত্তি, কারবার প্রভৃতি সে কিরূপ ব্যবস্থা করিবে, অর্থাদি কিভাবে কোন্ বিষয়ে ব্যয় করিলে কল্যাণ হয়, সেই সকল পরামর্শ করিবার জন্যই নাকি, আমাদের আহ্বান করিয়াছে।

এদেশীয় ভোটিয়াগণের মধ্যে, যে একেবারেই নিঃস্ব সে ছাড়া তিব্বতে গিয়া তাকলাখারে মাল খরিদ বিক্রয় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা সকলেই রাখে। লাভ বা লোকসান যাহা হউক উহারা তাহাতে বড় কাতর নয়, কারবারটি করা চাই-ই। যে উহা না করিতে পারে সে নিজেকে বিশেষ দুর্ভাগা এবং অতি হীন মনে করিয়া সর্ব্ববিধ স্বাধীন ক্রিয়াকলাপ, আমোদ-প্রমোদে বঞ্চিত হইয়া থাকে। বাধ্য হইয়া উদরান্নের জন্য তাহাকে কোনো স্বজাতীয় ব্যবসায়ীর নিকট দাসত্ব স্বীকার করিতে হয়।

আমাদের এই ধনীরামের বেশ বড় কারবার এবং সেই হেতু তিব্বতে সে তো প্রতিবৎসর যায়-ই;—অনেক টাকার কেনা-বেচা করে, তাহাতে প্রভূত পরিমাণে লাভ-ও করে। তাহা ছাড়া তাহার চাষ-আবাদও আছে। শাংরু গ্রামের মধ্যে সে-ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি এবং অনেককেই প্রতিপালন করে। ধর্ম্মার্থে ব্যয়ও আছে, তাহার স্বরূপ পরে বলিব।

পথে যাইতে যাইতে সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন,—ধনীরাম যদি তার অর্থাদি বিষয়-সম্পত্তি সদ্ব্যবহারের পরামর্শ চায়, তাহা হলে কি ভাবে উহার সদ্ব্যবহার হয়—একটি ঠিক যুক্তিযুক্ত পরামর্শ বল দেখি, তোমার এ সম্বন্ধে কি ভাব?

আমি বলিলাম—আমার কিছু ভাব নেই, যদি কেউ আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে, তা হলে আমি বলব, ভাল বলে তার যা বুদ্ধিতে হয় অর্থাৎ সৎকর্ম্ম বলে যে সকল কর্ম্ম তার ধারণা, স্বাধীনভাবে তাহাতেই তার অর্থব্যয় করাই আমার পরামর্শ, এ ছাড়া আর আমার কিছুই পরামর্শ নেই।

সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন, আমি মনে করছি বলব যে, তার টাকাকড়ি যা কিছু সম্পত্তি সকলই রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে দেওয়া; তাইতে এদেশে তীর্থযাত্রী যারা আসবে, সাধু সন্ন্যাসীরা সকলেই উত্তম থাকবার স্থান এবং আহারের সুবিধা, এরূপ একটা কিছু করা; তা ছাড়া ঐ মিশনের যে ভাবে চিকিৎসালয় প্রভৃতি থাকে তাও থাকবে, বুঝলে হ্যা, কি বল? আমি বলিলাম,—বেশ, খুব ভালো।

কালীর বেগ ক্রমশই বাড়িতেছে, বেগ তত প্রখর না হইলে সোজাসুজি পার হইয়া শাংরু গ্রামে উঠা যাইত—যাহা নদীতীর হইতে প্রায় দুইশত ফুট উচ্চে অবস্থিত। নদীর বেগ বেশী হওয়ায় আমাদের কতকটা রাস্তা ঘুরিয়া একটি সেতু পার হইয়া শাংরুতে উঠিতে হইল। ক্রমে আমরা তিনজনেই ধনীরামের গৃহে উপস্থিত হইলাম, রুমা ভিতরে স্ত্রীলোকদিগের নিকট চলিয়া গেল।

প্রাঙ্গণে অনেক লোক কাজ করিতেছে। বেশীর ভাগ লোক চিড় কাষ্ঠ লম্বা টুকরা করিয়া কাটিয়া জমা করিতেছে আর তাহার একপার্শ্বে প্রকাণ্ড একটি ডেক্‌চিতে কি রান্না হইতেছে। পার্শ্বে, বারান্দার নীচে ধনীরাম সিং একখানি খাটিয়াতে বিছানার উপর বসিয়া ছিল। তাহার আশপাশে দেওয়ালে বন্দুক, ঢাল, তলোয়ার, ভোজালি ঝুলিতেছে। আমাদের শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সে অভ্যর্থনা করিয়া তাহারই একজন লোককে আর একখানি খাটিয়াতে বসিবার জন্য কম্বল ও তাহার উপর তিব্বতের গালিচা বিছাইয়া দিতে বলিল।

অধিকাংশই পাকাচুল, পাকা গোঁফ, নিয়ত ধূমপানে উহা পীতাভ লোহিত হইয়া গিয়াছে, মাথায় টুপী, পাশে গুড়গুড়ী—বিষণ্ণ বদনে ধনীরাম বসিয়াছিল। স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন বিচক্ষণ, উদ্যোগী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্ম্মী লোকের যেমন চেহারা হয় ধনীরামের মুখাকৃতি সেইরূপ, তাহার উপর কেবল একটি শোকের ক্ষীণ আবরণ পড়িয়া যেন তাহাকে কতকটা অবসন্ন দেখাইতেছিল।

এখন আমাদের বসিতে বলিয়া ধীরে ধীরে,—হাল চাল ত সব শুনা হুয়া,—কেবল এইটুকু বলিয়া সে নিম্নদৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মুখে মদের গন্ধ।

তাহার পর সঙ্গী-মহাশয় ধীর গম্ভীর ভাবে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সেই

বিশিষ্ট ধরনে,—তুনিয়াকা য়্যায়সাই হাল, সব কোইকো একদফে যানা হোগা, বলিয়াই আরম্ভ করিলেন, ধনীরাম চুপচাপ, স্থির হইয়া রহিল আর মাঝে মাঝে মুষ্টিবদ্ধ নলে টান দিতে লাগিল।

প্রায় আধ ঘণ্টার পর যখন সঙ্গী-মহাশয় ক্লান্ত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন তখন সে ধীরে ধীরে যাহা বলিল তাহার অনুবাদ এইরূপ,—আমি সবই বুঝি, মহারাজ, সকলই জানিতে পারিতেছি, কিন্তু আমার পাপের ভোগ যেটুকু আছে সে বেদনাটা আমাকে যে সহ্য করিতেই

হইবে। কালে সকল বেদনাই মিলাইয়া যাইবে। সুখের ব্যাপার দুঃখের ব্যাপার সবই কালে মিলাইয়া যায়, তবে বর্ত্তমানে, পুত্রশোক যে কি ভীষণ তাহা অনুভব করিয়া অন্তরটা যেন পুড়িয়া যাইতেছে। এসব আমার সহ্য করিতেই হইবে, আবার সকল কর্ম্মও করিতে হইবে এত বুঝিয়াও তবু, হামরা লেড়কা, বলিয়া যে একটা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে উহাই আমায় এত যন্ত্রণা দিতেছে। মহারাজ! কাহারও কথায় সে জ্বালা যাইবার নয়, কাহাকেও বুঝাবার নয়। সে হিন্দীতে এই কথাগুলি ধীরে ধীরে এমনভাবে বলিল যে, তাহার উপর আর কাহারও কথা বলিবার প্রয়োজন হইল না।

যাহাকে সান্ত্বনা এবং পরামর্শ দিতে আসা তাহার বুদ্ধি, বিবেচনা এবং শোক সহ্য করিবার শক্তি যে পরামর্শদাতা অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে তাহা বুঝিতে আমাদের বিলম্ব হইল না। তখন ও-সকল প্রসঙ্গ ছাড়িয়া সঙ্গী-মহাশয় অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত, নীতিকথা, সাধু, অতিথিসেবায় মনের শান্তি হয় ইত্যাদি—ধনীরাম সব শুনিল, বুঝিল কিন্তু আর কিছুই বলিল না। এইরূপে প্রায় দেড় ঘণ্টা কাটাইয়া আমরা উঠিলাম।

ফিরিবার সময় আপ্যায়িত হইয়া ধনীরাম একজন লোক দ্বারা আমাদের সঙ্গে কিছু কিছু দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দিলেন। বাসায় ফিরিয়া দেখা গেল উহা কিছু কম নয় বেশ বড় একটি বোঝা। চাল, আটা, ছাতু প্রত্যেকটি পাঁচ সের করিয়া, একটি নূতন বস্ত্রে বাঁধা। মিছরির তাল কতকগুলি; আর ছিল দুইজনের জন্য বসিবার দুই ইঞ্চি পুরু ঘন লোমাচ্ছাদিত দুখানি মৃগচর্ম্ম, তাহাকে উহারা 'ব্রেড়ের খাল' বলে। ব্রেড়ের নামক একপ্রকার মৃগ ও-অঞ্চলে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, দেখিতে অনেকটা কস্তুরী মৃগের মত। ছাল বা পশুচর্ম্মকে এ-দেশের লোকে খাল বলে। এইভাবে সে ব্যক্তি আমাদের মত সাধু-সজ্জনের সম্মান রক্ষা করিল,—কিন্তু বিষয়-সম্পত্তি ব্যবস্থার কথা কিছুই হইল না।

সঙ্গী মহাশয়—এ-সকল আমাদের পথের সম্বল, বুঝলে হ্যা; ভগবান আমাদের কত রকমেই সুবিধা করেছেন, বলিয়া ছালখানির উপর বসিলেন এবং খাটিয়ার পায়া ঠেস দিয়া সশব্দে মালা নাড়িতে আরম্ভ করিলেন।

পরদিন মায়ের সঙ্গে রুমার সেই বোনঝিটি আসিয়া উপস্থিত। রূপটি বেশ, উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, লম্বা ছিপছিপে গড়ন,—বয়স প্রায় চতুর্দ্দশ হইবে। রূপার গহনার রাশি ঝুলাইয়াছে। দিলীপ প্রত্যহ একবার করিয়া আমাদের এখানে আসিত, সেদিন আর আসিল না। বৈকালে আমার সঙ্গে যখন তাহার দেখা হইল তখন সে বড়ই ব্যস্ত হইয়া সকল ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিল এবং আশাপ্রদ উত্তরের অপেক্ষায় আমার দিকে চাহিল। রুমার বংশগৌরবের যুক্তি গোপন করিয়া আমি এই কথা বলিলাম যে,—তাহার পিতামাতার যদি মত হয় তবে তাহার সম্ভবতঃ বিশেষ আপত্তি নাই। আমি আর বেশী ও-দিকে মন দিতে নারাজ,—অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম। তারপর নাথজী আসিয়া মিলিলেন, আমিও বাঁচিলাম। আমরা তখন সকলে মিলিয়া অন্যদিকে গেলাম। দিলীপ যে আমার কথায় সন্তুষ্ট হইতে পারিল না তাহা বলাই বাহুল্য।

পরদিন দিলীপ সিং রুমার ওখানে যখন আসিল তাহার বদনে একটি সলজ্জ ভাব ছিল যাহা কোনো বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। সে ছল-ছুতা করিয়া একবার জল, একবার সুপারি প্রভৃতি চাহিল, ভাবিয়াছিল রুমা তাহার লাঠির হাতে দিয়াই ও-সকল পাঠাইয়া দিবে, আর সেই অবসরে একবার তাহাকে দেখিয়া লইবে। কিন্তু রুমা লাঠিকে মোটেই আমাদের ঘরের মধ্যে আসিতে দিল না, নিজেই ও-সকল আনিল এবং তাহার সঙ্গে অন্য কথা আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পরে, তবে আজ আসি বলিয়া সে ক্ষুণ্ণমনে চলিয়া গেল। আমার মনোভাব বুঝিবার জন্য রুমা যখন আমার মুখের দিকে চাহিল তখন মনের দুঃখ গোপন করিতে অন্যদিকে চাহিলাম। তাহার একদিন পরেই উহারা চলিয়া গেল। এ-সকল ব্যাপার পণ্ডিতজীর অগোচরেই রহিল।

রুমার ভগিনীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হইল। সে সঙ্গী-মহাশয়ের দাড়ি দেখিয়া হাসিয়াই অস্থির। এদের দেশে যেখানে পুরুষেরা সবাই মাকুন্দ অর্থাৎ শ্মশ্রুগুম্ফহীন, দাড়ি এমনই একটি বিশেষ বস্তু যাহা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার হাসি দেখিয়া সঙ্গী-মহাশয় তাহাকে দেখন-হাসি নাম দিলেন। তাহার স্নেহ ও সেবাপরায়ণতার পরিচয় আমরা পরে যখন তিব্বতে কৈলাসাদি স্থানে যাই তখন পাইয়াছিলাম, সে-কথা পরে বলিব। তাহার আসল নাম রুমতি।

রুমার বাটিতে নীচে, প্রাঙ্গণের অপরপার্শ্বে দুইজন হুনিয়া বা তিব্বতী থাকিত। একটি প্রাচীন, একটি নবীন,—উহারা দুই বাপবেটায় রুমার বড়ই অনুগত ছিল। প্রবীণ হুনিয়া মহাশয়কে চারি আনা পয়সা দিয়া রুমা আমাদের মৃগচর্ম্ম দুইখানি নরম করাইয়া দিল। উহারা চামড়া নরম করিবার অর্থাৎ ট্যানিং-এর কাজ ভালই জানে। দেখিলাম জলের ছিটা দিয়া ভিজা মাটির মধ্যে চামড়া একদিন রাখিয়া পরদিন তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা একপিট চাঁছিয়া পরিষ্কার করিয়া দিল। অতি সহজ উপায়েই সে পরিপাটি কাজটি করিল, যে পদ্ধতি, বোধ হয়, আমাদের দেশে একেবারেই অজ্ঞাত।

উহাদের পিতাপুত্রের স্নেহময় ব্যবহার একটি দেখিবার এবং বুঝিবার বিষয়। সর্ব্বক্ষণই বচসা তাহাদের হইত। সোজাসুজি ধাক্কা দেওয়া, মারামারি গালাগালি লাগিয়াই ছিল। আবার কখনও কখনও রক্তা-রক্তি ব্যাপারও ঘটিত। একদিন দেখিলাম পুত্র রুধিরাক্ত বদনে একেবারে রুমার ঘরে আসিয়া লম্প-ঝম্প করিয়া বিকট-শব্দে কত কি বলিতে লাগিল। তাহার ভাষা ত আমরা বুঝি না তবে অনুমানে বুঝিলাম যে, পিতার ঘোরতর অন্যায় সম্বন্ধেই রুমার কাছে নালিশ করিল। তখন রুমা গিয়া তাহার পিতাকে বলিল যে, আমার বাড়ীতে তোমাদের মত খুনেকে রাখিতে পারিব না, তোমরা এখনই বাহির হও। আমাদের যাহা বলিল তাহার মর্ম্মার্থ এই ;—দেখেছেন কিরূপ রাক্ষস-প্রকৃতির ওরা,—বাপবেটায় ত হাতাহাতি লেগেই আছে ; এই সব লোকের সঙ্গে আমায় এখানে বারমাস বাস করতে হয়।

দুই-চারি দিন হইতে দেখিতেছি প্রত্যহ দুই-চারি জন কৈলাসযাত্রী এখানে জমা হইতেছিল। তাহার মধ্যে বদরীনারায়ণের পথে কর্ণপ্রয়াগ-বাসিনী তিনটি মাতাজী কৈলাস-যাত্রা উপলক্ষে এখানে আসিয়া এক প্রতিবেশীর গৃহে উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠা তাঁহার বয়স প্রায় ষাট বৎসর হইবে। শীতপ্রধান দেশে গায়ের মাংস শীর্ণ ও লোল হয়, তাঁহারও হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার শরীরে বল যথেষ্ট ছিল। মনে কর, তাঁহারা বদরীনারায়ণ হইতে পদব্রজে আসিয়া আবার কৈলাস যাইবার জন্য কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। মাথায় কানঢাকা টুপী, পরিধানে গৈরিক, গলায় মোটা তুলসী, এবং বড় বড়

রুদ্রাক্ষের মালা, হাতেও রুদ্রাক্ষের তাগা। আমরা সেদিন আহারাদির পর দ্বিপ্রহরে যখন বসিয়া একটু লেখাপড়ায় মন দিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, তখন জ্যেষ্ঠ মাতাজী ভিক্ষার্থে রুমার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রুমা তাঁহাকে যথাবিধি সৎকার করিল। তখন তিনি রুমাকে কি একটা কথা বলিলেন, তাহাতে সে অস্বীকার করিল, বলিল—এখন আমার বড় কাজ, আমি পারিব না, আর কাহাকেও ধর গিয়া।

তিনি ক্ষুণ্ণ মনে প্রস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাকে ডাকিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কি হইয়াছে? আমি প্রথমে তাহার কথা বুঝিতে পারি নাই, রুমা বুঝিয়াছিল, বলিল—ও বলিতেছে একটু কাপড় আছে তাহাতে একটা কোর্ত্তা বানাইয়া দিতে।

ভাবিয়া দেখিলাম যে, আমি ত বসিয়াই আছি, হাতে কোনো বিশেষ কাজ নাই, বসিয়া বসিয়া সেলাইটুকু করিয়া দিতে পারিব না? এ আর কি বড় কথা, আমি স্বীকার করিলাম। তখন রুমা অপ্রতিভ হইয়া উহা নিজেই করিতে চাহিল। তাহাকে এই বলিয়া নিরস্ত করিলাম যে, এখানে বেকার অবস্থায় এই ছোট কাজটিতে আমি যে আনন্দটুকু পাইব তাহা হইতে আমায় বঞ্চিত করিও না। তখন রুমা আর কোনও আপত্তি করিল না।

এইভাবেই আমাদের দিন কাটিতেছিল। পথের খবর আমরা প্রত্যহই পাই। শুনিলাম এবার রাস্তা খুলিবে। আশায় আশায় দিন-গুলি একে একে বেশ কাটিয়া যাইতে লাগিল।

প্রাকৃতিক দৃশ্যসম্পদ উপভোগের জন্য আঠারো দিন কতটুকুই বা সময়। গারবিয়াং-এর চারিদিকে অপরূপ দৃশ্যাবলীর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহার কোনো-না-কোনো একটিকে লইয়া আমার সারাদিনই কাটিত। সম্মুখে কালীপারে চিরতুষারমণ্ডিত পর্ব্বতশিখর, তাহার আশপাশের কতকটা লইয়া কোনোদিন থাকিতাম। দিকে দিকে কতই নির্ঝর, গতিছন্দে মুখর, তাহারই একটি লইয়াই কোনোদিন পড়িলাম, কোনোদিন দূরে গভীর নিম্নে কালীর সর্পিল গতি; ব্যাসের দেওদার জঙ্গল হইতে যেরূপ দেখা যায়, খসড়া করিয়াই একদিন কাটাইলাম। যদিও সম্বল মাত্র পেন্সিল ও কাগজ —তথাপি তাহার মধ্যে একটি সম্পূর্ণ কর্ম্মের আনন্দই পাইতাম। এইভাবে এখানে আঠারোটি দিনে আমার sketch-এর সংগ্রহ, সংখ্যায় লোকচক্ষুর

অগোচরে বাড়িয়া চলিতেছিল। সুতরাং আমার দিনগুলি এই গারবিয়াং-এ বেশ আনন্দেই কাটিতেছিল, কিন্তু আমার শ্রদ্ধেয় সঙ্গী-মহাশয়ের তাহা ছিল না,—তিনি প্রথম তিন দিন এই অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি উপভোগ করিয়াছিলেন, তারপর আর ভাল লাগিল না। সপ্তাহখানেক বাদে গারবিয়াং-এর সব কিছুই তাঁহার চক্ষুশূল হইয়া উঠিল। কত দিনে পথ খুলিবে, কবে যাওয়া যাইবে, আর এখানে বসিয়া থাকা যায় না। নিরন্তর এই ছিল তাঁহার মুখের বুলি। একদিন রূমাকে বলিয়া ফেলিলেন,—

দেখো হামারা দেবীজী! তোম বহুৎ লিখায়া পিলায়া—হামকো বহুৎ যতন কিয়া, হাম বহুৎ খুস্ হুয়া—অব হামারা ইচ্ছা আপকো ঔর তকলিফ না দে, হামারা মনমে হোতা, কালসে হাম ডাকখানেমে রহেগা, আপ ক্যা বোলো?

শুনিয়া আমার অন্তরে যাহা হইল তাহা কথায় বলিতে বাধে। রূমার মনে কি হইল তা সেই-ই বুঝিল,—প্রথমে, মুখে তাহার কোন কথাই ফুটিল না। একটু পরে সে বলিল,—কেঁও আপ য়্যায়স্যা বাৎ মুসে নিকালা, পণ্ডিত জি! আপকা ইহা ক্যা তকলিফ হুয়া? হাম বহুৎ আনন্দসে আপলোকনকো সেবা করতি হৈ। হামকো আপনা লেড়কী সমঝকে আপ ঐসি বাৎ মুসে ঔর না নিকালো মহারাজ। ভগবান কা কৃপাসে হামারা কুছ অভাব তো নহি, হামারা যো কুছ হ্যায় সব হি আপলোকনকো ওয়াস্তে।

প্রকৃত কথা কি, এখানে আমরা বাস্তবিক নিজগৃহের মতই স্বচ্ছন্দে ছিলাম। এরূপ সুবিধা যে পোষ্ট আপিসে কিছুতেই হইবে না তাহা তিনিও জানিতেন এবং তাঁহার অন্তরে যাইবার ইচ্ছাও ছিল না। তবে যে কিজন্য একথা উত্থাপন করিলেন তাহা সরল বুদ্ধিতে বুঝিবার যো নাই। তবে রূমার কথাগুলি শুনিয়া যখন তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কি বল হ্যা, অনেকদিন হয়ে গেল আর কতদিন গৃহস্থকে আশ্রয়-পীড়া দেওয়া যায়। তুমি না হয় এখানে থাক, আমি না হয় কাল হতে পোষ্ট আপিসে গিয়ে থাকি।

তখন আমি বলিলাম, এখানে আমরা প্রথম হতেই একসঙ্গেই এসে উঠেছি, তাহার পর, এখানে আমাদের সকল সুবিধাই হয়েছে, প্রায় দুই সপ্তাহ কেটে গিয়েছে, আর চার পাঁচদিনের মধ্যেই আমরা যাব, সামান্য কটা দিনের জন্য ঝঞ্ঝাটে প্রয়োজন কি? আর আপনি যাবেন,

আমি থাকব এ-কথার অর্থ কি বুঝতে পারলাম না তো? যখন দুইজনে একত্রে এসেছি এবং বরাবর একত্রেই রয়েছি তখন যেতে হলে দুই-জনকেই ত যেতে হবে, আপনি যাবেন আমি থাকব, কেন? আমরা যাতে অন্যত্র না যাই, এখানেই থাকি, তার জন্য ও এত যত্ন করছে, আর সাধুসন্ন্যাসী, তীর্থযাত্রী, অতিথি প্রতিপালনই তো ওর কাজ। এতদিন কাটাবার পর এখন ওর মনে কষ্ট দিয়ে চলে গেলে ওর যে কি সুবিধা করবেন তা তো বুঝতে পারলাম না।

তখন তিনি বলিলেন—মিছে আর অত অব্‌লিগেশনে যাবার প্রয়োজন কি?

আমি বলিলাম,—দুই সপ্তাহ থেকে, তার অন্ন খেয়ে, সর্ব্ববিষয়ে তার সাহায্য ও সেবা নিয়ে উপস্থিত যে ওবলিগেশনটি দাঁড়িয়েছে তার কি হবে?

তিনি বচনে নিরস্ত হইলেন না, বলিলেন,—তবুও আর রেকারিং বাড়াবার প্রয়োজন কি? বলিয়া তিনি উপরে চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলে পর রুমা আঙ্গুল গুণিতে গুণিতে,—এক দুই করিয়া তাহার ভাষায় বলিতে লাগিল,—বুধবার এপা, বৃহস্পতিবার-তিগর শুক্র নিশে, শনি সুম্, রবি পি, সোম ঙুই, মঙ্গল টুকু, দুন্, যেদে, গুই, চি,—ইত্যাদি এই তো মোট চৌদ্দ দিন হুয়া,—কাহে ব্যস্তে আপনে ইহাসে যানেকো বাৎ বোলতে পিতাজী,—

আমি তাহাকে বলিলাম—হাম পণ্ডিতজীকো বাৎ কুছ সমঝা নহি,—দেবীজী!

আমাদের যাত্রার দিন এইবার নিকটে আসিয়াছে। একদিন খবর পাওয়া গেল রাস্তা খুলিয়াছে। ক্রমেই আমরা দেখিলাম চৌদাস, বুদি প্রভৃতি স্থানের মহাজনেরা মাল লইয়া গারবিয়াং অতিক্রম করিয়া গেল। শুনিলাম, তাহার মাকে সঙ্গে লইয়া লাল সিং পাতিয়ালও শীঘ্রই আসিতেছে, তাহার মাল আসিয়া পড়িয়াছে। এমনই সময় শ্রাবণের মাঝামাঝি ডুডুং উৎসব পড়িয়া গেল। সকলকারই অনুরোধ যে, এখানকার ডুডুং না দেখিয়া আমরা যেন যাত্রা না করি। আমরা ডুডুং দেখিতে রহিলাম। সেইদিন হইতে ঢাকের আওয়াজে জানাইয়া দিল যে, গারবিয়াং-এ ডুডুং সুরু হইয়া গিয়াছে। তিনটি দিনের উৎসব। আমাদের দেশে চড়কের মত ঢাকের বাদ্য অবিরাম চলিতেছে। ব্যাপারটি বলিতেছি—

এই উৎসবটি বৎসরের মধ্যে একবার শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষে ও দ্বিতীয়বার অগ্রহায়ণের কৃষ্ণপক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ইহা উৎসব বটে, কিন্তু আসলে এটি আগুশ্রাদ্ধেরই ব্যাপার। কার্ত্তিক হইতে আষাঢ়ের মধ্যে যাঁহারা দেহত্যাগ করেন, এই শ্রাবণে তাঁহাদের জন্য এই প্রেততর্পণ বা প্রেতকার্য্যের অনুষ্ঠান এবং যাঁহারা শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিকের মধ্যে স্বর্গে যান তাঁহাদের জন্য অগ্রহায়ণ মাসে এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান; অগ্রহায়ণে ইহারা সব ধারচুলায় নামিয়া যায়, সুতরাং উৎসবটি তখন সেইখানেই সম্পন্ন হয়।

ইহারা মৃত ব্যক্তির আবির্ভাব মানে, তবে সেই আবির্ভাবের আধারটি অদ্ভুত রকমের। সেটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট, সজ্জিত এবং অলঙ্কৃত একটি মেষ। মৃত ব্যক্তি স্ত্রীপুরুষভেদে মেষেরও লিঙ্গভেদ হইয়া থাকে। মানুষে যে সকল মূল্যবান বস্ত্র অলঙ্কার ব্যবহার করে, যেমন বেনারসী সাড়ী বা ধুতি রেশমের নানাবিধ বিচিত্র বস্ত্রাদি, শাল জোড়া, ক্রিয়াকর্ম্মে ব্যবহার করে যাহার যতটা সংগ্রহ আছে সমস্তই নির্ব্বাচিত মেষটির পেট ও পিঠ বেড় দিয়া পরিপাটিরূপে গুছাইয়া বাঁধিয়া দেয়। তাহার মুণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া পুচ্ছ পর্য্যন্ত বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করা হয়;—তাহার মধ্যেই ইহারা মৃতব্যক্তির আবির্ভাব মানে।

যে যে বাড়ীতে শ্রাদ্ধ সেই সকল গৃহে ঢাকঢোলের সঙ্গে ঘটা করিয়া সেই মেষবরকে লইয়া যাওয়া যায়। তাহাকে স্ত্রীলোকেরা অভ্যর্থনা করিয়া একটি সুসজ্জিত মণ্ডপের ধারে লইয়া যায়। সেই মণ্ডপের উপরে বহুতর দ্রব্য-সামগ্রী স্তরে স্তরে সাজানো আছে। পিতলের পানপাত্রে প্রথম স্তরে মদ্য, তাহার উপর শুষ্ক ফলাদি, চাল, ডাল, আটা, ঘি প্রভৃতি, তাহার উপরের স্তরে জামাকাপড়, জুতা, উত্তম পশম ও রেশমের প্রাচীন বস্ত্রাদি সজ্জিত আছে। তাহার ধারেই নীচের জমিতে হুঁকা গুড়গুড়ি, পিতলের নানাপ্রকার কারুকীর্ত্তি, তৈজসপত্র, আবার সতরঞ্চ, কার্পেট, দীপাধার প্রভৃতি যাহার যাহা কিছু সংগ্রহ সযত্নে চমৎকার সাজানো আছে।

সেই অলঙ্কৃত মেষবরকে আনা হইলে শোকে মুহ্যমানা পুরাঙ্গনাগণ তাহাকে মাল্যে ভূষিত করে। মদ হইতে আরম্ভ করিয়া নানাবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন, ভোটিয়া সমাজের যাহা-কিছু উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য, নৈবেদ্য, মৃতব্যক্তির নাম করিয়া তাহাকে খাওয়ায়, অথবা মুখে গুঁজিয়া দেয়। এইরূপে প্রত্যেক শ্রাদ্ধবাড়ীর মেষটি প্রত্যেক শ্রাদ্ধবাড়ীতে নিমন্ত্রণ খায়।

ডুডুং-এর মেষবর
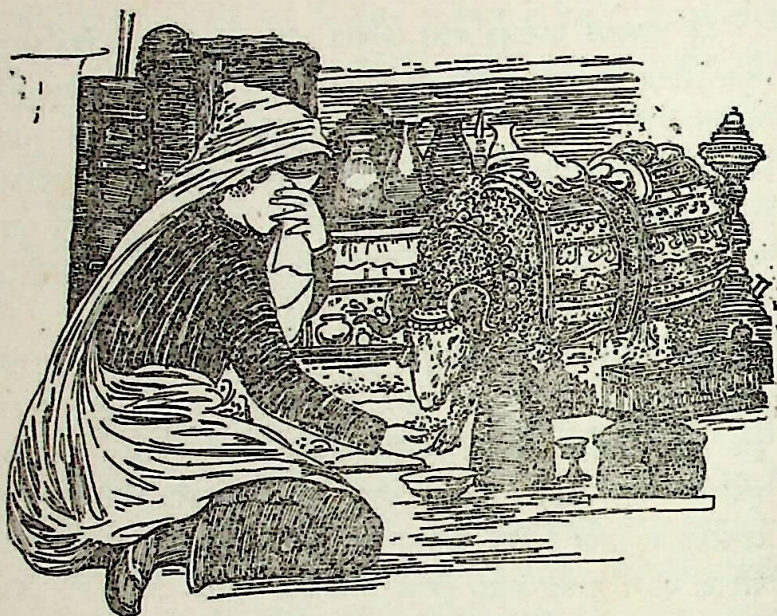
পরে বৈকালে, তাহার সমস্ত অলঙ্কার বস্ত্রাদি খুলিয়া, হিন্দুদের যেমন ষাঁড় দাগিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, এই ভেড়াকেও সেইরূপ লাল রং মাখাইয়া নিভৃতে নদীপারে ছাড়িয়া দেওয়াই নিয়ম। তাহার পর অর্থাৎ ছাড়িয়া দিবার পর তাহার যে অবস্থা হয়, তাহা শ্রাদ্ধবাড়ীর লোকের কানে শুনিতে নাই। যদি শুনিতে থাকিত তাহা হইলে,—একদল লোক মেষটিকে সযত্নে ঘরে লইয়া, কাটিয়া কুটিয়া তরকারি বানাইয়া খাইয়াছে, এই কথাই শুনিতে হইত। দ্বিপ্রহরে আমরা নিকটবর্তী দুই-একটি বাড়ীতে সেই সজ্জিত মেষের আদর অভ্যর্থনা এবং ভোজনের পালা দেখিলাম।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে রুমা আর একটি বাড়ীতে লইয়া গেল। প্রত্যেক বাড়ীই দ্বিতল, উপরে উঠিবার সিঁড়িটি সংকীর্ণ এবং বিশৃঙ্খল। উপরে একটি ঘরে বৃষকাষ্ঠের মত মূর্ত্তিকে স্ত্রীলোকের ন্যায় বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিয়া একদিকের দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখা হইয়াছে, গৃহমধ্যে একটি অগ্নিকুণ্ড, তাহাতে গম পুড়িতেছে। আর গৃহস্বামী বিমর্ষভাবে শোকাকুলিতচিত্তে একটি বালিশে ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন। চারিদিকের দেওয়ালে বাসন-কোসন, নানাপ্রকার পার্ব্বত্য বিলাসদ্রব্য সাজানো আছে। ঘরের মধ্যে কলসে মদ, উৎকট গন্ধে বেশীক্ষণ থাকা যায় না। যে যাইতেছে জলযোগের

মত এক পাত্র না টানিয়া ছাড়িতেছে না। সেখান হইতে আমরা আর এক বাড়ী গেলাম। সেখানে এক পুরুষমূর্ত্তিকে শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি যুদ্ধের পোষাকে সাজাইয়া রাখিয়াছে। বাকি সব সজ্জা একই ভাবের।

ইহার পর আবার শোভাযাত্রা ছিল। সন্ধ্যার সময় প্রথমে ঢাকের আওয়াজে আমরা এবং ওখানকার পাড়াপ্রতিবেশী অনেকেই, রাস্তার বামে একখানি একতল গৃহের ছাদের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং দেখিতে লাগিলাম। শোভাযাত্রার দলে আগাগোড়া সকলেরই পায়ে জুতা, তাহারই উপর চুড়িদার পাজামা তাহার উপর পশমী বাগুয়া বা সাদা শালের চাপকান, কোমরে চাদর জড়ানো, মাথায় পাগড়ী—সকলই সাদা। প্রথমেই প্রকাণ্ড জয়ঢাক বাজাইতে বাজাইতে দুইজন আসিতেছে, তারপর দুইজন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড করতাল, বিকৃত ভঙ্গীতে অঙ্গচালনা করিয়া বাজাইতে বাজাইতে চলিতেছে। তাহাদের পিছনে একহাতে ঢাল অপর হাতে তলওয়ার দশ-বারো জন পার্ব্বত্য ভোটিয়া বীর বাদ্যের তালে নৃত্য করিতে করিতে আসিতেছে। প্রত্যেকে একই ভাবে একই ভঙ্গীতে একই তালে অঙ্গচালনা করিতেছে। তাহাদের মধ্যে দিলীপকে দেখিলাম। তাহার পর আরও কতকগুলি বালকবীর, তাহারাও মদমত্ত অবস্থায় অগ্রগামী বীরগণের অনুকরণে নাচিতেছে। এইরূপে প্রত্যেক শ্রাদ্ধবাড়ীর অঙ্গনে একবার করিয়া সমবেত হইয়া নৃত্যে কিছুকাল কাটাইয়া যাওয়াই নিয়ম। শেষে ক্লান্ত-শরীরে যে যেখানে পায় পড়িয়া রাত্রিটুকু কাটাইয়া দেয়। শেষের দিন একটু বিশেষ ব্যাপার।

সেদিনও গোধূলি-লগ্নে উদ্দাম গীতবাদ্যাদি সংযোগে পানাবেশে বিভোর, সারি সারি ভোটিয়া বীরবৃন্দ নৃত্যে উন্মত্ত হইয়া সকলে প্রধান রাস্তা দিয়া গ্রামের প্রান্তে একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণে সমবেত হইলেন। মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঠের গুঁড়ি ধূ ধূ জ্বলিতেছে, লক্ লক্ শিখাগুলি নাচিতে নাচিতে কখনও ঊর্দ্ধে, কখনও বামে, বায়ুচালিত হইয়া কখনও বা দক্ষিণে প্রসারিত। বীরগণও সেই প্রজ্বলিত হুতাশনের চারিদিক বেড়িয়া নাচিতে নাচিতে পরে একধার হইতে আরম্ভ করিয়া অর্দ্ধ বৃত্তাকারে দাঁড়াইলেন, তখন অপর দিক হইতে চিড়কাঠের মশালধারিণী শ্রেণীবদ্ধ নারীগণ আসিয়া সেই অগ্নি বেষ্টনপূর্ব্বক নাচিতে লাগিলেন। পরে হস্তস্থিত সেই মশাল-গুলি অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া, আহুতি শেষ করিয়া যে যার ঘরে ফিরিয়া

ডডং-এর শেষ
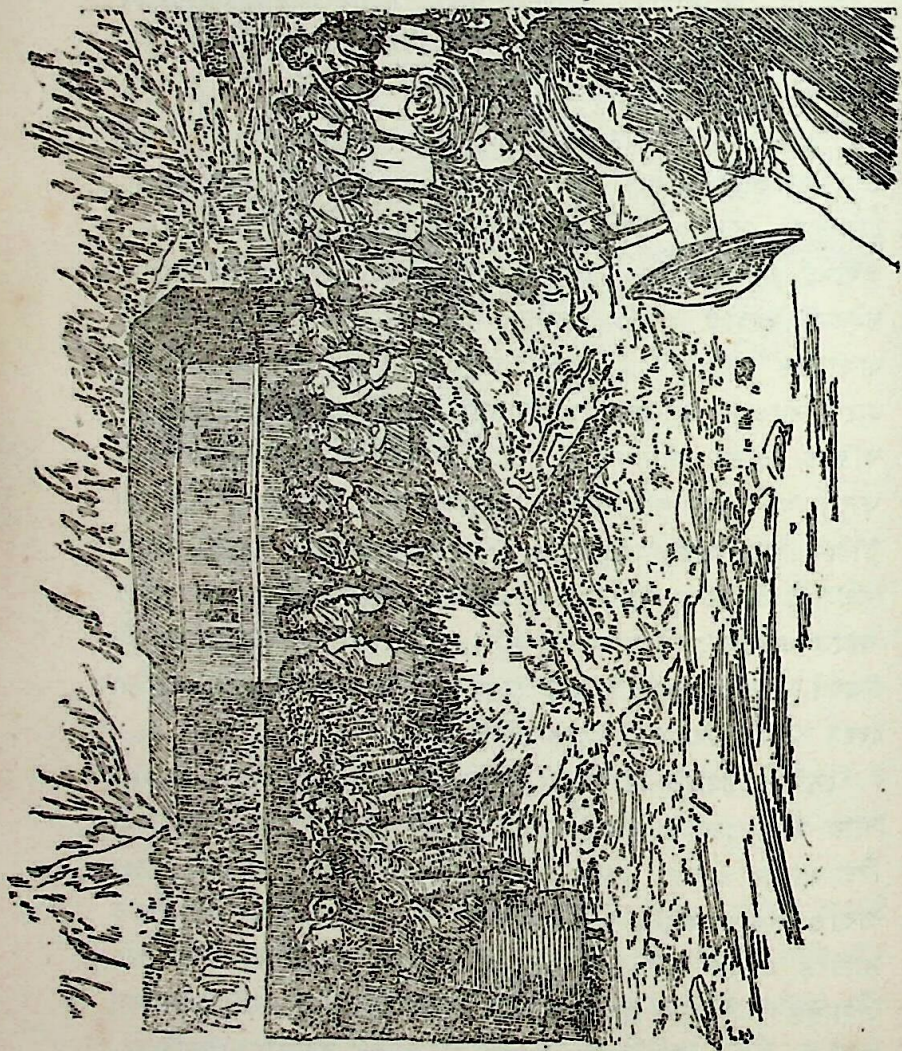
গেলেন। ডুডুং শেষ হইলে ঢাকের বাগু থামিল। এ অঞ্চলে যতগুলি গ্রাম আছে সব গ্রামেই পর্য্যায়ক্রমে এই ভাবে ডুডুং পর্ব্ব সম্পন্ন হয়। শ্রাদ্ধোৎসব যে রাত্রে শেষ হইল তাহার পরদিন গ্রামের রাস্তায় কাহাকেও আর দেখিতে পাওয়া গেল না, গ্রামখানি যেন অসাড়, নিস্পন্দ।

পরদিন বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া দেখি দিলীপের মধ্যম ভ্রাতা একটি সুন্দর পাহাড়ী টাটুর উপরে চড়িয়া কালাপানির দিকে চলিয়াছে। দেখা হইলে নমস্কার করিয়া বলিল,—রাস্তা খুলিয়াছে, আমরা আগে চলিলাম, আপনারা তুই-তিন দিন পর যাত্রা করিবেন।

এইবার মহানন্দে তৎপর হইয়া যাত্রার আয়োজনে লাগিয়া গেলাম। সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন, এবার লিপুপাক পাস অতিক্রম করিতে হইবে, তুইজনের জন্ত তুইটি ঘোড়া লওয়া যাক, আর মালপত্রের জন্ত একটা ঝাব্বু হইলেই চলিবে। আমি বলিলাম নাথজী, লালগীর, কুমায়ু'র চারিজন সাধু এমন কি কর্ণপ্রয়াগবাসিনী মাতাজী কয়জন বৃদ্ধা যখন হাঁটিয়া যাইবেন, আমি কেন ঘোড়ায় যাইব? কেবল একটা ঘোড়া আপনার জন্ত লইলেই হইবে।

এই রাজ্যে মহিষের ন্তায় ভারবাহী কঠিন পার্ব্বত্য পথের সম্বল এক-প্রকার জীব আছে। তাহাদের দ্বারা তুই-আড়াই এমন কি তিন মণ বোঝা সহজে একস্থান হইতে অন্ত স্থানে চালান যায়। পাহাড়ী গাভীমাতা এবং তিব্বতের চমরী-পিতার সংযোগেই এই ঝাব্বুর জন্ম। ইহাকে চাঁওর কি চেলাও বলে। গারবিয়াংবাসিগণের প্রত্যেকেরই তুই-তিনটি করিয়া ঝাব্বু, ঘোড়া, গরু, দশ-বিশটা ভেড়বকরী, তুই-একটি কুকুর আছে। কুকুর ছাড়া অন্ত পশুপালনে ইহাদের কোনও খরচ নাই। সারা বছর তাহারা কালীপারের জঙ্গলেই চরিয়া খায়। তিব্বতেও দেখিয়াছি পশুপালনে কোনও খরচ নাই। কুকুরের খাওয়াটা প্রত্যেক সংসারের ভুক্তাবশিষ্ট যাহা কিছু তাহাতেই হইয়া যায়।

এখান হইতে কালাপানি হইয়া তাকলার যাইতে প্রত্যেক ঘোড়া ও ঝাব্বুর জন্ত তুই টাকা ভাড়া লাগে। আমি ইতিমধ্যে কলিকাতা হইতে আরও কিছু টাকা আনাইয়া লইয়াছিলাম।

কালই আমাদের যাত্রা।

মায়াবতী হইতে তুই-চারজন স্বামীজী কৈলাস যাইবার অভিপ্রায়

প্রকাশ করিয়া রুমাকে লিখিয়াছিলেন। শেষে তাঁহাদের আসা হইল না, সেজন্য রুমা দুঃখিত হইল। তাহার বড় ইচ্ছা ছিল যে আমরা সকলে মিলিয়াই একসঙ্গে তিব্বতের তীর্থগুলি ভ্রমণ করিয়া আসিব, যেহেতু আমরাও বাঙ্গালী, দুইদলে মিলনের আনন্দটি রুমাও উপভোগ করিবে ;—কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। শেষ অবধি তাঁহারা যাত্রা সম্বন্ধে আর কোনও সংবাদই দিলেন না।

পরদিন যখন আমরা যাত্রা করি, রুমাদেবী বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, লালসিং পাতিয়াল ও তাহার মা শীঘ্রই এখানে আসিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গে রুমা এবং অন্য দুই ভগিনী যতদিন তাকলাখারে না পৌছান, ততদিন যেন আমরা কৈলাসের পথে যাত্রা না করি। কারণ তিব্বতীয় তীর্থের পথসকল বিপদসঙ্কুল; আমাদের মত লোকের একলা যাইবার নয়। তখন এ কথাটার মর্ম্ম ভাল বুঝিতে পারি নাই, শেষে ভালরূপই বুঝিয়াছিলাম।

রুমার ঘর হইতে যখন আমরা যাত্রা করিয়া বাহির হইলাম তখন অনেকগুলি ভোটিয়া প্রতিবেশিনী আমাদের বিদায় দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে—বালিকা, কিশোরী, যুবতী এবং পৌঢ়া প্রায় সব রকম বয়সের নারীই ছিলেন। তাঁহাদের নামগুলি আমি পাঠকের গোচর করিতেছি, বিরক্তিকর হইলে পরিত্যাগ করিবেন। নামগুলি এইরূপ, যথা—

গোবিন্দি, জসলী, নন্দা, নন্দী, যমুনা, গঙ্গা, রাঙ্গা, কাঙ্গা, লাঠি, সিনলাঠি, লালী, নাকো, সিনো, সেসিনো, রদিমা, পদিমা, রুকমা, রুকলী, নিক্কী ইত্যাদি।

গারবিয়াং-এ প্রায় আঠারো দিন থাকিয়া সেদিন যখন তিব্বতে যাইবার আনন্দে সঙ্গী-মহাশয় শুভযাত্রার মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অগ্রে নাথজী ও আমি পশ্চাতে, গিয়া কালাপানির রাস্তায় পড়িলাম, তখন তিনি একটা উঁচু ঢিপির উপর উঠিয়া অতি সাবধানে ঘোড়ার পিঠে বসিলেন, তারপর মৃদুহাস্যে বলিলেন, বুঝলে হ্যা, এখান থেকে যাত্রাই আমাদের ঠিক কৈলাসযাত্রা।

॥ ৯ ॥

কালাপানি,—লিপুধুরা

কালীগঙ্গার তীরে তীরে বরাবর পথটি। কয়েকটি প্রবলগতি গিরিনদী অতিক্রম করিয়া আমরা সেদিন দ্বিতীয় প্রহরের শেষ নাগাদ কালাপানিকা জঙ্গলের মধ্যভাগে পৌছাইলাম। এই পথের একটু বিশেষত্ব আছে। মধ্যে মধ্যে জঙ্গলের ভিতর দিয়াই পথ, কিন্তু সে জঙ্গল তত ঘন নহে। ছোট ছোট গাছ তাহার মধ্যে বনগোলাপের জঙ্গলই বেশী। এমনই সুন্দর গাছগুলি, কণ্টকশূন্য শাখা-প্রশাখা লইয়া তাহার গড়ন এতই বাঁকাচোরা যে সহজে গোলাপ গাছ বলিয়া ধরিবার উপায় নাই। পাতায় পাতায় ভরা নানা জাতীয় পাহাড়ী ছোট ছোট গাছ, খণ্ড খণ্ড প্রস্তরশরীর হইতে বাহির হইয়া বহুদুর প্রসারিত হইয়া আছে। ক্রমশঃ যতই কালাপানির নিকট যাইতে লাগিলাম ততই গাছপালা কমিয়া যাইতে লাগিল। তাহার পরিবর্ত্তে দেখি বিচিত্র আকৃতির, গভীর রেখাঙ্কিত, নানা বর্ণের, অতি রুক্ষ, তৃণগুল্ম-বর্জ্জিত বিরাট গিরিমূর্ত্তি। উহাকে ইংরাজীতে ক্যানিয়ন বলে, বাঙ্গালায় কি নাম তাহা জানি না। পর্ব্বত ত নানা-প্রকারেরই আছে, কিন্তু বাঙ্গালায় সকলের নাম আসে না। যাহার কথা বলিতেছি, জীর্ণ কঙ্কালসার তাহার শরীর, সাধারণ পর্ব্বতের আকৃতি নহে। দূর হইতে দেখিলে উহাকে কোন মন্দির বা প্রাসাদের অংশ-বিশেষ বলিয়া ভ্রম হয়। উহা মায়াময়, এবং অপূর্ব্ব চিত্তাকর্ষক; দৃষ্টিমাত্রেই মনকে বিস্ময়ে অবাক করিয়া দেয়। হিমালয়ের এই অংশেই ঐ সকল বিচিত্র পর্ব্বত দেখা যায়।

কালাপানির পান্থশালায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে দুইটি প্রবল ধারার সঙ্গম, তাহার উপর একটি সেতু। সেই সেতুর নিকটে, পথের দিকে কয়েকটি ঐরূপ বিচিত্র পাহাড়ের সারি। পথের ধারেই, সুতরাং বেশ সুন্দর দেখা যায়। পাদদেশে সামান্য দুই চারিটি লতাগুল্মের ঝোপ,

প্রকাশ করিয়া রুমাকে লিখিয়াছিলেন। শেষে তাঁহাদের আসা হইল না, সেজন্য রুমা দুঃখিত হইল। তাহার বড় ইচ্ছা ছিল যে আমরা সকলে মিলিয়াই একসঙ্গে তিব্বতের তীর্থগুলি ভ্রমণ করিয়া আসিব, যেহেতু আমরাও বাঙ্গালী, দুইদলে মিলনের আনন্দটি রুমাও উপভোগ করিবে ;—কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। শেষ অবধি তাঁহারা যাত্রা সম্বন্ধে আর কোনও সংবাদই দিলেন না।

পরদিন যখন আমরা যাত্রা করি, রুমাদেবী বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, লালসিং পাতিয়াল ও তাহার মা শীঘ্রই এখানে আসিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গে রুমা এবং অন্য দুই ভগিনী যতদিন তাকলাখারে না পৌছান, ততদিন যেন আমরা কৈলাসের পথে যাত্রা না করি। কারণ তিব্বতীয় তীর্থের পথসকল বিপদসঙ্কুল ; আমাদের মত লোকের একলা যাইবার নয়। তখন এ কথাটার মর্ম্ম ভাল বুঝিতে পারি নাই, শেষে ভালরূপই বুঝিয়াছিলাম।

রুমার ঘর হইতে যখন আমরা যাত্রা করিয়া বাহির হইলাম তখন অনেকগুলি ভোটিয়া প্রতিবেশিনী আমাদের বিদায় দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে—বালিকা, কিশোরী, যুবতী এবং পৌঢ়া প্রায় সব রকম বয়সের নারীই ছিলেন। তাঁহাদের নামগুলি আমি পাঠকের গোচর করিতেছি, বিরক্তিকর হইলে পরিত্যাগ করিবেন। নামগুলি এইরূপ, যথা—

গোবিন্দি, জসলী, নন্দা, নন্দী, যমুনা, গঙ্গা, রাঙ্গা, কাঙ্গা, লাঠি, সিনলাঠি, লালী, নাকো, সিনো, সেসিনো, রদিমা, পদিমা, রুকমা, রুকলী, নিক্কী ইত্যাদি।

গারবিয়াং-এ প্রায় আঠারো দিন থাকিয়া সেদিন যখন তিব্বতে যাইবার আনন্দে সঙ্গী-মহাশয় শুভযাত্রার মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অগ্রে নাথজী ও আমি পশ্চাতে, গিয়া কালাপানির রাস্তায় পড়িলাম, তখন তিনি একটা উঁচু টিপির উপর উঠিয়া অতি সাবধানে ঘোড়ার পিঠে বসিলেন, তারপর মৃদুহাস্যে বলিলেন, বুঝলে হ্যা, এখান থেকে যাত্রাই আমাদের ঠিক কৈলাসযাত্রা।

॥ ৯ ॥

কালাপানি,—লিপুধুরা

কালীগঙ্গার তীরে তীরে বরাবর পথটি। কয়েকটি প্রবলগতি গিরিনদী অতিক্রম করিয়া আমরা সেদিন দ্বিতীয় প্রহরের শেষ নাগাদ কালাপানিকা জঙ্গলের মধ্যভাগে পৌঁছাইলাম। এই পথের একটু বিশেষত্ব আছে। মধ্যে মধ্যে জঙ্গলের ভিতর দিয়াই পথ, কিন্তু সে জঙ্গল তত ঘন নহে। ছোট ছোট গাছ তাহার মধ্যে বনগোলাপের জঙ্গলই বেশী। এমনই সুন্দর গাছগুলি, কণ্টকশূন্য শাখা-প্রশাখা লইয়া তাহার গড়ন এতই বাঁকাচোরা যে সহজে গোলাপ গাছ বলিয়া ধরিবার উপায় নাই। পাতায় পাতায় ভরা নানা জাতীয় পাহাড়ী ছোট ছোট গাছ, খণ্ড খণ্ড প্রস্তরশরীর হইতে বাহির হইয়া বহুদুর প্রসারিত হইয়া আছে। ক্রমশঃ যতই কালাপানির নিকট যাইতে লাগিলাম ততই গাছপালা কমিয়া যাইতে লাগিল। তাহার পরিবর্ত্তে দেখি বিচিত্র আকৃতির, গভীর রেখাঙ্কিত, নানা বর্ণের, অতি রুক্ষ, তৃণগুল্ম-বর্জ্জিত বিরাট গিরিমূর্ত্তি। উহাকে ইংরাজীতে ক্যানিয়ন বলে, বাঙ্গালায় কি নাম তাহা জানি না। পর্ব্বত ত নানা-প্রকারেরই আছে, কিন্তু বাঙ্গালায় সকলের নাম আসে না। যাহার কথা বলিতেছি, জীর্ণ কঙ্কালসার তাহার শরীর, সাধারণ পর্ব্বতের আকৃতি নহে। দূর হইতে দেখিলে উহাকে কোন মন্দির বা প্রাসাদের অংশ-বিশেষ বলিয়া ভ্রম হয়। উহা মায়াময়, এবং অপূর্ব্ব চিত্তাকর্ষক; দৃষ্টিমাত্রেই মনকে বিস্ময়ে অবাক করিয়া দেয়। হিমালয়ের এই অংশেই ঐ সকল বিচিত্র পর্ব্বত দেখা যায়।

কালাপানির পান্থশালায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে দুইটি প্রবল ধারার সঙ্গম, তাহার উপর একটি সেতু। সেই সেতুর নিকটে, পথের দিকে কয়েকটি ঐরূপ বিচিত্র পাহাড়ের সারি। পথের ধারেই, সুতরাং বেশ সুন্দর দেখা যায়। পাদদেশে সামান্য দুই চারিটি লতাগুল্মের ঝোপ,

উপর দিকে চাহিলে উলঙ্গ, জীর্ণ, লোহিত, পিঙ্গল পাষাণের মায়াস্তূপ; বিচিত্র গভীর রেখায় বহুধা বিভক্ত অসংখ্য গঠন, যেন স্থাপত্য অলঙ্কারের আভাস;—পুরীতে পুরুষোত্তম মন্দিরের জগমোহন বা নাটমন্দিরের মতই দূর হইতে বোধ হইতেছে। দেখিলেই মনে হয় যেন পাষাণনির্মিত একটি বিশাল পুরাতন দেউলের ধ্বংসাবশেষ, যাহার মধ্যে এখনও যেন কোন বিগ্রহ বর্ত্তমান।

আসলে শীতের সময়ে বরফ জমিয়া পর্ব্বতশরীর বহুকাল ঢাকাই থাকে, তাহাতেই পাষাণ জীর্ণ হইয়া যায়। তাহার পর ক্রমে যখন ঘনীভূত তুষার গলিতে আরম্ভ হয় অতি শীতল সেই বারিস্রোত ক্রমাগত নানা পথে, বিভিন্ন গতিতে নামিতে থাকে—তাহাতেই ঐরূপ বিচিত্র গভীর রেখার সৃষ্টি হয়। তাহার উপর বজ্র আছে। মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রদেবতা তাঁহার বিখ্যাত অস্ত্রটির আঘাতে পর্ব্বত-শীর্ষ চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া নানা আকারে গড়িয়া নরলোকের বিস্ময় সৃষ্টি করেন।

দেখিলাম তাক্‌লাখার যাত্রী মহাজনদের দুই-তিনটি তাঁবু পড়িয়াছে। সাধারণের জন্য এখানে কাদামাটি, নোড়ানুড়ি ও পাথরে গাঁথা দেওয়াল, উপরে উপরে কোনোটির আচ্ছাদন আছে, কোনোটির নাই, এইরূপ আট-দশখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কপাট ও গবাক্ষশূন্য ঘর, ভিতরে অন্ধকার। এগুলিই কালাপানির পান্থশালা। ভেড়াবকরী আটকাইবার খোঁয়াড়ও সেই সঙ্গে কয়েকটি আছে।

ব্যবসায়িগণের মধ্যে যাহাদের অবস্থা তত ভাল নয়, তাহারাই কোনরূপে রাত্রিটা ইহার মধ্যে কাটায়;—আর অবস্থাপন্ন বণিক যাহারা, তাহারা সঙ্গে তাঁবু রাখে। মালপত্র রাখার ব্যবস্থাও তাহাদের আলাদা, শয়নের ত কথাই নাই। গারবিয়াং-এ রূমার এক দূরসম্পর্কের জ্যাঠা, এখানে গোবরিয়া পণ্ডিত নামেই বিখ্যাত, সেই ব্যক্তির ভূ-সম্পত্তি অনেক। আবার এখানেও তাঁর একখানি প্রশস্ত মকান আছে, সেটি কালী নদীর ওপারে। আমরা যখন গারবিয়াং-এ ছিলাম, সেই সময়েই নেপাল হইতে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ আসে, তিনি সেখানেই বিবাহ করিয়া সংসার পাতিয়াছিলেন। যাহা হউক, এখানে তাঁহার মকানখানি অনেকটা ধর্ম্মশালায় দাঁড়াইয়াছে;—তাঁহার স্বজাতি মহাজনগণ তিব্বতে যাইতে ও ফিরিয়া আসিতে সেইখানেই রাত্রি-যাপন করেন।
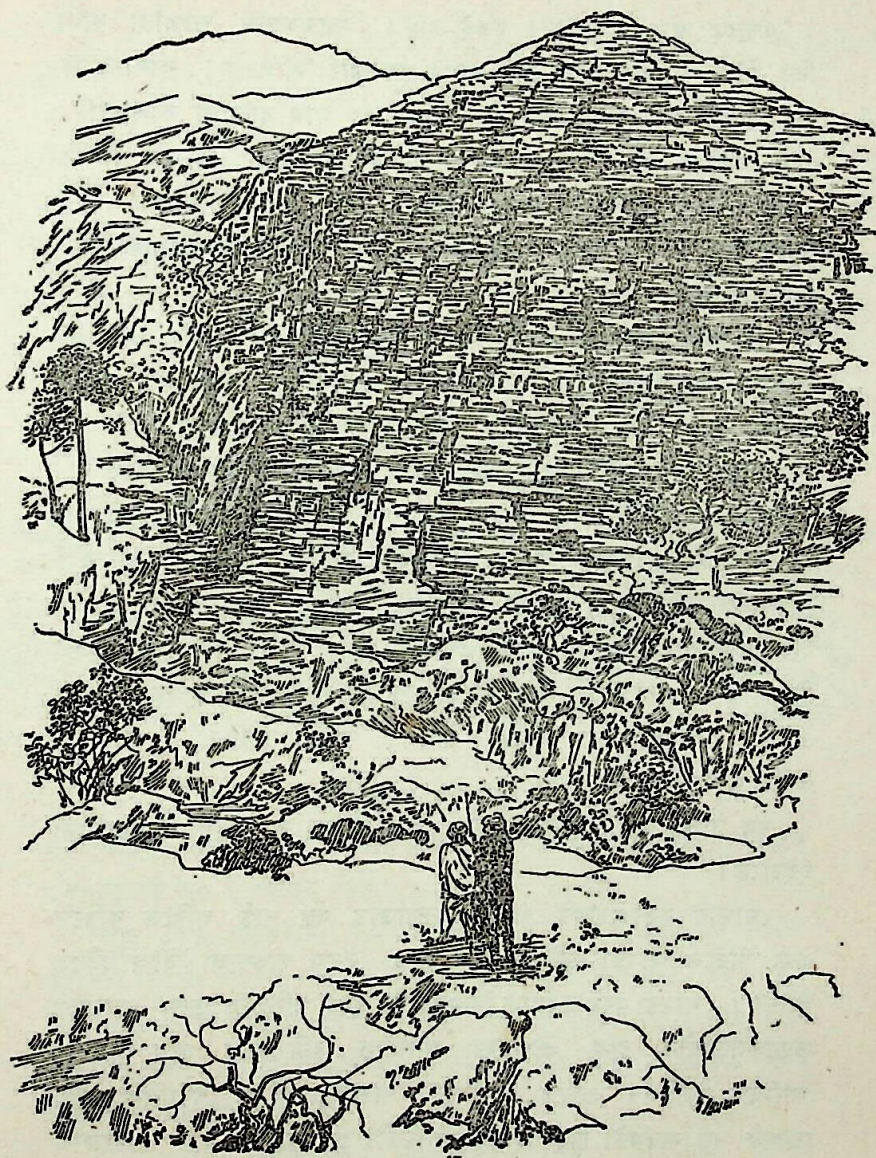
কালাপানির পথে

এখানে আর গাছপালার দৃশ্যই নাই। অনেকগুলি জলধারা নানা দিক হইতে নামিয়া কালাপানি নামক মূলধারায় মিলিয়াছে। কালাপানির জল ময়লা, যেন কয়লাধোয়া জল, সেই জন্য নাম হইয়াছে কালাপানি। সেটি আসলে এই কালী বা সারদারই মূল ধারাটি। আমার বিশ্বাস এখানে কয়লা আছে। ভূতত্ত্ববিদেরাই ঠিক বলিতে পারিবেন এত উঁচুতে কয়লার খনি থাকা সম্ভব কি না; আমি নদীতটে কয়লার অংশ দেখিয়াছিলাম।

এখানকার বিজনতা একটি বিশেষ অনুভবের বস্তু। মনে কর, এই অন্ধকূপের মত পান্থশালা; তিব্বতে যাইতে ও আসিতে মাত্র এক রাত্রের আড্ডা, বহুদূর পর্য্যন্ত লোকালয় নাই। এমন স্থানের শূন্যভাবটি কেমন? বড় গাছপালাও নাই, ছোট ছোট ঝুপি জঙ্গল, যাহা নজরেই পড়ে না। সুতরাং একলা যদি কেহ এখানে আসিয়া দাঁড়ায়, দিনমান হইলেও তাহার প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। চারিদিকে বিশাল অভ্রভেদী নগ্ন জীর্ণ বিবর্ণ পর্ব্বতশ্রেণী মাথা তুলিয়া রহিয়াছে এ যেন পৃথক একটি জগৎ। যাহা হউক,—আমরা তিনজন একখানি ঘরে আশ্রয় লইলাম, নাথজী টিকরা রুটি পাকাইলেন, ভোজনান্তে সুনিদ্রায় রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন প্রভাতে লিপুধুরার পথে যাত্রা করিলাম। পর্ব্বতের শীর্ষদেশ বা চূড়াকেই এখানে ধুরা বলিয়া থাকে।

খুব ঠাণ্ডা ছিল। যাহার যাহা কিছু শীতবস্ত্র সঙ্গে ছিল গায়ে চড়ানো হইয়াছে।

ঘোড়ায় সঙ্গী-মহাশয় আগে, শুভযাত্রার মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে এবং পিছনে আমরা গুটিগুটি চলিলাম। ক্রমে গাছপালা বিরল হইতে লাগিল। আমরা যখন ক্রমোচ্চ গিরিসঙ্কটের পথে পড়িলাম তখন একেবারে তৃণবৃক্ষলতাহীন, রুক্ষ, প্রস্তরময় অসমতল ভূমি স্তরে স্তরে দৃষ্টিপথে আসিতে লাগিল। প্রথমে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে শিবালিক শ্রেণী, তাহার পর কতকটা নিম্ন হিমালয়ের দ্বিতীয় স্তর যাহার মধ্যে আসকোট, বালুয়াকোট, ধারচুলা, খেলা প্রভৃতি ভোটিয়া পরগণার কতকাংশ অতিক্রম করিয়াছি, তাহার পর হিমালয়ের উচ্চতর স্তর। এই তৃতীয় স্তরে হিমালয়ের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যায়, গারবিয়াং, লিপুলাক প্রভৃতি এই স্তরের অন্তর্গত। আমরা এখন ইহাই অতিক্রম
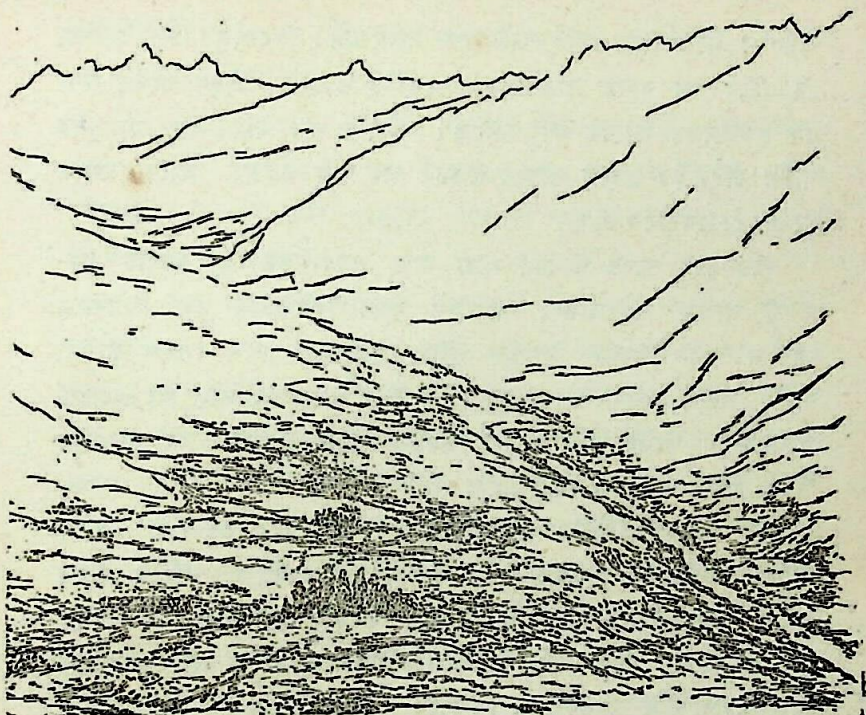
গিরিসঙ্কট—লিপুধুরা

করিতেছি। ইহার পশ্চিমে জাস্কর, তৎপশ্চাতে লাদাক শ্রেণী, তাহার উত্তরে কৈলাসশ্রেণী যাহা তিব্বতের মধ্যে।

আজ বেশ প্রফুল্লমনেই যাত্রা করিয়া আনন্দে প্রায় দেড় দুই মাইল আসিয়া ক্রমশঃ অনুভব করিতে লাগিলাম যেন পা দুটি ভারী হইতেছে। এই গিরি-সঙ্কটের উচ্চতা ষোল হাজার আটশত ফুট, সুতরাং প্রায় তিন মাইলের উপর আমরা উঠিতেছি। অল্পে অল্পে এইবার ক্রমশঃ শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্টও আরম্ভ হইল।

রাজপুতানার মরুপ্রদেশ দেখিয়াছি। সেই রকমেরই একটি মরুরাজ্য;—পার্থক্যের মধ্যে এটি মহোচ্চ অজগর পর্ব্বতের অংশ-বিশেষ। যেদিকে চাও কেবল খণ্ড খণ্ড ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রস্তর-সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই চোখে পড়িবে না। এটি আগাগোড়া পথ তো নয়ই, যেন মুর্ত্তিমান অপরূপ বন্ধুরতা। আমাদের ঝাব্বুওয়ালা যেখান দিয়া যাইতেছে সেইটি

অনুসরণ করিতেছি,—তাহাতেই পথ বলিতেছি। কোন্ চিহ্ন দেখিয়া সে এটিকে পথ বলিয়া বুঝিয়াছে তা সেই-ই জানে। এইরূপ পথের মধ্যে ঘন কণ্টকলতা, তাহার বর্ণও বিচিত্র। সবুজের ধার দিয়াও যায় না, ধূসর পাটল যাহা দূর হইতে প্রস্তরক্ষেত্রের সঙ্গে এক হইয়াই আছে, কোন পার্থক্য চোখে ঠেকে না।

দূরে দূরে পথের উপরেই মধ্যে মধ্যে সদ্যদ্রবীভূত তুষারপ্রবাহ এক-একটি পাওয়া যাইতেছিল, পথিকের তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য। যেখানে যেখানে জল, সেখানে উপস্থিত হইলে পথিকের তৃষ্ণা শতগুণ বাড়িয়া যায়। অঞ্জলি ভরিয়া পানে এ তৃষ্ণা মিটিতে চাহে না, মনে হয় প্রবাহটি আগাগোড়া কণ্ঠের মধ্যে ঢালিয়া উদরস্থ করিয়া ফেলি। কি চমৎকার শীতল, পবিত্র এই জল, ইহার তুলনা নাই।

এই মরুদেশে বিশেষ কোন জীবজন্তু দেখিতেছি না,—কে এখানে থাকিতে আসিবে? শুনিয়াছি, কখনও কখনও কস্তুরী মৃগ এদিকে চরিতে আসে, যখন এখানে বরফ থাকে না। তখনই এই সকল কণ্টকলতার জন্ম হয়, ইহাই খাইতে তাহারা এখানে আসে। মধ্যে মধ্যে দুই-একটি কাক দেখিতেছি, মিসকালো, যাহাকে আমরা দাঁড়কাক বলিয়া জানি। যেখানে ভেড়া, বকরী আটকাইবার খোঁয়াড়ের মত আছে সেখানেই ইহাদের গতিবিধি। আর দেখিলাম দুই-এক প্রকারের পতঙ্গ কানের পাশ দিয়া ভোঁ ভোঁ শব্দে উঠিয়া গেল, যেন এই গিরিসঙ্কটে দুর্গম পথের বার্ত্তা আগেই জানাইয়া দিল।

আকাশে মেঘের ছড়াছড়ি, তাহার মধ্যে কখন কখনও দিনমণির সাক্ষাৎ মিলিতেছিল, সে অল্পক্ষণের জন্যই। ঘন মেঘের এই রাজত্বের মধ্য দিয়া আমরা চলিতেছিলাম। বৃষ্টি এখানে প্রাই হয় না। আনন্দ আমাদের মধ্যে ছিল প্রচুর, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহা যেন লোপ পাইতে বসিয়াছিল। নাথজী মধ্যে মধ্যে এক-একটি গান ধরিয়া বড়ই উপকার করিতেছিলেন, কতক্ষণ তাই লইয়া চলিতেছিল। তেলেগু ভাষা ত বুঝিবার জো নাই, তবে দুই-একটির প্রথম লাইন মনে আছে;—

সং গুরু রায়া, ইটুয়ান্টি কালা গ্যান্টীনি।

তারপর, নাথজীর কণ্ঠ অতি মধুর, বিশেষতঃ তাঁর,—কুনিয়াড়া তরামে নিন্নু, কুবালায়া বিনতা,—দিনকারা শশী তারা, ঘন মূলা

ভেলিগিঞ্চি, ঘন তেজা মহু জপু কান্তি মন্তোড়া বিবু। কুনিয়াড়া ইত্যাদি। এই গানখানি অপূর্ব্ব ভাবোদ্দীপক।

এই সময়ে তাঁহার গানগুলি যথার্থই ঔষধের কাজ করিতেছিল। তাঁহারও শরীর বড় ভাল ছিল না, বিশেষতঃ তিনি জ্বরভাব লইয়াই বাহির হইয়াছিলেন। এই পথে তাহাকে সঙ্গে না পাইলে আমার অবস্থা যে কি দাঁড়াইত কে জানে।

অল্প দূর যাইতে-না-যাইতেই বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব করিতে লাগিলাম। একে ত ভয়ানক ঠাণ্ডা, তাহার উপর ঝড়ের মত শীতল বাতাস চালাইতেছে। চক্ষুতে চশমা ছিল, নাক, কান, মুখ, পশমের টুপিতে ঢাকা তার উপর মাথায় পাগড়ী ও সর্ব্বাঙ্গ জামাজোড়ায় ঢাকা, তবুও বাতাস স্থচের মত বিঁধিতেছে। শরীর ক্রমশঃ ভয়ানক দুর্ব্বল বোধ হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে তৃষ্ণায় গলাও শুকাইতে লাগিল। এক স্থানে কিছুক্ষণ বসিয়া একটু বিশ্রামের পর কিছু জলযোগ করিয়া আমরা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। পা যেন চলিতে চাহে না, অল্প দূর গিয়া আবার গলা শুকাইতে লাগিল। বরফের উপর দিয়া চলিতেছি তবুও গলা শুকাইতেছে। নির্ঝরিণী সত্যদ্রবীভূত তুষার অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিলাম,—শরীরে যেন বল আসিল; ক্ষণেকের তরে তৃষ্ণাও মিটিল; কিন্তু হায়! বোধ হয় একদণ্ডও যায় নাই, আবার তৃষ্ণা—অসহ্য এ তৃষ্ণা—তৃষ্ণার কি জ্বালা! এইভাবেই আমরা এ-পথে চলিতে লাগিলাম।

নাথজী বলিল, বিখ চঢ় গেয়া, অর্থাৎ বিষ চড়িয়া গিয়াছে।

এখন এই বিষ চড়ার কথাটা বলি। সেই যে আলমোড়া হইতে প্রায় সকলের মুখে এক কথাই শুনিয়া আসিতেছি যে লিপুধুরায় উঠিতে বিষ চড়িয়া যায়, শ্বাস চলে, মাথা ঘোরে। ইহার কারণটি এই যে, মনে কর, নীচে সমতল দেশের তুলনায় তিন মাইলের উপর এই উচ্চ স্থানে বায়ুর তারল্য। আমরা কত নীচে থাকি ধূলি, ধূম এবং বিবিধ গন্ধপূর্ণ ঘন বাতাস নিয়ত সেবন করি, আমাদের ফুসফুস ঐরূপ ঘন বায়ুতেই কর্ম্ম করিতে অভ্যস্ত। সুতরাং এখানকার সেই বিশুদ্ধ শীতল এবং সূক্ষ্ম সমীরণ তাহার মধ্যে পূর্ণ হইতে বেশী সময় লাগে। সেই যে ফুসফুসের কতকটা অতিরিক্ত আয়াস তাহার ফলেই হাঁপ লাগে। তাহা ছাড়া এখানকার বায়ু যত সূক্ষ্ম ততই রুক্ষ, প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসেই কণ্ঠ শুকাইয়া যেন

জলের প্রয়োজনীয়তা ঘন ঘন বোধ হইতে থাকে। যেটুকু অঙ্গ বাহির হইয়া আছে, আগুনে পুড়িয়া গেলে যেরূপ জলে সেইরূপ জালা করিতেছে, —মাংস কুঞ্চিত হইয়া অশীতিপর বৃদ্ধের মত হইয়াছে।

ইহার কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। গারবিয়াং-এরও বায়ু তরল-জলও খুব শীতল, কিন্তু এই লিপুধুরার তুলনায় উহা অনেক পরিমাণেই কম। এস্থানে এই যে মাথা ঘুরিতে থাকে, ক্লান্তি আসে, ঘন ঘন বিশ্রামের প্রয়োজন বোধ হয়, চক্ষু জ্বলিতে থাকে, চাহিতে ইচ্ছা হয় না, যেন জ্বরভাব, ইহারই নাম বিষ চড়া।

বায়ুর মত এখানকার জলও অত্যন্ত লঘু ও তরল। চিনি বা মিছরীর পানায় আর আমাদের দেশের কলের জলের তারল্যে যে প্রভেদ ;—এখানকার উচ্চস্তরের হিমালয়ের জলে আর আমাদের দেশের কলের জলে সেই প্রভেদ। পূর্ণ এক লোটা জল পান করিলেও উদরে কোনরূপ গুরুত্ব উপলব্ধি হয় না। উহার পরিপাক-শক্তি এত অধিক, পূর্ণ ভোজনের পর দুই-তিন অঞ্জলি পান করিলে দুই ঘণ্টার মধ্যে পাকস্থলী হাল্‌কা হইয়া যায় ও পুনরায় ক্ষুধা অনুভূত হয়। এরূপ পুনঃপুনঃ অধিক আহারে শরীর সবল হয় মাত্র ; কিন্তু মাংসপেশী বাড়ে না বা শরীর স্থূল হইয়া যায় না। হিমালয়ের সর্ব্বত্রই হিন্দু এবং ভোটিয়া বা হুনিয়া প্রভৃতি জাতির মধ্যে, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কাহারও স্থূল শরীর বড় দেখি নাই, হাড়ে মাসে জড়িত শরীর বেশ পুষ্ট ও বলবান। ইহারা কখনও জল পান করে না, কেহ কেহ মোটেই জল স্পর্শ করে না ; তাহার পরিবর্ত্তে চা কিংবা মদই ইহাদের পানীয়। সর্ব্বদাই গরম কাপড় ব্যবহার করে, গরম চা খায়, সেই কারণেই অতি শীতল এই গলিত তুষার পানীয়, পান করিতে তাহারা ভয় পায় পাছে সর্দ্দি লাগে ;—তাহা ছাড়া হৈজাকী বিমারেরও ভয় আছে। জল হইতেই উহার উৎপত্তি, ইহাই সাধারণের ধারণা।

কালাপানি অবধি পাখীর ডাক আর নদী কিংবা কোন-না-কোনও জলস্রোতের গর্জ্জন প্রায় সমস্ত রাস্তা শুনিতে শুনিতে আসিয়াছি, এখন এখানে আর সেসব কিছুই নাই। নদীর গর্জনও নাই, পাখীর ডাকও নাই, আছে কেবল ক্বচিৎ দাঁড়কাকের বিরস চীৎকার ; না হইলে সে গভীর নিস্তব্ধ ভাবের তুলনা নাই। যদি কোন স্থানের সহিত ইহার তুলনা করিতে হয় তাহা হইলে গভীর নিস্তব্ধ রাত্রে নদীতীরের বিস্তীর্ণ শ্মশানক্ষেত্রই ইহার

কতকটা উপযুক্ত উপমার বস্তু। মধ্যে মধ্যে বেগে বায়ু চলিতেছে, তাহার যে শব্দ তাহাতেই নিস্তব্ধ ভাবটি মাঝে মাঝে ভঙ্গ হইতেছে।

শীঘ্র শীঘ্র উত্তীর্ণ হইয়া যাইব ভাবিয়া মনের জোর আনিয়া যতই দ্রুত পা চালাইতে চেষ্টা করি, পা ততই ভার হইয়া আসে, শরীরও পরক্ষণেই দুর্ব্বল বোধ হয়। স্বপনে এমনই অনেকবার হয়। ভয় পাইয়াছি—দৌড়াইয়া ভয়ের কারণ এড়াইবার চেষ্টায় যতই পা দ্রুত চালাইবার চেষ্টা করিতেছি পা ততই যেন গুরুভারে অচল। এখন জাগ্রত অবস্থায় ঠিক সেইরূপ শরীরের গুরুভার বহন করিয়া চলিতে চলিতে প্রায় দ্বিপ্রহরে আমরা বিস্তৃত এক তুষার ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই হিমতুষার রাজ্যে এতটা শীতের মাঝেও ঘাম হইতেছে,—ভিতরের জামা ভিজিয়া গিয়াছে, ঘামে মাথার পাগড়ি ভিজিয়া গিয়াছে। একটি উচ্চ প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া দেখিতেছি,—সেই স্থানটি অনেক দূর পর্যন্ত তুষারে আবৃত। কোন কোন স্থানে তাহার তলদেশ দিয়া নদী বা জলস্রোত কুল কুল শব্দে চলিতেছে, পিপাসায় প্রাণ ছটফট করিতেছে,—কিন্তু তাহা মিটিবার নয়। জমির উপর কোথায় এক-দেড়ফুট কোথাও বা দুই ফুট বরফ জমিয়াছে। উররে ধূলা মাটি পড়িয়া স্থানটি যে তুষার মণ্ডিত তাহা দূর হইতে প্রথমে বুঝা যায় না। আমরা বুঝিলাম যে, শিখরদেশ আর বেশী দূর নহে। সেখান হইতে যদিও দেখা যায় না বাঁকের মুখে পড়ে, তথাপি অনুমানে বুঝিলাম যে, এক মাইলের মধ্যেই হইবে। মনে বল আনিয়া আবার চলিতে লাগিলাম।

মধ্যে মধ্যে কুয়াসা বড় রঙ্গ করিতেছিল। উপরে মেঘ ত আছেই; মাঝে মাঝে আমরা মেঘের মধ্য দিয়াঃ চলিতেছিলাম। কুয়াসাই মেঘের শরীর;—তাহার মধ্যে পড়িয়া অগ্রপশ্চাৎ দেখা যাঃতেছে না; দৃষ্টিকে ত আচ্ছন্ন করিতেছেই, তাহার সঙ্গে শরীর মন এবং বুদ্ধিকেও যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে, অগ্রসর হইবার যো রাখিতেছে না। বড় সাবধানে তখন পথ দেখিয়া চলিতে হইতেছে। এইভাবে কতক্ষণে কুজ্ঝটিকামণ্ডল পরিষ্কার হইয়া গেলে পর তখন সহজ দৃষ্টিতে আবার সূর্য্যের প্রকাশ দেখিয়া আমরা কিছুক্ষণ চলিতে লাগিলাম।

তুষারক্ষেত্রে পড়িয়া অবধি আর কোথাও জলপান করিতে পাই নাই। কারণ ক্ষেত্রটুকু সবই বরফে ঢাকা, ঝরণা বা প্রবাহ যা-কিছু সবগুলি

জলের প্রয়োজনীয়তা ঘন ঘন বোধ হইতে থাকে। যেটুকু অঙ্গ বাহির হইয়া আছে, আগুনে পুড়িয়া গেলে যেরূপ জলে সেইরূপ জ্বালা করিতেছে, —মাংস কুঞ্চিত হইয়া অশীতিপর বৃদ্ধের মত হইয়াছে।

ইহার কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। গারবিয়াং-এরও বায়ু তরল-জলও খুব শীতল, কিন্তু এই লিপুধুরার তুলনায় উহা অনেক পরিমাণেই কম। এস্থানে এই যে মাথা ঘুরিতে থাকে, ক্লান্তি আসে, ঘন ঘন বিশ্রামের প্রয়োজন বোধ হয়, চক্ষু জ্বলিতে থাকে, চাহিতে ইচ্ছা হয় না, যেন জরভাব, ইহারই নাম বিষ চড়া।

বায়ুর মত এখানকার জলও অত্যন্ত লঘু ও তরল। চিনি বা মিছরীর পানায় আর আমাদের দেশের কলের জলের তারল্যে যে প্রভেদ;—এখান-কার উচ্চস্তরের হিমালয়ের জলে আর আমাদের দেশের কলের জলে সেই প্রভেদ। পূর্ণ এক লোটা জল পান করিলেও উদরে কোনরূপ গুরুত্ব উপলব্ধি হয় না। উহার পরিপাক-শক্তি এত অধিক, পূর্ণ ভোজনের পর দুই-তিন অঞ্জলি পান করিলে দুই ঘণ্টার মধ্যে পাকস্থলী হাল্কা হইয়া যায় ও পুনরায় ক্ষুধা অনুভূত হয়। এরূপ পুনঃপুনঃ অধিক আহারে শরীর সবল হয় মাত্র; কিন্তু মাংসপেশী বাড়ে না বা শরীর স্থূল হইয়া যায় না। হিমালয়ের সর্ব্বত্রই হিন্দু এবং ভোটিয়া বা হুনিয়া প্রভৃতি জাতির মধ্যে, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কাহারও স্থূল শরীর বড় দেখি নাই, হাড়ে মাসে জড়িত শরীর বেশ পুষ্ট ও বলবান। ইহারা কখনও জল পান করে না, কেহ কেহ মোটেই জল স্পর্শ করে না; তাহার পরিবর্ত্তে চা কিংবা মদই ইহাদের পানীয়। সর্ব্বদাই গরম কাপড় ব্যবহার করে, গরম চা খায়, সেই কারণেই অতি শীতল এই গলিত তুষার পানীয়, পান করিতে তাহারা ভয় পায় পাছে সর্দ্দি লাগে;—তাহা ছাড়া হৈজাকী বিমারেরও ভয় আছে। জল হইতেই উহার উৎপত্তি, ইহাই সাধারণের ধারণা।

কালাপানি অবধি পাখীর ডাক আর নদী কিংবা কোন-না-কোনও জলস্রোতের গর্জ্জন প্রায় সমস্ত রাস্তা শুনিতে শুনিতে আসিয়াছি, এখন এখানে আর সেসব কিছুই নাই। নদীর গর্জনও নাই, পাখীর ডাকও নাই, আছে কেবল ক্বচিৎ দাঁড়কাকের বিরস চীৎকার; না হইলে সে গভীর নিস্তব্ধ ভাবের তুলনা নাই। যদি কোন স্থানের সহিত ইহার তুলনা করিতে হয় তাহা হইলে গভীর নিস্তব্ধ রাত্রে নদীতীরের বিস্তীর্ণ শ্মশানক্ষেত্রই ইহার

কতকটা উপযুক্ত উপমার বস্তু। মধ্যে মধ্যে বেগে বায়ু চলিতেছে, তাহার যে শব্দ তাহাতেই নিস্তব্ধ ভাবটি মাঝে মাঝে ভঙ্গ হইতেছে।

শীঘ্র শীঘ্র উত্তীর্ণ হইয়া যাইব ভাবিয়া মনের জোর আনিয়া যতই দ্রুত পা চালাইতে চেষ্টা করি, পা ততই ভার হইয়া আসে, শরীরও পরক্ষণেই দুর্ব্বল বোধ হয়। স্বপনে এমনই অনেকবার হয়। ভয় পাইয়াছি—দৌড়াইয়া ভয়ের কারণ এড়াইবার চেষ্টায় যতই পা দ্রুত চালাইবার চেষ্টা করিতেছি পা ততই যেন গুরুভারে অচল। এখন জাগ্রত অবস্থায় ঠিক সেইরূপ শরীরের গুরুভার বহন করিয়া চলিতে চলিতে প্রায় দ্বিপ্রহরে আমরা বিস্তৃত এক তুষার ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই হিমতুষার রাজ্যে এতটা শীতের মাঝেও ঘাম হইতেছে,—ভিতরের জামা ভিজিয়া গিয়াছে, ঘামে মাথার পাগড়ি ভিজিয়া গিয়াছে। একটি উচ্চ প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া দেখিতেছি,—সেই স্থানটি অনেক দূর পর্যন্ত তুষারে আবৃত। কোন কোন স্থানে তাহার তলদেশ দিয়া নদী বা জলস্রোত কুল কুল শব্দে চলিতেছে, পিপাসায় প্রাণ ছটফট করিতেছে,—কিন্তু তাহা মিটিবার নয়। জমির উপর কোথায় এক-দেড়ফুট কোথাও বা দুই ফুট বরফ জমিয়াছে। উররে ধূলা মাটি পড়িয়া স্থানটি যে তুষার মণ্ডিত তাহা দূর হইতে প্রথমে বুঝা যায় না। আমরা বুঝিলাম যে, শিখরদেশ আর বেশী দূর নহে। সেখান হইতে যদিও দেখা যায় না বাঁকের মুখে পড়ে, তথাপি অনুমানে বুঝিলাম যে, এক মাইলের মধ্যেই হইবে। মনে বল আনিয়া আবার চলিতে লাগিলাম।

মধ্যে মধ্যে কুয়াসা বড় রঙ্গ করিতেছিল। উপরে মেঘ ত আছেই; মাঝে মাঝে আমরা মেঘের মধ্য দিয়াঃ চলিতেছিলাম। কুয়াসাই মেঘের শরীর;—তাহার মধ্যে পড়িয়া অগ্রপশ্চাৎ দেখা যাঃতেছে না; দৃষ্টিকে ত আচ্ছন্ন করিতেছেই, তাহার সঙ্গে শরীর মন এবং বুদ্ধিকেও যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে, অগ্রসর হইবার যো রাখিতেছে না। বড় সাবধানে তখন পথ দেখিয়া চলিতে হইতেছে। এইভাবে কতক্ষণে কুজ্ঝটিকামণ্ডল পরিষ্কার হইয়া গেলে পর তখন সহজ দৃষ্টিতে আবার সূর্য্যের প্রকাশ দেখিয়া আমরা কিছুক্ষণ চলিতে লাগিলাম।

তুষারক্ষেত্রে পড়িয়া অবধি আর কোথাও জলপান করিতে পাই নাই। কারণ ক্ষেত্রটুকু সবই বরফে ঢাকা, ঝরণা বা প্রবাহ যা-কিছু সবগুলো

ত ঢাকা পড়িয়াছে, জল পাইব কোথায়? পথের পাশে অগভীর অথচ বেশ প্রশস্ত একটি খরজলস্রোত চলিতেছে, উপরে প্রায় দুই ফুট বরফ জমিয়া আছে। একস্থানে কতকটা ধসিয়া বেশ একটু বড় ফাঁক, তাহার মধ্যে দৃষ্টি পৌঁছাইতেছে না বটে, কিন্তু কুলু কুলু শব্দে জানাইতেছে উহার তলে একটি জলের স্রোত অবিরাম চলিতেছে। তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের কানে উহা কি মিষ্ট, বিশেষতঃ অশেষ প্রস্তর সমাকীর্ণ রুক্ষ এই পার্ব্বত্য ভূমিতে। আগেও মধ্যে মধ্যে ঐরূপ শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। এখন এখানে জল পাইবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও নাথজীর কথায় পান করিবার আশা ত্যাগ করিতে হইল। কারণ উহার নিকট পৌঁছানই মহা বিপদজনক, যদি একটি বড় চাপ খসিয়া পড়ে তাহা হইলে ঐখানেই তুষার সমাধি হইয়া যাইবে। এদিকে যতই কষ্ট হোক, সামান্য তৃপ্তির জন্য জীবনকে বিপন্ন করবার বেলা প্রাণ খুব হুসিয়ার। আর বসিয়া থাকিলেও তৃষ্ণা মিটিবে না, জলের চিন্তারও শেষ হইবে না, উঠিলাম,—এবার আমরা উভয়েই এতটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি যে, কাঁধ ধরাধরি করিয়া চলিয়াছি। কিন্তু এই অবিচ্ছিন্ন তুষারপথে ধুরার এত নিকটে, ক্রমশঃ এত শ্বাস চলিতে লাগিল এবং এতটা শক্তিহীন মনে হইল যে, ইচ্ছা হইতে লাগিল এইখানেই শুইয়া পড়ি। কিন্তু জানিতাম শুইলে আর উঠিতে হইবে না।

ঐ সম্মুখেই চিরতুষারাবৃত শৃঙ্গ দেখা যাইতেছে, বোধ হইতেছে যেন অতি নিকটেই। কিন্তু এইটুকু মাত্র ব্যবধান এই ক্লান্ত শরীরে অতিক্রম করিতে পারিব বলিয়া মনে হইতেছে না। এইরূপে লিপুলাক্ গিরিসঙ্কটের সাত মাইল পথের সকল ক্লেশ সফল করিয়া আমরা প্রায় দুইটা নাগাদ ধুরায় উঠিলাম।

এখানে একটি দণ্ড পোতা আছে। তাহার নিকটে পত্রহীন বহু শাখাযুক্ত একটি শুষ্ক বৃক্ষ, তাহাতে বিবিধ বর্ণের ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড অনেকগুলি ঝুলিতেছে।

হিমালয়ের সকল প্রদেশেই গাছে বিবিধ বর্ণের ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড ঝুলানোর ব্যাপার দেখিয়াছি। এটা মেয়েদেরই কাণ্ড, ঠাকুরকে কোনরূপ মানসিক করিয়াই ঝুলানো হয়। এখানে যেটি, সেটি শুভযাত্রার জন্যই। অনেকে নিরাপদে গিরিসঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়াই বাঁধিয়া দিয়াছে। এই লিপুধুরা

গিরিসঙ্কট পার হইতে কত কত পথিকের প্রাণান্ত হইয়াছে,—অসহ্য শীতের তাড়নায় কত লোকের শরীর বিকল হইয়া গিয়াছে তাহার নমুনা ত স্বচক্ষে দেখিয়াছি, শুনিয়াছি ত অনেকই। বাস্তবিক এই পথ, সঙ্কটত্রাতার কৃপা ব্যতীত যে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না তাহা সত্য। এইরূপ স্থান আমিষাশী মানবের পক্ষে যতটা সহজ, নিরামিষাশীদের পক্ষে ততটা নয়। ভোটিয়া ও হুনিয়ারা অনায়াসেই এ সঙ্কটে পরিত্রাণ পায়।

আমাদের লিপুধুরা গিরিসঙ্কটের সঙ্কট এইটুকু পর্য্যন্ত। যাহা হউক, শৃঙ্গে উঠিয়াই সম্মুখে দেখিলাম,—তিব্বত! দূর বহুদূর পর্য্যন্ত যে দৃশ্য নয়নে পড়িল তাহাতে পথের সকল দুঃখ ক্লেশ তখনকার মত স্মৃতি হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া, আনন্দে সর্ব্বশরীর পুলকিত হইয়া উঠিল। বড় আরামে চূড়ায় মনোমত একখানি পাষাণের উপর বসিয়া প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিলাম।

সেই লিপুশিখর হইতে সম্মুখে তিব্বতের দিকে বহু দূর দূরান্তরে বিবিধ বর্ণের কত শত পর্ব্বত। দূরত্ব হেতু উহার আসল বর্ণের উপর একটি ঈষৎ নীলধূসর প্রলেপ যেন অসীমের আভাষ প্রাণে জাগায়। তারপর কোন পর্ব্বত আকারে এবং বর্ণে বিশাল বালুকার স্তূপের ন্যায়, কোনটি লোহিত সম্ভবতঃ উহা গৈরিকের, কোনটি বা যেন গঙ্গামৃত্তিকার মত বর্ণ, কিন্তু দৃশ্যের মধ্যে কোথাও হরিৎ বর্ণের লেশমাত্র নাই; বৃক্ষশূন্য, জনমানবের গতিবিধি শূন্য যেন অন্তহীন মরুরাজ্য ধূ ধূ করিতেছে।

পার্শ্বে ও পশ্চাতে অসংখ্য অমলশুভ্র তুষারকিরীট পর্ব্বতশৃঙ্গ, তাহারা কতকটা মেঘরাজ্যের মধ্যে রহিয়াছে। আবার কোথাও চতুর্দ্দিকে তমসাচ্ছাদিত হিমসিক্ত বাষ্প একটি অব্যক্ত রাজ্যের পানে কতকটা উঠিয়া আর যেন উঠিতে না পারিয়াই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। আশপাশে চতুর্দ্দিকে ভূখণ্ড ঘন তুষারাবৃত, তাহার উপর ধূলা পড়িয়া মলিন। এত উচ্চ স্তরের ধূলা! চারিদিকেই নিকটে দূরে রঙ্গে ভঙ্গে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত কুলু কুলু শব্দে অবাধে আপন গতিতে নিম্নাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে, মনে হয় আমাদেরও যেন আকর্ষণ করিতেছে।

স্থানটি দেখিয়া বোধ হইল যেন সে-স্থানের মেঘ কখনও সরে না, চিরমেঘাবৃত পর্ব্বতশিখর, সূর্য্যের প্রখর কিরণ নাই, যেন ছায়ার রাজ্য।

দূরে তিব্বতে, কিংবা এই শিখর নিম্নে রৌদ্র দেখা যাইতেছে, তবে উহা ক্ষীণ, তেমন প্রখর নহে, তাহাতেও যেন কতক ছায়া মিশানো।

কালাপানি হইতে লিপুর উচ্চ শিখর সাত মাইলের উপর হইবে, তাহার কম নহে। এই কয় মাইল সবটাই চড়াই, তবে উহা খাড়া চড়াই নহে, মালভূমির মত উচ্চ আবার কতকটা নীচু, এইরূপ আসলে সমস্তটুকুই চড়াই। আমরা সাড়ে পাঁচটা হইতে এ চড়াইটি অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিয়া প্রায় দুইটার সময় ধুরায় উঠিতে পারিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে প্রায় আটবার কি দশবার বসিতে হইয়াছিল, পাঁচ-সাত মিনিটের অধিক সম্ভবতঃ কোথাও বসা হয় নাই।

লিপুধুরা হইতে তিব্বতের যে দৃশ্য কথায় বুঝাইবার ভাষা নাই। কোথাও ইতিপূর্ব্বে ত এমনটি দেখি নাই। মনে কর, ষোল হাজার কয়েক শত ফুট উচ্চ এই শিখর দেশ হইতে দূর, বহু দূরে প্রসারিত অবাধ দৃশ্যের সম্মুখে দৃশ্যের মহিমা কতগুণ বাড়িয়া যায় তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে কাহারও ধারণা করিবার শক্তি নাই।

ধুরায় উঠিয়া আমার শরীরে এত স্ফূর্ত্তি, এতটা বল আসিল, তখন বোধ হইতে লাগিল অনায়াসে আরও একটা গিরিসঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারি ;—কিন্তু পথের কথা স্মরণ হইলে এতটা সাহস আর থাকে না।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কথায় আছে যে, যখন তাঁহারা মানস সরোবর ও কৈলাসের পথে যাইতেছিলেন হিমালয়ের উচ্চ স্তরে উঠিয়া একস্থানে কয়েকজন লোক তাঁহাদের ইহার অধিক অগ্রসর হইতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহার ওদিকে আরও গেলে পাথর হইয়া যাইবে—সুতরাং ফিরিয়া যাও। তাহাতে তিনি ফিরিয়া আসেন, কিন্তু তাঁহার আর দুইজন সঙ্গী না ফিরিয়া বরাবর গিয়াছিলেন। পরে অবশ্য তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে বিদেহভাবে মানস সরোবরে লইয়া গিয়াছিলেন এইরূপ বর্ণনা আছে।

এটা শ্রাবণের প্রথম, সুতরাং এখানকার গ্রীষ্মকাল ; এখন যেরূপ শীত, তারপর স্থানে স্থানে তুষারমণ্ডিত ভূমি অতিক্রম করিতে জমিয়া যাইতে হয় ইহা মিথ্যা নয়। শীতের সময় এ-সমস্ত তুষারে আবৃত থাকে, সে সময়ে অধিক দূরে গেলে যে পাথর হইয়া যাইতে হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। বিশেষতঃ আমাদের দেশের তীর্থযাত্রী সাধুগণ পর্য্যাপ্ত

গরমবস্ত্রাদি সঙ্গে লইয়া বা সেরূপ ভাবে প্রস্তুত হইয়া প্রায়ই এদিকে আসেন না, তাহাতে অনেককেই ভগ্নশরীর লইয়া ফিরিয়া যাইতে হয়। এখানকার গ্রীষ্মেই যখন এইরূপ শীত, শীতের সময় কেহ কেহ হঠাৎ আসিয়া পড়িলেই এই নরশরীর লইয়া যাওয়া কিরূপ ভয়ানক তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহার নমুনা ত গারবিয়াং-এ থাকিতেই দেখিয়াছিলাম।

তাকলাখার বা পুরাং, লিপুধুরা হইতে আরও সাত মাইল। যাহা হউক, সঙ্গী-মহাশয় অনেক দূর গিয়া পড়িয়াছেন, কাজেই আমরাও এখন নামিতে আরম্ভ করিলাম। এখন পা এত লঘু হইয়াছে যে অবলীলাক্রমেই চলিয়াছি। উৎরাইমুখে যেন উড়িয়া যাইতেছি। নামিবার সময়েও কতকটা তুষারাবৃত স্থান আছে, উহার নীচে প্রচ্ছন্ন জলস্রোত চলিয়াছে। নামিতে কি আরাম! বোধ হয় ত্রিশ মিনিটের মধ্যে আমরা দেড় দুই মাইল নামিয়া আসিলাম। নামিতে নামিতে কতকটা কৃষ্ণবর্ণ ভূখণ্ড অতিক্রম করিলাম। সে স্থানটিতে কয়লা আছে বোধ হইল। উহা অনেকটা বাহির হইয়া উপরের নোড়ানুড়ির সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে। তাহার পার্শ্ব দিয়া যে জলধারা সেই স্থানটি ধৌত করিয়া চলিয়াছে তাহাতে জলও কতকটা কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতেছে।

প্রায় ক্রোশখানেক নামিবার পর আমরা দেখিলাম, একজন হিমালয়-বাসী ভোটিয়া নদীর ধারে ধারে কি যেন খুঁজিতে খুঁজিতে চলিয়াছে, তাহার একটি বেশ সুন্দর টাটু ঘোড়া পশ্চাতে রহিয়াছে। সে মাঝে মাঝে রশি ধরিয়া তাহাকে কতকটা টানিয়া লইয়া যাইতেছে আবার সেখানে ছাড়িয়া দিয়া বিশেষ মনোনিবেশপূর্ব্বক নদীতীরে কি অনুসন্ধান করিতেছে। ঘোড়াটি ছাড়া পাইয়া পাথরের ধারে ধারে ক্বচিত কণ্টকাকীর্ণ লতাগুল্ম যাহা পাইতেছে, খুঁজিয়া খুঁজিয়া টানিয়া ছিঁড়িতেছে। এদেশের ভেড়া, ছাগল, গরু, ঘোড়া মাত্রই ঐরূপ গুল্মলতা খাইয়া প্রাণধারণ করে। এখানে গাছপালা, শাকসব্জী বা ঘাস-খড় নাই; ঐ বিরল পার্ব্বত্য গুল্মই এই দক্ষিণ-পশ্চিম তিব্বতের গৃহপালিত পশুগণের আহার, সুতরাং অত্রস্থ পশুগণকে গৃহপালিত না বলিয়া বনপালিত বলিলেই ঠিক হয়।

ভোটিয়া মহাজন মহাশয় আমাদের দেখিয়া একটু শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া বলিল, আপনাদের কেহ এই ঘোড়ায় চড়িয়া যদি যাইতে ইচ্ছা করেন ত কতকদূর যাইতে পারেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কত লইবে? সে বলিল যে,—আমি কিছু লইব না, ধর্মের জন্যই দিতেছি, আপনারা সাধু লোক, আপনাদের উপকার হইলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করিব। আমিও তাকৃলাখার যাইতেছি; আমার একটি মহামূল্য দ্রব্য হারাইয়াছে, উহা নদীতীর ধরিয়াই খুঁজিতে খুঁজিতে যাইতেছি। ইচ্ছা হয়তো আপনারা কেহ একজন ঘোড়াটাতে চড়িয়া যাইতে পারেন।

নাথজীকে বলায় তিনি অস্বীকার করিলেন, কারণ সাধুসন্ন্যাসীর যানবাহনাদি চড়িতে নাই; তাহাতে আবার তিনি একাজে একান্তই অপটু। এতটা ভীষণ চড়াই পার হইয়া শেষে উৎরাইয়ের মুখে ঘোড়ায় চড়িতে আমারও ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ঘোড়াটিতে আমরা কেহ চড়িয়া গেলে উহার একটি উপকার হয়।

কথাটা এই যে নদীতীর অতি প্রশস্ত এবং বন্ধুর;—ঘোড়াটার লাগাম ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেও তাহাকে বিলক্ষণ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। ঘোড়াটিকে পশ্চাতে ছাড়িয়া হৃতদ্রব্য অনুসন্ধানে নদীতীরে একবার তাহাকে আসিয়া আবার ফিরিয়া সেই ঘোড়াকে খানিক টানিয়া লইয়া যাইতে হইতেছে। এইরূপে তাহাকে একবার ঘোড়াকে সামলাইতে এবং একবার নদীতীরে যাইতে হইতেছে, তাহাতেই তাহার এই ধর্মের উদ্রেক। আমি ত স্বীকার করিয়া দুর্গা বলিয়া ঘোড়ায় উঠিলাম। গুটি গুটি মাইল দুই গিয়া সেইরূপ, শুধু চারি ধারে পাঁচিল ঘেরা, ভেড়বকরী আটকাইবার মত একটি পান্থশালা পাইলাম। শুনিলাম সঙ্গী-মহাশয় এবং আমাদের ঝাবুওয়ালা লোকটি ঐখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিলেন। তখন বেলা প্রায় সাড়ে তিনটা কি চারিটা আন্দাজ হইবে।

নামিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি ধুরায় আন্দাজ কাটার সময় উঠেছিলেন? তাঁহার কাছে ঘড়ি একটি বরাবর থাকে জানিতাম। তিনি বলিলেন, প্রায় সাড়ে বারটা আন্দাজ আমি পর্ব্বতশীর্ষে পৌছে অনেকক্ষণ বসেছিলাম। তোমাদের দেখতে পেলাম না, কাজেই নামতে শুরু করলাম। এখানে এসে ত প্রায় দেড় ঘণ্টা বসেই আছি, এখন কি করবে বল? এরা বলছে যে, ইচ্ছা করলে আজ এখানে থেকে কাল তাকৃলাখারে যাওয়া যেতে পারে।

আমি বলিলাম, সঙ্গে আমাদের তাঁবু নেই—ভেড়বকরী আটকাবার জন্যই এ স্থান,—এখানে ত থাকা যেতেই পারে না। আজই আমাদের তাকলাখারে উপস্থিত হতেই হবে, না হলে পথে থাকবার স্থান কোথায়? মোটে ত আর চার মাইলের ব্যাপার।

অগত্যা কিছু জলযোগ করিয়া উঠিলাম। বামপার্শ্বে বৃক্ষশূন্য গাঢ় পীতবর্ণ বিশাল দুর্ভেদ্য গিরিশৃঙ্গ দাঁড়াইয়া আছে, তাহার নীচেই কর্ণালী নদী। সেই নদীর তীরে তীরে পথ দিয়া আমরা যাইতে লাগিলাম। আর চড়াইও নাই উৎরাইও নাই, এখানে সবটাই সমতলভূমি, অসংখ্য জলস্রোত নানাদিক হইতে আসিয়া সেই নদীতে মিলিয়াছে। কোথাও কোথাও কতকটা স্থান ব্যাপিয়া লতাগুল্মসকল নদীর জল পাইয়া সুচিক্কণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে অল্প কতক হরিৎ বর্ণের আভা।

লিপুধুরা হইতে তাকলাখার সাত মাইলের মধ্যে। অনেকগুলি নদীনালা অতিক্রম করিয়া আমরা প্রায় দেড়ঘণ্টা হাঁটিয়া বিশাল কর্ণালী-নদীর তীরে উপস্থিত হইলাম। এপারে তীরের উপরেই একখানি গ্রাম আছে। সেই গ্রামখানিতে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশখানি গৃহ।

তিব্বতের ভদ্রাসনগুলি দেখিতে একটি বিশিষ্ট ধরনের। ধরনটা অনেকটা প্রকাণ্ড ইটের পাঁজার মত। ভিত্ বেশ প্রশস্ত, জমি হইতে উপরের দিকে ক্রমে তত প্রশস্ত নহে, অনেক অংশে মিশরের স্থাপত্যের ধরন, তাহা বলিয়া পিরামিডের মত উপরিভাগ অত সরু নহে। সকল গৃহই বাহিরে চুনকাম করা, মাটি কাঠ ও পাথর দিয়া প্রস্তুত।

গ্রামখানির মধ্যে এক-আধটি ছোট ছোট গাছ দেখা গিয়াছিল। গ্রামের পার্শ্বেই শস্যক্ষেত্র। এই স্থানেই যাহা-কিছু চাষ আবাদ হয় দেখিলাম, সম্ভবতঃ গ্রামবাসীদেরই ক্ষেত্র হইবে। সেখান হইতে তাকলাখার এক মাইল দূরে সম্মুখে দেখা যাইতেছে, উপর হইতে ক্রমে প্রশস্ত হইয়া—নদীতীরে আসিয়া শেষ হইয়াছে। পরিষ্কার মুক্ত বায়ুমণ্ডল, মধ্যে কোনও প্রকার প্রতিবন্ধক নাই।

কর্ণালীর পরপারেই তাকলাখার বা তাকলাকোট বা পুরাং মণ্ডি—যেখানে এই সময় ভোটিয়াগণ হাট বসায়। চড়াইয়ের উপরে সর্ব্বোচ্চ স্তরে পুরাং গিরিদুর্গ,—সেই স্থান হইতে ক্ষুদ্র অক্ষবিন্দুর মতই দেখা যাইতে লাগিল। দৃশ্যটি অতি চমৎকার। কর্ণালী সেস্থানে বাঁকিয়া পূর্ব্বদিকে
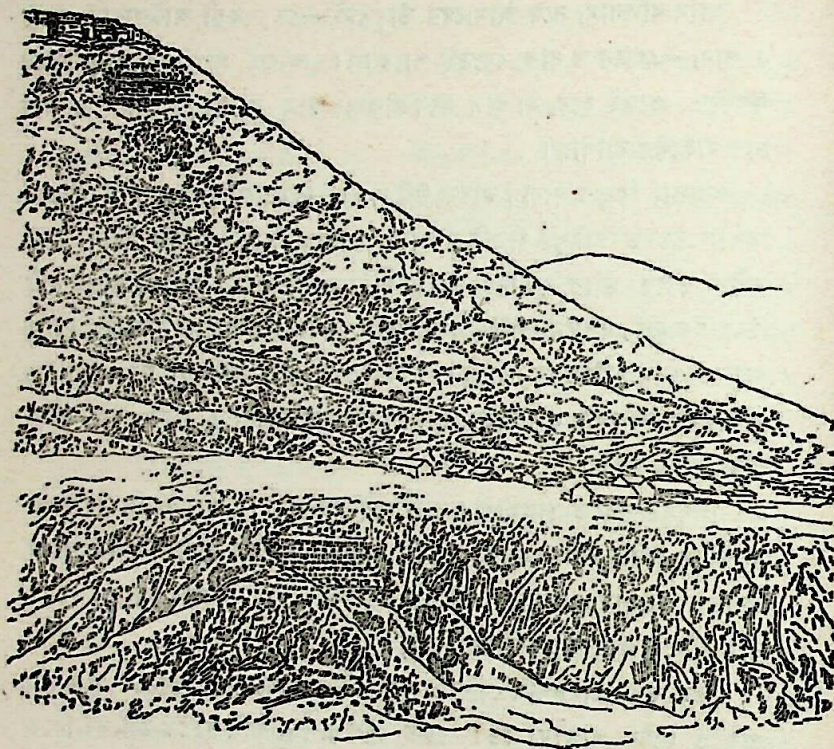
চূড়ায় পুরাং—বিস্তীর্ণ ভূমির উপর তাক্‌লাখার মণ্ডি, নিম্নে কর্ণালী

ঘুরিয়া পুনরায় দক্ষিণদিকে গিয়া বরাবর কোজরনাথ হইয়া নেপালের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। কর্ণালীর তিব্বতী নাম, মাপ চু। চু শব্দে জল। কর্ণালী-নদীর গর্ভ প্রায় আধ মাইল প্রশস্ত।

গ্রামখানির মধ্য দিয়া আমরা কর্ণালীর তীরে আসিয়া দাঁড়াইলে পুরাং-এর মোহন দৃশ্য আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পরন্তু এত উঁচু যে নীচের দিকে দৃষ্টি পড়ে না,—দৃষ্টিসম্মুখেই যেন আবদ্ধ হইয়া থাকে। নদীর সর্ব্বত্রই জল নাই;—প্রায় বারো কি পনের হাত বিস্তৃত প্রবল স্রোত নদীর দক্ষিণকূল ঘেঁসিয়া একটানা চলিয়াছে। সুদৃঢ় কাষ্ঠনির্ম্মিত একটি সেতু;—তাহারই উপর দিয়া লোকজন, মালবোঝাই পশু প্রভৃতি পারাপার যাতায়াত করে। এপারের গ্রাম হইতে উহা প্রায় আধমাইলেরও উপর দূরে।

কর্ণালীর উভয় তীরেই নদীগর্ভ হইতে খাড়া প্রায় একশত ফিট উচ্চ।

এপারে যেমন এই গ্রামখানি, ঠিক ওপারে, কোনাকুণি অর্থাৎ বাঁকের মুখেই যেন বিস্তীর্ণ মাঠের উপর তাক্‌লাখার মণ্ডি দেখা যাইতেছে। এখন বেশী ঘর নাই, দুই চারখানি দেখা যাইতেছে, মাটির দেওয়াল, তাহার উপর তাবুর মত মোটা কাপড়ের আচ্ছাদন, মণ্ডির ঘরগুলি এইরূপ এক ধরনের। দূর হইতে একখানি প্রকাণ্ড মাঠের মতই দেখাইতেছিল। তাহার পশ্চাতে ক্রমশঃ চড়াই,—পাহাড়টি প্রায় তিন হইতে চারিশত ফিটের মধ্যে। তাহার উপর পুরাং কেল্লা এবং এ প্রদেশের শাসনকর্তা বা রাজার প্রাসাদ, লামাদের মঠ, পাঁচ-সাতখানি লাল, সাদা, পীতরঙের তিব্বতী অট্টালিকা; তাহার মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ দেখা যাইতেছে। পর্ব্বতের উচ্চ চূড়ায় দুর্গ, দূর হইতে দেখিতে বড় সুন্দর, একটি প্রশান্ত এবং মহান্ ভাবের দৃশ্য। তাহার উপর বৃক্ষলতাশূন্য, নগ্ন বলিয়া আরও কি যে একটি অস্পষ্ট ভাববিশেষের উদ্দীপন হয়।

এপারের গ্রাম হইতে নামিয়া নদীগর্ভে পড়িলাম এবং আধমাইল চলিয়া সেই সেতুটি পার হইলাম। তারপর কতকটা সৈকতভূমি অতিক্রম করিয়া আমরা দেখিলাম ছোট ছোট আরও কতকগুলি ধারা আছে;—সেগুলিও হাঁটিয়া পার হইলাম। শেষে আরও কতকটা চড়াই ভাঙ্গিয়া তাক্‌লাখার মণ্ডিতে প্রবেশ করিলাম। চৌদাসের অন্তর্গত সোঁসার পাটোয়ারী দিলীপ সিং-এর ভাই কিষণ সিং-এর দোকান হইল আমাদের আশ্রয়।

তাক্‌লাখারের উপর পর্ব্বতটির তিব্বতী নাম—পুরাং।

———

॥ ১০ ॥

পুরাং,—শিম্পি-লীং গোম্পা—গুরু
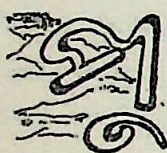
পুরাং অতি প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ বৃহৎ জনপদ। এই পুরাং-এর সহিত কিছু ঐতিহাসিক স্মৃতি জড়িত আছে। সে প্রায় একশতাব্দী হইতে চলিল, কাশ্মীরাধিপতি রনবীর সিংহ তাঁহার সুবিখ্যাত সেনাপতি জারাওয়ার সিংহের অধীনে একবার বহুতর সৈন্য ঐ অঞ্চলে প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ তিব্বতস্থ কতকটা অংশ অধিকার করা।

পুরাং-এর জুম্পানওয়ালা, যিনি এ প্রদেশের শাসনকর্তা, পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়া লাসা হইতে বহুতর চীন সৈন্য এবং তাহার অধীনে যতগুলি তিব্বতী সৈন্য আছে তাহা সংগ্রহ করিয়া পুরাং কেল্লায় দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিলেন।

বালতিস্থান, জাস্কর, লাদাক প্রভৃতি স্থান জয় করিয়া বিজয়ী সেনাপতি জারওয়ার সিংহ অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ভাবিয়াছিলেন অতি সহজেই তিব্বতের এই অংশ জয় করিয়া কাশ্মীররাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবেন। তিব্বতের পশ্চিম প্রান্তে রুদকের ছোট কেল্লাটি তিনি বিনাযুদ্ধে হস্তগত করিয়া শতদ্রু এবং সিন্ধুনদের উপত্যকার উপর দিয়া সৈন্য চালনা করিলেন।

তাহার পর থলিং নামক নগরটি দখল করিয়া তিনি কিছু অসুবিধা বোধ করিলেন। কারণ সৈন্যগণের বস্ত্র এবং খাদ্যাদি সরঞ্জামের অভাব বোধ হইতে লাগিল। তখনকার দিনে খাদ্যাদি মালপত্র বাহির হইতে সরবরাহের এখনকার মত সহজ উপায় ছিল না, তাহার উপর শীত পড়িয়া গেল।

তখন সেনাপতি দলস্থ কয়েকজন অতি বিশ্বস্ত সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত পরামর্শ করিতে বসিলেন—সকলেই কিন্তু একবাক্যে আপত্তি করিল যে, এ অবস্থায় এই সকল অসুবিধার মধ্যে অগ্রসর হওয়া কোনক্রমে যুক্তিসংগত নহে। এখানেই যখন খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে, দেশ হইতে রসদ আসিতেছে না, তখন আরও অগ্রসর হইলে এই দরিদ্র দেশে এতগুলি সৈন্যের উপযুক্ত দ্রব্যাদি কিরূপে মিলিবে?

কিন্তু সেনাপতি জারওয়ার সিংহ কাহারও কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া সর্ব্বসমেত সৈন্যগণকে পুরাং-এর দিকে অগ্রসর হইতে আজ্ঞা দিলেন। তিনি বলিলেন যে, যখন এখানে অভাব ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে বসিয়া বসিয়া নিরুপায় হওয়া অপেক্ষা অগ্রসর হইয়া চেষ্টা করাই আমাদের এখানকার প্রধান কর্ম্ম। ফিরতেও ত বিপদ কম নয়, শত্রুসৈন্য ছাড়িবে কেন?

কতদূর অগ্রসর হইয়া প্রচণ্ড শীতে সৈন্যদল কাতর হইয়া পড়িল। তিনি এ সকল লক্ষ্য করিয়াও নিরুপায় হইয়া সৈন্যগণকে অগ্রসর হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু বহুতর সৈন্য শৈত্যাধিক্য এবং খাদ্যের অভাব হেতু ক্লিষ্ট হইয়া পড়িল। এমন কি তাহার এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য প্রবল শীতে রুগ্ন এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল।

এদিকে তিনি সংবাদ পাইলেন তিব্বতী এবং চীন সৈন্য তাহার উচ্ছেদের জন্য পুরাং হইতে বাহির হইয়াছে এবং অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে।

সেনাপতি জারওয়ার, তাহার নিজ সৈন্যগণ অজেয় এই বিশ্বাসে, ছয়-সহস্রের মধ্যে মাত্র চারিশত সৈন্য তাহাদের সম্মুখীন হইতে পাঠাইয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র বাহিনী অচিরাৎ চীন এবং তিব্বতী সৈন্যকর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইল। এই সংবাদে সেনাপতি পুনরায় ছয়শত সৈন্যের আর এক বাহিনী প্রেরণ করিলেন যাহা তাহাদের অগ্রবর্ত্তী বীর সৈন্যগণের দশাই প্রাপ্ত হইল।

অদম্য জারওয়ার ইহাতে তিলমাত্র বিচলিত না হইয়া অচিরে তাঁহার সমস্ত সৈন্য কেন্দ্রীভূত করিয়া স্বয়ং অগ্রবর্ত্তী হইয়া তীর্থপুরীর দিকে সৈন্য চালনা করিলেন। সে স্থানে অনেক কষ্টে উপস্থিত হইয়া তিনি লক্ষ্য করিলেন বিপক্ষ সৈন্য এখনও এদিকে আসিয়া পৌছায় নাই, তখন তিনি পুনরায় পুরাং-এর দিকে অগ্রসর হইলেন।

তীর্থপুরী হইতে পুরাং আসিতে হইলে অনেকগুলি প্রশস্ত এবং বেগবতী নদী পার হইতে হয়, তাহার উপর শীতের প্রাবল্য হেতু তাঁহার সৈন্যগণ বিবশ হইতে লাগিল। যুদ্ধের পূর্ব্বরাত্রে শীত এইরূপ প্রবল হইল যে সৈন্যগণ প্রভাতে তরবারি দৃঢ়ভাবে মুষ্টিবদ্ধ করিতে পারিবে কি-না তাহাতে বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হইল। রাত্রে সৈন্যগণ যত রজ্জু, তরবারির খাপ, বন্দুক ঝুলাইবার বন্ধনী প্রভৃতি জ্বালাইয়া রাত্রি কাটাইল।

তাহার পর প্রভাত হইতে-না-হইতে বিপক্ষ দলের প্রবল আক্রমণে সৈন্যগণ অসহায় হইল, যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিবার শক্তি তাহাদের বেশীক্ষণ রহিল না। অবশেষে সমুদয় সৈন্য পরাজিত এবং উচ্ছৃঙ্খল হইয়া সেনাপতির সকল আশা অতলে ডুবাইয়া দিল।

মহাবীর জারওয়ার একক অদম্য তেজে বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া অবশেষে শত্রুহস্তে ছিন্নমুণ্ড হইয়া অশ্ব হইতে পতিত হইলেন। এই বিফল অভিযানের কাহিনী আগাগোড়াই মর্ম্মন্তুদ।

বিজয়ী হনুমানগণ বিজয়চিহ্নস্বরূপ তাঁহার সেই ছিন্নমুণ্ড লাসায় লইয়া গেল এবং যত্নপূর্ব্বক বিজয় স্মৃতি করিয়া রাখিয়া দিল।

শতাধিক সৈন্য নিতির পথে এই দুঃসংবাদ বহন করিয়া ভারতে ফিরিয়া আসিল। সে ঘটনা অনেকদিন হইয়া গিয়াছে, সেই অবধি বিজয়ের গরিমায় তিব্বতে—বিশেষতঃ এ অঞ্চলের অধিবাসিগণকে একেবারে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তখনকার তাহাদের সে বীরত্বের কাহিনীটুকুই সার হইয়া এখন জনপদবাসিগণের মুখে মুখে ফিরিতেছে।

তিব্বতের পশ্চিম-প্রান্তের রাজপ্রতিনিধি অথবা শাসক তাহাকে জুম্পান পুশো বলে,—পাহাড়ের উপর পুরাং দুর্গে তিনি থাকেন। শুনিলাম এখন তিনি এখানে নাই; গতবৎসর লাসা গিয়াছেন, এখনও ফিরেন নাই; এখান হইতে পর্ব্বতপথে যাইতে লাসা একমাসের পথ। তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদি এখানে আছে। এতটা নারী অধিকার পৃথিবীর আর কোথাও নাই। বর্ত্তমানে জুম্পান পুশোর স্ত্রীই রাজকার্য করিয়া থাকেন। তিনিই ভোটিয়াদের এখানে প্রবেশ করিয়া মণ্ডি বা বাজার খুলিতে হুকুম দিয়াছিলেন। ভোটিয়ারা তাহাকে জুম্পানওয়ালা বলে। এ প্রদেশের জুম্পানওয়ালাই গভর্ণর; সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী, তাঁহার অধীনেই সিপাহীশাস্ত্রী যা-কিছু সবই। তবে ভারতীয় বৃটিশের সুনিয়ন্ত্রিত সেনার তুলনায় উহা যে কিছুই নহে তাহা আর লিপিবদ্ধ করিবার আবশ্যক করে না। শাসনকর্ত্তাকে দেশবাসীগণ জুম্পান পুশো, কর্ত্রীকে চেম্ পুশো, তাঁদের পুত্রকে সে-পুশো এবং কন্যাকে নিনি-লা বলিয়া থাকে।

বহুকাল নিরুপদ্রবে শান্তি উপভোগ করিয়া ধ্বংসের পূর্ব্বে আমাদের প্রাচীন সেনবংশের গৌড় রাজ্যে যুদ্ধবিভাগের যে অবস্থা হইয়াছিল ইহাদেরও সে অবস্থা। প্রথম কথা, ভারতবর্ষ হইতে তিব্বত কখনও

বিশেষরূপে আক্রান্ত হয় নাই। শুনা যায়, বহুকাল পূর্ব্বে উহা একবার নেপালকর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। উহারা নেপালকে কিছু ভয় করে। ইহা কিছু এমন- লোভনীয় রাজ্য নহে যাহাতে (ভারতের) বাহিরের কোন স্বাধীন শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হইবে। তিব্বতের পরপারে চীন রাজ্য। চীনের অধীন হইয়া ইহারা বহুকাল আছে ;—এবং চীনের সঙ্গেই ইহাদের সংস্রব বেশী। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তিব্বতীরা চীনেরই অনুকরণ করে। তিব্বতের অধিবাসী প্রজাগণকে অধীনে রাখিতে এখানকার রাজশক্তির বড় বেশী সিপাহীশান্ত্রী অথবা অর্থ ব্যয় করিতে হয় না। প্রজাগণ স্বভাবতই রাজভক্ত। রাজপুরুষ-গণের পোশাক প্রায়ই সাধারণ প্রজাগণের মতই পোশাক—কেবল টুপীটি কিছু ভিন্ন রকমের আর কটিতে তরবারী। লামাগণের পোশাকের কিছু পারিপাট্য আছে, তাহা পরে বলিতেছি।

তিব্বতের পৌরাণিক নাম কিম্পুরুষবর্ষ। কিম্ অর্থাৎ কুৎসিৎ, কিম্পুরুষ বলিতে কুৎসিত পুরুষ বুঝায়। এখানকার স্ত্রী পুরুষ মাত্রেই দেখিতে কুৎসিত না হইলেও অদ্ভুত লাগে ;—বোধ করি সেই কারণে সৌন্দর্য্যপ্রিয় আর্য্যগণ ইহার ঐ নামকরণ করিয়া থাকিবেন। ইহাদের দেখিলে সত্যই কিম্ভূত কিমাকার মনে হয়।

হুনো বুড়ো ও হুনো বুড়ীর নাম করিয়া আমাদের দেশের মেয়েরা শিশুদের যে ভয় দেখায় ইহারা সেই হুনো। হনুদ্বয় উচ্চ বলিয়া ইহাদের হনু বা হুণ বলে কি-না এবিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ বিচার করিয়া ঠিক করিবেন, তবে আমরা এইটুকুমাত্র বলিতে পারি যে এ-অঞ্চলের তিব্বতীয়গণ স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিচারে সকলেই হনুমান এবং হনুমতী। উচ্চ হনুদ্বয়ই ইহাদের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। এদিকে হুণেরা প্রায় সকলেই শ্রমজীবী, কৃষকশ্রেণী। গায়ের রং তামাটে, রক্তবর্ণ পোশাকই ইহাঁদের বড় প্রিয়। তবে শীতের সময় সাধারণতঃ পশুচর্ম্মের জামা ব্যবহার করিয়া থাকে। উহা সমতল-ভারতবাসী আমাদের মত আদ্ধির পাঞ্জাবি জামা ও সিল্কের চাদরধারী সভ্যগণের চক্ষে বড়ই বিকট। হুনিয়ারা প্রায় সাড়ে ছয়ফুট অবধি দীর্ঘ হয় ;—নচেৎ সাধারণতঃ ইহারা সাড়ে চার হইতে সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা হইয়া থাকে। পাহাড়ী ভোটিয়ারা যেমন একটু খর্ব্বাকৃতি, ইহারা সেরূপ নহে। লম্বা, দৃঢ় শরীর, গায়ে কোর্ত্তা, কোমরে চর্ম্মবন্ধনী, মাথায় টুপী, পায়ে তিব্বতী বুট যাহাকে সোম্বা বলে, পৃষ্ঠে বেণী। লামা ছাড়া সকলেরই কটিতে তরবারী, ছোরা। কাহারও হাতে

রুলের মত লাঠি থাকে। ইহারা প্রায়ই দীর্ঘজীবী হয়, তবে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকরাই বেশী বাঁচে।

পান আহার ইহাদের প্রধানতঃ জলের পরিবর্ত্তে মদ, চা, ছাতু, শুষ্ক বা পক্ক মাংস ও ক্বচিৎ রুটি। সাধারণতঃ সভ্যজাতির মধ্যে মাংসপ্রিয় স্বভাব আমিষাশী দেখা যায়; তাহার মধ্যে আবার অনেক জাতিই পশুপক্ষী প্রভৃতির মাংস বিচার করিয়া খায়। ইহাদের কোন মাংসের বিচার ত নাইই, পরন্তু কাঁচা রক্ত পর্য্যন্ত বাদ যায় না। ছাগল, ভেড়া বা চমরী প্রভৃতি কাটিলে যে রক্তটা পড়ে, বাটি হাতে দুই চারি জন উহা ধরিয়া লইয়া সেইখানেই ছাতুর সঙ্গে মাখিয়া বড় আনন্দে উদরস্থ করিতে আরম্ভ করে। খাদ্যাখাদ্যে ইহারা অঘোরীগণের ন্যায় নির্ব্বিকার।

আহার্য্যদ্রব্যাদি রাঁধিবার সমস্ত তৈজসপত্রই তামার উপরে কলাই। আজকাল এলুমিনিয়ম পর্য্যাপ্ত আমদানী হইতেছে। আটা, ছাতু, মাখন, শুষ্ক চা, শুষ্ক মাংস ইত্যাদি রাখিবার পাত্র কাঠের কতক কতক তবে তাহার বেশীভাগ চামড়ার। গারবিয়াং প্রভৃতি স্থানেও তাহাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই তীব্বতীয়গণের আচারব্যবহার বেশীরভাগ ভোটিয়াগণ শুধু অনুকরণ নহে, একেবারে প্রকৃতিগত করিয়া লইয়াছে।

নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীপুরুষগণের জামা কাপড়ে মদ, শুষ্ক মাংস এবং ঘাম—এ সকল মিলিত এমন একটি দুর্গন্ধ বাহির হয় যে, কাছে বসা বা চলাফেরাতে আমাদের মত জীবের প্রাণও চঞ্চল হইয়া উঠে।

উহারা প্রায়ই দুই জন একত্রে চলে। কখন কখন স্ত্রীপুরুষ একত্রে চলে, বাজার করে। পর্দ্দা উহাদের নাই, তবে কোন কোনও বিষয়ে ইহাদের লজ্জা যাহা স্ত্রীপ্রকৃতিতে স্বাভাবিক উহা আছে। এই নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীপুরুষেরা প্রায়ই দেখিতে কঠোর শ্রীহীন, বিকট দর্শন কিন্তু মানুষ ভাল।

অবস্থাপন্ন নর ও নারীগণ বেশ সুন্দর হয়, তাহাদের বর্ণও বেশ উজ্জ্বল, অঙ্গও শ্রীমান্। স্ত্রীলোকের টুপী পৃথক। কেহ কেহ রৌদ্র হইতে বাঁচিবার জন্য মাথায় একপ্রকার আচ্ছাদন ব্যবহার করে। উহা কপাল ও চক্ষু ছাড়াইয়া অনেকটা ঝুঁকিয়া থাকে; তাহাতে রৌদ্রের সময় পথ চলিতে মুখেচোখে রৌদ্র লাগে না। বিলাতি হ্যাটের মত, উহা নানাপ্রকারের হইয়া থাকে।

অবিবাহিত পুরুষগণ মাথায় টুপী পরে না, তাহাদের চুল বেণীবদ্ধ হইয়া

পৃষ্ঠে ঝুলিতে থাকে। আর নারী পক্ষে কুমারীগণ মস্তকে কোনরূপ অলঙ্কার ধারণ করে না। শুধু তাহা নহে, তাহারা কেশ-মার্জ্জন করে না, মাথাটি একটি ঝুপী জঙ্গল এবং নানা প্রকার কীটপতঙ্গাদির আবাসস্থল হইয়া থাকে। বিধাতার নির্ব্বন্ধে পাত্রসংযোগ ঘটিলে তখন নানা প্রকার চুল বাঁধিবার ধুম পড়িয়া যায়। পরে তাহার উপর অলঙ্কার চড়ে। সে অলঙ্কার যে কত প্রকারের তাহা আর কি বলিব। ধাতু প্রায়ই তাহার মধ্যে থাকে না; প্রবাল, প্রস্তর শম্বুক, কড়ি প্রভৃতি আয়তন ক্রমে যোজনা করিয়া তাহাই সেই রূপসীগণের মস্তকে শোভাবর্দ্ধন করিয়া থাকে। পুরুষগণ বিবাহিত

রূপসী পল্লীবাসিনী

হইলে তখন নানাপ্রকার টুপী উড়াইয়া চলে। অবশ্য লাসার দিকে সভ্যতা বা বেশভূষার পারিপাট্য অন্যবিধ। তবে সাধারণ ভদ্র অভদ্র সবারই বক্ষে একটি চতুষ্কোণ অথবা ষট্‌কোণ ধাতু নির্ম্মিত কবচ ঝুলিতে দেখা যায়। বড় লোকের সেটা স্বর্ণ ও রত্নাদি নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

তিব্বত যে লামার রাজ্য একথা বোধ হয় সাধারণের জানা আছে; সেই কারণে এদেশে ধর্ম্মযাজক বা সাধু-সন্ন্যাসীর প্রভাবই বেশী। দলাইলামা হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট গ্রামের একটি ছোট ধর্ম্ম-যাজকের ক্ষমতা সমাজ বা গৃহস্থের উপর একধারে বহিতেছে। এদেশের জনসাধারণের সর্ব্বপ্রধান আদর্শই লামাগণ। সর্ব্বোচ্চ আদর্শ দলাইলামা যিনি লাসা অর্থাৎ স্বর্গে বাস করেন।

তিব্বতীয়রা বহু কাল হইতে সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক শাসিত বলিয়াই শুধু যে প্রজাশক্তি এত ক্ষীণ হইয়াছে তাহা নয়, জলবায়ুর গুণেও ইহাদের অনেকটা

জড়বুদ্ধি ও উদ্যমহীন করিয়াছে ; ঘরে কোনরূপ যাহোক আহারের সংস্থান থাকিলে খাটিতে একেবারেই নারাজ।

এ দেশের সাধারণপ্রজা বা জমিদার সকলেরই একটি বিচিত্র সংস্কার যে লামা, সংসারত্যাগী বা ধর্ম্ম-যাজক, যে-কেহ সন্ন্যাস লইয়া ধর্ম্মাশ্রয় করিয়াছেন তিনিই ভগবান বুদ্ধের অবতার। তাঁহাদের পুজা ব্যতীত অন্য যাহা-কিছু সে সকল বৃথা কর্ম্ম। দেশের যাহা-কিছু ধনরত্ন তাঁহাদেরই, তাঁহাদের উপাসনাই ধর্ম্ম। প্রকৃতির নিয়মবশে সর্ব্বত্যাগীর নিকটেই ধনসম্পত্তি বেশী যায়। সুতরাং এদেশে মঠাধিকারীরাই যে শক্তিমান হইবে

গ্রাম্য কুমার গ্রাম্য কুমারী

তাহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে! সাধারণ প্রজার উপার্জ্জনের চার ভাগের এক ভাগ রাজকর, তা ছাড়া গ্রাম বা নগরের মঠস্থ সন্ন্যাসিগণের আবার কতকটা প্রাপ্য আছে। যে যত দিতে পারিবে তাহার পুণ্য এবং কীর্ত্তি তত অক্ষয় হইবে।

আমাদের পল্লীগ্রামে এটা নাই এমন নয়, তবে পার্থক্য এই যে, এখানে স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিচারে শতকরা নিরানব্বই জনের মধ্যে এই ভাবেরই

প্রভাব, আর আমাদের দেশে উহা নিম্ন শ্রেণীর অথবা নিরক্ষর নারীসমাজের মধ্যে অধিক প্রচলিত। পুরুষের মধ্যে উহা খুবই কম বলিতে হইবে, যেহেতু তাঁহাদের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা এবং তথাকথিত সামাজিক জ্ঞানের প্রভাব অল্পবিস্তর ঢুকিয়াছে।

সমগ্র তিব্বতের মধ্যে ইতর জনসাধারণের অর্থ উপার্জ্জনের যে-সকল পন্থা আছে তাহার মধ্যে ডাকাতি বা পরস্বাপহরণ অন্যতম। কাহারও টাকাকড়ি ও মালপত্র অথবা কোথাও পথে একদল মালদার যাইতেছে, তাহাদের নিকট অর্থাদি থাকা সম্ভব, এই সকল সুযোগ ইহারা কখনই ত্যাগ করে না। টাট্টু ঘোড়ার উপর চড়িয়া একত্র তিন চারিজন তাহারা ভ্রমণ করে। পৃষ্ঠে পুরাতন ধরনের বন্দুক, কটিতে তরবার, তাহা ছাড়া কোষবদ্ধ ছোরা, ভোজালী—এ সকল ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বাঁধা থাকে। হাতে চাবুকের মত ছোট একটি রুল ও মাথায় পানামা হ্যাটের মতই বড় বড় টুপী সর্ব্বদাই থাকে।

ডাকাতি অথবা পরস্ব অপহরণ কর্ম্ম ইহাদের ততটা অন্যায় বলিয়া বোধ হয় না, সুযোগ পাইলেই অশিক্ষিত সাধারণ ডাকাতি, লুটপাট বা খুন করে। ঐ সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ একবার, তুইবার, পাঁচবার, বা সাতবার পবিত্র কৈলাস পর্ব্বতটি প্রদক্ষিণ এবং উচ্চৈঃস্বরে সেই শুভ্রতুষার-মণ্ডিত কৈলাস-শিখরদেশকে লক্ষ্য করিয়া নিজ অপরাধের কথা উচ্চারণ করিলেই পাপক্ষয় হয়। পাপ গুরুতর বোধ হইলে প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ আমাদের দেশে যেমন বাবা তারকেশ্বরের মানসব্রতধারিগণ মুখে কুটা ধরিয়া, মুণ্ডিত মস্তকে দণ্ড কাটিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে করিতে পথ অতিক্রম করে, কেহ বা ঐরূপে ৺তারকনাথের মন্দির প্রদক্ষিণ করে, ইহারাও সেইরূপ অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া এ দিকের কঠিন পার্ব্বত্য পথ সকল অতিক্রম করিয়া কৈলাসে যায়। আরও বিচিত্র ইহাদের প্রায়শ্চিত্তের ফাঁকি যাহা আমাদের দেশে এখনও অজ্ঞাত—সেটি এই যে, এই প্রায়শ্চিত্তকামীদের মধ্যে কেহ নিজে অশক্ত বোধ করিলে প্রতিনিধি দ্বারা ঐ কর্ম্মটি নিষ্পন্ন করিতে পারে। আর একজন অর্থের বিনিময়ে তাহার হইয়া ঐরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া পরিক্রমাদি সম্পন্ন করিবে; তাহাতেই পাপ ক্ষালন হইবে। এইরূপে পাপ ক্ষালন করিয়া সে আবার পূর্ব্ববৎ নিজের কর্ম্ম করিতে থাকে। আবার লুটতরাজ, ডাকাতি, খুন

ইত্যাদি কর্ম্ম করে, আবার পাপ ক্ষালন;—এইরূপ হয়তো সারা জীবনই চলে।

লামাদের ইহারা কিছু বলে না। ভারতীয় সন্ন্যাসী গৈরিকধারী, তাহাদের ইহারা কিছু বলে না। সন্ন্যাসিগণের উপর ইহাদের অসীম শ্রদ্ধা।

ভোটিয়াদের মত ইহাদেরও পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরাই অধিক পরিশ্রমী। উদরান্নের জন্য ক্ষেত্রের কর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া রন্ধনাদি গৃহকর্ম্ম সকল এবং গালিচা বয়ন পর্যন্ত ইহারাই করে। পুরুষেরা ঘোড়ায় চড়িয়া পৃষ্ঠে বন্দুক বাঁধিয়া শিকারান্বেষণে বাহির হয়;—আর খরিদ-বিক্রির কাজও করিয়া থাকে।

ইহাদের নিকট যে বন্দুক থাকে উহা সেকালের গাদা বন্দুক। উহার দুইদিকে লম্বা লম্বা সঙ্গীনের খোঁচার মত দুইটি ঈষৎ বক্র-বাহু আছে, মাটিতে গাড়িয়া বা পুঁতিয়া ব্যবহার করিতে হয়। প্রতিবারই গাদিয়া পলিতা লাগাইয়া লক্ষ্য করিতে হয়। যদি তাক্ মাফিক লাগে তবেই, নতুবা এতটা পরিশ্রম বিফলে যায়।

হিমালয়ের ভারতীয় অথবা নেপালী প্রজা এদিকে যাহারা তীর্থভ্রমণের জন্য অথবা ব্যবসায় উপলক্ষে আসে, সকলেরই নিকট দুই-একটি করিয়া বিলাতি রিভলভার, বন্দুক প্রভৃতি থাকে। বিলাতী আগ্নেয় অস্ত্রকে ইহারা বড় ভয় করে। সকলেই জানে তাহার নিকট ইহাদের পৃষ্ঠবদ্ধ সেকালের গাদা বন্দুক কোন কাজেরই নয়। পিঠ হইতে খুলিয়া আগুন ধরাইয়া লক্ষ্য ঠিক করিতে করিতে তাহার আট-দশটি ফায়ার হইয়া যাইবে। উহাদের পৃষ্ঠের এই আগ্নেয় অস্ত্রটি পৃষ্ঠেই বদ্ধ থাকে, প্রায় নামে না এবং কার্য্যও অতি কম হয়, সুতরাং উহা ভয় দেখাইবার জন্যই বেশীর ভাগ ব্যবহৃত হয়। তাহার আসল ব্যবহারটি পর্য্যন্ত ইহাদের মনে আছে কি-না তাহাতে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিব্বত রাজ্যটি চিরকালই নিরুপদ্রব। এমনই প্রাকৃতিক সংযোগ যে, কোন অভাবই ইহাদের তীব্র নয়, সেজন্য দারিদ্র্য আছেই; তাহা ছাড়া সামান্য ভাবে কখনও কোন বিদেশী শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় নাই। সেই কারণে এখানকার প্রজাবৃন্দের শৌর্য্য-বীর্য্য যুদ্ধ-নিপুণতা বা উন্নতি নাই। যে-রাজ্যের প্রজাসাধারণের জীবনে তীব্র অভাববোধ নাই, বা পশ্চাতে শত্রু নাই, সে-রাজ্যের প্রজারা কখনই উন্নত,

পরাক্রমশালী এবং উদ্যমশীল হইতে পারে না। বহিঃশত্রু যে মনুষ্যকে ব্যক্তিগত এবং জাতিগতভাবে উন্নত ও শক্তিমান করিয়া তুলে ইহা বোধ হয় এখন এই বিংশতি শতাব্দীতে আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না।

কিছুদিন পূর্ব্বে লর্ড কার্জনের সময়ে তিব্বত অভিযানের ফলে একটু নাড়া পাইয়াছিল, কিন্তু তাহার ফল এ অঞ্চলে বড় কিছু হয় নাই, উহা লাসার দিকেই হইয়াছে। তবে এদিকে এইটুকু হইয়াছে যে, ভারতীয় প্রজাদের তিব্বতে ব্যবসা উপলক্ষে আসা ত দূরের কথা, তীর্থদর্শনে আসাও দুষ্কর ছিল; তাহা এখন সুলভ হইয়াছে। ইংরাজ কর্ত্তৃক গিয়াণ্টসি দখল ও দুই একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধের পর ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে লাসায় ইংরাজ এবং তিব্বতীয়গণের যে সন্ধি হয় তাহাতে যে সকল শর্ত্ত থাকে, তাহার মধ্যে একটি শর্ত্ত এই ছিল যে, ব্যবসা উপলক্ষে ব্রিটিশ প্রজাগণ গিয়াণ্টসি, ইয়াটাং এবং গড়তোক এই তিনটি স্থানে ব্যবসায় খুলিতে পারিবে। গিয়াণ্টসি দার্জ্জিলিং-এর অন্তর্গত কালিম্পং হইতে প্রায় দেড় শত মাইল, ইয়াটাং মধ্যস্থলে আর গড়তোক তিব্বতের পশ্চিমোত্তর সীমান্ত ঘেঁষিয়া, সিন্ধু নদের উপর অবস্থিত একটি প্রাচীন ক্ষেত্র, তাহাতে একটি বৃহৎ কেল্লা আছে। যাহা হউক, সেই সন্ধির পর হইতে ব্রিটিশ প্রজাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এই পথটি খুলিয়াছে, তাহাতে ব্যবসা-বাণিজ্য ত চলিতেছে বটেই, আমরাও মানস-সরোবর কৈলাস প্রভৃতি পুরাণোক্ত প্রাচীন স্থানগুলি দেখিবার চেষ্টায় এতদূর আসিবার সুযোগও পাইয়াছি।

যেদিন আমরা তিব্বতে পৌঁছিলাম সেদিন এবং তাহার পরদিন বিশ্রাম করিতেই কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে তাকলাখার মণ্ডীর চারিদিকে বেড়াইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া আসিলাম। সঙ্গী-মহাশয় কৈলাসে যাইবার সঙ্গী অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এখানে তখন সবেমাত্র পাঁচ-ছয়জন ভোটিয়া দোকান পাতিয়াছে। অনেকে পাল খাটাইতেছে, কেহ কেহ ঘরের দ্বার আঁটিতেছে। ইহাদের সঙ্গেই সকল রকম যন্ত্রপাতি থাকে এবং সকল কর্ম্ম আপনারাই করিয়া লয়। যাহারা দোকান ফাঁদিয়া বসিয়াছে তাহাদের দোকানের মধ্যে দুই-চারিজন তিব্বতী হুনিয়া আসাযাওয়া করিতেছে দেখা যাইত।

এখানকার দোকানগুলির চারিদিকে মাটি ও পাথরের প্রাচীর, একটি-

মাত্র দ্বার। উপরে ছাদের স্থানে, দুই দিকের ক্রমোচ্চ দেওয়ালের উপরে ঠিক মধ্যস্থলে লম্বালম্বি একটি মোটা রলা বা দণ্ড গাঁথা, তাহার উপরে মোটা পালের কাপড়, তাহার উপরে ত্রিপল দিয়া ঢাকা। আমাদের দোচালার মতই ব্যবস্থা। কার্ত্তিক মাসে যখন দোকান তুলিয়া ইহারা চলিয়া যায়, তখন উপরের আচ্ছাদনের কাপড়চোপড়, মধ্যের দণ্ড, মায় দ্বারগুলি পর্য্যন্ত খুলিয়া লইয়া অন্যত্র রাখিয়া যায়। তখন ঘরগুলির অবস্থা, উপরের আচ্ছাদন ও দ্বারবিহীন, ফাঁকা দেওয়ালগুলি খাড়া থাকে, যেন জনমানব-পরিত্যক্ত একখানি গ্রামের ধ্বংসাবশেষ।

প্রত্যেক দোকানঘরের ভিতর, চারিদিকেই কেবল দরজাটুক্ বাদে, দেওয়ালের ধারে ধারে, প্রস্থে প্রায় দেড় হাত পরিমাণ ফালি স্থানে আল দিয়া, নুড়ি পাথর বিছাইয়া তাহার উপরে মালপত্র সাজাইয়া রাখে; আর মধ্যে চতুষ্কোণ স্থানে চেটাই বা ফরাস পাতা থাকে। তাহার একপার্শ্বে অধিকারীর বসিবার ও শুইবার ফালি গদি বিছানো,—বাকী সমস্ত স্থানটুকুতে খরিদ্দার আসিয়া বসে। প্রত্যেক ঘরের পার্শ্বসংলগ্ন আর একটি ছোট ঘর থাকে, তাহাতে রন্ধনাদি হয়। ব্যবস্থা ইহাদের সকল দিকেই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

চৌদাসের অন্তর্গত শোঁসার পাটোয়ারী দিলীপ সিংহের কথা বোধ হয় পাঠকের মনে আছে, তাহার দাদা কিষণ সিংহ একজন সওদাগর, এই তাক্‌লাখারে প্রতিবৎসরই কারবার করে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই ভদ্রলোকটি এখন সবেমাত্র দোকান পাতিয়া মালপত্র গুছাইয়া রাখিতেছে, কতক বা পার্শ্বে গাদা দিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে। এমনই অব্যবস্থিত অবস্থায় সে আমাদের আশ্রয় দিল; বলিল,—আপনারা কিছু আগে আসিয়া পড়িয়াছেন, এখন বড় একটা যাত্রীরা আসে নাই। তা হোক, এখানেই আপনারা থাকিতে পারিবেন। আহারাদির জন্য চাল, ডাল, আটা প্রভৃতি যাহা প্রয়োজন হইবে তাহা লইবেন। আমরা কৃতার্থ মনে করিয়া তাহার আশ্রয়ে মালপত্র সমেত আপাততঃ কিছুদিনের জন্য রহিলাম। যথার্থ কথা এই যে, তখন আমাদের তিনজনকে একসঙ্গে আশ্রয় দিবার মত আর কেহ ছিল না। কিষণ সিং না থাকিলে আমাদের যে অশেষ কষ্টে পড়িতে হইত, আমরা বিপন্ন হইতাম, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

এসময়ে এখানে সকালে সন্ধ্যায় আমাদের পৌষ মাসের শীত,

দ্বিপ্রহরে অল্প গরম থাকে, তখন রৌদ্রের ঝাঁজ বড় বেশী হয়। বায়ু এত রুক্ষ যে গায়ে লাগিলে গা ফাটিয়া যায়, ক্ষণে ক্ষণে গলা শুকাইয়া উঠে। প্রায় বারোটা হইতে বৈকাল তিনটা পর্যন্ত এমন জোরে হাওয়া চলে, বোধ হয় যেন ঝড় বহিতেছে। তখন ঘরের উপরের পাল ত্রিপল প্রভৃতি যেন উড়াইয়া লইয়া যাইবার উপক্রম। এখানে তো বৃষ্টি প্রায়ই হয় না। যদি কখনও হয় বিন্দু বিন্দু হইয়াই বন্ধ হইয়া যায়। সেইজন্য মহাজনদের এখানে পালেই ছাদের কাজ চলে।

আমাদের দুদিন তাকলাখারে আসিবার পর তৃতীয় দিনে দেখা গেল, প্রাতঃকাল হইতে দলে দলে তিব্বতীয় নরনারী চড়াই ভাঙ্গিয়া উপরে পুরাং কেল্লা এবং শিমপি-লিং গোম্পার দিকে উঠিতেছে। চড়াইটি আধ মাইলের কিছু কম হইবে। দূরদূরান্তর গ্রাম হইতে স্ত্রী ও পুরুষ, নানারূপ পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া সারি সারি উঠিতেছে, আবার উপর হইতে সারি সারি আর একদল নামিতেছে। আর প্রাতঃকাল হইতে কাড়া নাকাড়া প্রভৃতি রণবাদ্য এবং সানাইয়ের আওয়াজ যেন হাওয়ায় ভাসিয়া মাঝে মাঝে কানে আসিতেছিল।

ব্যাপার কি, কিষণ সিংহকে জিজ্ঞাসায় জানা গেল যে,—উপরে গোম্পায় আজ একটা বৌদ্ধ পর্ব্ব আছে,—গুক্কু নামে প্রসিদ্ধ। প্রতি বৎসর এই সময়ে উহা হয়। সে বলিল, আপনারা যদি ইচ্ছা করেন অনায়াসে যাইতে পারেন, কোন বাধা নাই,—আমাদের একজন আপনাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইবে। সুতরাং আমরা সত্বর আহারাদি করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর প্রস্তুত হইলাম এবং একজন ভোটিয়া মহাশয়ের সঙ্গে চড়াই উঠিতে আরম্ভ করিলাম। দোভাষীর কাজ তাঁহার দ্বারাই চলিয়াছিল; নামটি তাঁর নয়ান সিং।

উঠিতে উঠিতে দেখিলাম, উপরদিকে পর্ব্বতগাত্রে কতকগুলি স্বাভাবিক এবং কতকগুলি মনুষ্য-নির্ম্মিত সুন্দর সুন্দর গুহা বা গহ্বর। এদিকের পাহাড়ে পাথর অপেক্ষা বালিমাটিই বেশী। উপরে, মধ্যে ও নীচে নিরেট মাটির এই গুহার শ্রেণী চলিয়াছে। সে গুহার মধ্যে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর আছে, ছোট ছোট মুক্ত প্রাঙ্গণও আছে। দ্বারে কপাট কোনটির আছে, কোনটির নাই, কপাটের পরিবর্ত্তে পরদা আছে। এ সকল গুহায় যাহারা গৃহহীন, ভৃত্য এবং মজুর ও মেষপালক শ্রেণীর লোক, তাহারাই

বাস করে। ইহার কিছু উচ্চে অপর গুহাশ্রেণীমধ্যে লামারা অনেকেই থাকেন। সকল সন্ন্যাসী মঠে থাকেন না। অনেকে একক প্রচ্ছন্নভাবে ভিন্ন গুহাতেও বাস করেন। তাহা ছাড়া মঠে বা গোম্পায় দেশ-শুদ্ধ লামাকে আশ্রয় দিবার মত এত স্থান কোথায়? কাজেই প্রকৃতির অনুকম্পায় এ দেশের সমস্ত লামা থাকিতে পারে এমন স্থানের সংস্থান এখানে পর্ব্বতের মধ্যে আছে। সহস্র সহস্র লামা এইভাবে স্বাভাবিক গোম্পায় অথবা যত্ননির্ম্মিত ঐরূপ পাহাড়কাটা গুহায় বাস করেন। পর্ব্বতের মধ্যে একটি স্থান ঠিক করিয়া যুবা লামাগণ কোদাল গাঁতি লইয়া নিজেরাই মনোমত গুহা প্রস্তুত করিতে লাগিয়া যান। চাষার ঘরের ছেলেরাই ত লামা হন, সুতরাং মাটি কাটিয়া গুহা প্রস্তুত করিতে, শুধু তা নয়, যত কিছু শ্রমজাত শিল্পকর্ম্ম আছে তাহা লামাদের জানা থাকে। তাহা ছাড়া, কোন লামা ইচ্ছা প্রকাশ করিলে গ্রামের যে-কেহ তাঁহার হুকুম তামিল করিয়া ধন্য হইবে। এ ত গেল লামাদের কথা। তিব্বতে এ অঞ্চলে, কটা লোকের ঘর-বাড়ী থাকে? বেশীর ভাগ দরিদ্র কৃষক, কারিগর মজুর, অবিবাহিত বা বিবাহিত প্রজাগণ—এইরূপ প্রকৃতিরচিত পর্ব্বতের মধ্যে মাটি কাটিয়া সহজভাবেই পরিষ্কার ঘরদ্বার বানাইয়া স্বচ্ছন্দে বাস করে। ইহার টেক্স খাজনা নাই। কেবল পরিশ্রম করিয়া বানাইয়া লইবার ওয়াস্তা। প্রকৃতির এরূপ স্বাভাবিক কৃপা আমাদের দেশের মানুষ পায় না। তবে ইহারা বড়ই অপরিষ্কার, ম্লেচ্ছভাবাপন্ন অবশ্য শীতপ্রধান দেশের গুণেই।

শিখরদেশে বড় বড় চারি-পাঁচখানি পুরী। পুরীগুলির উপাদান মাটি, কাঠ ও পাথর ছাড়া অন্য কিছু নয়। কাঠ কুটার কাজও নেহাৎ কম নয়। উপরের ছাদ খুলিয়া কোথাও কোথাও আলোর বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। কাঠ, মাটি ও পাথরের পোড়ানুড়ি-মিশ্রিত দেওয়াল, কোথাও বা পাহাড় কাটিয়া মাটি বাহির করিয়া দেওয়াল প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার উপর কড়ির মতই বড় বড় কাঠের চকোর, তাহার উপর সরু সরু কাঠের বিম লাগানো; উহা বরগার কাজ করিতেছে। তাহার উপর মাটি লেপিয়া ছাদ প্রস্তুত হইয়াছে। এখানকার অর্থাৎ তিব্বতের সকল কাঠের আমদানী নেপাল হইতেই হয়। বন-জঙ্গল এ রাজ্যে ত নাই। বনলক্ষ্মীর কৃপায় নেপালই অধিক সমৃদ্ধিশালী, ইহা ভারতের সর্ব্বজনবিদিত।

মধ্যে বৃহৎ পুরীটি পুরাং-এর প্রধান মঠ শিম্পিলিং গোম্পা,—দ্বিতীয়খানি জুম্পানপুশোর প্রাসাদ; তার পর বিচারালয়, পার্শ্বে সেনানিবাস। আর যে সকল বাড়ী আছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি বাড়ীতে কর্ম্মচারিগণ, সৈন্যগণ আর লামারা থাকেন। বাড়ীগুলির বাহিরের দৃশ্য যেরূপ, তাহাতে দেওয়াল গবাক্ষ প্রভৃতি আছে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ভিতরে গুহায় পরিপূর্ণ। গুহাই ওখানকার ঘর; পর্ব্বতগাত্রে গুহা কাটিয়া বাসের উপযোগী স্থান প্রস্তুত করিতে তিব্বতে যেমনটি দেখিয়াছি, এরূপ আর কোথাও দেখি নাই। শতাধিক ঘর লোক আছে এরূপ একখানি গ্রামে যত লোক ধরে, ক্ষুদ্র একটি পর্ব্বতের গাত্রে তত লোক গুহা কাটিয়া বাস করিতেছে। উহাই একখানি গ্রাম বলিলে কিছুমাত্র ভুল হয় না। এদিকে পাহাড়ে মাটিই বেশী। তিব্বতের পর্ব্বতগুলি দক্ষিণ হিমালয়ের মত অত অধিক উচ্চ নয়, সেই কারণে সমতল স্থানে প্রাচীর তুলিয়া গৃহনির্ম্মাণ অপেক্ষা এদেশের সকল শ্রেণীর অধিবাসিগণ এরূপ ভাবে পাহাড় কাটিয়া ঘর প্রস্তুত করাই সহজ বলিয়া মনে করেন।

এখন উৎসবের কথা যাহা বলিতেছিলাম। আমরা এখন তিব্বতের এই অঞ্চলের প্রধান পুরাং মঠ বা শিম্পি-লিং গোম্পার সিংদ্বারে উপস্থিত হইয়াই দেখিলাম সম্মুখে, বড় প্রাঙ্গণে তিব্বতীয় নরনারীর ভিড়। পার্শ্বে একস্থানে দামামা, নাক্কাড়া ও করতাল প্রভৃতি ঘোরনাদে ধ্বনিত হইয়া চারিদিক কাঁপাইতেছে। আমরা নয়ান সিংহের সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

প্রাঙ্গণের পার্শ্বে একদিকে অনেকগুলি গলি বা সুঁড়ি পথ আছে। সম্ভবতঃ উহা ভিতরের গুহাঘরে যাইবার জন্য; তাহার মধ্যে অনেকগুলি স্ত্রীপুরুষ ঠেলাঠেলি করিয়া ঢুকিতেছে ও বাহির হইতেছে। কেহ কাপড়-চোপড় আঁটিয়া পরিতেছে, কেহ বা হস্তস্থিত কোন বস্তু রাখিতেছে, কেহ বা কাহার স্থানভ্রষ্ট বস্ত্র বা অলঙ্কার যথাস্থানে পরাইয়া দিতেছে। স্থানটির চারিদিকেই মদের উৎকট গন্ধ।

প্রাঙ্গণ পার হইয়া আর একটি দ্বার, তাহা পার হইয়া দেড় হাত পরিমিত একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত ক্ষয়প্রাপ্ত পুরাতন সিঁড়ি। উহাতে অবিরাম জনপ্রবাহ ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি করিয়া যাওয়া আসা করিতেছে। আমরা সেই ভিড়ের সঙ্গে সঙ্গে উপরে উঠিলাম। উঠিয়া আবার একটি দ্বার দিয়া দক্ষিণে

বারান্দায় প্রবেশ করিলাম। সেখানেও যাতায়াত-রত দর্শকের সংখ্যা কম নহে। এই স্থানের পথ সঙ্কীর্ণ—বোধকরি উহা তিন হাতের উপর হইবে না। সকল পথই এখানকার সরু সরু,—সেই প্রাচীন প্রথায় নির্ম্মিত।

তাহার উপর অসংখ্য তিব্বতীয় পল্লী নর-নারীর যাতায়াত; সুতরাং একস্থানে একটু স্থির হইয়া দাঁড়াইবার যো নাই। আমরা সেই বারান্দা পার হইয়া জীর্ণ কাষ্ঠের সিঁড়ি দিয়া ছাদে উঠিলাম, সেখানে ভিড় অনেকটা কম ছিল। ছাদের সবটাই খোলা, কেবল নিম্নে প্রাঙ্গণ যতটুকু, কেবল তাহারই উপরে অনেকটা উচ্চে চন্দ্রাতপ আচ্ছাদিত, সুতরাং কতকটা ফাঁক থাকায় তাহার মধ্য দিয়া প্রাঙ্গণ বেশ দেখা যায়। দেখিলাম অনতিপ্রশস্ত দীর্ঘ প্রাঙ্গণ, তাহার উত্তর দিকের দেয়ালের সঙ্গে মিলিত চারি পাঁচটি ধাপের উপর একটি অনতিপ্রশস্ত বেদী। সেই বেদীর ঠিক উপরে রঙ্গমঞ্চের দর্শকের সম্মুখস্থ চিত্রিত যবনিকার মত সুন্দর একখানি বিশাল রেশমী বস্ত্রের পট; তাহাতে উপবিষ্ট বিশাল-শরীর ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি। দক্ষিণ হস্তে অভয় মুদ্রা, বামে যোগীর যুক্ত মুদ্রা। তাঁহার উপরে, নীচে, পার্শ্বে কয়টি অবতার-মূর্ত্তি চিত্রিত। উপরে মৈত্রেয় বুদ্ধের মূর্ত্তি, পার্শ্বে রামসীতা-মূর্ত্তি, নীচে নরসিংহ, চীনের ড্রাগনের আকৃতি মারের মূর্ত্তি, আরও অন্যান্য অনেক দেবমূর্ত্তি চারিদিকেই চিত্রিত আছে, তাহার মধ্যে আমাদের যমরাজার মূর্ত্তিই বিশেষ লক্ষণীয়।

পটখানি আগাগোড়া রেশমী বস্ত্রের উপর বিবিধ বর্ণের রেশমী সূতায় বোনা। আশ্চর্য্য প্রণালীতে নির্ম্মিত, রং তুলি দিয়া আঁকা নহে। দেখিবার একটি অপূর্ব্ব সামগ্রী। ইহা এই দেশে প্রস্তুত কিংবা চীনে প্রস্তুত তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যদি এখানকার হয়, তবে সেটি চীনের অনুকরণ মাত্র। সে পটখানির পশ্চাতে মন্দিরের উচ্চচূড়ার মত দেখাইতেছিল, উহা আমাদের দেশের মত নয়। সেই প্রধান বেদীর চারি পাঁচটি ধাপ, তাহার উপর শ্রেণীবদ্ধ পিত্তলনির্ম্মিত দীপাধার রক্ষিত। প্রত্যেকটিতে মাখন দেওয়া, জ্বালিবার জন্য প্রস্তুত আছে, তবে এখনও জ্বালা হয় নাই। বেদীর পার্শ্বে উচ্চ, প্রকাণ্ড একটি আধারে মাখন রহিয়াছে। এদিকে চমরীর মাখনেই দেবালয় বা মঠের দীপ জ্বলে। উহাতে জলীয় অংশ মোটে নাই বলিলেই হয়, সেইজন্য মোমের মত সবটাই জ্বলে। গৃহস্থ গ্রামবাসী সকলে মিলিয়া ঐ মাখন সরবরাহ করে। এদেশে উৎপন্ন

মাখন অধিকাংশ চা পান, ও নিজ নিজ ঘরের এবং মঠের দীপ জ্বালিতেই ব্যয় হয়।

আশেপাশে মোটা গোলাপী রঙের তিব্বতী ধূপের কাঠি জ্বলিতেছে, তাহাতে সেই স্থানে একটি উগ্র বিজাতীয় গন্ধ বাহির হইতেছে, যাহা সুগন্ধ মোটেই নয়;—সঙ্গে তাহার আরও একটা চামসা গন্ধ মিশানো। অপ্রশস্ত সেই বেদীর ঠিক সম্মুখেই প্রাঙ্গণের এপারে, ঐ বেদীর দিকে মুখ করিয়া বসিবার মত পুরু আসন যুক্ত আরও একটি উচ্চ বেদী। উহা মঠের প্রধান লামা বা মোহান্তের বসিবার স্থান, আর সেই বড় বেদীর দক্ষিণ পার্শ্বে লম্বা লম্বা কাষ্ঠের তক্তা; তাহার উপর পৃথক পৃথক, পুরু, রক্তবর্ণ বস্ত্রে নির্ম্মিত আসন শ্রেণীবদ্ধ রাখা আছে। এইরূপ চারি-পাঁচটি সারি, প্রত্যেক সারিতে প্রায় সাত-আটজনের বসিবার আসন; প্রত্যেক আসনের সম্মুখে প্রায় এক হাত উচ্চ ছোট ছোট কাষ্ঠের চৌকি, উহার উপর জলপাত্র, চায়ের পেয়ালা প্রভৃতি থাকে। পার্শ্বের বারান্দার মধ্যেও ঐরূপ অনেক আসন পাতা আছে, তবে উহার সম্মুখে পাত্রাধার কাঠের চৌকি নাই।

মধ্যস্থিত সর্ব্বোচ্চ প্রধান বেদীর বামে একখানি অন্ধকার ঘর বা কুটুরীর মত। সেটি প্রাঙ্গণতল হইতে বেশ কতকটা নীচু হইবে। আমরা ছাদের উপর হইতে দেখিতে পাইতেছি, ঘরের মধ্যে কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রকাণ্ড উপুড়-করা একটি প্রকাণ্ড ঢাকের মত। সেটি একটি মানুষ অপেক্ষাও দীর্ঘ এবং তাহার বাহ্যাংশ চিত্রবহুল;—কেন্দ্রে তদুপযুক্ত ভারসহ একটি লৌহদণ্ডে আমূল বিদ্ধ এবং ভূগর্ভে প্রোথিত। ইহাই বৌদ্ধ ধর্ম্মের ঢাক। মধ্যস্থলে কতকগুলি রজ্জু সংলগ্ন আছে, তাহাই ধরিয়া টানিয়া যাত্রীরা চারিদিকে সেটি ঘুরাইতেছে এবং তাহার সঙ্গে ঘণ্টা সংলগ্ন থাকায়, আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টাধ্বনি চলিতেছে। ঢাকের উপর নানারূপ মূর্ত্তি বিবিধবর্ণে চিত্রিত আছে।

বুদ্ধদেব নূতন ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, যে উহা গ্রহণ করিয়া তাঁহার শরণ লইবে তাহার পরমপদ, নির্ব্বাণপ্রাপ্তি ঘটিবে। এটি তাহার স্থূল বা সঙ্কেত অভিনয়। স্ত্রী-পুরুষ অনেকে এই ধর্ম্মরজ্জু ধারণ করিয়া নিজেরা চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে সেটিকেও ঘুরাইতেছে।

প্রাঙ্গণের সকল আসনই শূন্য, সেখানে এখন কোন লোকজন দেখিলাম

না। তাহার পর আমরা ছাদ হইতে নামিয়া পুনরায় বারান্দার আর একটি পথ দিয়া প্রধান মন্দিরের চারিদিক তিনবার প্রদক্ষিণ করিলাম। তখন মন্দিরের দ্বার বন্ধ ছিল, কাজেই তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলাম না। প্রদক্ষিণের যে পথ বা গলি, তাহার চারিধারেই অন্ধকার। উহা যে সঙ্কীর্ণ তাহা বোধ হয় আর বলিতে হইবে না। ঊর্দ্ধ অধঃ দুই পার্শ্বের ভিত্তি এবং পথগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম। মন্দিরের বাহিরের দেয়ালে ও মধ্যে সংলগ্ন কাষ্ঠের অনেকগুলি ছোট ছোট ঢোলকের আকৃতি, মধ্যে লৌহ-শলাকাযুক্ত ঘূর্ণনোপযোগী চক্র আছে। যাত্রিগণ সকলে একবার অঙ্গুলি ও হস্ততালুর সাহায্যে উহা ঘুরাইতে ঘুরাইতে অগ্রসর হইতেছে। ঘুরাইবার সময়ে কাষ্ঠ এবং লৌহ-কীলকের ঘর্ষণে পক্ষিকুল-কলরবের মত একপ্রকার শব্দ বাহির হইতেছিল।

এখানে সব-কিছু প্রদক্ষিণের ব্যাপার, সকলেই প্রদক্ষিণ করিতেছে। তাহার পর আমরা আরও একটি ছোট জীর্ণ কাষ্ঠের সোপান আরোহণ করিয়া প্রধান লামার ঘরে গেলাম। ছোট ঘরটি সর্ব্বত্রই ধূলায় পরিপূর্ণ।

একদিকে উচ্চ লম্বা একটি কাষ্ঠাসন, তাহার উপরে খুব পুরু মোটা গদি, তাহার উপরে একখানি কম্বলের আসন। তাহার উপর শিম্পিলিং গোম্পার বড় লামা মহাশয় বসিয়া আছেন। সম্মুখেই রক্তাম্বর-পরিহিত দীর্ঘ শরীর দুইজন লামা তাঁহার আজ্ঞার অপেক্ষায় সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া।

এই যে শিম্পিলিং গোম্পার প্রধান মোহান্ত বা লামা তিনি রাজধানী লাসা হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া আসেন। এই মঠের প্রধান লামা হইয়া কাহারও আজীবন কাটাইবার নিয়ম নাই। পাঁচ-সাত অথবা দশ বৎসর অন্তর একজন করিয়া লাসা হইতে আসিয়া মোহান্ত লামার নিকট হইতে এখানকার সকল দায়িত্ব বুঝিয়া লইলে পর তখন ভূতপূর্ব্ব মোহান্ত লাসার দিকে যাত্রা করেন। ব্যাপারটি আমাদের ভারতের রাজপ্রতিনিধি বদলের মত। নূতন মোহান্তের আগমন এবং পুরাতনের প্রস্থান উপলক্ষে মঠে একটি উৎসব হয়। যাহা হউক, এ অঞ্চলে এই পুরাং মঠই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বাকীগুলি সব এই মঠেরই অধীন। শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এবং সাধক না হইলে এ মঠের মোহান্তের পদটিতে অন্য কেহ অভিষিক্ত হইতে পারেন না। এখন আমরা লামার ঘরে প্রবেশ করিলাম।

সম্মুখের গৃহভিত্তিতে একটি বেদী, তাহার উপরে পিতলের বুদ্ধমূর্ত্তি, আশেপাশে আরও ছোট ছোট অনেক মূর্ত্তি আছে। পার্শ্বের দেওয়ালে কাঠের পাটাতন। তাহার উপর চিত্রিত মলাটযুক্ত রক্তবর্ণ সূত্রে বদ্ধ বহুকালের প্রাচীন, সংগৃহীত ধর্ম্মপুস্তকরাশি স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। পুঁথির আকৃতি আমাদের দেশের পুঁথি অপেক্ষা অনেক বড়। ঐ সকল পুস্তক যে কতকালের তাহা বলা যায় না এবং উহা যে ব্যবহৃত হয় না, কেবল সজ্জিত আছে, তাহা দেখিলেই বুঝা যায়। উপরে খানিকটা পুরু ধূলা জমিয়া আছে।

কতকগুলি বৃহদাকার পুস্তক দেখিলাম, উহা লাল কাপড় দিয়া ঢাকা, যেন অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দিরস্থ গুরু-দোয়ারার মধ্যে রক্ষিত গ্রন্থসাহেব।

সঙ্গের দোভাষী নয়ান সিং লামার নিকট আমাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন। বলিলেন, ইহারা কলিকাতা হইতে মানস সরোবর ও কৈলাস দর্শনের জন্য আসিয়াছেন। আমরা লামাবরকে মাথা নীচু করিয়া নমস্কার করিলাম। তিনি আমাদের ঘাড়ে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং এক এক গুচ্ছ লাল রঙের সূত্র গলায় পরাইয়া দিলেন। সঙ্গী-মহাশয় উহা গ্রহণ করিয়া হাতে রাখিলেন, পরে একেবারে বড় লামার পার্শ্বে সেই গদীর আসনে গিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাহাতে ঐ প্রতিহারী লামাদের মধ্যে একজন লামা তাহাদের ভাষায় তাঁহাকে উঠিয়া যাইতে বলিলেন, সঙ্গী-মহাশয় সে দিকে লক্ষ্যই করিলেন না। সঙ্গের সেই দোভাষী ভদ্র ভোটিয়া মহাশয় বলিলেন, 'ই ক্যা হ্যায়, উহাঁ আপ লোকোন কো বৈঠনেকী জায়গা নেহি।' আমরা বুঝিলাম যে লামার সহিত ঐরূপ একাসনে বসাই বড় দোষ। লামা না হইলে অন্যের তাহাতে অধিকার ত নাই-ই তাহা ছাড়া ইনি যখন এখানকার প্রধান লামা। তখন পণ্ডিতজী অপ্রতিভের হাসি হাসিয়া—হাম্ কাশীজীকা লামা হ্যায়;—বলিলেন, তিনি কাশীর সন্ন্যাসী, অর্থাৎ শিম্পিলিং গোম্পার প্রধান লামার কাছে কাশীর লামা বসিয়াছে তাহাতে এমন কি দোষ হইয়াছে, দুজনেই ত লামা।

প্রধান লামা মহাশয় মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ ব্যক্তি কি বলিতেছে? তখন সেই দোভাষী বুঝাইয়া দিলেন, ইনি বলিতেছেন, ইনি কাশীর লামা। তাহা শুনিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন এবং পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—সে কোথায়? দোভাষী তাঁহাকে

বুঝাইলেন যে উহা হিন্দুদের একটি পবিত্র তীর্থস্থান। কিন্তু অন্য দুইজন লামা যাঁহারা দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহারা রোষকশায়িত নেত্রে বার বার আমাদের দিকে চাহিতে লাগিলেন। নাথজী ও আমি লামার নিকট হইতে একটু দূরে আসন গ্রহণ করিয়াছিলাম।

প্রধান লামা

বড় লামার বয়স আন্দাজ ষাটের উপর পাঁচ-ছয় বৎসর হইবে। পূর্ণ মুণ্ডিত মস্তক, পাকা পাকা দুই-চারিগাছি গোঁফ এবং দাড়ি সযত্নে রাখা আছে। মূর্ত্তিটি সৌম্য, ধীর এবং শান্ত, মুখে কথা নাই, সদাই হাসি। চক্ষু তাঁহার একে ক্ষুদ্র যাহা তিব্বতীয়গণের বিশিষ্টতা, তাহার উপর যখন তিনি হাসিতেছিলেন, চক্ষু দুটি একেবারে বুজিয়া একটি রেখামাত্র দেখাইতেছিল। মঞ্চের উপর আসনে তিনি বসিয়া আছেন, মধ্যে মধ্যে প্রয়োজন হইলে হাত নাড়িতেছেন, কিন্তু শরীর এবং নিম্ন অঙ্গ মোটেই নড়িতেছে না। সম্মুখে পুস্তকাধার, তাহার উপর খোলা ধর্ম্মপুস্তক,—মধ্যে মধ্যে তাহাতে মনোনিবেশ করিতেছেন।

সঙ্গী-মহাশয় হিন্দীতে তাঁহার নিজের সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিলেন; তাহার পর লামা তারানাথের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তারানাথ

কো চিন্‌তা হ্যায়? উন্‌কো বহুত কিতাব হ্যায়, হাম ওসব পড়া হ্যায়, ও হামারা দেশকা আদমী হ্যায়।

তারানাথ বঙ্গবাসী মহাপুরুষ, অনেকদিন চীন তিব্বত প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। শেষে মঙ্গোলিয়ার অন্তর্গত উর্গানগরের প্রধান লামা হইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত, চীন, তিব্বতীয় ভাষায় মহাপণ্ডিত ছিলেন, অনেকগুলি সংস্কৃত এবং পালি বৌদ্ধ গ্রন্থ তিব্বতীয় এবং চীনা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরীতে কতক গ্রন্থের অনুবাদ আছে। এ অঞ্চলের কেহ তাঁহার নামও শুনে নাই। লামা মহাশয় কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কেবল মুদিত চক্ষে মৃদু হাসিতে লাগিলেন, পরে তিনি সম্মুখস্থ পুস্তকে মনোনিবেশ করিলেন।

আমরা এইবার উঠিব;—উঠিবার সময় সঙ্গী-মহাশয় তাঁহার গীতা একখানি বড় লামাকে উপহার দিলেন। তিনি উহা গ্রহণ করিয়া একবার খুলিয়া দেখিলেন। পরে দোভাষীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এখানি কি পুস্তক? সঙ্গী-মহাশয় চীৎকার করিয়া বলিলেন—এ শ্রীমৎভগবদ্গীতা হ্যায়, হাম ইস্কো অনুবাদ কিয়া হ্যায়, আপকো গ্রন্থগার মে রাখ দেও।

ভগবান জানেন এতটা বুঝাইবার প্রচেষ্টা কতটা সফল হইল। দোভাষী মহাশয় সেখানি ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন; তিনিও হাসিতে হাসিতে ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন যে উহা গ্রহণ করিয়া খুশী হইয়াছেন।

লামাকে নমস্কার করিয়া আমরা উঠিলাম এবং অপর একপথে একটি ঘরের মধ্যে ঢুকিলাম। সে ঘরখানি একটি প্রকাণ্ড পুস্তকাগার, সেখানেও ঐরূপ স্তরে স্তরে বিচিত্র আবরণবিশিষ্ট পুস্তকের রাশি সজ্জিত রহিয়াছে। সঙ্গী-মহাশয় এখানেও লামাদের সঙ্গে ঐরূপ হিন্দী ভাষায় কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন; প্রারম্ভেই তাঁহারা হাত নাড়িয়া জানাইলেন যে ও ভাষা কিছুই বুঝেন না কিন্তু তাঁহাদের কথাও বুঝা গেল না। দোভাষী মহাশয় তখন অন্যদিকে। এখানকার পুস্তকগুলিও প্রাচীন; মধ্যে মধ্যে ঝাড়া-মোছাও হয়, সে কারণ বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা আছে, তবে নিত্য ব্যবহার হয় কি-না সন্দেহ।

তাহার পর আর একদিকে আর একখানি ঘরে যাওয়া গেল। দেওয়ালে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র এবং ভিতরের ছাদ হইতে লোহার শিকলে বাঁধা একটি

চমরীমুণ্ড

প্রকাণ্ড চমরীর মুণ্ড ঝুলিতেছে। দেখিতে বড় ভয়ঙ্কর, এতবড় চমরীর মুণ্ড কোথায়ও দেখি নাই। আমরা কতক্ষণ ধরিয়া এই আশ্চর্য্য দৃশ্যটি দেখিলাম।

এবারে সকলে আমরা নীচে নামিলাম। দ্বিতলে এখন উপাসনা-মন্দিরের দ্বার খোলা হইয়াছে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম অন্ধকার চারিদিক, অনেকটা দূরে যেন একটু আলোক দেখা যাইতেছে। প্রকাণ্ড মন্দির, ভিতরের চারিদিকই চিত্রিত, যেন একটি নাট্যশালা। উহার ভিতরে মধ্যে মধ্যে কাষ্ঠের স্তম্ভ, মধ্যের কতকটা ছাদ খোলা আছে। আরও ভিতরে গিয়া দেখিতে পাওয়া গেল সম্মুখে উচ্চ বেদী, তাহার উপর একটি পাঁচ-ছয় হাত উচ্চ, উপবিষ্ট আলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি, সোনালী রং-করা। বুদ্ধগয়ার মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে যেমন একটি সোনালী রং-করা বিশাল দারুমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, এটিও সেইরূপ, শতদল পদ্মের উপর স্থাপিত। বেদীর নীচে সারি সারি দীপাধারে দীপ জ্বলিতেছে।

বেদীর সম্মুখে আসনের শ্রেণী, সামনাসামনি রাখা। বেশ প্রশস্ত, উচ্চ কাষ্ঠমঞ্চের উপর দুই সার, রক্তবস্ত্রে প্রস্তুত পুরু গদীর আসন বিস্তৃত। তাহার উপর লামাগণ বসিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন।

আমাদের অজন্টা গুহাচিত্রমধ্যে যে ভাবের স্থাপত্য চিত্রিত আছে এখানকার স্থাপত্য অবিকল সেই শ্রেণীর। সেইরূপ সরু সরু দারুনির্ম্মিত স্তম্ভশ্রেণী, বিবিধ বর্ণে চিত্রিত। আবার কোথাও এক বর্ণেরই প্রলেপ। এখানকার বারান্দা, চত্বর, প্রাঙ্গণপার্শ্বের সকল স্থান, মন্দির অভ্যন্তর—সর্ব্বত্রই এই স্থাপত্য বিদ্যমান। সহজেই অনুমান করিতে পারি প্রাচীন ভারতের সঙ্গে তিব্বতের যোগ ছিল। কতটা ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল এখানকার প্রত্যেক মঠ এবং সাধারণ গৃহে প্রবেশ করিলেই নিশ্চিত বুঝিতে পারি।

যাহা হউক, সেই প্রশস্ত মন্দিরের চারিভিতে যে সকল অংশ স্পষ্ট আলোক-বর্জ্জিত সে সকল স্থানেও একত্র অনেক লোক পৃথক পৃথক বসিতে পারে এরূপ ভাবে চৌকির উপর পুরু আসনের সারি। ঘরখানি যেন প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে পূর্ণ রহিয়াছে। ধ্যান ধারণা অভ্যাসের অতি উপযুক্ত স্থান। নিয়মমত লামাগণ প্রত্যহ এখানে দুই বেলা আসিয়া উপাসনা এবং শেষে ইচ্ছামত ধ্যানে বসেন। যাঁহার মন কখনও একাগ্র হয় না, তিনি যদি এখানে আসিয়া কিছুক্ষণ বসেন তাহা হইলে বোধ হয় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার অসংযত চিত্ত সংযত এবং নির্দ্দিষ্ট কোন বিষয়ে সহজেই একাগ্র হইয়া আসিবে। মন্দিরমধ্য ধূপের সুগন্ধে আমোদিত করিয়াছে।

মন্দির হইতে বাহির হইবা মাত্র আমাদের সহচর সেই ভোটিয়া দোভাষী বলিলেন, প্রাঙ্গণে এখন উপাসনা হইবে, চলুন সেখানেই যাওয়া যাক। তখন পুনরায় সেই মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে যেখানে বেদীর উপর বুদ্ধদেবের বিশাল পট ঝুলিতেছিল,—সেই অঙ্গনের উপর বারান্দায় গিয়া আমরা জীর্ণ অপ্রশস্ত রেলিং-এর ধারেই কতকটা স্থান অধিকার করিয়া একেবারে বসিয়া পড়িলাম। বারান্দায় অসম্ভব ভীড় দেখিলাম, বোধ হয় তিলধারণের স্থান নাই। বেদীর দীপগুলি তখন জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু লামাগণ তখনও কেহই আসেন নাই।

এখানে লামা বলিতে সর্ব্বত্যাগী বুঝায়। তাঁহারা সর্ব্বত্রই মুণ্ডিত মস্তক, লোহিত বস্ত্রধারী। আমাদের দেশে যেমন শঙ্করাচার্য্যের সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের মধ্যে গৃহত্যাগী এবং কুমার ব্রহ্মচারী প্রভৃতি শ্রেণী, এখানেও তদ্রূপ। এক শ্রেণীর লামা, তাঁরা চিরকুমার, শাস্ত্রজ্ঞ, তপস্বী, সাধক, যোগী যাহা-কিছু। এই শ্রেণী হইতেই মঠের মোহান্ত নির্ব্বাচিত হন। আর এক শ্রেণীর লামা, তাঁহারা গৃহী ছিলেন, স্ত্রী-পুত্র লইয়া ঘর করিতেন, পরে কোন কারণে বৈরাগ্য হওয়ায় সন্ন্যাস লইয়া ভজন, সাধন, তপস্যা কিংবা ধর্ম্মশাস্ত্র চর্চ্চা করেন। আর একশ্রেণীর লামা আছেন, তাঁহারা ভিক্ষুক শ্রেণীর, পর্য্যটন করাই ইঁহাদের কাজ। তবে এরূপ লামাদের সংখ্যা কম। ইহা ছাড়া মঠের বালক ব্রহ্মচারী অনেকগুলি আছেন, তাঁহাদেরও মুণ্ডিত মস্তক, লামাগণের মত রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ। মঠে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস এবং অপরাপর জ্যেষ্ঠ লামাগণের সেবা করাই তাঁহাদের কাজ। সেবা অর্থে জ্যেষ্ঠদের নিজ নিজ আসনে, ভোজ্য সামগ্রী পরিবেশন এবং সর্ব্ব-প্রকারে আজ্ঞাপালন। তাঁহারা সকলেই যে লামা হইবেন এমন কোন কথা নাই, অথবা পরবর্ত্তীকালে বিবাহাদি করিয়া সংসার প্রবেশেও বাধা নাই। কেহ বা আর সংসারে না গিয়া ধর্ম্মসাধন উদ্দেশ্যে যথারীতি দীক্ষিত হইয়া কোন মঠেই হউক বা বাহিরে কোনও একটি গুহা আশ্রয় করিবেন।

ইঁহাদের সাধন-প্রণালী বিস্ময়কর এবং সংযমও অসাধারণ। বাকসংযমই সর্ব্বপ্রথম এবং ইঁহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে কথা কওয়া আদৌ নিয়মবিরুদ্ধ। প্রয়োজনেও কাহাকে ডাকিতে হইলে, নিকটে হইলে ইঙ্গিতে, দূরে দৃষ্টির আড়ালে হইলে ঘণ্টা বা কোনরূপ সাঙ্কেতিক শব্দের দ্বারা।

লামা সাধকগণ অধিকাংশই আসনসিদ্ধ। ভগবান বুদ্ধদেবের, ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্,—সেই প্রতিজ্ঞা, সেই দার্ঢ্যই যেন শিষ্যপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখানকার পর্ব্বতগুলি গুহায় পরিপূর্ণ। দীক্ষিত হইয়া সাধক, মঠের মধ্যেই হউক বা বাহিরেই হউক একটি মনোমত গুহার মধ্যে একটি বেদী প্রস্তুত করিলেন। সেই বেদীতে বুদ্ধের একটি ধ্যানমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাহাতেই বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ আবির্ভাব অনুভব করিয়া ভজন-সাধনা আরম্ভ করিলেন। প্রারম্ভে, বেদীর সম্মুখে মোটা কম্বল, মৃগ বা ব্যাঘ্রচর্ম্মাদি দ্বারা নিজের মনোমত একটি আসন প্রস্তুত করিয়া পরে সঙ্কল্প স্থির করিয়া আসনে উপবেশন পূর্ব্বক জপ, ধ্যান আরম্ভ করেন। এইরূপে একাদিক্রমে এক দুই মাস করিয়া বৎসরাবধি চলে। কেহ কেহ চারি পাঁচ অথবা ছয় বৎসর অবধি, অবাধে একাসনে থাকেন।

সাধন অবস্থায় কেহ তাঁহার নিকট এক পেয়ালা চা, ছাতু প্রভৃতি প্রয়োজনমত রাখিয়া যায়; সাধক, সময় এবং ইচ্ছামত সেইগুলি ব্যবহার করেন। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে এক একবার উঠিয়া সেইখানেই একটু পাদচারণ করেন মাত্র,—এইটুকুই তাঁহাদের শারীরিক পরিশ্রম।

প্রথমতঃ কোনরূপ কঠিন শারীরিক পরিশ্রম না থাকায় গুরু আহারের প্রয়োজন হয় না,—তাহার উপর শরীর স্থির থাকে, কোনরূপ অসংযত চালনা আদৌ হয় না, মন নিয়তই উচ্চ ভাব লইয়া একাগ্র থাকে, সে কারণে ক্ষুৎপিপাসা অনুভব হয় না। চারিদিক বন্ধ অন্ধকার গুহামধ্যে শারীরিক চাঞ্চল্য ঘটিবারও সম্ভাবনা থাকে না, যেহেতু সাধকের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সাধনের অনুকূল। সেই সকল কারণে সাধকগণ এত দীর্ঘকাল একাসনে থাকিতে পারেন। এখানকার প্রকৃতি আকাশ, বায়ু, জল, মাটি, সূর্য্য-তেজ সমস্তই অত্যন্ত রুক্ষ এবং সেই কারণেই উহা সাধনের অনুকূল। এখানকার জলবায়ুতে শরীর শুকাইয়া যায় বটে, কিন্তু ক্ষয় হয় না। মাটিতে ধারণ শক্তি এবং বায়ুতে ওজঃ খুব বেশী পরিমাণেই আছে। সাধকেরা এইরূপে দীর্ঘকাল কাটাইয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইলে তখন বাহিরে আসেন; কেহ কেহ একেবারে ঐরূপে আসনে বসিয়া সমাধিস্থ হইয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছেন এরূপও শুনা গিয়াছে। তবে বহুকাল একাসনে বদ্ধভাবে বসা অভ্যাসের ফলে তাঁহাদের পদদ্বয় অকর্ম্মণ্য, অনেকটা পঙ্গু হইয়া পড়ে

এবং শরীরও কতকটা শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া যায়। আমাদের ভারতে স্থানে স্থানে উর্দ্ধ-বাহু সন্ন্যাসী আছেন, হয়ত অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। তাঁহাদের উর্দ্ধোত্থিত হস্তটি যেমন শীর্ণ এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে, ইঁহাদের পদদ্বয়ের অবস্থাও সেইরূপ হয়। এখানকার যিনি বড় লামা তাঁহাকেও পা দুইটি ঐরূপ আসন অভ্যাসে শীর্ণ এবং রক্ত চলাচলের অভাব হেতু বিবর্ণ, তাহার উপর পুরু একটা ময়লা ছাল এবং নখগুলি দীর্ঘ ও বক্র হইয়া গিয়াছে। তাঁহার ঘরে যখন গিয়াছিলাম ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছিলাম। মলমূত্র ত্যাগের সময় অথবা কোন বিশেষ পর্ব্ব উৎসব ব্যতীত তাঁহাদের পাদ চালনার প্রয়োজন হয় না। নিজ নিজ সাধন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, শিষ্যগণকে উপদেশ, যাহা কিছু কর্ম্ম আসনে বসিয়াই চলে।

এখানে লামাদের মধ্যে অনেকের সিদ্ধি বা যোগৈশ্বর্য্যের কথাও শুনা যায়। আসল কথা এই যে, আমাদের ভারতীয় পাতঞ্জল যোগ দর্শন, শিব, ঘেরণ্ড, অষ্টাবক্র ও যোগী যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির মধ্যে যে সকল যোগ-ক্রিয়ার উল্লেখ আছে, লামাগণ সেই সকল যোগ-ক্রিয়া অবলম্বন করিয়াই মহা-শক্তিমান। শাস্ত্রের নাম এবং কতকগুলি পারিভাষিক শব্দমাত্র পৃথক ;—অনুষ্ঠানে একই। এই ভাবে ভারতীয় যোগসাধনের ধারা এখানে চলিতেছে এবং ইহা উভয় দেশেই কি বিদ্বান্, কি মূর্খ সাধারণ জনগণের নিকট একটি গুহ্য রহস্য হইয়া রহিয়াছে। ভারতে পাতঞ্জলোক্ত কৈবল্যের অন্যবিধ উপায় রাজযোগ,—তাহার অন্তর্গত যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান সমাধি ইহা যেমন অষ্টাঙ্গ যোগ বলিয়া প্রচলিত, বৌদ্ধদের ধর্ম্মসাধনের মধ্যেও সেইরূপ সম্যক সঙ্কল্প, দৃষ্টি, বাক্, কর্ম্ম, জীবন, ব্যায়াম, স্মৃতি ও সমাধিই নির্ব্বাণলাভের উপায় হিসাবে প্রচলিত। আসলে দুইই এক, কেবল নামগুলি ভিন্ন। ইহার পর আবার তন্ত্রের প্রক্রিয়াও সেই সঙ্গে চলে। উচ্চ অধিকারীরা সকলেই তন্ত্রমতের সাধন দ্বারাই উন্নত এবং অশেষ যোগৈশ্বর্য্যের অধিকারী হন।

লামাসাধকগণের সাধনে জপেরই আধিক্য দেখা যায়। জপ-প্রণালী বহুবিধ ;—মালাজপ, করজপ, জিহ্বা নাড়িয়া জপ, মানস জপ প্রভৃতি নানা প্রকার আছে। কিন্তু সাধারণের মধ্যে এক নূতন ব্যাপার দেখিতেছি। ইহারা অসংযত চঞ্চল মনকে সহজে কেন্দ্রস্থ করিবার জন্য অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক কৌশল প্রয়োগ করিয়া থাকেন। একপ্রকার যন্ত্র আছে তাহা

সহজে ঘুরাইয়া জপ চলে। মালা অপেক্ষা ইহারই চলন এখানে খুব বেশী, লক্ষ্য করিয়াছি।

সাধারণতঃ শুষ্ক মাংস, ছাতু এবং চা লামাগণের আহার, মদ্যপান নিষিদ্ধ। কেহ কেহ মাংসাদি কোন প্রকার আমিষ ভক্ষণ করেন না;— সেটা অনেকটা নিজ নিজ রুচির উপর নির্ভর করে। এই পুরাং মঠে বয়স্ক ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসী লইয়া প্রায় তিনশত লামা আছেন।

এখন এই উৎসবের কথা,—

উপরে চন্দ্রাতপশোভিত এই প্রাঙ্গণের শোভা এখন ফুটিয়া উঠিল। পটশোভিত উচ্চ বেদীর সোপানশ্রেণীর উপর যে সকল দীপাধার শ্রেণীবদ্ধ ছিল এখন সবগুলি জ্বালিয়া দেওয়ায় ঐ স্থান অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত এবং চারিদিকের ধূপগুচ্ছের সুগন্ধে সর্ব্বত্রই আমোদিত করিয়াছে। তবে এই পবিত্র স্থানে চামরী মাখন ও মদ্যের অপ্রিয় গন্ধ তাহার সঙ্গে মিলিয়া একপ্রকার ঘন তীব্র বায়ু মাঝে মাঝে আসিতেছিল। আমরা যে দ্বিতলের বারান্দা হইতে দেখিতেছি, সেখানে আর লোক-চলাচলের স্থান নাই, সুসজ্জিত স্ত্রী-পুরুষে সেই সঙ্কীর্ণ স্থানটি পূর্ণ করিয়াছে। সময় সময় এমন মনে হইতেছিল বুঝি বা সেই জীর্ণ কাষ্ঠের বারান্দাটি ভাঙিয়া পড়ে। উহা দ্বিতল হইলেও নিম্নতল হইতে সাত কি আট ফিটের বড় বেশী উচ্চ নহে।

বড় বেদীর দক্ষিণদিকে যে সকল উচ্চ আসন ছিল ক্রমে ক্রমে রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ, মুণ্ডিত মস্তকে পীতবর্ণ পশমের শিরস্ত্রাণশোভিত লামাগণ একে একে আসিয়া এক একটি আসন পূর্ণ করিয়া দাঁড়াইলেন। বেদীর বামে,— যেদিকে ধর্ম্মচক্র আছে, ঐ দিকেই সাধারণ প্রবেশ-দ্বার। সেইদিক হইতে এখন একদল বাদক শানাই, করতাল, কাড়ানাকড়া বাজাইতে বাজাইতে আসিয়া বেদীর ঠিক সম্মুখে, সেই উচ্চ শূন্য আসনের পার্শ্বে দাঁড়াইল। শানাই দুটির আকৃতির একটু বৈশিষ্ট্য আছে। প্রায় চারি হাত লম্বা পিতল-নির্ম্মিত, প্রত্যেকটি অপূর্ব্ব। আর করতাল প্রত্যেকটি সাইকেলের চাকার মতই প্রকাণ্ড।

তাহার পর কোষমুক্ত কৃপাণ হস্তে, রক্তবর্ণ সৈনিকের পোশাকে পুরাং-এর প্রধান সেনাপতি সদর্পে আসিয়া, যাত্রাদলের ভীমসেনের মত নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী পূর্ব্বক রোষকষায়িত নেত্রে উপর নীচে সকল দিকেই চাহিতে

চাহিতে বিকট শব্দে কি একটা ঘোষণা করিয়া দিলেন। তাঁহারই পশ্চাতে আরও তিন-চারিজন সৈনিক পরিচ্ছদধারী আসিয়া সসম্ভ্রমে এক পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পায়ে দোকৃচা বা তিব্বতীবুট, সর্ব্বশরীরে পীতবর্ণ সাটিনের উপর নানাবর্ণের কারুখচিত লম্বমান মোহান্তের পরিচ্ছদ এবং মাথায় টোপরের মত মুকুট-ভূষিত থুলো লামা আসিয়া আসনের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। লামাগণ তাঁহাকে সমস্বরে স্তুতি ও অভিবাদন করিলেন, তিনিও মস্তক নত করিয়া প্রত্যভিবাদন করিলেন। একজন লামা তাঁহার পদদ্বয় হইতে জুতা খুলিয়া দিলে, তিনি উঠিয়া সেই উচ্চ বেদীর উপর বসিলেন। তখন লামাগণ সকলেই শিরোভূষণ অপনয়নপূর্ব্বক হাতে লইয়া নিজ নিজ আসনে বসিলেন। তাহার পরেই আবার সেনাপতি মহাশয় বড় গলায় মুক্ত তলবার উচ্চে ধরিয়া বিচিত্র ভঙ্গীতে একটা আদেশ বা ঘোষণা সমাগত সাধারণকে জানাইয়া দিলেন, পরে দুইবার সতেজে বাহ্বাস্ফোটন করিয়া গুম্ফে ঘন ঘন অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে সেই সভাস্থল হইতে দ্বার অবধি সদর্পে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। সম্ভবতঃ তিনি সভামধ্যে উপাসনাদি হইবে বলিয়া কাহাকেও গোলমাল বা কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। সেনাপতির ব্যাপারটি আগাগোড়াই হাস্যোদ্দীপক।

টিউডোরদিগের সময়ে ইংলণ্ডের আর্কবিশপ্‌দের যেরূপ ছিল, প্রধান লামার পরিচ্ছদ এবং শিরোভূষণ উভয়ই সেই ধরনের না বলিয়া ঠিক সেইরূপ বলিলেও মিথ্যা বলা হইবে না। আর বাকী সাধারণ লামাগণের যে পীতবর্ণ শিরোভূষণের কথা বলিয়াছি উহা পূর্ব্বকালে গ্রীকদিগের হেলমেট্ বা শিরস্ত্রাণের উপর পাখীর মাথায় মুকুটের মত যেরূপ একটা থাকিত, এগুলিও ঠিক সেইরূপ। উহা পীতবর্ণ পশমের প্রস্তুত। আর পরিচ্ছদ, লামাদের অঙ্গের সাধারণ পোশাকের উপর গাঢ় রক্তবর্ণ বস্ত্রের, অবিকল কলিকাতায় হাইকোর্টের বিচারপতিগণের গাউনের মত। তবে পার্থক্য এই, জজদের গাউন কৃষ্ণবর্ণ আর এগুলি রক্তবর্ণ। এ ধরনের অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্যের ধর্ম্মাধিকরণের পোশাক ইহাদের মধ্যে যে কোথা হইতে আসিল তাহা আমি ভাবিয়া পাইলাম না। এই অদ্ভুত পরিচ্ছদের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম এবং অনুমান করিলাম এ অঞ্চল হইতেই উহা পাশ্চাত্ত্যে গিয়া থাকিবে। চীন দেশের প্রাচীন ধর্ম্মাধিকরণের পোশাক-

পরিচ্ছদ ব্যাবিলনের পথে পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে গিয়াছে ইহা এক শ্রেণীর পণ্ডিতের মত। ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে সভায় প্রবেশ ও উপবেশন প্রভৃতি অন্যান্য রীতি-নীতি প্রাচ্য প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন। ইহা অতীব চিত্তাকর্ষক এবং পরিপাটি ও সুশৃঙ্খল।
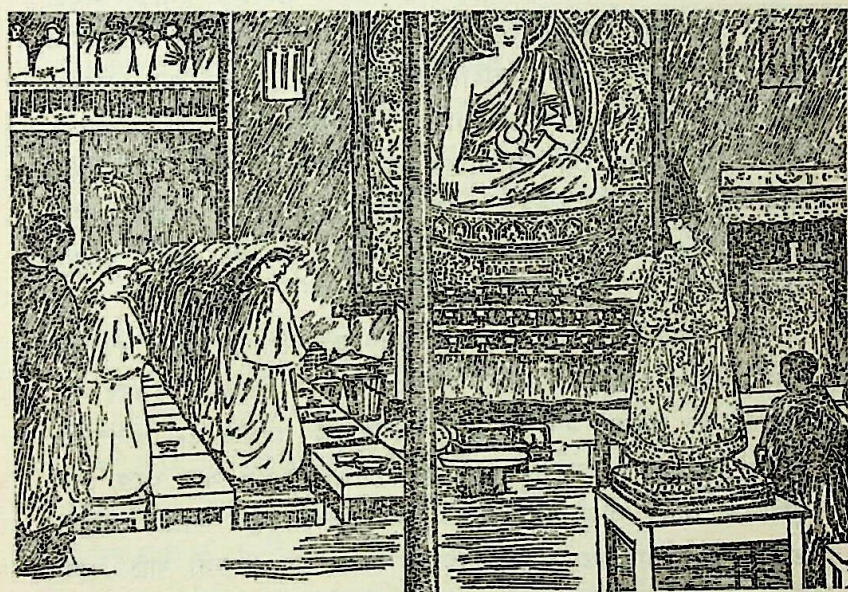
উৎসবক্ষেত্রে

যাহা হউক, সকলে আসন গ্রহণ করিলে প্রাঙ্গণস্থ সভাতল নিঃশব্দ হইল। তখন প্রথমে প্রধান লামা ধীরে ধীরে অল্পক্ষণ মাত্র মন্ত্র পাঠ করিলেন। তিনি চুপ করিলে তখন অন্যান্য লামাগণ একত্রে সমস্বরে ধীরে ধীরে মন্ত্র পাঠ আরম্ভ করিলেন। স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর বিকৃত করিয়া, গোঁঙানির মত একটা নাকি আওয়াজে তাঁহাদের বৌদ্ধ তন্ত্র-মন্ত্র পাঠ চলিতে লাগিল। প্রাঙ্গণের প্রান্তে, একদিকের চকের মধ্যেও অনেকগুলি লামা বসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি যুবকও ছিলেন, তাঁহারাও ইহাতে সমস্বরে যোগ দিলেন।

কাশী প্রভৃতি স্থানে যে বেদ পাঠ হয়, গুরু উৎসবের অনুষ্ঠানটি সেইরূপ, কিন্তু ইহাদের পাঠের তাল বা ছন্দ একটু বিশিষ্ট ধরনের। সেই মৃদু

অনুনাসিক শব্দগুলির মধ্যে চ ও দ এর উচ্চারণই প্রচুর। উচ্চারিত মন্ত্রের শব্দ প্রত্যেকটি দুই অক্ষরের এবং প্রত্যেক বর্ণটি চন্দ্রবিন্দু যোগে উচ্চারিত হইতেছিল। দুই মাত্রার প্রত্যেক শব্দটি উচ্চারণের পর এবং পরবর্ত্তী শব্দ উচ্চারণের পূর্ব্বে, অর্দ্ধ মাত্রা ছেদ বা ফাঁক পড়ে। লিখিতে গেলে প্রত্যেক অক্ষরের মাথায় চন্দ্রবিন্দু দিতে হয়। তাঁহাদের উচ্চারণ এতটা জড়িত যে, স্পষ্ট বুঝিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। একটানা গোঁঙানি প্রায় পনর মিনিটকাল চলিল, তাহার পর এক পরদা চড়িয়া আবার তখনই এক পরদা নামিয়া আবৃত্তি হইতে লাগিল, এইরূপ প্রায় আধ ঘণ্টা। তাহার পর সকলেই কিছুক্ষণ, বোধ হয় ধ্যানের জন্য নিস্পন্দ রহিলেন। শেষে বড় লামা মহাশয় আরম্ভ করিলেন। অতি অল্পক্ষণ তিনি আবৃত্তি করিয়া তাহার পর চুপ করিলেন। তারপরই, আবার সমবেত লামাদের পালা, তারপর সব চুপচাপ ;—বোধ হয় এটা কিছুক্ষণের অবকাশ।

তখন আট, দশ, বার বৎসরের বালক ব্রহ্মচারিগণ, চায়ের বড় বড় পাত্র আনিয়া বেদীর বাঁ-দিকে জমা করিতে লাগিলেন। তাহার পর বালতির মত কাঠের আধারের মধ্যে ঘনদধি এবং প্রকাণ্ড রম্য ধাতুপাত্রে ছাতুর স্তূপ আনিয়া সেইখানে জমা করিলেন ;—এইরূপে একে একে সেই স্থানটিতে অনেক পাত্র জমা হইল। লামাগণের সম্মুখে কাষ্ঠের চৌকি, তাহার উপর পানপাত্র বা চা খাইবার কাষ্ঠনির্ম্মিত নেপালী বাটি রাখা ছিল, পূর্ব্বে বলিয়াছি। যখন আহার্য্য দ্রব্যগুলি জমা হইতেছিল, তখন লামাগণের সম্মুখস্থ আধারে রক্ষিত চা পানের নিজ নিজ পাত্র ঠিক করিয়া রাখিয়া দিলেন। আবার তাহার মধ্যে কেহ কেহ নিজ আস্তরণের ভিতর হইতে, রক্তবর্ণ রুমালে জড়ানো রূপায় বাঁধান কাষ্ঠপাত্রও বাহির করিলেন।

এই তিব্বতীয় এবং ভোটিয়াদের চা পানের জন্য একপ্রকার কাষ্ঠের পাত্র, পেয়ালা বা বাটি ব্যবহৃত হয়, উহা নেপাল হইতে আসে। কেহ কেহ উহার ভিতর দিকটা রূপার পাতে বাঁধাইয়া লয়। এদিকে সর্ব্বত্রই এই পাত্র ব্যবহৃত হয়। যাহা হউক, পরে একজন লামা সঙ্কেত করিলে বালক লামাগণ চা পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিলেন। চায়ের পর ছাতু আসিল। কেহ লইলেন, কেহ বা নিবৃত্ত হইলেন। তাহার পর দধি আসিল, তাহাও কেহ কেহ লইলেন, সকলে লইলেন না। তাহার পর

আবার ছাতু আসিল। বারান্দার মধ্যে যে যুবকগুলি বসিয়াছিলেন, তাঁহারাই সকল দ্রব্যের সদ্ব্যবহার কিছু বেশী করিলেন। প্রাঙ্গণের যে দিকে খাদ্যভাণ্ডার, সেই দিকে দুই-চারিজন দর্শক বৃদ্ধ ও বালক বসিয়াছিল, এখন নিজ নিজ পাত্র বাহির করিয়া তাহারাও প্রসাদ পাইতে লাগিল। তাহারা দধি ও ছাতু একত্র মাখিয়া তাহাদের সেই মলিন ছিন্ন বসনের ভিতর হইতে শুষ্ক মাংস দুই এক টুকরা বাহির করিয়া তাহার সহিত মিলাইয়া মনের আনন্দে সেবা করিতে লাগিল।

সকলের ভোজন শেষ হইলে, লামাগণ রক্তবর্ণ রুমালে নিজ নিজ পাত্র পরিপাটি মুছিয়া যথাস্থানে উপুড় করিয়া রাখিয়া দিলেন। যাঁহাদের রৌপ্যমণ্ডিত বিশিষ্টপাত্র, তাঁহারাও উহা মুছিয়া নিজ বক্ষের আস্তরণের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। প্রধান লামা, তাঁহার পাত্রস্থ চা উঠাইয়া কেবল ওষ্ঠে স্পর্শ করিলেন মাত্র, পান করিলেন না;—উহা রাখিবামাত্র অপরে উঠাইয়া লইয়া গেল।

লামাগণের মধ্যেই দুই-একজন বৃদ্ধ কফ রোগগ্রস্ত ছিলেন। কাসির বেগ উপস্থিত হইলে কাসিয়া, বুকের ভিতর পকেট হইতে পাটকরা রক্তবর্ণ কাপড়ের ভিতর দিকে চট লাগানো একখানি রুমাল বাহির করিয়া তাহাতে শ্লেষ্মা ত্যাগ করিলেন এবং বই বন্ধ করিয়া রাখার মত পাট করিয়া পুনরায় বুকের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। সরল, সহজ এবং সভ্য ব্যবস্থা।

যখন সকলের জলযোগ হইয়া গেল, তখন আবার বৌদ্ধ বেদমন্ত্র পূর্ব্বানুরূপ আবৃত্তি আরম্ভ হইল। প্রায় একদণ্ড পরে সাধারণের পাঠ থামিয়া গেল, প্রধান লামার পাঠ আরম্ভ হইল। তাহাও তিনি অল্পক্ষণেই শেষ করিলেন। তখন সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মাথায় টুপি দিলেন। প্রধান লামাকে জুতা পরাইয়া দেওয়া হইলে তিনি যেদিক হইতে আসিয়াছিলেন সেইদিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আগে, সেইরূপ প্রহরী এবং সেনাপতি,—ধ্বজ-পতাকাধারী সকলে সারি দিয়া চলিল। সভাভঙ্গ হইল,—আমরাও ভীড় ঠেলিয়া কোনরকমে বাহিরে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

রাস্তায় আসিলে পর আমাদের ভিন্ন দেশী দেখিয়া উপরে ছাদ হইতে দুই একজন তিব্বতী রমণী পাথর ছুঁড়িয়া অভ্যর্থনা করিলেন। উহার একটি নাথজীর গায়ে লাগাতে তিনি কুপিত হইয়া, ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং

রুষ্টনয়নে সেদিকে ধাবিত হইলেন। নাথজীকে ধরিয়া রাখিলাম,—বিবাদ বিসম্বাদ এখানে মহা বিপদজনক।

জম্পান পুষোর বাড়ীর সম্মুখ দিয়া অন্যান্য গৃহগুলিও অতিক্রম করিলাম। আমাদের আশঙ্কা ছিল, পাছে আরও কিছু বা ঘটে। একে ত এদেশীয় নরনারী সাক্ষাৎ চণ্ডচণ্ডীর অবতার; তাহার উপর উৎসবের দিনে কারণ-বারি কিছু বেশী মাত্রায় পান করিয়া তাহাদের যেটুকু আবরণ ছিল তাহাও নষ্ট হইয়াছে। ইচ্ছা ছিল জুম্পানের বাড়ী-ঘর দেখিয়া আসিব,—এই ব্যাপারের জন্য তাহা আর ঘটিল না।

বলিয়াছি পুরাং মঠ, কেল্লা ও গভর্ণরের বাড়ী প্রভৃতি পর্ব্বতের শিখর-দেশেই অবস্থিত। সেখানে জল নাই। নীচে যেখানে ভোটিয়াদের মণ্ডি তাহার অনতিদূরে পশ্চিমপ্রান্তে দুইটি ধারা আছে—একটি বেশ মোটা আর একটি সরু। তাহা ছাড়া আরও পশ্চিমে আর একটি ঝরণার মত আছে। পালা অনুসারে নিকটস্থ গ্রাম হইতে শ্রমজীবী স্ত্রীলোকের দল প্রাতে আসিয়া নিকটের ধারা হইতে কাঠের বাল্‌তি সকল পূর্ণ করিয়া প্রত্যহ মঠে, রাজবাড়ীতে এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে জল যোগান দিয়া যায়। ইহাই এখানকার সনাতন নিয়ম;—বহুকাল ধরিয়া এইরূপে উপরের সকল পুরীতেই জল সরবরাহ হয়। আমরা প্রায় প্রত্যহই নীচে মণ্ডি হইতে দেখিতে পাইতাম,—সারি সারি, কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ-পরিহিত, জলপূর্ণ লম্বা লম্বা কাঠের আধারগুলি পৃষ্ঠে দৃঢ়রূপে বদ্ধ স্ত্রীলোকদল সম্মুখে ঝুঁকিয়া, ধীরে ধীরে চড়াই ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতেছে। ভোটিয়াদিগের ন্যায় তিব্বতেও সমস্ত শারীরিক কঠিন পরিশ্রমের কর্ম্ম স্ত্রীলোকেরাই করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই গাঢ় নীলবর্ণের পোশাক ভালবাসে। মঠের যাহা কিছু চা, মাখন, চাউল, আটা, ছাতু প্রভৃতি আহার্য্য তাহার অধিকাংশই নিকটবর্তী গ্রামের প্রজাবর্গের দ্বারাই সরবরাহ হয়।

কাহারো সংসারে অসুখ বা অশান্তি ঘটিলে জনসাধারণ লামাগণের নিকট আসিয়া আশীর্ব্বাদ লইয়া যায়। মাদুলী বা কোনরূপ দৈব কবচেই ইহারা অধিক বিশ্বাসী। লামাদের নিকট হইতে উহা লইতে হয়। অপ-দেবতার ভয়টি জনসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল, এসব ব্যাপারে কবচ ধারণই প্রশস্ত বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস। সকল অসুখ অশান্তিতে লামা গিয়া ঝাড় ফুঁক, মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতি দেশীয় নিয়মাদি প্রয়োগ এবং আরোগ্য

দান করেন। লামাগণ সর্ব্বদাই পরোপকারী, কাহারও কোন বিষয়ে অশান্তি উপস্থিত হইলে তাঁহারা প্রতিকারের কোন-না-কোন উপায় করিয়া থাকেন। তবে সর্ব্বদেশে সর্ব্বসম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রষ্ট দুই-চারিজন থাকেই, এই সাধারণ নিয়মের এখানেও ব্যতিক্রম নাই।

এখানে লামার সংখ্যা জনসাধারণের এক-চতুর্থাংশ,—কেহ কেহ বলেন অর্দ্ধেক। আমাদের ভারতীয় সন্ন্যাসিগণের মধ্যে পাঞ্জাবী নানকপন্থী ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণের শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যহেতু অনেকের মধ্যে যেমন একটা অসুস্থ দুর্ব্বল এবং অশান্ত ভাব দেখা যায়, এখানে তাহা নাই। এদেশের জলবায়ুর গুণে লামা বা সন্ন্যাসী সাধারণের শরীর সুস্থ;—সেই কারণে তাঁহাদের মধ্যে অশান্ত ভাবটি নাই। ধীর শান্ত স্বভাব, মুখমণ্ডলে লাবণ্য, সৌম্যদর্শন লামাগণকে দেখিয়া এবং অল্পদিন তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া বড় আনন্দ পাইয়াছিলাম।

ভারতে সকল প্রদেশেই ভিখারী অল্পবিস্তর আছে। তাহার মধ্যে কৃত্রিম ও অকৃত্রিম দুই রকমই আছে। তবে সম্ভবতঃ বাংলা ও উড়িষ্যাতেই যেন সংখ্যায় কিছু বেশী। দেশের সকল স্থান হইতে কলিকাতায়ই উহার আমদানী বেশী, তাহা সাধারণতঃ সবারই নজরে পড়ে। আবার তাহার মধ্যে কালীঘাট যে সকলকে হার মানাইয়াছে এরূপ ধারণা বরাবরই ছিল, কিন্তু তিব্বতে আসিয়া সে ধারণা আর নাই। যেদিন এখানে পদার্পণ করিয়াছি, সেই দিন হইতে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা আমাদের বুঝাইয়াছে যে, তিব্বতে ভিখারীর সংখ্যার তুলনায় ভারতবর্ষ অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। এই তাক্‌লাখার স্থানটুকুতে যদি সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ-সাত শত লোক থাকে, তাহা হইলে তাহার অর্দ্ধেকের উপর গৃহহীন অন্নবস্ত্রের ভিখারী পর্ব্বতগুহা আশ্রয় করিয়া থাকে, সেইজন্য স্থানাভাব হয় না। বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—এক কথায় আবালবৃদ্ধবনিতা যখন প্রাতঃকালে দলে দলে ভিক্ষায় আসে, দেখিলে অবাক হইতে হয়। আমাদের বাঙালী ভিখারীর মধ্যে অন্নবস্ত্রের দারিদ্র্য থাকিলেও বচনের বেশ জোর আছে, ভিক্ষা না পাইলে হয়ত দুই-চারি কথা গৃহস্থকে শুনাইয়া দিয়া যায়,—তাহারা ভিক্ষার চাল, কাঁড়া কি আকাঁড়া সে ব্যাখ্যানও করিয়া থাকে। এখানকার ভিক্ষোপজীবিগণ সেইরূপ নহে। তিনটি আঙ্গুলে যেটুকু আটা বা ছাতু উঠে তাহাই অম্লানবদনে লইয়া চলিয়া যায়। রুটি খাইতে খাইতে একগ্রাস

ভিখারীর দল

ফেলিয়া দাও, যদি দুই-এক গ্রাস অন্ন পাতে পড়িয়া থাকে তাহাও তাহারা বড় যত্ন করিয়া লইয়া যায়। ইহারাই যথার্থ অকৃত্রিম ভিখারী।

এখানকার স্ত্রীলোকেরাই পুরুষ অপেক্ষা দীর্ঘজীবী। আশী-নব্বই অথবা শত বৎসরের বৃদ্ধেরা ভিক্ষা করিয়া খায়, ইহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু পুরুষের সংখ্যা ভিখারী দলের মধ্যে কম, ইহাও স্পষ্ট লক্ষ্য হয়।

আমাদের বাংলায় বা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যেমন গান গাহিয়া ভিক্ষা করে এখানেও সেইরূপ এক শ্রেণীর ভিক্ষুক আছে, তাহারা নাচ-গান করিয়া ভিক্ষা করে। এক হাতে একটি লোহার ত্রিকোণ যন্ত্র, আর এক হাতে একটি লৌহশলাকা আর ঘুঙ্গুরসন্নিবিষ্ট একটি ডমরু। সেই ত্রিকোণ যন্ত্রের সাহায্যে টিং টিং করিয়া তাল দিয়া গান, আর সঙ্গে সঙ্গে তাণ্ডব নৃত্য। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হাবভাব অনেকটা সার্কাসের ক্লাউনের মত;—মুখটিও তাহাদের নানা বর্ণে চিত্রিত।

আমরা এখানে কিষণ সিংহের আশ্রয়ে ছিলাম ভাল। আহারাদির ব্যাপার,—প্রাতে একবার ভোটিয়া বা তিব্বতী ধরনের চা,—দ্বিপ্রহরে চৌদাসের প্রসিদ্ধ মশুর ডাল ও বোগড়া চালের খেচরান্ন,—তাহাতে কাঁচা লঙ্কা, চমরীর ঘৃত আর লবণ। আর রাত্রে নাথজীকো রোটী,—যদি জুটিল ত কোন শাক, না জুটিল ত শুধুই লবণ আর নেপালী গুড়। উহা গারবিয়াং হইতেই সংগ্রহ করা ছিল। নাথজী দুই বেলাই রাঁধিয়া

বাসন কোসন –
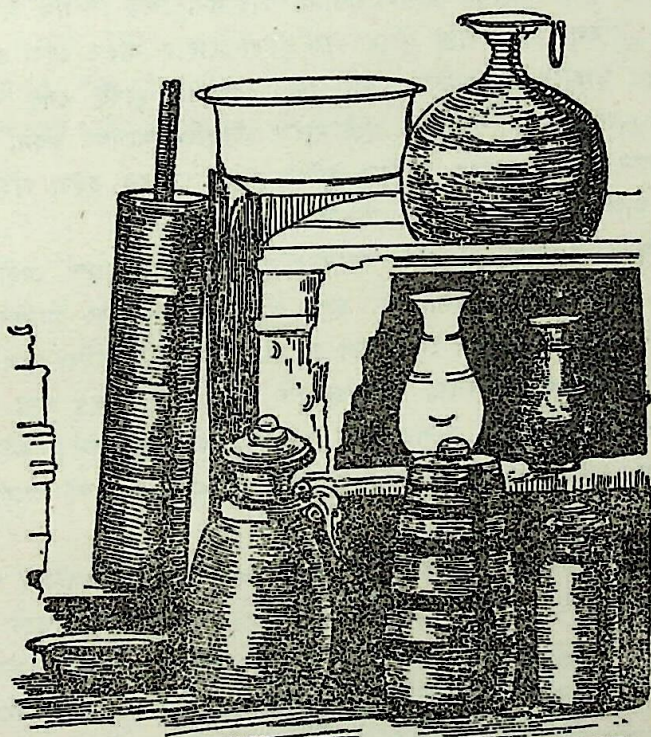
আমাদের শ্রম এবং বন্ধনের দায় হইতে বাঁচাইতেন। রন্ধন যে একটি বন্ধন, তাহাতে যেটুকু সন্দেহ ছিল, এই তিব্বত ভ্রমণে আসিয়া উহা চরম মীমাংসায় দাঁড়াইয়া গেল। তাহার উপর নিজ উচ্ছিষ্ট পাত্র ধোয়া যে কিরূপ কষ্টকর, বিশেষতঃ যেখানে জলকষ্ট। তাহার উপর বিদেশ বলিয়াই গায়ে লাগিত না।

ভোটিয়াদের রান্নাঘরের সরঞ্জাম আমাদের পক্ষে একটি দেখিবার

জিনিস। গারবিয়াং-এ অবস্থানকালে যাহা দেখিয়াছিলাম, এখানে কিষণ সিং-এর তাঁবুতে, ক্ষুদ্র রান্নাঘরখানির মধ্যেও ঠিক তাহাই দেখিতেছি।

তাহার মধ্যে বড় তামার ঘড়া আছে, ঘটি আছে, বাটি আছে, কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মদের কেঁড়ে আছে, ঘৃতপাত্রও আছে, চা প্রস্তুতের চোঙ্গা ও ঢালিয়া রাখিবার ডেকৃচিও আছে। চুলা ধরাইবার হাপরটি পর্য্যন্ত। কোন অভাবই ইহাদের এখানে নাই,—এমনই ইহাদের কর্ম্মশক্তি।

এদিকে সঙ্গী-মহাশয় অনেক সন্ধানই করিলেন, কিন্তু কৈলাস যাইবার সঙ্গী মিলিল না। তথাপি তিনি ব্যস্ত হইয়া যাহার সহিত দেখা হইতে লাগিল তাহাকেই জানাইতে লাগিলেন। সকলের মুখেই সেই একই কথা, এখনও ত আসিয়া কেহ জুটে নাই। কিছুদিন অপেক্ষা করুন, দুই-চারিজন করিয়া অনেকে আসিয়া জুটিবে, তখন দলবদ্ধ হইয়া যাইবেন, সঙ্গে মালপত্র লইয়া দুই-একজন যাইবার রাস্তা তিব্বতে নহে।

আমি তাঁহাকে বলিলাম—আসবার সময় আপনাকে রুমা দেবী যে এত করে বলে দিয়েছিল,—তা ছাড়া ধারচুলায় লালসিং পাতিয়ালও বিশেষ করে বলেছিলেন যে, তাঁরা না থাকলে যাবার সুবিধা হবে না, রাস্তায় বিপদ-আপদ আছে, চোর-ডাকাত আছে। তাহাদের পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও আপনি যাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছেন কেন? এই ত আমরা দুই-একদিন মাত্র এসেছি। আর, বিশ্রামেরও একটু প্রয়োজন আছে।

তিনি বলিলেন,—তাদের কাছে বলেছি বলেই যে ঠিক সেইমত কাজ করতে হবে তার মানে কি? যদি ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গী জুটে যায় তাহলে কি আমরা তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করে বৃথা সময় কাটাব? শীঘ্র শীঘ্র এখানকার কাজ শেষ করে ফিরতে হবে ত, তাদের সঙ্গে এমন ত কিছু বাধ্যবাধকতা নেই যে তাদের সঙ্গেই যেতে হবে।

আমি দেখিলাম একটু বেশী মাত্রায় মস্তিষ্ক চালনা করিয়া হিসাব করিলে একথা নেহাত অযৌক্তিক নহে। তখন সে প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া অন্য প্রয়োজনীয় কথা আরম্ভ করিলাম। লাল সিং পাতিয়ালের সঙ্গে তাহার মাতা, রুমা প্রভৃতি আসিবার যখন বিলম্ব হইতেছে তখন সেই অবসরে আমরা কোজরনাথ বেড়াইয়া আসি না কেন? এই ত উত্তম সুযোগ। কারণ কৈলাস হইতে ফিরিয়া আসিবার পর তখন আর যাওয়া

ঘটিবে কি-না তাহাতে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। যেহেতু সঙ্গী-পণ্ডিতজী ঘরে ফিরিবার জন্য এখন হইতেই এমনই উতলা হইয়াছেন, সময় সময় অসহ্য বোধ হইতেছে।

তিনি সহজেই কথাটা শুনিলেন, এবং গ্রহণ করিলেন, তারপর রাজীও হইয়া গেলেন।

সেই রাত্রেই আমরা ঠিক করিয়া ফেলিলাম, এ পথে যখন আমাদের কোন বাহনের প্রয়োজনই নাই, হাঁটিয়াই যাওয়া যাইবে, তখন আগামী কাল প্রাতেই আমরা রওনা হইব; আর বৃথা বিলম্ব করিবার কি প্রয়োজন? সঙ্গে হাল্কা জামা-কাপড় কিছু লইলেই হইবে, এখান হইতে কাল ও পরশু দু-দিনেই যাতায়াত সম্পূর্ণ হইবে।
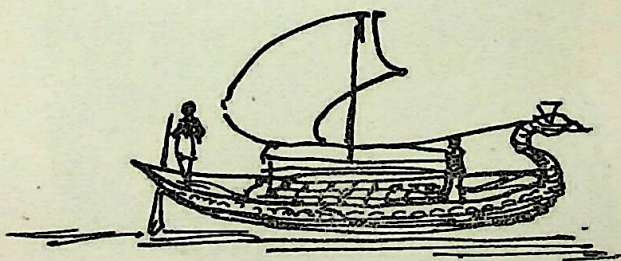
॥ ১১ ॥

কোদণ্ডনাথ বা কোজর জো
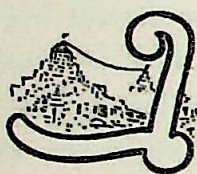
খানকার লোকে যদিও বলে আট মাইল, তাকলাখার হইতে কোদণ্ডনাথ কিন্তু দশ মাইলের কম নয়। কর্ণালী নদীটি পার হইয়া আমরা দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।
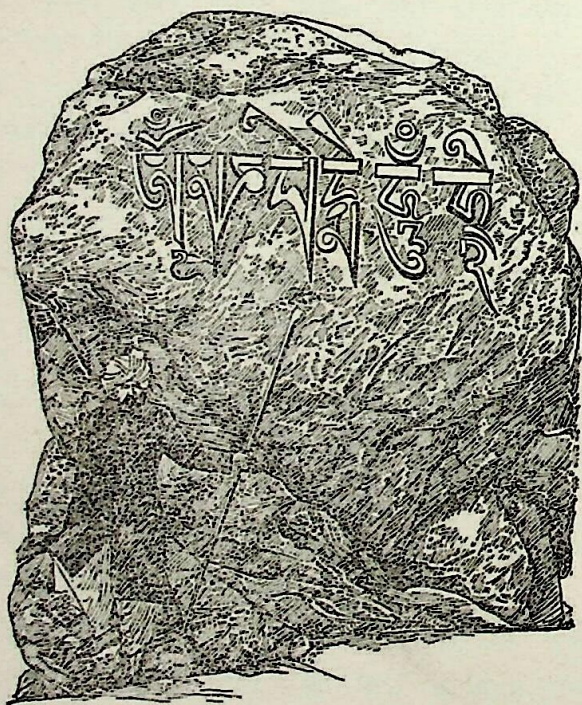
ওঁ মণিপদ্মে হুং হ্রীং

পথের একটু বিশেষত্ব এই যে, সারা পথটির মধ্যস্থলে গৈরিকরঞ্জিত ক্রমোচ্চ, স্তরে স্তরে সাজানো প্রস্তরখণ্ডের স্তূপ প্রায় তিন হাত উচ্চ, বহু

দূরাবধি, বোধ হয় কোদণ্ডনাথের মন্দির পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। মধ্যে কোথাও একখানি বিশালকায় প্রস্তরখণ্ড নানা বর্ণে রঞ্জিত, মধ্যস্থলে তিব্বতী ভাষায় বড় বড় অক্ষরে, ওঁ মণিপদ্মে হুং হ্রীং, এই মন্ত্রটি চিত্রিত আছে। কিছু বেশী দূরে দূরে কোথাও সমচতুষ্কোণ প্রস্তর-স্তম্ভের উপর প্রস্তরাচ্ছাদন, বাহিরের দিকে নানা বর্ণে চিত্রিতঐ মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। সেগুলি কোনো-না-কোনো লামা বা সন্ন্যাসীর সমাধি। উহা আকারে কোন কোনটি স্তূপাকার, তাহার উপরে চিত্রিত পতাকা উড়িতেছে। বেশী ভাগ রক্তবর্ণ পতাকা। স্তূপের মধ্যে স্থাপত্য অলঙ্কারও আছে। উহাতে পথের সৌন্দর্য্যও বাড়াইয়াছে। বামাবর্ত্ত ঐ পথের মধ্যবর্ত্তী স্তূপগুলিকে দক্ষিণে রাখিয়া চলিতে হয়। আর প্রত্যাবর্ত্তনেও তাই তখনই অপর পার্শ্ব দিয়া ফিরিতে হয়। এইভাবেই কোদণ্ডনাথে যাতায়াতের পথটি রচিত। এখানে কোন লামা দেহত্যাগ করিলে প্রায়ই পথের উপর সমাধি দিবার ব্যবস্থা আছে।

নদী পার হইয়া ঐরূপ মন্ত্রপূত প্রস্তরের স্তূপ সারি সারি পথের মাঝে চলিতেছে। এক স্থানে এইরূপ একটি সারি লম্বে প্রায় আধ মাইল জুড়িয়া আছে দেখা গেল। নাথজী আর আমি দুইজনে ক্রমশঃ একটু বে অগ্রসর হইলাম, সঙ্গী-মহাশয় ধীরে ধীরে পশ্চাতে আসিতে লাগিলেন তখন কে জানিত এটি এত গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে?

এবার একটি বিস্তৃত নদী পার হইয়া আমাদের এক লামার সঙ্গে দেখা হইল। তাঁহার লাল পরিচ্ছদ, হাতে একটি লাঠি। আমরা তাঁহাদের ভাষা বুঝি না কিন্তু তিনি সামান্য হিন্দী বুঝেন। তিব্বতীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রাদি তাঁহার অনেক পড়াশুনা আছে,—হিন্দী ভাষা শিখিবার বড়ই ইচ্ছা। তিনি আমাদের বলিলেন যে, ভালরূপে হিন্দী শিখিয়া তাঁহার কলিকাতা যাইবার ইচ্ছা আছে। তিনি থাকেন সেই স্থান হইতে কতকটা উত্তর দিকে, কোন পর্ব্বতের গুহায়;—এখন কোদন্নাথ যাইতেছেন। আমরাও যখন সেই স্থানেই যাইতেছি তখন বড় আনন্দেই তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া কথা কহিতে কহিতে চলিতে লাগিলাম।

আমি বা নাথজী ক্রমান্বয়ে তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছি, কত কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছি; তিনি মৃদু মৃদু হাসিয়া দু-একটি কথায় তাহার উত্তর দিতেছেন। কথাগুলি লিখিলে কিছু মন্দ হইবে না।

প্রশ্ন—আপনি কোথায় থাকেন, কি করেন, এখন কোথায় যাইতেছেন ?

উত্তরে তিনি উত্তর দিক দেখাইয়া বলিলেন,—ঐ পর্ব্বতের নীচে নদীতটে একটি ছোট আশ্রয় আছে ; সেখানে থাকি, আর মাঝে মাঝে পর্য্যটন করিয়া বেড়াই, এখন কোজর জো যাইতেছি।

সংসারে আপনার কে আছেন, কত দিন লামা হইয়াছেন ?

সংসারে আমার কেহই নাই, বাল্যকাল হইতেই আমি লামা হইয়া এইরূপে জীবনযাপন করিতেছি।

আপনাদের এখানে গৃহস্থ লোকের ঘরে বালকদের বিদ্যাশিক্ষা কিরূপ হইয়া থাকে ?

গৃহস্থের ছেলেদের নিজ নিজ ঘরে বিদ্যা শিক্ষার সুবিধা হয় না বটে, তবে তাহারা বাল্যকাল হইতেই পিতার নিকট পৈতৃক কর্ম্ম শিক্ষা পায়। যাহাদের পড়া-শুনা করিবার ইচ্ছা হয়, মঠে লামাদের আশ্রয় না লইলে তাহাদের আর অন্য উপায় নাই। নীতি উপদেশ, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তক সকলই মঠে লামাদের হাতে, সুতরাং মঠের অধীন না হইলে আর সে সকল পুস্তকে হাত দিবার উপায় নাই! এ অঞ্চলের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা নিরক্ষর, তাহারা ঐ ভাবেই বহুকাল আছে।

পথের লামা

এখানে চাষ-আবাদ কেমন হয় ?

শাকসব্জী এখানে বড়লোক ছাড়া খায় না। মাংসই এখানকার প্রধান আহার, তবে যাহার জমি আছে, কিছু কিছু মটর, শিম ইত্যাদি চাষ করে। ধান ও গম হয়, সরু ও মোটা, এই দুই রকমই এখানে বেশ

হয়। নিজেদের খাইবার মত রাখিয়া তাহারা বেশী দামে বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করে।

এখানকার প্রধান কারবার কিসের, কোন্ জিনিস এখানে বেশী উৎপন্ন হয়?

পশুলোমের কারবারটাই এদেশের প্রধান। কাজকর্ম্ম যা-কিছু ঐ পশম লইয়াই চলে।

কোন্ কোন্ দেশের সঙ্গে এ দেশের কারবার?

বহুকাল হইতে নেপালের সঙ্গেই আমাদের বেশী কারবার। সব কাঠ এখানে নেপাল হইতেই আসে। তারপর চীন ও ভারতের সঙ্গে। এখন ভারতের সঙ্গে কারবার একটু বাড়িয়াছে। যা-কিছু এখানকার জিনিস আগে নেপাল দিয়া ভারতে যাইত। এখন বরাবর পশ্চিম হিমালয় দিয়া চলিয়া যায়।

এদিক হইতে কোন্ পথে মালামাল যাতায়াতের সুবিধা?

দারমা, মিলামের পথে যায়, লিপুধুরার পথেও মাল যায়, লাদাক দিয়াও যায়। আবার কাশ্মীরের মধ্যে আরও দুইটি পথ আছে, সারা বৎসর সে পথে মাল যাতায়াত করে। এখন আর কোন গোলমাল নাই—আগে এমন ছিল না। ইংরাজেরা আগে ঢুকিতে দিত না, তাই নেপালের ভিতর দিয়া এ দেশের মাল ভারতে যাইত। এখন সকল পথের, সব ঘাঁটিই ইংরাজ নিজের হাতে রাখিয়াছে। এ দেশের মহাজনদের ইচ্ছামত কারবার করিবার সব সুবিধা নাই।

এরূপ কথায় কথায় আমরা একটি নদী-তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে জলের বেগ অতিশয় প্রবল। উহা পার হইতে হইতে দেখা গেল ওপারে, দুই-তিনটি বালক ও একটি বৃদ্ধা শুষ্ক গোময়খণ্ড অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়া জ্বালাইয়াছে এবং তাহার উপর হাঁড়ি চাপাইয়া পাশে বসিয়া আছে। আমরা পার হইয়া তাহাদের নিকটেই একটা স্থানে বসিলাম। দেখিলাম, সেই বালক তিনটি, জামার পকেট হইতে দুই-তিন টুকরা শুষ্ক মাংস বাহির করিল ও তিনজনে মিলিয়া চিবাইতে লাগিল, পরে আর একটুকরা বাহির করিয়া বৃদ্ধার হস্তে দিল। বৃদ্ধাটি এক হস্তে তাহা মুখের মধ্যে পুরিয়া আর এক হস্তে ঘুটিয়াগুলি অগ্নির দিকে সরাইয়া দিতে লাগিল এবং হাপর করিতে লাগিল। এদেশে হাপরের সাহায্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রন্ধনের কার্য্য সর্ব্বত্র সম্পন্ন হয়।

অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমরা আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। লামা মহাশয় আগেই চলিয়া গিয়াছেন। পথে সেইরূপ স্তূপাকার, ওঁ মণিপদ্মে হুং ক্রীং, চিত্রিত প্রস্তরসমষ্টির সারিও আমাদের সঙ্গেই চলিতে লাগিল।

চক্ষের উপরে এইসব চিত্রবিচিত্র পাথরগুলি অবিরাম বাড়িতেছিল; মনের মধ্যে চিন্তাও চলিতে ছিল,—আমাদের এই প্রাচ্য দেশগুলিতে সাজানোর ঘটা সর্বত্রই সমান, যেমন ভারতে তেমনি চীনে, জাপানেও তেমনি। পথের শোভা গাছে; আমাদের দেশে, চীন বা জাপানেও গাছ দিয়াই পথের শোভা বাড়াইবার প্রয়াস, এখানে তো গাছের সুবিধা নাই, এ মাটি গাছের উপযুক্ত নয়, অথচ শিল্পিমন কখনও অলস থাকিতে পারে না। কাজেই ইহারা এই তুচ্ছ, অযত্ন-বিক্ষিপ্ত সামান্য প্রস্তরখণ্ড লইয়াই তাহাতে এমনই বর্ণসমাবেশ করিয়াছে, শিল্পীর হৃদয়-ভাবের এমন ছাপ দিয়াছে যেখানে পথও সার্থক সেই সঙ্গে শিল্পিজীবনও ধন্য হইয়াছে। দেখিলে বিস্ময় লাগে।

এই কিম্ভূতকিমাকার মানুষ, তাহাদের জাতিগত আলঙ্কারিক শিল্পের নিদর্শন পথ সাজাইবার যে সুন্দর রীতির পরিচয় দিয়াছে, এ পথে যাহারাই আসিবেন দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন।

এলামাটি হইতে পীত, গৈরিক হইতে লাল এবং খড়িমাটি হইতে সাদা এই তিনটি রঙের ব্যবহার সর্ব্বত্রই দেখিয়াছি। নীল বা ল্যাপিস ল্যাজোলীর ব্যবহারও আছে, তবে পথেঘাটে তত নয়। সারা পথটি প্রথমোক্ত ঐ তিনটি রঙেই রঞ্জিত, ওঁ মণিপদ্মে হুং, মন্ত্রটি ক্ষুদ্র, বৃহৎ সকল প্রস্তরখণ্ডের মধ্যেই দেখিতে দেখিতে আমরা তিনটি বড় বড় জলস্রোত পার হইয়া প্রায় দেড়টা নাগাদ কোদন্নাথের মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইলাম। সঙ্গী-মহাশয় পশ্চাতে,—সুতরাং আমরা মন্দিরদ্বারে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

তিনি আসিলেন প্রায় পনের মিনিট পরে; একেবারে গরম মেজাজ। আসিয়াই নাথজীকে লক্ষ্য করিয়া পরিহাসের ভঙ্গিতে বলিলেন, তোম লোক তো ঘোড়েকা মাফিক্ চল্‌তা হ্যায়। প্রত্যুত্তরে নির্ভীক নাথজী বলিলেন, হাঁ, কোই ঘোড়েকো মাফিক্ চল্‌তা হৈ, কোই হাতীকো মাফিক্, কোই উঁটকো মাফিক্ চল্‌তা হৈ,—হর্ আদমী কো চলনা হর কিস্মকা হোতা হৈ।

সিংহদ্বারে প্রবেশ করিয়া কতকটা গেলে পর অঙ্গন পাইলাম,—তাহার

পর দুইটি মন্দির দেখিতে পাওয়া গেল। একটিতে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা এবং অপরটিতে মহাকাল ও তারামূর্ত্তি। মধ্যস্থলে একটি বিরাট যন্ত্র আছে, নিত্য পূজা হয়। এখানে তারামূর্ত্তি প্রায় সর্ব্বত্রই আছে। এই তারার উপাসনা বৌদ্ধতন্ত্রের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ উপাসনা। সাধনক্ষেত্রে যতগুলি উচ্চ অধিকারী
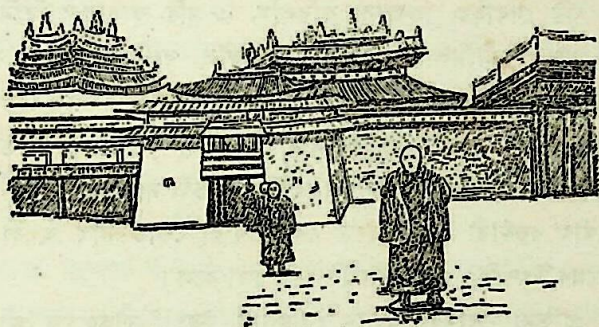
কোজর জো সিংহদ্বার

লামা; তাঁহারা সকলেই তারামন্ত্রে দীক্ষিত। আমাদের ভারতে তারার উপাসনা এরূপভাবে কোথাও নাই বলিলেই হয়। এই দেশে সর্ব্বস্থানেই দেখিতেছি তারার উপাসনাই প্রবল। উহা চীনাচার,—মহাচীন হইতেই সব দেশে গিয়াছে।

যন্ত্র বলিতে অধিষ্ঠানের স্থান বুঝায়। প্রথমে জপ, পরে ধ্যানের দ্বারা মন্ত্রকে জাগ্রত করিয়া বিশিষ্ট-রেখাঙ্কিত যে বিশেষ কেন্দ্রে শক্তির অধিষ্ঠান সাধকের প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে, তাহাকে যন্ত্র বলে। তিব্বতের সর্ব্বত্রই তন্ত্রোক্ত-যন্ত্র এবং মন্ত্রের অসাধারণ প্রভাব।

কোদণ্ডনাথের বিশাল বিশাল মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া যখন এক কোণে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম, তখন তেজোদীপ্ত প্রশান্তবদন, গৌরবর্ণ, প্রবীণ দীর্ঘকায় এক লামা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, পূজারী-লামার সঙ্গে তিনি প্রসন্নমনে কথা কহিতেছিলেন। আমায় ঐরূপভাবে দাঁড়াইয়া নিরীক্ষণ করিতে দেখিয়া শিস্ দিয়া ডাকিলেন। নিকটে গেলে আকারে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কে, কোথা হইতে আসিতেছি—ইত্যাদি। আমি বলিলাম, কলিকাতা। তিনি যে কি বুঝিলেন ভগবান জানেন। হাতে আমার খাতা অর্থাৎ স্কেচ-বুকখানি ছিল।

সেখানি তিনি বিশেষ আগ্রহে গ্রহণ করিয়া আগাগোড়া সমস্ত পাতাগুলি দেখিতে লাগিলেন। একস্থানে 'ওঁ মণিপদ্মে হুং হ্রীং' লেখা দেখিয়া আমায় প্রত্যেক অক্ষরটি দেখাইয়া বলিলেন, এটা ওঁ এটা ম এটা ণি ইত্যাদি। দেখা শেষ হইলে খাতাখানি দিলেন। তখন আমি সম্মুখের তিনটি মূর্ত্তি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এ মূর্ত্তি কাহার? তিনি সংখ্যা-গণনার মত অনামিকার মধ্যপর্ব্বে বৃদ্ধাঙ্গুলি রাখিয়া প্রথমে বলিলেন, রামচন্দ্র, দ্বিতীয় লক্ষ্মণ, তৃতীয় পার্ব্বতী। রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে যে পার্ব্বতীর কি সম্বন্ধ তাহা বুঝিতে পারিলাম না।* হিমালয় পারে তিব্বতে আসিয়া সীতা যে পার্ব্বতী হইয়াছেন দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য মনে করিলাম। কোদণ্ড-নাথ অর্থাৎ ধনুর্দ্ধারী রাম হইতে কোদন্নাথ বা কোজরনাথ অথবা কোজর জো নামের উৎপত্তি। দেবতাকে তিব্বতে জো বলে।

যে প্রতিমা আমরা এখানে দেখিলাম উহা বৌদ্ধযুগের আলঙ্কারিক শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা। এই মূর্ত্তিই সর্ব্বপ্রথমে আমার প্রাণে ভারতীয় শিল্পের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ আনিয়া দিল;—এইখানেই আমি অন্তরে অন্তরে ভারতীয় শিল্পের এক অনির্ব্বচনীয় প্রেরণা অনুভব করিলাম যাহা পরবর্ত্তীকালে আমার কর্ম্মজীবন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল। পূর্ব্বে ছিলাম পাশ্চাত্ত্য কলাবিদ্যার ভক্ত।

উচ্চ মঞ্চের উপর উপযুক্ত ব্যবধানে তিনটি রজতনির্ম্মিত শতদলপদ্মের উপর তিনটি দণ্ডায়মান মূর্ত্তি। মধ্যের পদ্মটি বিশাল, তাহার উপর প্রায় সাড়ে চারিহাত দীর্ঘ স্বর্ণময় প্রতিমা; অপূর্ব্ব রত্নালঙ্কারমণ্ডিত মুকুট,—হস্তে কোদণ্ডশোভিত রামচন্দ্র; বামে সীতা বা পার্ব্বতী ও দক্ষিণে লক্ষ্মণের অপেক্ষাকৃত ছোট সুবর্ণময় মূর্ত্তিদ্বয়, তাহাতেও ঐরূপ অলঙ্কারশোভিত মুকুট। হিরণ্ময় এই প্রতিমাত্রয়ের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য দেখিলাম তাহাতেই আমার জীবন সার্থক হইল।

* আমার এই ভ্রমণের পর যাঁহারা কোদণ্ডনাথ গিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ বলেন,—এই মূর্ত্তিত্রয় কীরাতার্জ্জুনের ব্যাপার।, মধ্যে কীরাতরূপী শিব, এক পাশে পার্ব্বতী অপর পাশে অর্জ্জুন। কিন্তু ঐ তিন মূর্ত্তির মধ্যে মাঝের মূর্ত্তি যে কীরাতের নয়, রামচন্দ্রের, তাহা মূর্ত্তির পানে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। সে যাহাই হোক না কেন আমি ঐ প্রধান লামার মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাই বলিয়াছি।

মূল বেদীর সম্মুখে দীর্ঘ রক্তবস্ত্রাচ্ছাদিত শ্রেণীবদ্ধ কাষ্ঠাধারে, নীচে হইতে স্তরে স্তরে আলোকমালা সজ্জিত রহিয়াছে। তার পরেই যাতায়াতের পথ, তারপরে সারি সারি লামাগণের গদিপাতা বসিবার আসন। তুইজন লামা সর্ব্বক্ষণ মন্দিরে থাকেন। রাত্রে সন্ধ্যারতির পর দ্বার বন্ধ করিয়া যে স্বার স্থানে চলিয়া যান।

এ তীর্থে প্রায় পঞ্চাশজন লামা থাকেন। মন্দির হইতে প্রায় তুই রশি দূরে সম্মুখেই কয়েকখানি চুনকাম-করা তিব্বতীয় গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার থুলো লামা ঐখানে থাকেন। অন্যান্য লামারাও সেইখানে কতক, কতক মন্দির-সংলগ্ন গৃহে বাস করেন। এখান হইতে দর্শন-শেষে আমরা থুলো লামার সঙ্গে দেখা করিতে যাই।

যে লামা মহাশয় মন্দিরে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহাকে ধরিয়াই এখানকার থুলো লামার আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাঁহার গৃহখানির সামনেই কতকটা খালি জমি। একপাশে খুব নীচু একতলা মাটির কুটুরি, গুহার মতই, দ্বারের স্থানে আগড় বন্ধ। প্রতিহারী লামা-মহাশয় থুলো লামার স্থানে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এই ছোট ঘরগুলি আমাদের দেখাইয়া কি ইঙ্গিত করিলেন তখন বুঝিতে পারিলাম না। পরে বুঝিয়াছিলাম এই স্থানেই আজ আমাদের বিশ্রাম করিতে হইবে। যাহা হউক, পরে আমরা তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া ছোট একটি দ্বার দিয়া থুলো লামার দ্বিতল গৃহে প্রবেশ করিলাম। ভিতরে অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না, তিনি কিন্তু ঠিক চলিতেছেন। পরে দক্ষিণে ঘুরিয়া একটি জীর্ণ কাঠের সিঁড়ি দিয়া সন্তর্পণে উপরে উঠিলাম। এখানে একটু আলো ছিল। একটি দ্বার, কৃষ্ণবর্ণ পরদায় ঢাকা। সেই স্থানে আমাদের দাঁড়াইতে ইঙ্গিত করিয়া লামা ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ এই মৃন্ময় অট্টালিকার চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইতে লাগিলাম। কতকটা দূরে একটি অশীতিপর বৃদ্ধা একটি প্রকাণ্ড তামার পাত্রে কিছু ভোজ্যদ্রব্য পাক করিতেছিলেন। একদিকে ক্ষুদ্র একটিমাত্র গবাক্ষ, তাহার ভিতর দিয়াই যেটুকু আলো আসিতেছিল। কিছুক্ষণ পর লামা-মহাশয় আমাদের ভিতরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। ভিতরে গিয়া দেখিলাম, চারিদিক বন্ধ—উপরে ছাদের মাথায় কতটুকু মুক্তস্থান দিয়া আলো আসিতেছিল। একদিকে থুলো লামার আসন, তাঁহার পার্শ্বে

পুঁথির কাঁড়ি। সুমুখে একটি নীচু কাঠের চৌকী, তাহার উপর চায়ের পেয়ালা ঘণ্টা ইত্যাদি। পার্শ্বের আসনে একটি দেবমূর্ত্তি লামা। তাহারও সুমুখে চৌকি। বাকি দুই দিকের গৃহতলে সারি সারি অনেকগুলি পুরু গদির আসন, সুমুখে চা-পাত্রাদি ভোজ্য-বস্তু রাখিবার লম্বা একটি ফালি তক্তা পাতা। সঙ্গী-মহাশয় অগ্রসর হইয়া লামার যথাসম্ভব নিকটে ঘেঁষিয়া একটি আসনে বসিলেন, পরে হাত তুলিয়া নমস্কারান্তে বলিলেন, হাম্ কাশীজীকা লামা হ্যায়।

কালো কাপড়ের কাঁধকাটা ফতুয়া ধরনের আংরাখা গায় দিয়া থুলো লামা বসিয়াছিলেন। গৌরবর্ণ, সুপক্ক দাড়িম্ব ফাটিয়া পড়িবার পূর্ব্বে যেমন হয়, গালে সেইরূপ রক্ত-আভা। মুণ্ডিত মস্তকে কদম্বকেশরের মত চুল
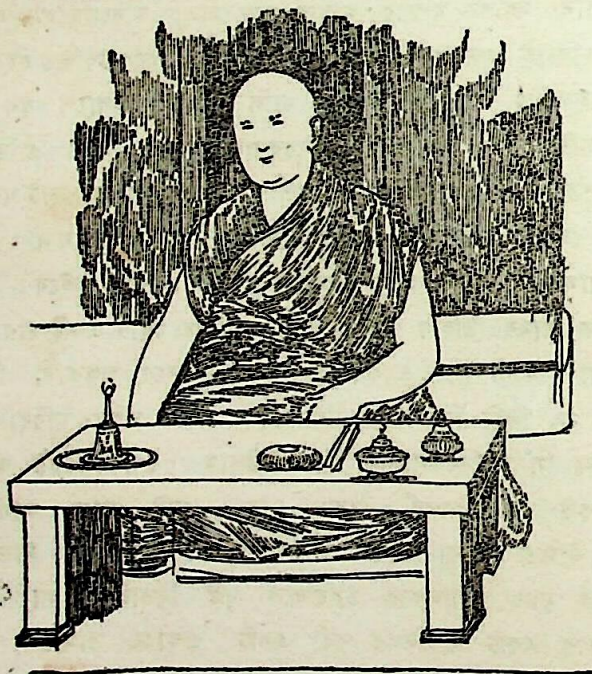
থুলো লামা

গজাইয়াছে, গোঁফ-দাঁড়ি পরিষ্কার কামানো, মুখখানি তাঁহার সদাই মধুর হাসিতে পূর্ণ ও উজ্জ্বল ;—দেহ তাঁহার যেন দৈব ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত।

সঙ্গী-মহাশয়ের কথা বুঝিতে না পারিয়া একবার তাঁহার, একবার

আমার, মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। এমন সময় একজন নেপালী আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিল। সেই ব্যক্তিই এ ক্ষেত্রে দোভাষীর কাজ করিয়াছিল।

সঙ্গী-মহাশয় লামাকে একখানি তাঁহার সেই গীতা উপহার দিলেন। লামা জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কিসের পুঁথি? তখন, কালার সঙ্গে যে ভাবে উচ্চৈঃস্বরে লোকে কথা কয় সেইরূপ উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীমহাশয়, তাঁহার অভ্যস্ত হিন্দীতে অনর্গল আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র ও লামাদের ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতাসকল বলিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার চীৎকার ও ভাষা শুনিয়া থুলো লামা-মহাশয় কেবল ঘাড় নাড়িয়া মৃদু মৃদু হাসিতেই লাগিলেন। ক্লান্ত হইয়া বক্তা যখন থামিলেন তখন দোভাষী নেপালীর সাহায্যে কথা হইতে লাগিল। সে ব্যক্তি লামাকে সঙ্গী-মহাশয়ের উত্তরটি অনুবাদ করিয়া বুঝাইল যে,—এখানি আমাদের ধর্ম্মপুস্তক—শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতা।

লামা জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাদের উপাসনা কিরূপ?

জপ, ধ্যান ইত্যাদিই আমাদের উপাসনা।

তোমাদের মন্ত্র কিরূপ? উত্তরে, পণ্ডিতজী, ক্রীং ক্লীং হ্রীং ইত্যাদি বলিলেন।

তাহার পর লামা—তোমরা কোথায় যাইবে, কি করিতে আসিয়াছ, এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সঙ্গী-মহাশয়ও সকল কথার উত্তর সংক্ষেপে দিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে নিজেই হিন্দীতে আবার বলিতে লাগিলেন। হামভি তোম লোককো মন্ত্র জান্‌তা হ্যায়, মণি পেমিহুং, ইসকা অর্থভি জান্‌তা হ্যায়। মণি পেমি হুং, অর্থাৎ হাম, মণিপদ্মম্ হ্যায় ইত্যাদি। কিন্তু হায় এই দগ্ধ এবং রসহীন তিব্বতে তাঁহার এমন করিয়া হিন্দীতে মণি পেমিহুং-এর ব্যাখ্যা কেহ বুঝিল না। লামা-মহাশয় তাঁহার ব্যাখ্যাপরায়ণ রাগোন্মত্ত মুখের প্রতি বিস্ময়দৃষ্টিতে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিয়া কেবল ঘাড়ই নাড়িতে লাগিলেন।

যে লামাটি আমাদের আনিয়াছিলেন তিনি ইত্যবসরে রক্তবর্ণ চা আনিয়া, থুলো লামার সম্মুখে পাত্রটি রাখিয়া দিলেন। পরে আমাদের জন্য চা আনিয়া দিলেন, উহা সেরূপ্ রক্তবর্ণ নহে। সঙ্গী-মহাশয় বড় চা-ভক্ত নহেন। তিনি না ভুগিলে চা খাইতেন না। আমাদের জন্য তার পর ছাতু আসিল সঙ্গে সঙ্গে কাঠের পাত্রে ঘোলও আসিয়া পৌছিল। এইরূপে

আমাদের চা, ছাতু, ঘোল প্রভৃতি দিয়া অভ্যর্থনা হইল, পরে সহকারী একজন লামা আমাদের জন্য একটি প্রকাণ্ড তামার পাত্রে, অতি সুন্দর মিহি চাউল, তুলার কাগজে কতকটা মাখন ও একটু নুন আনিয়া, নীচে পরিচারকগণের থাকিবার জন্য নির্দিষ্ট সেই গুহাটি দেখাইয়া আমাদের রন্ধন, ভোজন ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন। নিকটেই একটি জলের ধারা ছিল।

একপ্রকার সুগন্ধি তৃণ এদিকে জন্মায় তাহা সংগ্রহ করিয়া মঠের বা গৃহস্থের ঘরের ছাদে শুকাইয়া রাখা হয়, তাহাই সময়ে ইন্ধনের কাজ করে। নচেৎ শুষ্ক গোময় প্রভৃতিই তিব্বতের সাধারণ ইন্ধন; এক বৃদ্ধা এক বাজরা ঐরূপ শুষ্ক তৃণ আমাদের রন্ধনের জন্য ইঙ্গিত করিয়া গেলেন।

এখানকার যিনি বড় অর্থাৎ থুলো লামা তিনি চিরকুমার ব্রহ্মচারী এবং সর্ব্বত্যাগী। তাঁহার শক্তি সম্বন্ধে এখানে অনেকে একটি অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

পূর্ব্বাশ্রমে তাঁহারা তিনটি ভাই। তিনি জ্যেষ্ঠ, তাঁহার সংসার ত্যাগের পরই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তার পর যোগাবস্থায় তাঁহারা পিতার আত্মার সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি যোগসাধনার্থে পুনরায় শরীর পরিগ্রহ করিবেন এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন।

ইহা অবগত হইয়া তিনি তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা, যিনি তাঁহারই মত একজন কুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন, তাঁহাকে, গৃহে গিয়া দারপরিগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন।

যখন তাঁহার পিতৃ-আত্মার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার মধ্যম ভ্রাতার ঔরসে এবং অমুক বংশের কন্যার গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করিবেন,—সেই জন্য তিনি তাঁহার মধ্যমকেই দারপরিগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন এবং ভদ্রবংশের সেই কন্যার সহিত তাহার বিবাহের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাঁহাদের বিবাহ হইয়া গেল।

প্রায় দুই বৎসর পরে তাঁহাদের একটি সুন্দর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। সেই পুত্র যখন পাঁচ বৎসরের হইল তখন থুলো লামা উৎসব ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া সেই ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে দীক্ষিত করিলেন এবং সেই অবধি নিজের নিকটেই রাখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন;—পরে তাহাকে সন্ন্যাসে

দীক্ষিত করিয়া প্রধান লামার পদে অভিষিক্ত করিবেন এরূপ ব্যবস্থা ঠিক হইয়া আছে। এখানকার জনসাধারণ এ-ব্যাপার ঐশ্বরিক শক্তির খেলা বলিয়াই জানে।

এখন হইতেই এখানে সকলে তাহাকে অবতার বলিয়া মানিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং পরে তাঁহার দ্বারা দেশের এবং দশের কল্যাণ হইবে এরূপ ধারণা সকলের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

নাথজী ও সঙ্গী-মহাশয় আহারাদির পর বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন, প্রায় আধ ঘণ্টা পরে তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন। তারপর এখন আমি কোজরনাথের মন্দির ও প্রতিমার দৃশ্যটি, এই সুযোগে আমার পুস্তকজাত করিব স্থির করিয়া বাহির হইলাম এবং অল্পক্ষণেই সেখানে পৌছিলাম।

আলমোড়ায় লালা অন্তিরাম সা ছবি আঁকিবার সরঞ্জামগুলি কেন যে এখানে আনিতে নিষেধ করিয়াছিলেন তাহা এইবার বুঝিলাম।

সিংহদ্বার ছাড়াইয়া অঙ্গনে আসিয়া দেখিলাম বালক ব্রহ্মচারী লামাগণ ছুটাছুটি করিতেছে। পার্শ্বে একখানি দ্বিতল গৃহের জানালা হইতে একটি ভোটিয়া নারী মুখ বাড়াইয়া দেখিতেছে। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই কথা কহিলেন এবং হিন্দীতে আলাপ করিলেন। আমাদের দেশে যেমন কাশীতে বৃন্দাবনে কিংবা পুরীতে অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা এবং বিধবারা তীর্থবাস করেন ইনিও সেইরূপ তীর্থবাসিনী। ভোটিয়া পরগণার অন্তর্গত দারমায় তাঁহার নিবাস। অনাথা বিধবা, তিনি এইখানে থাকেন এবং এইখানেই জীবনপাত করিবেন এই সংকল্প। স্ত্রী-জীবনে ধর্ম্মের প্রভাব আমাদের দেশ অপেক্ষা এদিকে কম নয়। যাহা হউক আলাপ-পরিচয়-শেষে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কাজের চেষ্টা করিলাম।

দ্বার হইতেই সম্মুখে যেরূপ দেখা যায়, আমি ঐ পরম সুন্দর ত্রিমূর্ত্তির রূপ-রেখা খাতায় আঁকিতে আরম্ভ করিলাম। দেখিতে দেখিতে দুই-একজন যুবক লামা আসিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। হঠাৎ একজন আমার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। হঠাৎ একজন আমার নিকট পেন্সিলটি চাহিয়া লইল, তারপর আমার খাতার উপর যথেচ্ছ আঁক পাড়িতে লাগিলেন। বিরক্ত হইয়া আমি তাঁহার হাত হইতে পেন্সিল লইয়া পুনরায় নিজকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করিলাম। অল্পক্ষণ কাজ করিবার পর গুণ্ডার মত

কঠোরমূর্ত্তি একজন লামা আসিয়া আমার হাত হইতে পুনরায় পেন্সিল কাড়িয়া ইঙ্গিতে বাহিরে যাইতে বলিল;—তাহাতে আর আর সকলে বিকট শব্দে হাসিয়া উঠিল।

লামাদের অত্যাচার

আমি এইসব লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলাম এবং পেন্সিলটি চাহিলাম, সে দিল না। তখন সেই ভোটিয়া নারী গবাক্ষ হইতে পুনরায় মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কি হইয়াছে? তাঁহাকে সকল ব্যাপার বলিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন, আপনি এখানে কিছু আঁকিবার চেষ্টা করিবেন না। ইহারা অসভ্য হিংস্র পশুবিশেষ, ওসব কিছু বুঝে না। পরে তাহাদের দিকে ফিরিয়া সতেজে তিব্বতী ভাষায় কত কি বলিতে লাগিলেন। ক্রমে দেখিলাম তাঁহাতে ও লামাতে কড়া কড়া কথা হইতে লাগিল। নানা কথা হইতে হইতে শেষে লামাসাহেব উত্তেজিত হইয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে আমার পেন্সিলটি সজোরে একদিকে ছুঁড়িয়া দিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ গিয়া উহা কুড়াইয়া লইলাম, দেখিলাম উহা ফাটিয়া দুইটি হইয়া গিয়াছে। উহাদের ব্যবহারে আমার ভয় হইল, পাছে ছুরি-ছোরাই বা বসাইয়া দেয়।

চলিয়া আসিবার কথা ভাবিতেছি, সেই স্ত্রীলোকটি হিন্দীতে বলিলেন, আপনি এখনই এখান হইতে চলিয়া যান, দেরী করিবেন না, এখানে থাকিলে ইহারা আপনার অনিষ্ট করিতে পারে। আমি তাহাই করিতে সঙ্কল্প করিলাম। ফিরিতেছি, তখন সেই বলবান লামাটি সম্মুখে আসিয়া সজোরে আমার হাত হইতে খাতাখানি ছিনাইয়া লইল এবং তাহার মধ্য হইতে কোদন্নাথের নক্সা যে পাতায় আরম্ভ করিয়াছিলাম সেই পাতাখানি ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল এবং খাতাখানি দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। আমি দ্রুতগতি বাসায় ফিরিয়া আপন স্মৃতি হইতে যথাসম্ভব মূর্ত্তি তিনটি পুনর্বিন্যাসে মনোনিবেশ করিলাম।* কাহাকেও কিছু বলিলাম না বটে, কিন্তু এই ব্যাপারে প্রাণের মধ্যে একটা বিষম আঘাত পাইলাম।

এ গেল একটি আঘাত এখন আরও একটি আঘাতের কথা বলি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সঙ্গী-মহাশয় আমাদের উপর পূর্ব্ব হইতে কিছু অপ্রসন্ন ছিলেন। তাহার উপর আবার আমরা, ঘোড়াকো মাফিক, দ্রুত আসিয়া তাঁহার অগ্রে এখানে পৌঁছানোতে তিনি কথা-প্রসঙ্গে মধ্যে

* পরে আমার কোন বান্ধবের কৈলাস মানসসরোবর ভ্রমণের সুযোগ ঘটিয়াছিল,—তিনি বহু স্থানের বহুতর ফটোগ্রাফ তুলিয়া আনিয়াছেন, পরে আপন ভ্রমণ-বৃত্তান্তের মধ্যে প্রকাশ করিবেন। তাঁহার নিকট প্রাপ্ত কোজর-যো ফটোতে মিলাইয়া দেখিলাম আমার চিত্রে এক মূর্ত্তি হইতে অপর মূর্ত্তির ব্যবধান কিছু কম হইয়াছে।

মধ্যে আমার উপর একটু অধিকতর বিরক্তি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। আমাকে শ্লেষ করিয়া কিছু বলিতে হইলে তিনি নাথজীকে সম্বোধন করিয়া তৃতীয় ব্যক্তির মত কিছু কিছু অন্তরস্থ কূট শ্লেষাগ্নি বাহির করিতেন। এ সকল তৃতীয় ব্যক্তির বুঝিবার সাধ্য ছিল না। তিনি এবং যাহার উপর প্রযুক্ত হইত সেই ব্যক্তিই কেবল বুঝিত, এমন কি নাথজীও সময়ে সময়ে বুঝিতে পারিতেন না।

যাহা হউক, রাত্রিটুকু আমরা এখানে কাটাইয়া প্রাতে তাকুলাখায় ফিরিয়া যাইব এই কথাই ঠিক রহিল। নাথজী বলিলেন যে একটু বেলা হইলে, রৌদ্র উঠিলে তাহার পর যাওয়া যাইবে, প্রভাতে বড়ই ঠাণ্ডা।

আমাদের সঙ্গে পর্য্যাপ্ত শীতবস্ত্র ছিল না, সবই তাকুলাখারে। দুই-এক দিনের ভ্রমণ বলিয়া বেশী বোঝা না বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই সঙ্গে সবগুলি আনা হয় নাই।

সঙ্গী-মহাশয় সব কর্ম্মেই একটু সাবধানী, তিনি প্রচুর গরম কাপড় গায়ে চড়াইয়াছিলেন, তাঁহার কিছুই অসুবিধা হয় নাই। এখন, বেলায় যাইবার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, তাহা কখনই হইতে পারে না, বেশী বেলা হইলে রৌদ্রে কষ্ট হইবে, (যেহেতু তাঁহার গায়ে গরম পোষাক বেশী করিয়া চড়ানো থাকিবে) অতএব ভোরেই যাইতে হইবে। নাথজী বলিলেন,—যো হোয়েগা সো হোয়েগা, সুবেরমে দেখা যায়গা, অব তো শোনা আচ্ছা ;—বলিয়া বেশ করিয়া কম্বলখানি আপাদমস্তক মুড়ি দিলেন।

ভোর পাঁচটার সময় সঙ্গী-মহাশয় উঠিয়া বাতি অনুসন্ধান করিলেন, আমি উহা বাহির করিয়া দিলাম। আমাদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, উঠিয়ে নাথজী, উঠ -হে চল বার হওয়া যাক্। বলিয়া তিনি পাগড়ি বাঁধিতে লাগিলেন। কিছু না বলিয়া আমি পাশ ফিরিয়া শুইলাম। নাথজীও, না হুঁ কিছু বলিলেন না। পাগড়ি বাঁধা হইলে তিনি বলিলেন, কি হে উঠলে না যে, তুমি এখন যাবে নাকি?

এই ভোরে এত শীতে যেতে পারব না।

তিনি বলিলেন, তবে তুমি থাক, চলিয়ে নাথজী হাম লোক চলি। নাথজীও বড় বেশী কিছু না করিয়া কেবল, আপ থোড়া আগাড়ি চলিয়ে, হাম লোক পিছে আতা হৈ, বলিয়া পাশমোড়া দিলেন।

তখন তিনি,—আচ্ছা, বলিয়া তাঁহার লাঠিটি লইয়া প্রস্থান করিলেন। সেই, আচ্ছার, মধ্যে এমন একটি পদার্থ ছিল যাহা, তাহার পর হইতে যতদিন আমরা একত্র ছিলাম ততদিন উত্তমরূপেই অনুভব করিয়াছিলাম যে উহা কি পরিমাণে অনল বহন করিতে পারে।

যাহা হউক, প্রভাত হইলে আমরা উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া লইলাম,—গতরাত্রের কতকগুলি ইন্ধন অবশিষ্ট ছিল তাহা জ্বালাইয়া নাথজী চা প্রস্তুত করিলেন। সঙ্গে কিছু খাবার তাকৃলাখার হইতে আনা হইয়াছিল, উহা দ্বারা শরীরটাকে ধাতস্থ করিয়া, রৌদ্র উঠিবার পর ধীরে ধীরে বাহির হইলাম। কোথাও যাইবার সময় কিছু খাবার আমরা নিজ নিজ সঙ্গে লইতাম। সঙ্গী-মহাশয়ের সঙ্গেও খাবার ছিল।

মধ্যপথে সেই নদীতীরে আসিয়া আমরা সঙ্গী-মহাশয়কে ধরিলাম, তিনি তখন বিশ্রাম করিতেছিলেন। নদীটির স্রোত অতিশয় প্রখর, জল কোথাও এক-হাঁটু, কোথাও বা কিছু কম।

তিনি একেই আমাদের উপর একটু অতিমাত্রায় অপ্রসন্ন ছিলেন, তাহার উপর আবার আমরা যখন তাঁহাকে মধ্যপথে ধরিলাম, তাহাতে তাঁহার বিরক্তির মাত্রা যেন আরও একটু বাড়িয়া গেল।

আমরা আসিয়া বসিতে না বসিতেই তিনি উঠিলেন। নদী পার হইবার জন্য জলের নিকট আসিয়া তাঁহার তিব্বতী পশমের ভারি জুতাটি বাম হস্তে এবং অপর হস্তে লাঠিটি সজোরে জলমধ্যস্থ প্রস্তর-সন্ধির মুখে গাঁথিয়া পার হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এক-আধবার অপারগ হইয়া পদস্খলনের মত হইল, তখন নাথজী সাহায্যার্থে হাত বাড়াইয়া বলিলেন, আইয়ে।

তিনি এ সময়েও অন্তরের বহ্নি আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। রোষদীপ্ত তীক্ষ্ণ কটাক্ষ হানিয়া,—তোমারা মাফিক জোয়ান, দো চারঠো পয়দা করনেকো তাকত আভি তক্ হাম রাখতা হ্যায়,—বলিয়া সেই প্রসারিত হস্ত প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং চেষ্টা করিয়া কোন রকমে পার হইয়া গেলেন। আমরাও তাহার পর পার হইয়া তাঁহাকে পশ্চাতে রাখিয়া চলিতে লাগিলাম। তখন বেলা প্রায় নয়টা হইবে।

এই ব্যাপারে তাঁহার উত্তেজনার মাত্রা বাড়িয়া গেল। তাঁহার প্রায় কুড়ি মিনিট পূর্ব্বে আমরা তাকৃলাখারে আসিয়া কিষণ সিংহের ডেরায়

পৌছিলাম এবং শুনিলাম লাল সিং পাতিয়াল ও তাঁহার মা আসিয়াছেন, কুমারী তিনটি ভগ্নী আসিয়াছে এবং আর সকলেই আসিয়া পৌছিয়াছেন। আনন্দিত চিত্তে সঙ্গী-মহাশয়কে শুভ সংবাদটি শুনাইবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, এ খবরটি পাইয়া নিশ্চয়ই তিনি জল হইয়া যাইবেন।

লাল সিং পাতিয়াল তখন তাঁহার ঘর ঠিক করিয়া, মাটি এবং গোময় লেপন শেষে উপরে ছোলদারী খাটাইবার যোগাড়ে অনেক লোকজন ব্যস্ত ছিলেন; তাঁহাকে আর বিরক্ত করিতে গেলাম না। ভাবিলাম, সঙ্গী-মহাশয় আসিলে একত্রই যাওয়া যাইবে।

তিনি আসিলে আমি খবরটি তাঁহাকে শুনাইয়া দিলাম। তিনি ত ভয়ানক রাগিয়াই আছেন; বিশেষ কোন আনন্দের চিহ্নই তাঁহার মুখে প্রকটিত হইল না। এখন কি করিয়া শান্ত করা যায় তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

জামাজোড়া খুলিয়া বসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে কিষণ সিংকে লক্ষ্য করিয়া তিনি এক অদ্ভুত গল্প ফাঁদিলেন। গল্পটি শুনিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, কি অর্থে উহা রচিত হইয়াছিল। তিনি হিন্দিতে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার অবিকল বাদানুবাদ এইরূপ;—দেখিয়ে কিষণজী, বলিয়া তিনি আরম্ভ করিলেন। আজ একটি ভারি আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়াছে। কোজরনাথ হইতে ফিরিবার সময়ে অর্দ্ধেক পথে যে নদীটি আছে, উহা পার হইয়া হাঁটিয়া আসিতেছিলাম। একটু দূরে আসিয়া দেখিলাম দুই-তিন জন ঘোড়-সওয়ার আসিতেছে। আমার মাথার পাগড়ি, চক্ষে ঠুলি-চশমা ও মাথায় ছাতা ছিল। আমি একলাই ছিলাম, আমার সঙ্গীরা আমায় পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রে পলাইয়াছিল (আগাড়ী ভাগা থা)। আমি সাহস করিয়া একাই আসিতেছিলাম। সেই লোক তিনটির মধ্যে একটি স্ত্রীলোক ও দুইটি পুরুষ। তাহাদের মধ্যে পুরুষ দুইটি কিছু আগে আগে আসিতেছিল, স্ত্রীলোকটি পশ্চাতে ছিল। তাহার পর স্ত্রীলোকটি আমার দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে, সেই লোক দুইটির মধ্যে সম্ভবতঃ তাহার স্বামীর নিকট গিয়া, পশ্চাতে আমার দিকে হাত দিয়া দেখাইয়া কি বলিয়া দিল। তাহার পর তাহার স্বামী ঘোড়া ফিরাইয়া আমার দিকেই আসিল। আমি দেখিলাম যে,

তাহার অভিপ্রায় কখনই ভাল নহে, নিশ্চয়ই কোন কুমতলব আছে। আমি তখন আমার মনে সাহস আনিলাম, আনিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলাম। আমার নিকটে অস্ত্রাদি বা আত্মরক্ষার কোন উপায়ই ছিল না। জামার পকেটে চশমার এই খাপখানি ছিল মাত্র। তখন আমি বজ্রমুষ্টিতে সেই খাপখানি পিস্তল ধরার মত ধরিলাম। সে সম্মুখে আসিয়া আমার সহিত কথা কহিবার যোগাড় করিতেছে তখন আমি বজ্রনিনাদে চারিদিক কাঁপাইয়া চীৎকার করিয়া তাহাকে বলিলাম, খবরদার, ঔর এক পা আয়েগা তো তোমারা শির লেগা;—বলিয়া তখন সেই সভার মাঝে তিনি সেইরূপ ভঙ্গীতে বিকট আওয়াজে অভিনয় করিয়া দেখাইয়া দিলেন যে কিরূপভাবে কথাগুলি বলিয়াছিলেন এবং কিরূপ ভাবে চশমার খাপ ধরিয়াছিলেন। পরে আবার সুরু করিলেন,—ঐরূপভাবে তাহাকে বলিবামাত্র সে একেবারে ঘোড়া ছুটাইয়া দৌড় দিল। কি আশ্চর্য্য ভগবানের দয়া আমার উপর;—ঐরূপ বুদ্ধি না করিলে যে কি হইত বলা যায় না। সকলে শুনিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

কিষণ সিং প্রমুখ অন্যান্য কর্ম্মচারীবৃন্দ তাঁহার কথাগুলি শুনিয়া নিশ্চয়ই বিলক্ষণ আমোদ অনুভব করিল। তাহার পর সঙ্গী-মহাশয় তাক্‌লাখারের পরিচিত অপরিচিত কাহারও নিকটে উহা সুবিস্তারে বলিতে বাকী রাখেন নাই। শুধু তাক্‌লাখার নহে, তাঁহার এ বীরত্বকাহিনী তাঁহার মুখে কৈলাস হইতে ফিরিবার পথে প্রত্যেকেই শুনিয়াছেন। তাহার পর কলিকাতায় আসিয়া উহা যে কিরূপ ভাষায় ও ভাবে প্রচারিত হইয়াছে তাহা অনেকেই তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়া ধন্য হইয়াছেন। শেষে তাঁহার সচিত্র পুস্তকেও উহা বর্ণিত ও চিত্রিত হইয়াছিল। বাহির হইতে পারি নাই তাই, তার উপর পথে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়াছি এই সব অপরাধের দণ্ড হইল এই উপাখ্যান। তাঁহার সেই, আচ্ছা, বলিয়া চলিয়া আসা, এতটাই ফল প্রসব করিয়াছিল। যাহা হউক মোটের উপর এই ব্যাপারের পর, অকারণে বা তুচ্ছ কারণ লইয়া তাঁহার ব্যবহারের বড় বৈষম্য ঘটিতে লাগিল।

॥ ১২ ॥

কৈলাসের পথে—রাবণ হ্রদ

পুরাং‌এর আরও কথা
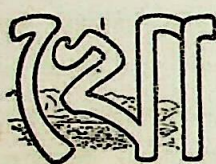
খোজর-জো হইতে ফিরিয়া আমরা তাক্‌লাখার মণ্ডিত অবস্থা আর এক রকম দেখিলাম। এই দুইটি দিনের মধ্যে অনেক মহাজন আসিয়া দোকান পাতিয়া বসিয়াছে; খরিদ্দারের সংখ্যাও অনেক বাড়িয়াছে। আমরা তিনজন বরাবরই কিষণ সিংএর ওখানেই বাস করিতেছি। কিন্তু এখন ক্রমশঃ খরিদ্দারের সংখ্যা বেশী এবং সেখানে অনেক লোকের যাতায়াত আরম্ভ হওয়াতে সকল সময় ওখানে থাকার বিশেষ অসুবিধা হইতে লাগিল। একে তাহার ঘরখানির চারিদিকে বিস্তর মাল সাজানো,—ফাঁকা জায়গাটুকুর এক পাশে রান্নার জায়গা, মধ্যেকার স্থানটুকুতে মহাজনদের গদি এক দিকে, বাকিটুকুতে নিরন্তর খরিদ্দারের আসা-বসা চলিতেছে, তাহার উপর আমরা তিনজন যদি সর্ব্বক্ষণ কতকটা জায়গা দখল করিয়া থাকি তাহা হইলে বড়ই অন্যায় হয়। সেই কারণেই আমরা দুই বার আহার ও রাত্রে শয়ন ব্যতীত প্রায় সকল সময় বাহিরেই কাটাইতাম।

লাল সিং পাতিয়াল আসার পর আমরা রুমার কাছে তাহার ওখানে থাকিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম,—সেখানে তাহার স্থান বেশী,—আমরা স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিব, তাহাতে কিষণ সিংএরও সুবিধা হইবে। কিন্তু এই সরল ভোটিয়া জাতির মনোভাব স্বতন্ত্র। রুমা বলিল, পিতাজী, কদাচ কিষণ সিংএর কাছে ওরূপ প্রস্তাব করিবেন না, তাহাতে সে মহা অপমানিত মনে করিবে। যখন প্রথমেই সে আপনাদের অতিথিরূপে আশ্রয় দিয়াছে তখন আর কোন কারণেই সে আপনাদের ছাড়িবে না। আপনাদের সুবিধা হউক বা অসুবিধাই হউক, কৈলাস পথে যাত্রা পর্য্যন্ত তাহার

আশ্রয়েই থাকিতে হইবে। এখানে বিদেশে আমরা সকলেই এক গোষ্ঠি, অতিথি-অভ্যাগতদের জন্য আমরা করিতে পারি না এমন কাজই নাই। যদি কোন কারণে কোন অতিথি বিমুখ হয় বা কাহারও আশ্রয় ছাড়িয়া যায় তাহা হইলে অপমানে আমাদের সমাজে তাহার মুখ দেখানো ভার হইবে।

দৌলত সিং নামে রুমার একটি ভাগিনেয়,—এখানে তাহারও একখানি দোকান আছে। রুমা সেইখানেই থাকে। নাথজী এবং আমি প্রত্যহ দৌলতের দোকানেই বসিতাম। আমার যাহা-কিছু লেখাপড়া, আঁকা-জোঁকা সবই সেখানে হইত। আসকোটের লালগীরও সময় সময় সেখানে জুটিত, সঙ্গী-মহাশয়ও মাঝে মাঝে দর্শন দিতেন, তবে অল্পক্ষণের জন্যই। তিনি কোথাও বেশীক্ষণ বসিতে পারিতেন না। অন্তরে তাঁহার একটা অশান্তি নিরন্তর ছিল। শীঘ্র শীঘ্র এই কঠিন তীর্থযাত্রা শেষ করিয়া কত দিনে দেশে ফিরিবেন এখন হইতে ইহাই তাঁহার চিন্তা ও উদ্বেগের বিষয়। তাঁহার ইচ্ছা, যত শীঘ্র হয় কৈলাসের দিকে যাত্রা করা, কিন্তু এ পোড়া দেশে ইচ্ছামাত্রেই কিছু হইবার যো ছিল না। এক-একটি যাত্রা সফল করিতে অনেক যোগাযোগ অপেক্ষা করে। অনেকের অনেক সাহায্যের প্রয়োজন হয়, শুধু পয়সা থাকিলেই হয় না। বিশেষতঃ এই বয়সে নিরন্তর আরামের ব্যাঘাত ঘটাতেও চির-অভ্যস্ত আচরণের বিলক্ষণ ব্যতিক্রম প্রতি পদে ঘটিত বলিয়া তাঁহার অশান্তিও সময় সময় অসহ্য রকম হইত। সেই হেতু এই আনন্দের তীর্থযাত্রার মধ্যে তাঁহার সঙ্গী হইয়া আমাদেরও অনেক সময় নিরানন্দ ভোগ করিতে হইতই।

কেদারনাথ হইতে ফিরিয়া আমরা তিন দিন পরে তবে কৈলাসের পথে যাত্রা করি। এই তিন দিনে আমরা এখানকার আরও অনেক কিছুই দেখিতে ও শুনিতে পাইয়াছিলাম।

এখানে যতগুলি দোকান দেখিলাম, লালসিং পাতিয়ালের দোকানই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। তাহার তিনখানি বড় বড় ঘর, লোকজনও বিস্তর। তাহার দোকানেই খরিদ্দার বেশী, এখানকার সকলেই তাহাকে বেশী মান্য-গণ্য করে। আমদানি ও রপ্তানি এই কাজই সকল মহাজন অপেক্ষা তাহার বেশী। কাজেই তাহার সহায়তা লাভ আমাদের সৌভাগ্যের যোগেই ঘটিয়াছিল বলিতে হইবে। তিন-চারি দিনের মধ্যেই সকল দোকান

বসিয়া গেল—হাট গম্‌গম্‌ করিতে লাগিল। আমাদের পরিচিতের মধ্যে, গারবেয়াংয়ের দিলীপের তিন ভাইয়ের দোকান ত আগেই বসিয়াছিল, এখন শাংরুয়ালা ধনিরাম শ্রেষ্ঠীর দোকানও বসিয়াছে। মোটা বুট পায়ে, কোমরে তরবারি, পৃষ্ঠে বেণীবিলম্বিত তিব্বতীয় স্ত্রী-পুরুষ ক্রেতাগণের যাতায়াতে তাক্‌লাখার মণ্ডি একেবারে জমজমাট। মণ্ডিতে সকালে এবং বৈকালেই খরিদ্দারের যাতায়াত কিছু বেশী, সাধারণতঃ মধ্যাহ্নে আহার এবং বিশ্রামের সময় কিছু কম থাকে।

বেলা দ্বিপ্রহরের পর এখানে এরূপ হাওয়া চলিতে থাকে যে, বাহিরে যাওয়া একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে। সে হাওয়া বড়ই রুক্ষ, তাহাতে শরীর শুকাইয়া যায়। প্রাতঃকালে এত ঠাণ্ডা থাকে যে নীচে নদীর জলে হাতমুখ ধুইবার পর আসিয়া কম্বলমুড়ি দিয়া বসিয়া থাকিলে সেই হাতে স্বাভাবিক জলবায়ুর গুণে কোন দ্রব্য পচিতে পায় না। বায়ু এরূপ রুক্ষ যে, একটি মৃতদেহ এক-দেড় সপ্তাহ পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে। প্রত্যেক লোকালয়ের চারিদিকে পরিত্যক্ত মলমূত্রাদি রহিয়াছে, কোন দুর্গন্ধ নাই, শুকাইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই কঠিন পাথরের মতই হইয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, নদীর পাড়ের উপর মাটির গুহা এখানে অসংখ্য আছে, আবার উপরে পর্ব্বতের আশপাশে সর্ব্বত্রই ঐরূপ গুহা। এই ভোটিয়া মহাজনেরা যখন এখানকার দোকানপাট তুলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করে, তখন তাহাদের অবিক্রীত দ্রব্যসমূহ আসবাবপত্র, এমন কি ঘরের দরজা, পাল খাটাইবার প্রকাণ্ড মেরুদণ্ডটি পর্য্যন্ত এখানে নিজ নিজ অধিকৃত গুহার মধ্যে পুরিয়া রাখিয়া যায়। এই সকল দ্রব্যাদি পাহারা দিবার জন্য এই দেশীয় কয়েকজন চৌকিদার বন্দোবস্ত থাকে; তাহারা চৌকিদারির জন্য পারিশ্রমিক পায়। আর যদি বেশী মূল্যবান কিছু অবিক্রীত থাকে, মহাজনেরা কেবল সেইগুলি সঙ্গে লইয়া যায় এবং উহা আপনাদের অধিকারের মধ্যে কোথাও রাখিয়া দেয়।

তিব্বতের এ-অঞ্চলে খুব পরিষ্কার উল বা পশম, ছাগল ও ভেড়ার মধ্যে পাওয়া যায়। সে ছাগল ও ভেড়া দেখিতে আমাদের দেশের ভেড়া হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; ছাগলের গায়ে এত লোম হয় যেন মাটিতে লুটিয়া পড়ে, দেখিতে অদ্ভুত। হুনিয়ারা তাহা হইতে নানাবিধ মূল্যবান বস্ত্র প্রস্তুত করে। এখানে সাধারণভাবে পশমের ব্যবহার এত বেশী যে, ঘোড়া, গরু,

চমরী, ঝাব্বু প্রভৃতি বাঁধিবার দড়ি, লাগাম—এ-সমস্তই ঐ পশমের। কোনও পশুর লোম ইহারা বৃথা নষ্ট করে না, কোন-না-কোন কাজে লাগাইয়া দেয়। এতটা পশমের ব্যবহার আর কোথাও দেখি নাই। অতিরিক্ত পশম ব্যবহারের ফলে বোধহয় প্রতিক্রিয়ার নিয়মেই ইহারা ভিন্ন দেশীয় সূতা ও রেশমের বস্ত্র সকল ব্যবহার করিতে বড়ই ভালবাসে এবং অনেক টাকা দিয়া খরিদ করে। বিদেশী রেশম বা তুলার বস্ত্র, নানা-প্রকারের সাটিন মখমল ইত্যাদি ব্যবহার এদেশের উন্নতসমাজের রীতি বা
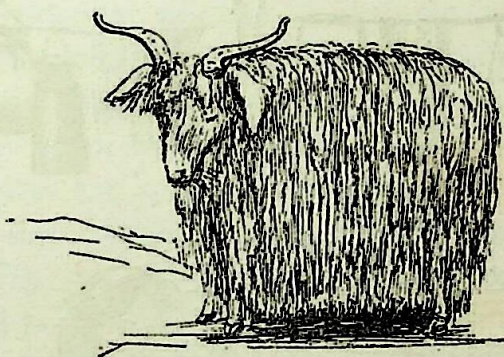
তিব্বতের ছাগল

চাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মধ্যশ্রেণীর গৃহস্থ, যাহাদের অবস্থা ভাল, তাহারাও বিদেশী রেশম ও কার্পাস-বস্ত্র ব্যবহার করিয়া সৌখীনতার পরিচয় দেয়। শীতের সময় ব্যাঘ্রচর্ম্মের বিশেষতঃ চিতাবাঘের জামা-ই এখানকার শ্রেষ্ঠ সৌখীনতার পরিচায়ক। আবার ভেড়ার চামড়া নরম করিয়া পশমের দিকটা ভিতরে আর চামড়ার দিকটা বাহিরে এইভাবে আজানুলম্বিত তিব্বতী ফ্যাসানের জামাও অনেক দেখিয়াছি। মণ্ডিতে অনেক রকমই আমরা দেখিতে পাইতাম।

আমাদের হিমালয়ের ভোটিয়া মহাজনেরা প্রায় সকলেই প্রতিবৎসর অন্যান্য মালের সঙ্গে এক-আধমণ ছোয়ারা বা বড় বড় শুষ্ক খেজুর লইয়া আসে। খরিদ্দার আসিলে একটি থালাতে দুই-চার গণ্ডা তাদের সম্মুখে ধরিয়া দেয়। এইরূপেই ইহারা এখানকার বিশিষ্ট ক্রেতাগণকে খাতির করে। সেই ক্ষুধার্ত্ত রাক্ষস খরিদ্দার, কথা কহিতে কহিতে আগ্রহের সহিত

উহা অল্পক্ষণেই নিঃশেষ করিয়া ফেলে। যেখানে বসিয়া খায়, বীচিগুলি তাহার চারিপাশেই ছড়াইয়া অপরিষ্কার করে। তাহারা ইহাকে, 'খস্থর' বলে এবং অত্যন্ত ভালবাসে। এইরূপে এখানকার হনুমান হনুমতী খরিদ্দারগণ এই খস্থর নামক অপূর্ব্ব বস্তুটির খাতিরে প্রায় সকল দোকানেই এক একবার পদার্পণ করিয়া যায়।

হুনিয়া খরিদ্দার

এ-অঞ্চলে আরও একটি মণ্ডি আছে;—উহা এখান হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে তীর্থপুরী বা টাটাপুরীর দিকে পড়ে, তাহার নাম জ্ঞানমা মণ্ডি। সেখানেও প্রতিবৎসর অনেক টাকার কেনাবেচা হয়, আর সেখানেও

এই ভারতবাসী ভোটিয়া মহাজনগণেরই কারবার। আসলেই দেখিতেছি এ-অঞ্চলে তিব্বতের সঙ্গে ভোটিয়াগণই ভারতের পক্ষ হইতে ব্যবসায়সূত্রে সম্বন্ধ বা সম্পর্ক রাখিতেছে। বিদ্যাহীন এই নিরক্ষর ভোটিয়ারা সেইজন্যই সমতলবাসী বাঙালীর তুলনায় অনেক শক্তিমান, অন্ততঃ ব্যবসায়ক্ষেত্রে এবং একতায়। ব্যবসায়ক্ষেত্রে যত পোড়া কপাল কি এই বাঙ্গালীরই হইতে হয়!

তিব্বতীয়দের সঙ্গে কারবার করিয়া এই ভোটিয়া মহাজনদের যে কেবলই লাভ হইতেছে তাহা নয়, অনেক লোকসানও সহ্য করিতে হয়। এ-অঞ্চলের এবং অনেক দূরদূরান্তরের অধিবাসিগণ এই মণ্ডিতে মাল সওদা করিতে আসে। দুই-চারিবার নগদ লইয়া একটু বিশ্বাস জন্মিলে তাহার পর ধারে মাল লইয়া যায়। এ-বৎসরের ধার পরবৎসরেই শোধ হইবে এরূপ প্রতিশ্রুতি বা লেখাপড়া থাকে কিন্তু পরবৎসর আর তাহার দেখা পাওয়া যায় না। যাহাদের বাড়ীঘর জানা থাকে তাগাদা দিলে তাহারা বলে টাকা নাই, পরে দিব। এইরূপে এখানকার প্রত্যেক ভোটিয়া মহাজনের এক দুই তিন চারি শত টাকা অবধি প্রতি বৎসর বাকি পড়ে। পরিচিত অপরিচিত যাহারই দোকানে গিয়াছি সকলেরই মুখে এইরূপ শুনিয়াছি।

সেই পুরানো ধরনের মুদ্রা-প্রস্তুতপ্রণালী এখনও ইহাদের চলিতেছে। নেপালে কিন্তু তাহা নয়, আধুনিক উন্নত প্রণালীতে এখানে তাহারা মুদ্রা প্রস্তুত করিতেছে; তাই তিব্বতের তুলনায় নেপালী মুদ্রা দেখিতে সুন্দর। এখানে ইহারা এখনও জগতের বৈজ্ঞানিক-প্রগতি বিশেষতঃ যন্ত্রব্যাপারে, ছাপাখানা ছাড়া, আর কোনটাই গ্রহণ করে নাই। টাকার অর্দ্ধেক বা সিকি ভাগ ব্যবহারে এখনও টাকাটি আধাআধি ভাঙিয়া অথবা চার টুক্‌রা করিয়া আধুলি, সিকি হিসাবে চালাইতেছে। বহির্জগতের সঙ্গে আদান-প্রদান না থাকার ফলে যাহা হয় এখানে সর্ব্বত্রই তাহা দেখিতেছি; অথচ স্বাধীন জাতি, নিজ রাষ্ট্রের মধ্যে কি উন্নতি ইহারা না করিতে পারিত।

এখানকার মুদ্রা বিচিত্র; এখানকার সিক্কা আমাদের ভারতীয় ইংরেজী টাকার হিসাবে সাড়ে চারি আনা মূল্যের, কিন্তু দেখিতে প্রায় আধুলির আকার। তবে এতটা সুগোল নয়। এখানে নেপালী, ভারতীয় এবং তিব্বতী-সিক্কা—এই তিনটি মুদ্রাই চলে। ভারতের মুদ্রা টাকা, আধুলি; সিকি প্রভৃতি ইহাদের অতি প্রিয়,—গাঁথিয়া গহনা পরে। ভারতের মুদ্রা

পাইলে আর সহজে বাহির করে না। নেপালী মুদ্রা আমাদের টাকার হিসাবে সাড়ে সাত আনার সমান। তাহার মধ্যে অনেকটা রৌপ্যের অংশ
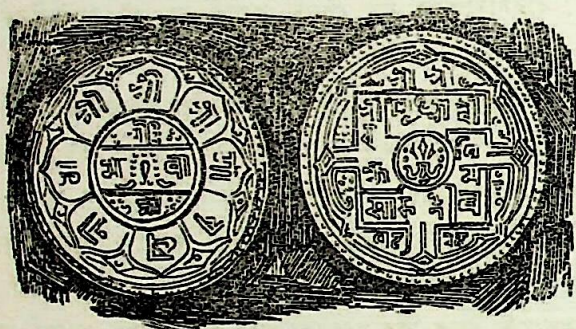
থাকে, খাদ খুবই কম। কিন্তু তিব্বতী মুদ্রায় দস্তার খাদ প্রায় চারি ভাগের আড়াই ভাগ। এখানকার খরিদ্দারেরা নেপালী ও তিব্বতী মুদ্রায় মাল খরিদ করে, ভারতীয় টাকা বড়-একটা বাহির করে না, কিন্তু যখন তাহারা পশম প্রভৃতি নিজেদের মাল বিক্রয় করে তখন ভারতীয় টাকা চায়। নিজ স্বাধীন রাজ্যে অনায়াসেই ভারতের মত সুন্দর মুদ্রা প্রস্তুত করিতে পারে,

তিব্বতী টাকা = ।১০
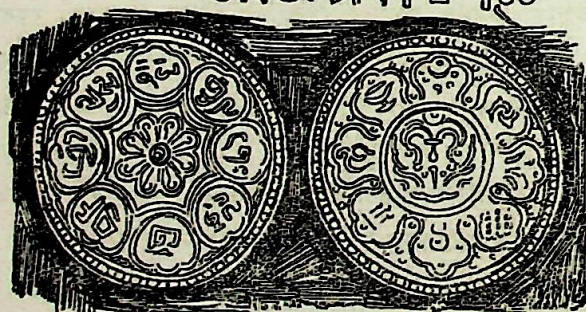
কিন্তু এমনই জড়বুদ্ধি যে তাহা করিবে না; করিবার চিন্তা পর্য্যন্তও না করিয়া ভারতীয় মুদ্রার উপাসনাই করিবে। এইরূপে তাহারা ভারতীয় টাকা সংগ্রহের চির ভক্ত এবং পক্ষপাতী।

দুগ্ধ এদিকে সুলভ নয়। চমরী এখানে অনেক আছে বটে, কিন্তু তাহার দুগ্ধ এদেশে বড় কেহ খায় না। সাধারণতঃ শিশু বা রোগী ব্যতীত কেহ এখানে দুগ্ধ পান করে না। আমাদের বিশেষ প্রয়োজনে দুই একবার দুগ্ধ পাওয়া গিয়াছিল, কোথাও চারি আনা কোথাও ছয় আনা হিসাবে সের লইয়াছে। সঙ্গী-মহাশয় পথের সম্বল হিসাবে কিছু খাদ্যদ্রব্য নিজের জন্য গোপনে প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ধনিরাম দুধ জোগাড় করিয়া সেরখানেক ক্ষীরের পেঁড়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল, উহা তিনি গোপনে রাখিতেন এবং নিজেই ব্যবহার করিতেন। ধনিরামের এরূপ খয়রাত অনেক ছিল। আমরা তাহারই সাহায্যে এখানে চমরীর মাখন খরিদ করিয়া পথের জন্য প্রায় দুই সের আন্দাজ ঘৃত প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলাম। আমরা দুগ্ধ ক্রয় করিতে গেলে হুনিয়ারা খামখেয়ালী একটা দর চাহিয়া বসে।

চমরী
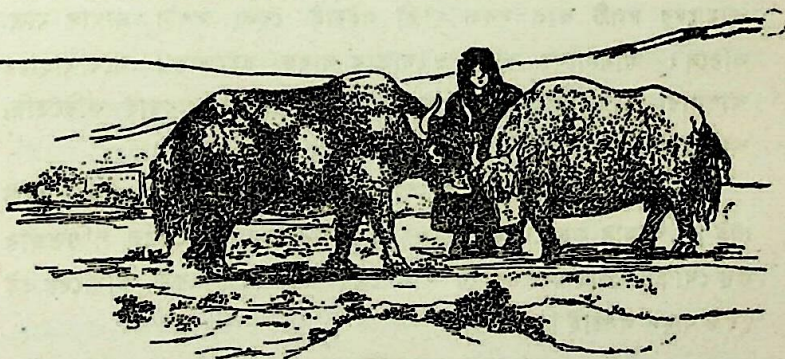
বাতাসের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সেই কারণেই এখানকার লোকের চক্ষু শীঘ্রই নষ্ট নয়, তাহার উপর শীতের প্রাবল্য। এখানে যে নিরন্তর ঝড়ের মত অতিশয় শীতল বাতাস চলে সেই প্রবল বাতাস চক্ষে লাগিলেই চক্ষু অসুস্থ হইয়া উঠে। তাহার উপর এই স্থানে দৃশ্যের মধ্যে হরিদ্বর্ণের আভাস মোটেই নাই, কেবল বিবর্ণ, রুক্ষ তৃণলতা ; বৃক্ষহীন নগ্ন পর্ব্বত, তাহার উপর তুষারের ধবলতা। কোথাও লাল গৈরিকের বা কোথাও রুক্ষ ধূসর বর্ণের পর্ব্বতমালা, আবার তাহার পশ্চাতে উপরে তুষারমণ্ডিত ধবলগিরি-শৃঙ্গই চক্ষে পড়ে। আকাশের নীলবর্ণটি না থাকিলে এখানে লোক অন্ধ হইয়া যাইত। ক্রমাগত রুক্ষ দৃশ্যের আধিক্যে মধ্যে মধ্যে আমাদেরও

শিরঃপীড়া ভোগ করিতে হইয়াছে। গাছপালা এত কম দেখিয়াছি যাহা গণনায় আসে না। এ তীক্ষ্ণ শীতল বাতাসে চক্ষু ফুলিয়া উঠে; জল পড়ে, তুস্থ হয় বলিয়াই এখানকার স্ত্রীলোকেরা চক্ষুর উপরে ও গালে একপ্রকার রক্তবর্ণ নির্য্যাস ব্যবহার করে, তাহাতে বিশেষ উপকার হয়। একে এখানকার রূপসীগণের যে সুন্দর রূপ, তাহার উপর সেই নির্য্যাসলিপ্ত মূর্ত্তি দেখিলে স্নায়ুমণ্ডলী সহজেই নিস্তেজ হইয়া আতঙ্ক উপস্থিত করে। দাঁত ইহাদের অত্যন্ত নোংরা ও দুর্ব্বল।

এইবার কৈলাসযাত্রার কথা। কৈলাস ও মানস-সরোবর যাইবার যাহা-কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং বাহনাদি এখানেই পাওয়া যায়। লাল সিং পাতিয়াল আমাদের জানাইল, কালই আপনারা যাত্রা করিতে পারিবেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমরা একলাই যাইব নাকি? লাল সিং বলিল, আমাদের দলটি কাল সকল যাত্রী লইয়াই বেলা দশটা নাগাদ যাত্রা করিবে। আপনাদের ঝাব্বু ও ঘোড়ার ব্যবস্থা হইতেছে। পথে যাহাতে আপনারা আরামেই যাইতে পারেন আমরা তাহার ব্যবস্থাই করিতেছি, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।

লাল সিং জিজ্ঞাসা করিল যে, আপনাদের ঝাব্বু ও ঘোড়া বাহন কয়টি চাই? আমার জন্য কোন বাহনের প্রয়োজন ছিল না, কেবল পণ্ডিতজীর জন্য ঘোড়া একটি এবং উভয়ের মালপত্রের জন্য ঝাব্বু একটি, আমাদের এই দুইটি বাহন লওয়াই স্থির হইল।

ঝাব্বু
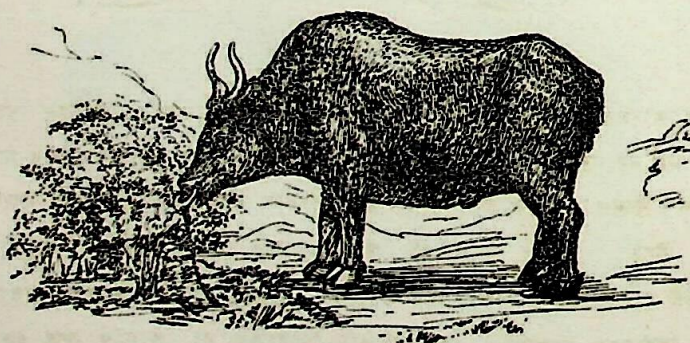
এখান হইতে ও-অঞ্চলে যাইতে ঘোড়া অথবা ঝাব্বুই প্রশস্ত। এক-একটি বাহন যাতায়াতের মূল্য বা ভাড়া চারি টাকা। সঙ্গী-মহাশয়ের শরীর

খারাপ বলিয়াই একটি পশু দরকার, না হইলে এ পথে পুরুষমানুষে বাহনের পিঠে যায় না। দলের সঙ্গে হাঁটিলে কষ্ট হয় না। মালের মধ্যে আমাদের তিনজনের জন্য দশ-পনের দিনের মত রসদ লওয়া হইল। এখানে আটা, টাকায় তিন সের হিসাবে, মোটা চাউলও তাই, বলা বাহুল্য, উহা ভারতেরই আমদানী। আমাদের রসদের মধ্যে রুমা ও শারুংওয়ালা ধনিরামের দানও কিছু ছিল। রুমা নিজেও ডাল, শুষ্ক মূলা, মেওয়া ফল, আচার প্রভৃতি অনেক কিছু গারবিয়াং হইতে আনিয়াছিল। আনন্দেই আমরা যাত্রার যোগাড় করিয়া লইলাম, আসলে সদাশয় লাল সিংএর সাহায্যই বেশী লওয়া হইল।

এবার আমরা কৈলাস ও মানস-সরোবর প্রত্যক্ষ করিতে যাইতেছি ভাবিয়া বাল্যকালে কোন দূরস্থানে যাইবার নামে যেরূপ হইত, মহা আনন্দে প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। গারবিয়াং-এর সেই তিনটি কর্ণপ্রয়াগের মায়িজী এখানে জুটিয়াছেন, তাহা ছাড়া চারিজন কুমায়ুঁর সাধু তাঁহারাও আসিয়া দল পূরা করিলেন। সঙ্গে তাঁহাদের গরম বস্ত্রাদি, এ পথের উপযুক্ত শীতের সরঞ্জাম ছিল না; এখানকার মহাজনগণ চাঁদা করিয়া তাঁহাদের পর্য্যাপ্ত শীতবস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া দিল। আমরা আসিবার পর হইতে লালগীর বরাবরই এখানে আমাদের সঙ্গে আছে, তাহার স্থানটি পৃথক হইলেও সে রোজ আড্ডা দিয়া যাইত। প্রাণ তাহার সদাই আনন্দপূর্ণ, বালকের মতই হাসিখুশী আমোদে সে আমাদের সকলকেই স্ফূর্ত্তি দিত;—কিন্তু সঙ্গী-মহাশয় তাহাকে মোটেই পছন্দ করিতেন না বলিয়া সে তাঁহার সম্মুখে বেশীক্ষণ বসিতে চাহিত না। এখন যাত্রার উদ্যোগে সেও নাচিয়া উঠিল। এইভাবেই আমাদের যাত্রার গতি নিত্যই বাড়িতেছিল। সে-রাত্রে ঘুমাইয়াও যাত্রার স্বপ্নই দেখিলাম।

আমাদের দলটি বড় কম হইল না। পাতিয়ালের জননী, রুমা তাহার জ্যেষ্ঠাভগিনী এবং সঙ্গী-মহাশয়—দলের এই কয়জন ঝাব্বুতে যাইবেন, বাকি সকলেই হাঁটিয়া যাইবেন। মান সিং এবং মণি সিং নামক পাতিয়ালের দুইজন আত্মীয় আমাদের অভিভাবক হইয়া চলিলেন;—অবশ্য তাঁহাদেরও পরিবারবর্গ সঙ্গে। তিনটি তাঁবু, দুইটি দু-নলা বন্দুক চলিল, আর আর দ্রব্যাদি লইয়া আরও চলিল দুই-তিনটি পশু, মোট ছয়-সাতটি ঝাব্বু।

স্ত্রী-পুরুষে কুড়ি-বাইশ জন মিলিত একটি দল কৈলাসযাত্রার জন্য

প্রস্তুত হইল। আমাদের নগদ টাকাকড়ি যাহা কিছু সমস্তই লাল সিং পাতিয়ালের নিকট রাখিয়া যাওয়া হইল যেহেতু পথে দস্যুভয় আছে। এখানে পথে দানকর্ম্ম ছাড়া পয়সার আর কোনই প্রয়োজন নাই;—সেই মত আমরা কিছু কিছু সঙ্গে লইলাম।

এখানে একটি প্রবাদ আছে, পুরী পয়সা, সরোবর সত্তু। অর্থাৎ পুরী বা পুরুষোত্তম যাইতে হইলে পয়সাই প্রধান সম্বল, আর মানস-সরোবর যাইতে প্রধান সম্বল হইল ছাতু; এখানে পয়সার বড় দরকার নাই। এদিকে যাঁরা ভ্রমণে আসেন তাঁরা আমিষাশী হইলেই সুবিধা, কারণ প্রচণ্ড শীত ও জলবায়ুর সঙ্গে আমিষটাই খাপ খায়, শরীরও থাকে ভাল। আমরা নিরামিষাশী ছিলাম বলিয়াই বেশী ভুগিতে হইয়াছিল।

আনন্দ-উৎসাহপূর্ণ প্রাণে পরদিন দ্বিতীয় প্রহরের প্রারম্ভেই আমরা বাহির হইলাম। তাকলাখার হইতে যাত্রাকালে সঙ্গী-মহাশয় একথা বলিতে ভুলিয়া যান নাই যে, এই যাত্রা আমাদের ঠিক কৈলাসযাত্রা।

পথের সম্বন্ধে বড় কিছু বলিবার নাই, কারণ কোনরূপ বাধা বা কষ্টদায়ক বন্ধুরতা এ-পথে নাই। পথ সরল, মরুভূমির মত বিস্তৃত, বিজন এবং অসমতল ভূমিখণ্ডের উপর দিয়া একেবারেই সোজা চলিয়া গিয়াছে। চারিদিকেই শুভ্র তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতমালা, দূরে দূরে দৃষ্টির মধ্যে আসিতেছে।

কর্ণালীর উপত্যকা ছাড়াইয়া দীলারীং নামক একখানি গ্রামের মধ্য দিয়া আমরা চলিতেছিলাম। পরিশ্রমী গ্রামবাসিগণ কৃষি এবং নিজ নিজ গৃহকর্ম্মের সুবিধার জন্য দূর নদী হইতে খাল কাটিয়া জলধারা আনিয়াছে। এখানে সর্ব্বত্র এই প্রকারে নদী কিংবা পর্ব্বতের ঝরান হইতে নালা কাটিয়া গ্রামের এবং শস্যক্ষেত্রের জন্য জল আনার ব্যবস্থা। আকাশের জলে এখানকার চাষবাসের কোনও ভরসা নাই, কাজেই এই সনাতন উপায়ের উদ্ভাবনা এবং বহুকাল হইতেই ইহা কার্য্যকরী।

জলের কাছে কোথাও কোথাও অল্প অল্প ঘাসের মত হইয়াছে, কিন্তু তাহার বর্ণ হরিৎ নয়, দগ্ধ হরিৎ বলিলেই ঠিক হয়। সে তৃণ কোমল নহে, কাঁটার মত শক্ত এবং রুক্ষ। এখানকার পশুগণ ইহা খাইয়াই প্রাণধারণ করে। আমাদের সঙ্গে যে-সকল ঝাব্বু ছিল, জলধারা পার হইবার সময় পৃষ্ঠে নরনারী বাহন লইয়া সেই তৃণের লোভে তাহারা মুখ বাড়াইয়া এক

এক গ্রাস আহরণের চেষ্টা করিতেছিল। সঙ্গী-মহাশয় সেই ভোটিয়া নারীগণের সঙ্গে ঝাব্বুতে যাইতেছিলেন। রুমার ভগিনী রুমতি, পণ্ডাৎজী, সম্বোধন করিয়া তাঁহার দাড়ি ও উদরটি লইয়া রসিকতা করিতে করিতে যাইতেছিল। এত সরলপ্রাণ মুক্তস্বভাব নারী খুব কমই দেখিয়াছি। আমাদের এই দলের মধ্যে সেইই,—নিজে হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া আর সবাইকেও হাসাইতে হাসাইতে, সঙ্গী-মহাশয়ের ঠিক পাশেই যাইতেছিল। মনে হয় তিনিও প্রবাসী নরনারী মিলিত এই যাত্রাটি বিশেষ উপভোগ করিতেছিলেন কিন্তু দৈববশে ইহাতে এক বাধা উপস্থিত হইল। তাঁহার বাহনটি, চলিতে চলিতে এক স্থানে একটু বেশী মুখ বাড়াইয়া সেই কণ্টক-তৃণ এক গ্রাস ধরিতে গেল, তাহাতে বে-তালে সেই ধাক্কাটি সামলাইতে না পারিয়া, সঙ্গী-মহাশয় পশুপৃষ্ঠ হইতে আসনসুদ্ধ একেবারে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেলেন। মেয়েরা ইহা দেখিয়া হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। পাশেই ছিল রুমতি, তাহার হাসিই বেশী। যাহা হউক এখন আমরা, তাঁহার লাগিয়াছে কিনা দেখিতে গেলাম, তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া, লাগে নাই, বলিয়া জামা ঝাড়িয়া লইলেন। ততক্ষণে পশুরক্ষক আসিয়া আবার আসন (জীন) ঠিক করিয়া তাঁহাকে একটু উঁচু স্থানে লইয়া, চড়াইয়া দিল। তিনি রেকাবে পা দিয়া চড়িতে পারেন না। কিন্তু এই পতনে তাঁহার মনমেজাজ খারাপ হইয়া গেল, আর তাহার ফল ভোগ করিতে লাগিলাম কেবলমাত্র আমি।

আজ আমরা প্রায় আট মাইল পথ গিয়া বালদাক নামক স্থানে একটি জলধারার নিকটে আড্ডা করিলাম। তিনটি তাঁবু গাড়া হইল, দুইটি এক সঙ্গে, অপরটি পৃথক। ধনিরামের দলটিও আমাদের সঙ্গে,—তাহাদেরও পৃথক তাঁবু পড়িল, একটু দূরে। বাহন হইতে নামিয়াই স্ত্রীলোকেরা যে যাহার থলি খুলিয়া মুড়ি, ছোলা, গম ভাজা, খেজুর, মিষ্টান্ন প্রভৃতি চিবাইতে আরম্ভ করিল। একটি পাত্রে রুমা আমাদেরও কিছু কিছু দিয়া গেল। তাঁবু খাটানো শেষ হইলে নাথজী 'রোটী' পাকাইল। যে পশুরক্ষক হুনিয়া আমাদের সঙ্গে ছিল, পাকের জন্য কাঠকুটা কিংবা শুষ্ক গোময় সংগ্রহ করা, চুলা ধরানো, জল আনিয়া দেওয়া এসকল তারই কাজ। চুলা ধরানোর কাজে হাপরের ব্যবহার সর্ব্বত্র প্রচলিত, একটা হাপর সকল যাত্রিদলের সঙ্গে থাকে।

নাথজীর শরীর খারাপ, জরভাব ছিল, নিজে কিছু না খাইয়া শুধু আমাদের জন্যই পাকাইলেন। আর কাহাকেও করিতে দিলেন না। তাঁহার ভিতরের কথা এই বুঝিলাম যে, আমরা তাঁহার আহারাদির ভার লওয়ায় সেই উপকারের ইহাই প্রত্যুপকার। তাঁহার দ্বারা যেটুকু হয় সেইটুকু কায়িক উপকার না করিলে ঋণী থাকিতে হইবে। কেন তিনি সামর্থ্য থাকিতে কাহারও নিকট বাধ্য থাকিতে যাইবেন? নাথজী যথার্থই স্বাধীনপ্রকৃতির মানুষ।

যাহা হউক, রোটি পাকানো হইলে রুমা, আমাদের আর কি চাই না গাই দেখিতে আসিল। বাঙালীবাবু আমরা পাতলা রুটিতেই অভ্যস্ত,— এখন রুটি পুরু হইয়াছে দেখিয়া সে একটু ঠাট্টার স্বরে বলিল, বড়িঁয়া রোটি পকায়ী নাথজী। তারপর হাসিতে হাসিতে নাথজীকে বলিল,—

নাথজীকো রোটি।
কৈলাস যাত্রাকি লিয়ে দো আঙ্গলী মোটি।

শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলে সঙ্গী-মহাশয়ও সহাস্য বদনে চীৎকার করিয়া তাঁহার অভ্যস্ত হিন্দীতে বলিলেন, বহুত আচ্ছা দেবীজী, আপকা এ কবিতা ভি হামারা কেতাবমে উঠ যায়েগা, অর্থাৎ তিনি এই কৈলাস-ভ্রমণ সম্বন্ধে যে পুস্তক লিখিবেন তাহাতে ইহাও লিখিবেন।*

রাত্রে প্রবল শীত ছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নিজবস্ত্রাদি বিছাইয়া আমরা শয়নের জোগাড় করিয়া লইলাম।

যে-সব সাধুসন্ত সঙ্গে ছিলেন, পাতিয়ালের দয়াবতী জননী, তাঁহাদের সকলকেই ভিতরে শয়ন করিতে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন, রাত্রে কাহাকেও ঠাণ্ডায় কষ্ট পাইবার প্রয়োজন নাই; সুতরাং বাহিরে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা ভিতরে আসিয়া আমাদের আশেপাশে স্থান করিয়া লইলেন। কুমায়ুঁর চারিজন সাধুর মধ্যে একজনের মুখ, হাতের আঙুল, কান, নাক সকল ফুলিয়া রক্তবর্ণ হইয়াছিল, বোধ হয় কুষ্ঠব্যাধির পূর্ব্বলক্ষণ। সঙ্গী-মহাশয় তাহাকে বাহিরে যাইতে বলিলেন, সে বেচারা তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। আমি তাঁহাকে বলিলাম,—এই ঠাণ্ডায় কোথায় কষ্ট পাবে,

---

* কিন্তু তাঁহার বোধ হয় স্মরণ ছিল না যখন পুস্তক প্রণয়ন করেন। কারণ অনেক দিন পরে তাঁহার পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছিল।

একপাশে পড়ে থাকলে আমাদেরই বা ক্ষতি কি হবে, ওটা তো সংক্রামক ব্যাধি নয়? সঙ্গী-মহাশয় অতিমাত্রায় উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, তোমার ও-সব ফিলানথ্রপি এখন রেখে দাও; ও যদি তোমার এত প্রিয় হয় তো না হয় আমিই বাইরে যাচ্ছি। আরও অনেক কথা যাহা শ্লেষ করিয়া বলিলেন, সে সকল না লেখাই ভাল। ইহাতে প্রাণে তীব্র বেদনা পাইলাম কিন্তু তাহা কাহাকেও বলিবার নয়।

যখন তিনি চুপ করিলেন সেই ভোটিয়া স্ত্রীলোকের মধ্যে একজন, এই-সব দেখিয়া শুনিয়া নিজে পুনরায় সেই ব্যক্তিকে বাহির হইতে ডাকিয়া আনিল এবং একধারে শুইতে বলিল। এবারে কিন্তু তিনি আর কিছুই বলিলেন না। না বলুন,—এই সূত্রেও তিনি আমার প্রতি আরও উগ্র এবং হিংসাপরায়ণ হইয়া উঠিলেন।

তাক্‌লাখারে ছিলাম ঘরের মধ্যে, এখানে একেবারে ফাঁকা মাঠের উপর তাঁবুর ভিতরে,—অবশ্য দূরে হইলেও চারিদিকে তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতমালা, প্রচণ্ড বেগে হু-হুঙ্কারে বাতাস চলিতেছে, তাহাতে শীতে অস্থিমজ্জা পর্য্যন্ত কাঁপাইতেছে। খুব পুরু এবং বড় একখানি ভোটিয়া কম্বল রুমা আমাদের দিয়াছিল। তিনজন আমরা পাশাপাশি শুইয়া আমাদের যাহা-কিছু আছে সব চাপাইয়া সর্ব্বোপরি সেইখানিতে আপাদমস্তক ঢাকা দিতাম। তাহাতে যে আমাদের কতটা উপকার হইত তাহা বলবার নয়। কোনরূপে আমরা শীতে কষ্ট না পাই সেদিকে রুমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

প্রথম দিন আমরা এত ক্লান্ত ছিলাম যে, শয়নমাত্রেই ঘুমাইয়া পড়িলাম;—এক ঘুমেই প্রভাত। অবিলম্বেই আমরা তল্পিতল্পা উঠাইয়া দল বাঁধিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। বহুক্ষণ চলিয়া দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি আমরা আজ মান্ধাতার নিকটে আসিয়া পড়িলাম। কতকালের এই মান্ধাতা, ইহার তিব্বতী নাম মিয়ো-নাম-নিমরী। আমাদের দক্ষিণপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ এই পর্ব্বতমালা বরাবর সোজা উত্তরপূর্ব্ব কোণের দিকে মানস-সরোবর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে।

এখানে মান্ধাতা তপস্যা করিয়াছিলেন। কত যুগযুগান্তরের কথা, এখন কেবল নামটি মাত্র রহিয়া গিয়াছে। তাঁবু খাটানো হইলে শীতল জলের সঙ্গে ছাতু ও চিনি মিশাইয়া, সেই দিনের আহার শেষ করিয়া একবার চারিদিক দেখিবার জন্য বাহিরে আসিলাম। বৃক্ষলতার নামগন্ধ নাই,

সবুজ রঙটি সেই কালাপানি পার হইবার পর আর চক্ষে পড়িয়াছে কিনা স্মরণ হয় না। তবুও দৃশ্যের মধ্যে সৌন্দর্য্য বড়ই গম্ভীর এবং বিশাল ভাব-উদ্দীপক ;—যাহা মনকে একাগ্র করিয়া তাহাতেই ডুবাইয়া দিতে চায়।

এদিকে লোকালয় নাই, কেবল মাঝে মাঝে পথিকদলের যাতায়াত। তাহাদের সঙ্গে যে সকল পশু থাকে তাহারা ছাড়া পাইলে ইতস্ততঃ চরিয়া খায়। একপ্রকার কণ্টকলতা এবং তৃণ কোথাও পাথরের ফাঁকে ফাঁকে জন্মিয়াছে, দেখিলাম উহারা সন্ধান করিয়া তাহাই খাইতেছে। সেই বিজন প্রান্তরে একদল শকুন একটি উচ্চভূমির উপর সারি সারি বসিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছে। দাঁড়কাক দুই-চারিটি ও কতকগুলি চড়াই-পাখী যাত্রীরা যে-সব খাদ্যাংশ ফেলিয়া দিয়াছে তাহার মধ্য হইতে নিজেদের উপযোগী আহার সংগ্রহ করিতেছিল। এখানকার চড়াইপাখী আকারে কিছু বড় এবং পিঙ্গলবর্ণ, তাহাদের কণ্ঠমধ্যে কালোর রেখা বেশী গভীর। নিকটে যে জলের ধারা তাহার চারিদিকেই অল্প অল্প কাঁটাঘাস কতদূর অবধি বিস্তৃত রহিয়াছে। সেখানেও কতকগুলি ঝাব্বু চরিতেছিল।

হঠাৎ নজর পড়িল একটু দূরে, তিন চারজন ভীষণাকৃতি তিব্বতী বা হুনিয়া ছোট ছোট ঘোড়ার উপর যেখানে আমাদের তাঁবু পড়িয়াছে শনৈঃ শনৈঃ সেই দিকেই আসিতেছে। কতকটা আসিয়া দুইজন পথিমধ্যে দাঁড়াইল, বাকি দুইজন অগ্রসর হইয়া একেবারে মণি সিং-এর তাঁবুর নিকটে আসিয়া মালপত্র দেখিতে লাগিল। মণি সিং তখন কি করিতেছিল দেখি নাই—তাহার পাশেই দু-নলাটি রাখা ছিল, সে হুনিয়াদের দেখিয়াই,—কিছু না বলিয়া কেবল সেটি হাতে তুলিয়া লইল। এইটুকুই যথেষ্ট হইল,—তাহারা কেবল দুই-একটি কথা বলিয়া পিছন ফিরিল। সঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া গিয়া তাহারা কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল। বুঝা গেল তাহারা কে এবং কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল। হাতিয়ার দেখিয়াই তাহারা বুঝিল এখানে কিছু সুবিধা হইবে না।

বাহিরে শীতল বাতাস ঝড়ের মত বহিতেছে, বেশীক্ষণ থাকা গেল না, তখন তাঁবুর ভিতরে আসিলাম; দেখিলাম নাথজী জ্বরে অচৈতন্য। পূর্ব্বেও জর ছিল, তবে এতটা বেশী হয় নাই। চা ও ছাতুর পানা তাঁহাকে খাওয়ানো হইল। সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন, ও কিছু নয়, পথশ্রমেই হইয়াছে

রাত্রে রুমাই আমাদের জন্য রুটি পাকাইল। আহারান্তে আমরা যাত্রার কথাই কহিতে লাগিলাম।

আমাদের সম্মুখেই যে-পর্ব্বত দেখা যাইতেছিল, তাহার নাম গুরলা, প্রাচীন নাম গরলা—তাহারই ওপারে রাবণ হ্রদ। আমরা হ্রদটি অতিক্রম করিয়াই কৈলাস যাইব এবং ফিরিবার পথে মানস-সরোবর হইয়া ফিরিব, এইরূপই সঙ্কল্প। আজ রাত্রি এক প্রহর থাকিতেই আমাদের যাত্রা আরম্ভ

ডাকাতের দল

হইবে। এখন যে যাহার শয্যা আশ্রয় করিলাম। সেই সাধু চারিটি—যাঁহাদের একজনকে সঙ্গী-মহাশয় ভিতরে রাখিতে চাহেন নাই, তাঁহারা আজ আর কেহ আমাদের তাঁবুর মধ্যে আসিলেন না। খুব সম্ভব তাঁহারা মণি সিং-এর তাঁবুতে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। এখানে ভোটিয়া নারীগণই কর্ত্তা, তাহারা সঙ্গী-মহাশয়ের এই ব্যবহার অনুমোদন করিল না। তবে তাহারা তাঁহাকেও কিছু বলিল না। নাথজী চায়ের সঙ্গে একটু আদার রস পান করিয়া আপাদমস্তক মুড়ি দিলেন।

সেদিন বোধ হয় শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী হইবে। রাত্রি এক প্রহর থাকিতে পশুরক্ষক হুনিয়া,—যাহার নাম আমরাই দিয়াছিলাম,—জুজু, হুড়ো হুড়ো শব্দে আমাদের ঘুম ভাঙাইয়া তাঁবুর খোঁটা খুলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। আমরা উঠিয়া দেখিলাম যে মাণ সিং-এর তাঁবু উঠানো ও গুছানো হইয়া ঝাব্বুর পৃষ্ঠে চড়িতেছে।

যাইতে পারিবেন কি না নাথজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, না যাইতে পারিলে কি এইখানে পড়িয়া থাকিব? আমরা চলিতে সুরু করিলাম। নাথজী আমার হাত ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। তিন-চারিটি জলস্রোত পার হইয়া সম্মুখে গুরলা লক্ষ্য করিয়া যাইতে লাগিলাম। তখনও একটু চাঁদের আলো ছিল। বালি ও উপলখণ্ডের উচ্চ স্তূপ পার হইয়া চলিতে চলিতেই চাঁদ ডুবিয়া গেল, অন্ধকারে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ হইল। সকলের চক্ষে কিছু কিছু ঘুম ছিল। যাঁহারা ঝাব্বুতে যাইতেছিলেন, সকলেই ঝিমাইতেছিলেন। ঠাণ্ডায় হাত-পা জ্বালা করিতেছিল। হাতে দস্তানা, পায়ে মোটা উলের মোজা, এই প্রবল শীতে সে সকল নিষ্ফল। নাথজী জ্বরে ও শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়াছেন। শীতবস্ত্র ছিল তাঁহারই সর্ব্বাপেক্ষা কম।

লিপুধুরা অতিক্রমকালে আমি যেরূপ পীড়িত হইয়াছিলাম নাথজী সঙ্গে না থাকিলে যে কি হইত বলা যায় না। নাথজীর সঙ্গের লোভেই আমি ঘোড়া, ঝাব্বু কিছুই আমার জন্য রাখি নাই। এখন নাথজীর শরীর অসুস্থ দেখিয়া মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল। আমি ভাল আছি বটে, তাঁহাকে ধরিয়া চলিয়াছি, কিন্তু আর কি করিতে পারি। যদি আমি একটি পশু-বাহন লইতাম তাহা হইলে এখন সেটি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু এখন সেরূপ সাহায্যের কোন সম্ভাবনা নাই, সে চিন্তাও নিষ্ফল।

রুমার ভগিনী রুমতি, আমাদের কাছেই ঢুলিতে ঢুলিতে যাইতেছিল। তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া নাথজীর প্রবল জ্বরের কথা বলিলাম। এখন আমরা গিরিসঙ্কটের মধ্যে পড়িয়াছি,—পথটি ক্রমোচ্চ চড়াই। এইখানে রুমতি নাথজীর অবস্থা দেখিয়া তাহার পশুটি ছাড়িয়া দিল।

এইভাবে অন্ধকারে চলিতে চলিতে পূর্ব্বাকাশে মহিমাময়ী ঊষার আবির্ভাবে ক্রমে পূর্ব্বদিক অল্প ফরসা হইয়া আসিল। যখন অল্প অল্প ভোরের আলো সম্মুখে দিঙ্মণ্ডলে ফুটিল তখন কি অপরূপ দৃশ্যই দেখিলাম!

ক্ষীণ কুজ্ঝটিকা—তাহার মধ্য দিয়া প্রথমে কিছুই দেখা যাইতেছিল না। ক্রমে,—অল্প অল্প দেখা গেল, প্রথমে দূরে,—নিম্নতলে একখণ্ড স্থির বিস্তৃত জল, উহা নীলাভ ধূসর, তাহা হইতে ক্ষীণ শ্বেত বাষ্প ধীরে ধীরে উঠিতেছে। ক্রমে অরুণোদয় হইতেই আরও অনেকটা দেখা গেল। কুজ্ঝটিকা আরও ক্ষীণ হইয়া যেন পর্ব্বতমালার গায়ে মিলাইয়াছে। দূরে, বহুদূরে, সারা উত্তর দিকটা জুড়িয়া কৈলাস পর্ব্বতশ্রেণী,—সেই শৈলমালার মধ্যস্থলে চিরতুষারাবৃত রজতশুভ্র সর্ব্বোচ্চ শিখর. প্রায় অর্দ্ধ শিবলিঙ্গের আকৃতি। সেই শৈলমালার মধ্যে কৈলাস শিখর দেখিয়া প্রাণের মধ্যে যাহা হইল, তাহা আর কি বলিব। আমরা ইহারই উদ্দেশ্যে, সুদূর বঙ্গদেশ হইতে এতটা দূর বিস্তৃত পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। অরুণোদয়ের ক্ষীণ সিন্দূরাভাস কৈলাসের রজতশুভ্র শিখরদেশে লাগিয়া কি মনোহর মহিমাপূর্ণ দৃশ্যই হইয়াছে।

ক্রমে যখন গুরলার উচ্চস্তরে উঠিলাম, যে দৃশ্যটুকু অন্তরালে ছিল তাহা এখন চক্ষের সম্মুখে পূর্ণরূপেই ভাসিয়া উঠিল।

আর কুয়াশা নাই। বালসূর্য্যরশ্মি কৈলাস শ্রেণীর উপর পড়িয়া উহার উর্দ্ধাংশ উজ্জ্বল সিন্দূরবর্ণে রঞ্জিত করিয়া তুলিল। আমরা দেখিলাম যেন রাবণ হ্রদের ও-পারে কৈলাস, এখান হইতে বেশী দূর নয়, বোধ করি ও-বেলাতেই পৌঁছানো যাইবে। কিন্তু কৈলাস সেই স্থান হইতে পুরা দুই দিনের পথ। এখন আমরা ক্রমশঃ নামিতে লাগিলাম।

প্রায় তিন-চার মাইল আসিয়া হ্রদের তীরে একস্থানে বিশ্রামের জন্য কিছুক্ষণ বসিলাম। নাথজীর জ্বর ছাড়ে নাই। তাহার উপর রুমাও আবার পীড়িত হইয়া পড়িল, তাহার পুরাতন শিরঃপীড়া,—তাহার উপর অম্ল রোগেও তাহাকে কাতর করিয়াছে। দলের মধ্যে এই দুটি প্রাণীর অসুস্থতাই মনের মধ্যে যাত্রার আনন্দ যেন পূর্ণরূপে অনুভব করিতে দেয় নাই।

রাবণ হ্রদের তিব্বতী নাম লাং-চো বা লা-গাং—ভোটিয়ারা ইহাকে রাক্ষস তাল বলে। এখানে কেহ স্নান করে না, এবং তীর্থ বলিয়া কেহ মানে না, বরং অপবিত্রই মনে করে। জলের নিকটে যাইবার যো নাই, চারিদিকেই চোরাবালি, পা বসিয়া যায়। দুই-একজন প্রবাসী পথিক এইরূপে প্রাণ হারাইয়াছে। ভোটিয়া যাত্রিগণের ধারণা রাক্ষসের তাল

বলিয়াই উহা এইরূপ ভয়ঙ্কর বিপদসঙ্কুল। আমি ইহা জানিতাম না। প্রথমে সঙ্গী-মহাশয় হাতমুখ ধুইতে গেলেন, ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, একঘটি জল আনো হ্যা, একটু দূর থেকে এনো, কাছের জল বড় অপরিষ্কার। আমি তখন ঘটি হাতে গিয়া যেমন জলে পা দিয়াছি একেবারে হাঁটুর অর্দ্ধেক বসিয়া গেল। ভাবিলাম একি! তারপর আর এক পা,—সে পা-ও যেমন বসিয়া যাইবার মত হইল। আমি চকিতে পশ্চাতে লাফ দিয়া হটিতে গেলাম, কিন্তু তাল রাখিতে না পারিয়া একেবারেই চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িলাম, তাহাতেই সামলাইতে পারিলাম, যদিও কাপড়জামা কতকটা ভিজিয়া গেল।

প্রায় দ্বিপ্রহর নাগাদ আমরা আবার উঠিলাম। রুমা এবার নাথজীকে তাহার বাহনটি ছাড়িয়া দিয়া বলিল, হাঁটিলে আমি ভাল থাকিব। পাহাড়ী মেয়ে, বুট পায়ে দিয়া অতি দ্রুত চলিতে পারে।

এই বিশাল হ্রদের চারিদিকে কোথাও মানুষ-বাসের কোনও চিহ্ন নাই, শুধু যাত্রীরা তীর দিয়া যাতায়াত করে এই মাত্র। ইহা সমুদ্রতল হইতে ১৪,৮৫০ ফুট উচ্চ। বিচিত্র উপলখণ্ডপূর্ণ এই পথটি।

রাত্রি চতুর্থ প্রহরে যাত্রা করিয়া আজ আমরা প্রায় দশ মাইল পথ আসিয়াছিলাম, এবেলা আরও আট মাইল হইল। মধ্যে একটি চড়াইয়ের উপর হইতে আমাদের দক্ষিণে মানসসরোবরের কিয়দংশ দেখা গেল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আবার আমরা রাক্ষসতালের শেষের দিকে আসিয়া আড্ডা করিয়া রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করিলাম। নাথজী একটু ভাল আছেন। গরম চা'র সঙ্গে ছাতু ও চিনি মিলাইয়া রাত্রে আমাদের আহার হইল।

প্রাতে আমরা কিছু বিলম্বে প্রায় নয়টার সময় আহারাদি শেষ করিয়া যাত্রা করিলাম। সম্মুখেই কৈলাসশ্রেণী, মধ্যে প্রায় বার-তের ক্রোশব্যাপী একটি মাঠ ব্যবধান। কৈলাসের পাদমূলে তারচেন আমাদের গন্তব্যস্থান।

এদিকে বৃক্ষের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রাহ্মি শাকের মত পাতাবিশিষ্ট কাঁটা-জঙ্গলের মত একপ্রকার বিচিত্র কণ্টকলতা মাঠে জন্মায় বলিয়াছি—উহার ডালপালাগুলি ভয়ানক কঠিন। উহাই এখানে ইন্ধনার্থে ব্যবহৃত হয়। সারা মাঠটি ঐরূপ ঝোপে পরিপূর্ণ, প্রায় কৈলাস পর্ব্বতের গোড়া

পর্য্যন্ত। তাহাতে ধূসর বর্ণের একপ্রকার খরগোস, উহারা ঐ কণ্টকলতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কচি কচি পাতাগুলি খাইয়াই বাঁচিয়া থাকে। মাঠে, মধ্যে মধ্যে কঠিন তৃণও দেখিতেছি, সেখানে কতকগুলি চরমী চরিতেছে। কিছু দূরে ধূসর এবং মিশ্রিত নীল বর্ণ, পেটের দিকে সাদা একটি ঘোড়া, টাটু অপেক্ষাও ছোট, অনেকটা গাধার মত, চরিতেছে দেখা গেল। রুমা বলিল, উহা বনঘোড়া, তিব্বতীরা উহাকে কায়াং বলে, দেখিতে বড় সুন্দর। নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই অদ্ভুত চীৎকার করিতে করিতে দৌড় দিল। ইহাদের দৌড় এক অদ্ভুত রকমের, চক্রাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, যেন কিছু প্রদক্ষিণ করিতেছে এইরূপ ভাবেই পালায়। চাহনি অনেকটা হরিণের মত, সহজে ধরা যায় না। আমরা সেই বিশাল মাঠে আসিতে আসিতে প্রায় চারিটি জলস্রোত পার হইলাম। আগে আমরা, পিছনে মেয়েদের সঙ্গে সঙ্গী-মহাশয় আসিতেছিলেন।

সঙ্কল্প করিয়া মানুষ যাহা কিছু করে, আনন্দের অভিলাষেই করে। সেই আনন্দ কর্ম্মের শেষেই পূর্ণরূপে পাওয়া যায়, তখনই কর্ম্মের সিদ্ধি। একপ্রকার ধৈর্য্যহীন আত্মাভিমানী, প্রতিষ্ঠা-লোভী জীব আমরা, যাহাদের মন অনেক সময় বাস্তব ছাড়িয়া কল্পনায় অনেক দূরে চলিয়া যায়। ফলে হয় কি?—কল্পনার বেগ যত প্রখর হয়, প্রাকৃতিক নিয়মে এই একাদশ ইন্দ্রিয় সংযুক্ত শরীরটি ততই ভারি হইয়া পিছাইয়া পড়ে, আর তখনই গোল বাধিয়া যায়। কর্ম্মের প্রারম্ভে অথবা কর্ম্মাধীন অবস্থায় কল্পনায় সিদ্ধিকে করতলগত অনুমান করিয়া যে অস্থায়ী আনন্দের উত্তেজনা, তাহাতে অভিমানই বাড়িয়া যায়, নিজেকে পারিপার্শ্বিক জনগণের তুলনায় এত বড় দেখায় যে, তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। দৃষ্টির সীমার মধ্যে সকলেই ছোট, আমিটি বড়। সেই সুখের অবস্থা হইতে যদি আর ফিরিতে না হইত তাহা হইলে বড় মন্দ ছিল না। কিন্তু হায়, আবার ফিরিতে হয়, আবার প্রকৃতির কঠিন নিয়মের বশে আসিয়া বাস্তব রাজ্যে আশপাশের ছোট ছোট সঙ্গীগণের মধ্যে আসিয়া পড়িতে হয়। প্রতিক্রিয়ার ফলে, কল্পনার সেই ফাঁকা আনন্দের পরিবর্ত্তে তখন চিত্তের মধ্যে এক অনিবার্য্য গ্লানি আসিয়া অভিমানকে ডুবাইয়া দেয়। তাহার মধ্যে যাহারা সরল ও সবল চিত্তের মানুষ সেই ধাক্কায় তাহারা অনেকটা সংযত হইয়া যায় এবং সেই গ্লানি হজম করিয়া ফেলে,

কিন্তু যাহারা দুর্ব্বল-চিত্ত আবার সেই হেতু বেশী আত্মাভিমানী, স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা হেতু তাহাদের মধ্যে সেটা আসিলে তাহারা আপনার মধ্যে সবটা ধারণ এবং হজম করিতে পারে না, না পারিয়া তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত আশপাশের বন্ধুগণের মধ্যে ছড়াইয়া দেয়, নিজের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেরও পীড়িত করিয়া তুলে।

কর্ম্মশক্তিসম্পন্ন উদ্যোগী মানবের যেটি প্রধান গুণ আত্মবিশ্বাস, সঙ্গী-মহাশয়ের সেটির অভাব ছিল না, তিনি নিজ শক্তির উপর চিরবিশ্বাসী, আজন্ম নির্ভীক, উদ্দিষ্ট কর্ম্মে চিরকালই নিজের মধ্যে মনোবল, সাহস, ও পটুতার পরিচয় পাইয়াছেন। কিন্তু কতকগুলি কর্ম্ম, যাহা বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ, সেই সকল কর্ম্ম অবলম্বন করিতে গিয়া তিনি নিজেও বিপর্য্যস্ত এবং অপরেরও মনোকষ্টের কারণ হইয়াছিলেন। এত কঠোরতা যে তিব্বতে যাইতে তাঁহাকে সহ্য করিতে হইবে, পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে অনেক পুস্তকাদি পাঠ করিলেও তাহা তিনি ভাবিতে পারেন নাই। যে সকল পর্য্যটকের ভ্রমণকাহিনী পাঠ করিয়া তিনি এই যাত্রায় নামিয়াছিলেন, যথা—সেইন হিড়েন, ল্যাণ্ডর সেরীং প্রভৃতি, তাঁহাদের লোকবল, অর্থবল, এবং এপথে ভ্রমণোপযোগী সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি প্রচুর ছিল। তাহা ছাড়া তাঁহাদের শরীর শীতপ্রধান দেশের, মদ্য মাংসে পুষ্ট এবং তাঁহারা বয়সে নবীন। কাজেই তাঁহাদের কাহিনীর মধ্যে এত কঠোরতার আভাস তিনি পান নাই। সামান্য রকম যাহা কিছু পাইয়াছেন সেই পুঁথিতে বর্ণিত কষ্টকাঠিন্যের সঙ্গে বাস্তব ভ্রমণ ব্যাপারে অবস্থাগতিকে কতটা তফাত ঘটিতে পারে তাহা কল্পনাও ছিল না। আমার বোধ হয় ঐরূপ অবস্থায় সবার তাহা আসিতেও পারে না। যেহেতু পুঁথির জ্ঞানের সঙ্গে বাস্তব জ্ঞানের চিরবিরোধ। তাহা ছাড়া এত কঠিন কষ্ট স্বীকার করিয়া তীর্থযাত্রা তাঁহার জীবনে এই প্রথম। একবার তিনি কঠিন তীর্থ কেদার ও বদরিকাশ্রমে গিয়াছিলেন। সে পথে বন্দোবস্ত খুব ভালই ছিল, তাহা ছাড়া সে হিন্দুরাজ্যের মধ্য দিয়া, তাহার উপর আবার লোকের কাঁধে চড়িয়া অর্থাৎ ঝাঁপানে। আমি ওপথের বৃত্তান্ত ভালই জানি, কারণ আমিও ওসকল তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছি আর পায়ে হাঁটিয়াই তাহা সম্পন্ন করিয়াছি।

পনের কিংবা ষোল হাজার ফুটের উপরে বাতাসে জলীয় অংশ কম

থাকে বলিয়া উহা অত্যন্ত লঘু ও রুক্ষ হয়। সেই কারণে আমাদের মত সমতলবাসিগণের অল্পাধিক শ্বাস-কৃচ্ছ্রতা ভোগ করিতে হয়ই ইহা তো জানা কথা। তাহার উপর তাঁহার উদরে মেদের সংস্থান কিছু অধিক-মাত্রায় থাকায় এবং বয়সের গুণেও বটে, তাঁহার একটু বেশী রকমের শ্বাসের কষ্ট উপস্থিত হইল। ইহা ছাড়াও আবার, তাঁহাকে ব্যবহার করিতে হইতেছে আর এক ভিন্ন জাতির লোকের সঙ্গে যাহাদের ম্লেচ্ছ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শুধু সাধারণ ব্যবহার মাত্র নয়, এমন কি তাহাদের সেবা ও সাহায্য সর্ব্ববিষয়েই লইতে হইতেছে। আহারে ব্যবহারে চলনে শয়নে, মদ্য মাংসাশী পলাণ্ডুসেবী আচারহীন, উচ্ছিষ্ট-জ্ঞানশূন্য একদল লোকের সঙ্গে ঘরকন্না করিতে করিতে যাইতে হইতেছে, তাহা হইতে নিজেকে বাঁচাইবার উপায় নাই। সুতরাং তাঁহার ন্যায় চিরস্বাধীন প্রকৃতি শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের পক্ষে উহার বন্ধন কম বাজিতেছে না। তাহার উপর আবার একজন স্বদেশীয় এবং স্বজাতীয় অর্ব্বাচীন সাথী এবং সাক্ষী হইয়া নিরন্তর সঙ্গে রহিয়াছে। এতাবৎকাল তিনি সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বভাবে সকলের কাছে নিজ সাহস, বিদ্যাবুদ্ধি ও বলবীর্য্যের পরিচয় নিজমুখে দিয়া আসিয়াছেন;—এখন বাহিরের প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে তাহার মিল হইতেছে না। অন্তরে অন্তরে সেটা তিনি বুঝিতেছেন। যতটা পরিমাণে মিল হইতেছে ততটা পরিমাণে অমিল হইতেছে, ততটা পরিমাণে উত্তেজনার মাত্রাটি বাড়িয়া যাইতেছে, আর ততটা ধাক্কা বা তাল আমার উপরেই আসিয়া পড়িতেছে, কারণ ঐ অবস্থায় আমিই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটের বস্তু। বাহিরের সেই ধাক্কায় আমায় মধ্যে মধ্যে অন্তরে বাহিরে কাঁপাইয়া তুলিতেছে।

তাঁহার শরীর যতই খারাপ হইতে লাগিল তিনি ততই অকারণ উত্তেজিত হইতে লাগিলেন; তাহার ফলে আমার প্রতি অসঙ্গত শ্লেষ বিদ্রূপ ইত্যাদির মাত্রাও বাড়িতে লাগিল। নাথজীকে মধ্যে রাখিয়াই আমার প্রতি তাঁহার যাহা-কিছু প্রয়োগ চলিত। এই কঠিন এবং সুদূর তিব্বতে, মানস-যাত্রার মধ্যে প্রীতিবশতঃই উভয়ে একত্র হইয়াছিলাম বা একত্র হইবার সংযোগ ঘটিয়াছিল। দৈবে একত্র যাত্রার এই যোগাযোগ হইয়া-ছিল বলিয়া ইহাতে এমন কিছু বুঝায় না যে, আমাদের দুই জনের মধ্যে কেহ একক এ যাত্রায় সাহসী ছিলাম না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি মনে

করিতেন যে, আমি তাঁহারই অনুকম্পায় এতটা দূর যাত্রার সুযোগ পাইয়াছি, সুতরাং সর্ব্ববিষয়ে সেবক হইয়াই আমার থাকা উচিত—যদি তাহা না করি তাহা হইলে আমি দুষ্ট ও অন্যায় ধর্ম্মী। কিন্তু আমার অন্তরাত্মা সর্ব্বপ্রকারে উহা অস্বীকার করিত। আমিও এই হিমালয়ে কম ভ্রমণ করি নাই তবে কারো কাছে তার বড়াই করি নাই। প্রাচীন, বয়োজ্যেষ্ঠ, বহুদর্শী, বিদ্বান্, দেশহিতৈষী বলিয়াই আমি তাঁহাকে সম্মান করিতাম এবং যাত্রার সংযোগটি তাঁহার সঙ্গে হইয়াছে বলিয়া আমি তাঁহাকে বিনীত ভাবে ধন্যবাদ দিতাম। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও অধিক দাবীর বোঝা ঘাড়ে রাখাটা অতিমাত্রায় অসঙ্গত মনে করিতাম এবং সেই কারণে আমি তাঁহার নির্ব্বিরোধী সেবক হইতে পারি নাই। ইহাই হইয়াছিল পথে আমাদের মধ্যে মনোমালিন্যের কারণ। তাহা ছাড়া আমাদের বয়সের মধ্যে দেড় যুগের ব্যবধান; কাজেই চিন্তায়, কর্ম্মে, ধর্ম্মে —জীবনের সকল বিভাগেই—আকাশ-পাতাল প্রভেদ রহিয়াছে। সঙ্গী সম্বন্ধে এত কথা হয়ত না বলিলেও চলিত, কিন্তু শুধু পথভ্রমণ এবং দেশের কথা ছাড়া সঙ্গীর কথা বলিবারও প্রয়োজন আছে মনে করি,—কারণ, দূরপথে, অপরিচিত একটি প্রকৃতির সঙ্গে আর একটি প্রকৃতির সংযোগে, পথের মধ্যে যে একটি অশান্তি উৎপন্ন হইয়া যাত্রাকে অনেক সময় দুঃসহ করিয়া তুলে, তাহার কথাও পাঠকের জানিবার প্রয়োজন আছে। এখন যাহা বলিতেছিলাম।

কাঁটাগাছের ঝোপে পরিপূর্ণ এই বিশাল প্রান্তর অতিক্রম করিবার সময় একটি অপূর্ব্ব পাখী নয়নগোচর হইল। উহাকে শ্বেতবর্ণ কাক বলিতে পারা যায়, কারণ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও কাকের মত আকৃতি, কেবল চঞ্চু এবং চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ; স্বর অতি ক্ষীণ। আরও একরকমের পাখী দেখিলাম, আকৃতিটি চড়াইপাখীর মত, তার রঙটি খুব ঘোর কালো এবং প্রকৃতি বড়ই চঞ্চল,—এক মুহূর্ত্তও স্থির নয়। নিরন্তর পুচ্ছ নাচানোই তার বিশেষত্ব।

প্রায় পাঁচ মাইল আসিবার পর নাথজী অল্প সুস্থ বোধ করিলেন এবং এখন রুমাকে তাহার ঝাব্বু ফিরাইয়া দিলেন। রুমা অনেকটা হাঁটিয়াছিল, এখন ক্লান্ত হইয়া পশুর পিঠে চড়িয়া বসিল—আমরা দুইজনে হাঁটিয়া চলিলাম। কতকটা চলিবার পর একটি স্রোতের নিকটে একস্থানে আমি

নাথজী বিশ্রাম করিতেছি, সওয়ারেরা পশ্চাতে আসিতেছে, দেখিলাম কতকটা দূরে মাঠের উপর নাতিউচ্চ প্রস্তরপ্রাচীর-বেষ্টিত একটি গৃহ, সম্ভবতঃ পশুপালকগণের আড্ডা হইবে। একটি লোক সেই প্রাচীর-বেষ্টিত গৃহের বাহিরে আসিতেছিল। হঠাৎ আট-দশটা, প্রকাণ্ড তিব্বতী কুকুর তাড়া করিয়া বিকট চীৎকার করিতে করিতে তাহাকে খাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। আমরা প্রায় আধ মাইল পথ দূর হইতে দেখিতেছি। নাথজীকে বলিলাম, ক্যা মুস্কিল, উসকো ক্যা হোয়েগা নাথজী? তাহাতে নাথজী,—দেখিয়ে তো,—বলিয়া দৃষ্টি না ফিরাইয়াই বসিয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে সে ব্যক্তি হস্তস্থিত লাঠি লইয়া ঘুরাইতে আরম্ভ করিল। উহার লম্ফ এবং লাঠি চালান বিষয়ে ক্ষিপ্রকারিতা দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া গেলাম। এইরূপে ঘুরাইতে ঘুরাইতে সে ক্রমশঃ পশ্চাতে হটিতে লাগিল এবং ক্রমে একেবারে মাঠে আসিয়া পড়িল। তখনও কুকুরেরা তাড়া করিতে ছাড়ে নাই। শেষে ঘূর্ণায়মান লাঠির আঘাত একটি কুকুরের গায়ে লাগিতেই সে লাঙ্গুল উচ্চ করিয়া রণে ভঙ্গ দিল। দেখাদেখি আরও দুইতিনটা তাহার সঙ্গে ফিরিয়া পলাইল। আশ্চর্য্য লোকটার লাঠি ঘুরাইবার কৌশল।

লোকটার পরনে চুড়িদার পায়জামা, গায়ে কেবলমাত্র কোট একটা, তাহার উপর মোটা কম্বল জড়ান, মাথায় রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল, হাতে লাঠি, অদ্ভুত পোষাক—এ দেশীয় নয়। লোকটি ক্রমশঃ আমাদের দিকেই আসিতে লাগিল। নাথজী বিস্মিতভাবে বলিলেন—আমাদের লালগীর নয়? তাহার কথা আমার তো মনেই ছিল না। আমরা যাত্রা করিবার পূর্ব্বে সে ত নীচে রাবণ হ্রদের তীরে মৎস্য খুঁজিতে খুঁজিতে আসিতেছিল, এতটা আগেই বা আসিল কিরূপে? আরও কাছে আসিলে দেখিলাম সে-ই তো বটে,—আমাদের আসকোটের রাজার উপেক্ষিত পুত্র সেই লালগীর, আশ্চর্য্য!

কিজন্য সে ওখানে গিয়াছিল জিজ্ঞাসা করিলাম। ব্যাপার কি? সে বলিল, তামাকু (অর্থাৎ চরস) পিনে কো ওয়াস্তে থোড়া আগ মাঙ্গনে গেয়াথা, শালা হুনিয়া লোক, কুত্তা লাগায় দিয়া। ইহারা বড় ভয়ানক লোক, একটু আশ্রয়ভিক্ষা করিতে গেলে দয়া ত দূরের কথা কুকুর লাগাইয়া রঙ্গ দেখে। একে তিব্বতীয় মাংসাশী কুকুর ভয়ানক শিকারী, তাহার উপর

বিদেশী দেখিলে বা সঙ্কুচিত লোক দেখিলে ভয়ানক আক্রমণ করে। ইহাদের তাড়াইতে লাঠি ছাড়া আর অন্য ঔষধ নাই।

আমরা আরও একটি নদী পার হইলাম। ক্রমশঃ কৈলাস আমাদের নিকটস্থ হইতে লাগিল। তাহার পর বহু দূরে তারচেন পাদমূলে দেখিতে পাইলাম। তখনও অনেকটা দূর ছিল, তা সত্ত্বেও কয়েকটা তাঁবুর শ্বেত বস্ত্রাচ্ছাদন সেখান হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধবল বিন্দুর মত দেখা গেল। উহা কৈলাসের পাদমূলেই। ঘন কণ্টকলতার ঝোপ, তাহার মধ্যে ভীত শশক-কুল,—দেখিতে দেখিতে একটি স্রোতের নিকটে আসিল। এবার আমরা দ্রুতই চলিতে আরম্ভ করিলাম, কারণ আকাশে মেঘের আড়ম্বর দেখা যাইতেছিল। কিন্তু এখনও প্রায় ছয় মাইল বাকী, আমরা নিশ্চিতই জানিতাম, যে, যত দ্রুতই চলা যাক অল্পক্ষণে তারচেন পৌছাইবার সম্ভাবনা মোটেই নাই। এইরূপে, যখন আর দেড় মাইল আন্দাজ বাকি, সেখান হইতে তারচেনের তাঁবুগুলি বড় বড় বিন্দুর মত দেখাইতেছে—তখন চট্‌পট্ শব্দে জল আসিল। এদিকে বৃষ্টি প্রায়ই হয় না, হইলেও বিন্দু বিন্দু হইয়া থামিয়া যায়। কিন্তু আমরা আশ্রয়বর্জ্জিত মাঠের এই দেড় মাইল পথটুকু বৃষ্টির ভিতর দিয়াই সোজা চলিয়া সন্ধ্যার সময় একেবারে কৈলাসের পাদ-মূলে তারচেন পৌছিলাম।

তাঁবু খাটানো হইলে আমরা ভিজা কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া নিজ নিজ স্থান ঠিক করিয়া লইলাম। কথা হইল, কল্যকার দিনটি বিশ্রাম করিয়া পরশুদিন প্রাতে পরিক্রমা সুরু করা যাইবে।

———

॥ ১৩ ॥

তারচেন্, কৈলাস পরিক্রমা ও তাহার ফল
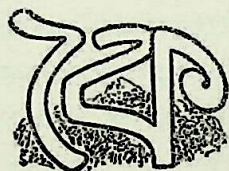
লাসক্ষেত্রে, প্রদক্ষিণ অথবা পরিক্রমাই হইল প্রধান কাজ,—আর এই তারচেন্ যাত্রীদের প্রধান কেন্দ্র,—বিশ্রামস্থান সব কিছুই এখান হইতেই। এখানে আসিয়া আমরা একটি দিন ও দুইটি রাত্রি বিশ্রাম করিয়া তৃতীয় দিনে পরিক্রমায় যাত্রা করি। যে দিনটি এখানে ছিলাম সেই দিনে এইখানে যাহা কিছু দেখিবার দেখিয়া লইলাম।

তারচেন্ ঠিক কৈলাসের পাদমূলেই অবস্থিত,—এখানে একটি গোম্পা বা মঠ আছে। তাহার মধ্যে ন্যূনাধিক একশত লামা, ব্রহ্মচারী তপস্বী বাস করেন। মঠটি খুব বড় নয়। এখানেও অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধের মূর্ত্তি আছে, পুস্তকাগারও আছে, তাহার মধ্যে রক্তবর্ণ বস্ত্রে আচ্ছাদিত বহু হস্তলিখিত পুঁথিও সংগৃহীত আছে, আর আছে ধ্যান-ধারণার জন্য পৃথক পৃথক গুহা বা নির্জ্জন শ্রেণীবদ্ধ কক্ষ সকল। যাত্রিগণের যাতায়াতও কম নয়। এখানকার এই মঠ বা গোম্পার নামটি, গাংডা।

মঠের চারিধারেই তাঁবু পড়িয়াছে। তাঁবু যাহাদের, তাহারা কারবারী ও তীর্থযাত্রী উভয়ই বটে,—এখানে তাহাদের রথদেখা ও কলাবেচা দুই কাজই হয়। দেখিলাম এখানে তিন-চারজন ভোটিয়া মহাজন দোকান খুলিয়া তাঁবুর মধ্যে কারবার লাগাইয়া দিয়াছে;—সঙ্গে তাহাদের স্ত্রী-পুত্রাদি সবই আছে। মার্কিন, বিলাতী ও জার্ম্মান মলের গাদা আর দুনিয়া খরিদ্দারের আনাগোনা। এক মেলা হইতে আসিয়া আর এক মেলার মধ্যে পড়িলাম।

আমাদের তাঁবুর পশ্চাতেই, চিরতুষারাবৃত কৈলাসশিখর। সদ্যদ্রবীভূত তুষারের একটি প্রবাহ, প্রখরা বেগবতী নির্ঝরিণী রূপে গর্জ্জন করিতে করিতে দ্রুতগতি নামিয়া দক্ষিণে মালভূমির মধ্যে কায়া বিস্তার করিয়াছে। একটি কাষ্ঠসেতুর সাহায্যেই পারাপার করিতে হয়। ওপারেও দুই-তিনটি

ছোলদারী পড়িয়াছে দেখা গেল। কৈলাস প্রদক্ষিণ শেষ করিয়া এই সেতু দিয়াই ফিরিতে হয়। দেখিলাম, মুণ্ডিতমস্তক এক ব্যক্তি অতি দীনবেশে সাষ্টাঙ্গ-প্রণিপাত করিতে করিতে সেই সেতুটি অতিক্রম করিতেছে,—শুনিলাম তাহার একচক্র প্রদক্ষিণ শেষ হইল।

আমাদের বাংলায় তারকেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া সন্ন্যাসীরা দণ্ড কাটিয়া যায় এবং প্রদক্ষিণ করে। ব্রতীরা মুখে কুটা ধরিয়া গঙ্গাতীর হইতে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে করিতে বরাবর বাবা তারকনাথের মন্দিরে পৌছায়, তারপর সেখানে মন্দির প্রদক্ষিণ ত আছেই,—এ এক দেখিয়াছি, আর এখানেও বত্রিশ মাইলব্যাপী কৈলাসের পরিক্রমার পথটি ঐরূপ দণ্ডবত
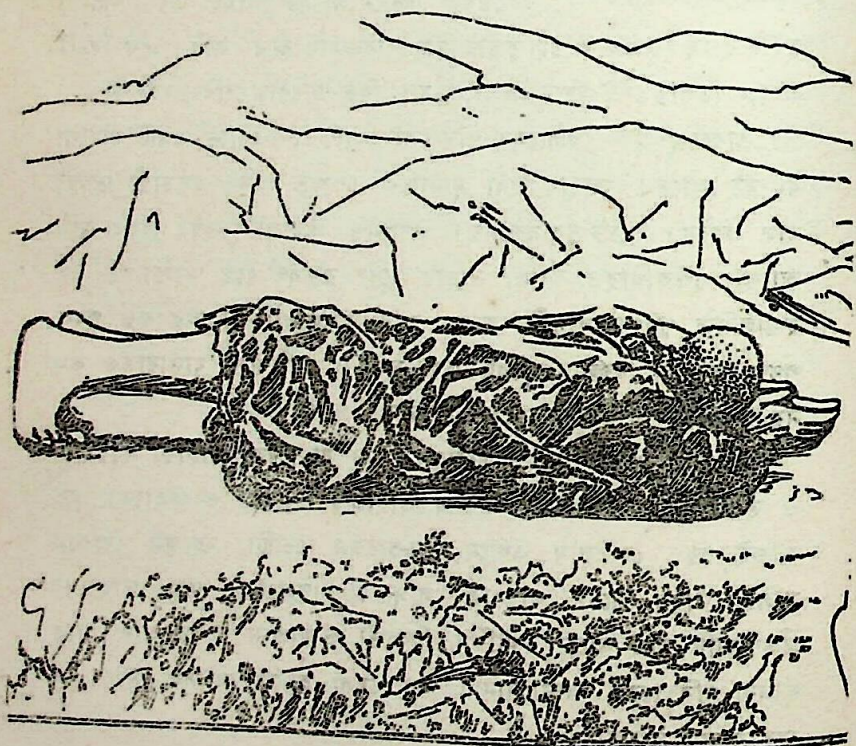
দণ্ড কাটিয়া প্রদক্ষিণ

হইয়া অতিক্রম, একবার নয় তিন পাচ সাতবার ঐরূপ প্রদক্ষিণের ব্যাপার দেখিতেছি। আর কোথাও এরূপ কৃচ্ছ্রসাধনের ব্যবস্থা আছে বলিয়া শুনি

নাই। স্বভাবতই জাগে যখন প্রশ্ন এই দুইটি দেশ ছাড়া এ ব্যাপার অন্য কোথাও নাই তখন ইহাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত কোন যোগাযোগ আছে কি? এই কৃচ্ছ্রসাধনের ব্যাপারটি কি বাংলা হইতে তিব্বতে যায় নাই? এরূপ অপূর্ব্ব তপস্যার মিল—একই উদ্দেশ্যমূলক সাধনের একই ক্রিয়া এবং ফললাভ অন্যত্র বিরল। বৌদ্ধতন্ত্রের সঙ্গে অনেক ব্যাপার বাংলা হইতে সেকালে তিব্বতে গিয়া ঢুকিয়াছে, অথবা তিব্বত হইতেই বাংলায় গিয়াছে। এক সময়ে বাঙ্গালার সঙ্গে তিব্বতের যে তন্ত্রমতের সাধনামূলক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তাহা বর্তমানে আমাদের ধারণাও নাই।

এখন এখানে, এই শ্রাবণ মাসে, যেমন তাকতাখারে লক্ষ্য করিয়াছি দিনমানে দশটার পর হইতে অল্প গরম থাকে, দ্বিপ্রহরে সেই গরম প্রচণ্ড হয়;—পরে, প্রায় দুইটা হইতে বড়ই ভীষণ বেগে শীতল হাওয়া চলিতে থাকে। প্রায় পশ্চিম হইতেই বাতাস আসে, তাহার পর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা পড়ে। দিবা তৃতীয় প্রহরে মাঘ মাসের জঙলী শীত, পরদিন বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত। রাত্রে শীতে মজ্জা পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া দেয়।

দিনমানে প্রাতে ততটা নয় তৃতীয় প্রহরের পর বাহির হইলেই, চোখের উপর অতীব প্রবল তীক্ষ্ণ শীতল বায়ুর আঘাত এখানে সকলকেই সহ্য করিতে হয়। তাহা ছাড়া দৃশ্যাবলী সর্ব্বত্রই বৃক্ষশূন্য, রুক্ষ পর্ব্বতমালা। প্রান্তরের মধ্যে ইতস্ততঃ সামান্য তৃণলতা যাহা দেখা যায়, তাহাতে সবুজের লেশমাত্র নাই। শীতের সময় ত কথাই নাই, চারিদিকে বিস্তৃত তুষারক্ষেত্র ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টির মধ্যে আসে না। এই সকল কারণেই এখানে চক্ষুরোগ অত্যন্ত প্রবল।

ভিখারী অসংখ্য বলিয়াছি। এই কৈলাসী ভিখারীর উৎপাত বড়ই বিষম। ভোজনে বসিলে সারি সারি বালক-বালিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, শিশুকালে জননী এবং সন্তানের হাত ধরিয়া জনক, তাঁবুর মধ্যে নিঃসঙ্কোচে প্রবেশ করিয়া পঁচিশ ত্রিশটি প্রাণী সারিবদ্ধ, অতি দীনভাবে হাত পাতিয়া—যাহাতে করুণার উদ্রেক হয় এরূপ ভঙ্গীতে—একেবারে ভোজনপাত্রের অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়ায়। সকলকে এক এক গ্রাস দিতে গেলে কাহারও খাওয়া হয় না। দ্বার অর্গলবদ্ধ না করিলে নির্ব্বিঘ্নে ভোজন শেষ করিবার উপায় নাই। কোথাও কাহাকে কিছু খাইতে দেখিলে, তাহাদের চক্ষু ভোজ্য ও ভোজনের ব্যাপার ছাড়া আর অন্য

কোন দিকে যাইবে না। অর্দ্ধভুক্ত ছিন্ন অংশটুকুও তাহারা পরম প্রীতির দান বলিয়া লইয়া যাইবে।

একদা, মাথায় বুনোদের মত এক ঝাঁক রুক্ষ চুল, বিকট মূর্ত্তি এক ভিখারিণীর সম্মুখে পড়িয়াছিলাম। পাশ কাটাইয়া যাইবার চেষ্টায় ফিরিতেছি,—সে ভয়ঙ্করী,—আমার দিকে ফিরাইয়া তার জিহ্বাটি বাহির করিয়া দুই হাতের মুঠা দুই কানে দিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল।

শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার

এ কি ব্যাপার ?—

সঙ্গে মণি সিং ভোটিয়া ছিল,—তাহার কাছে শুনিলাম শ্রদ্ধা এবং

সম্মানের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে এখানে এই প্রকারই রীতি। আমাদের দেশে যেটি ব্যঙ্গ, কুৎসিত, মুখ-বিকৃতি, উপেক্ষা, ঘৃণা প্রকাশের লক্ষণ—এটি সেখানে সম্মান এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ আনুগত্যের পরিচয়। আশ্চর্য্য, দেশাচারের প্রকৃতি। তাহা হইলে কোনও দেশের ব্যবহার ত সর্ব্বত্রই নিন্দনীয় নয়।

এইবার পরিক্রমার কথা। পরিক্রমায় যাইবার পূর্ব্বে, আমাদের দলটির সঙ্গে মালপত্র কিভাবে থাকিবে সেই বিষয়ে পরামর্শ শেষে এই স্থির হইল যে, এখানে ইহাদের পরিচিত একজন ভোটিয়া বণিকের জিম্মায় সকলকারই মাল রাখিয়া যাওয়া হইবে। পরিক্রমায় ঝাব্বু ঘোড়া প্রভৃতি বাহন অথবা তাঁবু বা শয্যাদ্রব্যাদি কেহ লইয়া যায় না। এই পথে কোন বোঝা বা ভারী জিনিস না লওয়াই নিয়ম, কারণ, পথের শেষদিকে কিয়দংশ এরূপ কঠিন যে, সেদিকে কোন বাহন লইয়া যাতায়াত দূরের কথা, একা যাওয়াই বিপজ্জনক। তীর্থযাত্রীরা আরও একটি কারণে হাঁটিয়া যায়,—একটু কায়ক্লেশ স্বীকার করিলে দেবতার দয়া বা কৃপা লাভ হইতে পারে।

পশ্চিম ভারতের এক মহাপুরুষ, বৃন্দাবনে এবং সারা ব্রজধামেই তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল। ঐ-অঞ্চলেই তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণনাম ব্যতীত তিনি কানে আর কিছু শুনিতেন না। মাথায় তাঁহার দীর্ঘ জটাজূট চূড়াবাঁধা, তাহার উপর ময়ূরপুচ্ছ লাগাইতেন, তাহাতে তাঁহার মূর্ত্তিটি শ্রীকৃষ্ণের মতই দেখাইত, সেইজন্য ভক্তেরা তাঁহাকে, 'মৌর মুকুট বাবা' বলিত ; ঐ নামেই তিনি সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন। সাধক ও বৈষ্ণব সমাজ তাঁহাকে সিদ্ধ বলিয়াই জানিত এবং তাঁহার প্রভাবও ছিল অসাধারণ। তিনি কখনও রেলে পদার্পণ করেন নাই, পায়ে হাঁটিয়াই সমস্ত তীর্থস্থান ভ্রমণ করিতেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি যোগবলে বহু দূর-দূরান্তর ইচ্ছামত গমনাগমন করিতেন।

একবার তিনি কৈলাসে আসিয়াছিলেন। স্থান-মাহাত্ম্যে তিনি এতই আকৃষ্ট হইলেন যে, এইখানেই দেহত্যাগ হইল না ; শীতের পূর্ব্বে তিনি ব্রজধামে ফিরিয়া গেলেন এবং আগামী বর্ষে পুনরায় আসিবার সঙ্কল্প করিলেন। এইভাবে ছয়টি বৎসর যাতায়াতের পর সপ্তম বর্ষে তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছিল। সেবারে আসিয়া তিনি সকলকে বলিলেন, এইবারেই আমার সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইবে। পরে এক পবিত্র পূর্ণিমা রাত্রে

যোগাসনে তিনি দেহত্যাগ করিলেন। এখানকার লামারা তাঁহার একটি সমাধি-মন্দিরের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গাংভার উপরেই তাঁহার সমাধিক্ষেত্র।

পশ্চিমাঞ্চলে তাঁহার অনেক ভক্ত আছেন, তাঁহার তুল্য প্রেমিক ভক্ত এবং যোগী লক্ষের মধ্যে একটিও দেখা যায় কি-না সন্দেহ। বাংলার গৃহী বৈষ্ণবগণের মধ্যেও তাঁহার কতকগুলি ভক্ত আছেন, যাঁহাদের আমি জানিতাম।

পরিক্রমায় যাইবার বিষয়ে সঙ্গী-মহাশয়ের প্রথমে সন্দেহ ছিল। লিপুলাক গিরিসঙ্কট উত্তীর্ণ হইবার পরই তাঁহার শ্বাসকৃচ্ছ্রতা বেশী রকম হইতেছিল,—রুক্ষ জলবায়ুর সহিত তাঁহার শরীরে মিল হইতেছিল না, তাহাতে মাঝে মাঝে বড়ই অবসন্ন করিয়া ফেলিতেছিল সেইজন্য তারচেনে আসিয়াই শরীরের অবস্থা বুঝিয়া তিনি রুমা দেবীকে বলিলেন, দেবীজী, পরিক্রমামে আপলোক সব যাইয়ে, হাম ইঁহাসে শিউজীকো দরশন করেগা। ইহা হমকো কোইকো পাস রাখকে যাও। পরে যখন আমাদের সকলের যাইবার তাড়া পড়িয়া গেল এবং নাথজী তাঁহার জ্বরে অসুস্থ দুর্ব্বল শরীর লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন এবং এতগুলি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, তাহাদের মধ্যে কাহারও বয়স সত্তরের কোঠায় চলিতেছে,—তাহারাও যাইতে প্রস্তুত হইল, তখন তিনিও যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, আপলোক সবকোই যায়েগা, আউর হাম ইঁহ রয়েগা? শিউজী যো করে, হামতো যায়গা। দেবীজী, ক্যা বলো?

সঙ্গী-মহাশয়ের সঙ্গে এ-পর্য্যন্ত যেটুকু ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, এখানেই তাহার পরিসমাপ্তি। শেষটা ভাল বলিয়া এখানে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

তাঁহার ব্যবহার উত্তর উত্তর অসহ্য হওয়ায় তারচেনের পথেই আমি মনে মনে তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগের সঙ্কল্প করি। পূর্ব্বেই শাংরুওয়াবা ধনীরাম শেঠের কথা বলিয়াছি,—বরাবরই সে ব্যক্তি আমাদের সঙ্গেই আসিতেছে, কথাবার্তাও মধ্যে মধ্যে তাহার সঙ্গে চলিতেছিল। শুনিলাম এখান হইতে তাহার ভস্মাসুর বা তীর্থপুরীতে যাইবার সঙ্কল্প আছে। দেখিলাম ইহাই আমার উৎকৃষ্ট সুযোগ, আমি তাহাকে ধরিয়া বলিলাম আমিও ঐ সঙ্গে তীর্থপুরী যাইব। কৈলাস পৌছিয়া একদিন বিশ্রাম করিব, পরদিন ধনী-

রামের সঙ্গে রওনা হইবে এইরূপ কথা তাহার সঙ্গে পথেই ঠিক হইয়া গেল।

তারচেন পৌঁছিয়া কথাটি সেদিন কাহাকেও না বলিয়া পরদিন প্রাতে প্রথমে সঙ্গীমহাশয়কে, তারপর রুমাকে, তারপর নাথজীকে বলিলাম। এই অসুস্থ অবস্থায় নাথজীও আমার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। সঙ্গীমহাশয় শুনিয়া বড়ই গম্ভীর হইয়া গেলেন। রুমা বলিল, কেঁও পিতাজী, আপ অভি হামলোককো ছোড়কে চলনেকো ওয়াস্তে তৈয়ার হুয়া। আমি তাহাকে আর বিশেষ কিছুই বলিলাম না;—সে বুদ্ধিমতী, ব্যাপারটা বুঝিয়াই ছিল।

পরে বৈকালে ধনীরামের তাঁবুতে গেলাম, শুনিলাম সে উপরের গুহা বা মঠ-গাংডায় গিয়াছে, সেখানে লামাদের ভোজ দিবে, সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিবে। তাহার সঙ্গে ত কথা ঠিকই আছে, তবুও তাহার লোকজনকে আবার বলিয়া আসিলাম। সে-রাত্রি কাটাইয়া পরদিন প্রভাতে আমার মালপত্র ঠিক করিয়া পৃথক রাখিলাম এবং ধনীরামের আড্ডায় গিয়া উপস্থিত হইলাম।

সেদিন আমাদের দল আহারাদি শেষ করিয়া দ্বিপ্রহরে পরিক্রমায় যাইবার কথা। ধনীরাম কিন্তু এখনও উপর মঠ হইতে নামে নাই। তাহার লোকজন বলিল, সে আজও নামিবে না, মঠে ত্রিরাত্র বাস করিবে, তারপর ফিরিয়া মানসসরোবর যাইবে, তীর্থপুরী যাইবার কিছুই ঠিক নাই। শেষে চুপি চুপি তাহার কর্ম্মচারী একজন বলিল, আপনি তার কথা বিশ্বাস করিবেন না তার মগজের ঠিক নাই, মদ খাইয়া সে এখনও গ্যাংডা-মঠে পড়িয়া আছে।

আমি ত আকাশ হইতে পড়িলাম। এ কি হইল? এত উদ্যোগ, এতটা আশা সে লোকটা আমায় একেবারে কাহিল করিয়া দিল। মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিলাম এবং আড্ডায় আসিয়া সঙ্গী-মহাশয়কে বলিলাম, আমার যাওয়া হইল না। শুনিয়া তিনি আনন্দে চীৎকার করিয়াই বলিলেন, বেশ হয়েছে, তাঁর অর্থাৎ ভগবানের,—ইচ্ছা নয়। রুমা বলিল, বহুত আচ্ছা হুয়া পিতাজী। নাথজী, তাঁর তল্পিতল্পা গুছাইয়া বসিয়াছিলেন সঙ্গে যাইবেন, —শুনিয়া বলিলেন,—হুয়া তো আচ্ছা, ন-হুয়া তো ওভি আচ্ছা, সাধুকো ক্যা হ্যায়। যো হুয়া ও ই সহি—। এই ঘটনাই হইল সঙ্গী-মহাশয়ের আমার প্রতি ব্যবহার পরিবর্ত্তনের কারণ।

সেইদিন প্রাতে আমাদের জন্য ক্রমা ভাত রাঁধিয়া আর সেই ভাতের ফেন, কি একটা শাকের সঙ্গে মিলাইয়া অতি সুস্বাদু একটি ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দিল। সঙ্গী-মহাশয় ভোজনান্তে অতীব প্রসন্ন হইয়া তাহাকে উৎসাহিত করিলেন,—দেবীজী! আপ তো অন্নপূর্ণা হো, ক্যা তরকারি বানায়া, বহুত স্ব'দিষ্ট হুয়া, হাম তো বহুত তৃপ্ত হুয়া, আপ হামারা বাস্তে জঙ্গলমে মঙ্গল বনায়া। যাহা হউক, আমাদের আহারাদি শেষ হইলে মালপত্র সরাইয়া তাঁবু গুটানো হইল,—উহা যথাস্থানে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া আনন্দে আমরা যাত্রা করিলাম। শীতবস্ত্র কম্বলাদি লইয়া সঙ্গে কেবল একজন হুনিয়া চলিল।

॥ ১৪ ॥

চিরতুষারাবৃত কৈলাস

ল্যকালে পদ্যে পড়িয়াছিলাম,—

কৈলাসভূধর অতিমনোহর কোটিশশী পরকাশ,
গন্ধর্ব্বকিন্নর যক্ষবিদ্যাধর অপ্সরাগণের বাস!

—ইহাই কৈলাস সম্বন্ধে আমাদের আবাল্য ধারণা। তারপর পৌরাণিক কৈলাস সম্বন্ধেও ঐরূপই একটি ধারণা ভারতবাসী অধিকাংশ হিন্দুর আছে। তার উপর মহাকবির বর্ণিত কৈলাস ও মানসসরোবরের ভাবচিত্র দেশের শিক্ষিত পণ্ডিতসমাজের মনে একটি এমনই স্বপ্নময় দিব্যভাবের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, তাহার পরিবর্ত্তন অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কৈলাসে চিরবসন্ত বিরাজ করিতেছে, অন্য কোন ঋতু এবং কামাদি কোন রিপুর অধিকার সেখানে নাই, সেখানে গো, মৃগ, শশক, সিংহ, শার্দ্দুল একত্র খেলা করে ইত্যাদি। পুরাণ অথবা কাব্যবর্ণিত কৈলাসের সহিত, এই যে ভৌগোলিক কৈলাস, আসলে একটি বিষয় ব্যতীত আর কোন ভাবেরই মিল নাই;—মিল আছে শুধু ইহার স্থির, প্রশান্ত নিস্তব্ধতায়।

চিরতুষারাবৃত কৈলাসের উচ্চতম শৃঙ্গটি দূর হইতে দেখিতে প্রায় অর্দ্ধ ডিম্বাকৃতি। যেন একটি বাণেশ্বর শিবলিঙ্গের অর্দ্ধাংশ,—সমুদ্রতল হইতে উহা ২২,৫০০ ফুট উচ্চ। অতটা উচ্চে সাধারণ তীর্থ-যাত্রী কেহই যাইতে পারে না। শুনিয়াছি বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া একজন ইউরোপীয় উহার একশত ফুট নিম্নদেশে পৌছিয়াছিলেন। তিব্বতীয় জনসাধারণ কৈলাস-শিখরকে গাংরী বলে। কৈলাস-সন্নিহিত এই অঞ্চলের তিব্বতী নাম গাংরিম্বোচি। চ শব্দটির উচ্চারণ অনেকটা শ-এর মত। শিখরদেশটি কেন্দ্র করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে প্রায় বত্রিশ মাইল অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে পার্ব্বত্য উপত্যকা ভূমি পরিক্রমার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার নাম গাঁকর এবং পূর্ণ দুইটি দিনে উহার কার্য্য সম্পূর্ণ হয়। আমরা সেই উদ্দেশ্যেই আজ বাহির হইয়াছি। কেন্দ্রস্থ শুভ্র তুষারমণ্ডিত শিখরদেশটি সর্ব্বদা দক্ষিণে রাখিয়াই ঘুরিতে হয়, সুতরাং পথটি বামাবর্ত্ত। এই পথের মধ্যে চারিদিকে

চারিটি গোম্পা বা মঠ আছে। তাহার মধ্যে তারচেনের ঠিক উপরেই প্রথমটি। পশ্চিম মুখে যাত্রা করিয়া প্রদক্ষিণ সুরু করিলাম। পথ প্রশস্ত এবং প্রায়ই সমতল। কিয়দ্দুর গিয়া বামে, দূরে, রাক্ষসতালের কিয়দংশ দেখা গেল, যেন একখানি নীল বস্ত্রাঞ্চল বিস্তৃত রহিয়াছে।

আরও কিছুদূর গিয়া দেখিলাম এক প্রৌঢ় লামা অশ্বারোহণে আমাদের বামে রাখিয়া আপন মনে চলিয়া গেলেন। কিয়দ্দূরে গিয়া তিনি ফিরিলেন এবং আমাদের দলপতি মণি সিংকে কিছু প্রশ্ন করিলেন। কিছুক্ষণ পর সকল কথা শেষ করিয়া আবার নিজ পথে প্রস্থান করিলেন, জিজ্ঞাসায় জানিলাম তিনি, দলটি কোন স্থান হইতে আসিতেছে এবং পরিক্রমার

অশ্বপৃষ্ঠে লামা

কাজ শেষ হইলে কোন্ দিকে যাইবে এ সকল খোঁজখবর লইলেন। জানি না তাঁহার কি উদ্দেশ্য ছিল। এখান হইতে ক্রমে ক্রমে যে সকল দৃশ্য একটির পর একটি নয়নগোচর হইতে লাগিল তাহার প্রত্যেকটিতে ভয়, বিস্ময় এবং

আনন্দ চিত্তকে আলোড়িত করিতে লাগিল। প্রত্যেক দৃশ্যের মধ্যে যেন একটি শূন্য ভাব যাহা পূর্ব্বে, জীবনে কখনও অনুভব করি নাই। দৃশ্যমান বিশালকায় নগ্ন প্রস্তর-সমষ্টি অবলম্বন করিয়া যেন কত কালের সঞ্চিত কত স্মৃতি দ্রষ্টাকে কত প্রকার ভাবের স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে।

আমরা প্রায় তিন মাইল গিয়া উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত একটি জলস্রোতের সম্মুখে পড়িলাম। এই নদীটি উত্তরে কৈলাস হইতে নামিয়া সমুদয় পশ্চিম দিকের পথটি ব্যাপিয়া আছে। আমরা এইখানে ঘুরিয়া সেই বিশাল নদীবক্ষের উপর দিয়া উত্তরমুখে চলিতে লাগিলাম। অল্পপরিসর জলধারা বোধ হয় দশ হাতের বেশী হইবে না, অতীব খরতর বেগ তাহার। চারি দিকেই বালুকা অগাধ ও বিচিত্র উপলখণ্ডে পরিপূর্ণ। বিস্তৃত নদীবক্ষের দুইদিকেই গগনস্পর্শী পর্ব্বত-চূড়াগুলি নানাপ্রকার আকৃতিবিশিষ্ট। বাঁকের মুখেই আমরা এক সাধু মহাত্মার সমাধি দেখিলাম। উপরে প্রস্তরসমষ্টি, তাহাতে গৈরিকবর্ণে তিব্বতী অক্ষরে নানাবর্ণে নানা মন্ত্র চিত্রিত। শীর্ষে একটি দণ্ড উপরে ধ্বজা, তাহাতে নানাবর্ণের পতাকা ঝুলিতেছে। দলের স্ত্রীলোকেরা সকলেই প্রদক্ষিণ করিয়া লইল এবং শেষে তাহারাও সেই ধ্বজায় নানাবর্ণের বস্ত্রখণ্ড বাঁধিতে লাগিল। সেই সমাধির পার্শ্বেই একটি কুটীর, তাহাতে একজন শিল্পী বাস করে, পাথরের উপর চিত্র করাই তার পেশা।

এখানে অর্থাৎ এই স্তূপের অতি নিকটেই এক গুহামধ্যে,—মধ্যে মধ্যে এক নারীমূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। তাঁহার সম্বন্ধে এক আশ্চর্য্য কাহিনী শুনিলাম। তিনি তিব্বতীয়, চিরকুমারী, সিদ্ধযোগিনী এবং মহাশক্তিশালিনী ;—ইচ্ছামত নিজ শরীর হইতে বাহির হন এবং ইচ্ছামত শরীরমধ্যে প্রবেশ করেন। তাঁহার সঙ্গে একটি লোক সর্ব্বদাই থাকে, সেও তিব্বতী। যখন তিনি এখানে থাকেন না তখন সেই ব্যক্তিই গুহা রক্ষা করে। সে তাঁহারই শিষ্য। যখন যোগিনী শরীর হইতে বাহির হন তখন সেই ব্যক্তিই তাঁহার দেহ রক্ষা করে। দেহটি ঠিক মৃত, শবের মতই পড়িয়া থাকে, তাহা তখন স্পর্শ করা নিষেধ। এইরূপে তিনি শরীর হইতে বাহির হইয়া যখন পুনঃপ্রবিষ্ট হন তখন অনেক স্থানের অনেক কথা বলিয়া থাকেন। অনেকের অনেক গুহ্য-কাহিনী তিনি বলিয়াছেন। এই অদ্ভুত সিদ্ধি তাঁহার জন্মগত। তিনি যখন যেখানে থাকেন তখন অনেক দূর-দূরান্তর হইতে
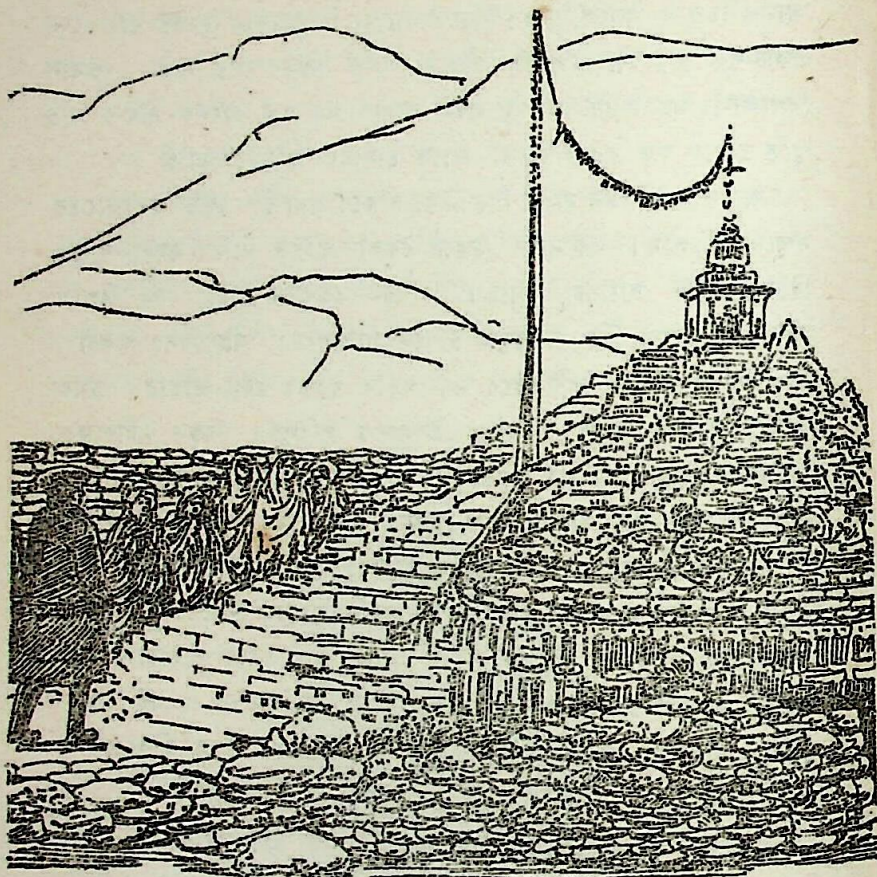
পথের স্তূপ-মন্দির

বহুতর নরনারী তাঁহাকে দেখিতে আসে। তিনি সম্প্রতি এখান হইতে পশ্চিমদিকে চলিয়া গিয়াছেন।

আমরা আরও মাইলখানেক চলিয়া বামে নদীতীরে পাহাড়ের উপরে দ্বিতীয় মঠ পাইলাম;—তাহার নাম নিয়ান্দি-পো গোম্পা। অনেকটা চড়াই উঠিতে হইবে, তাই রমা গেল না, সঙ্গী-মহাশয়ও গেলেন না, তাঁহারা নীচে নদীতীরে একটি বিস্তৃত শিলাখণ্ডের উপর বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, আমরা নাথজীকে লইয়া প্রায় জন পনেরো যাত্রী উপরে উঠিলাম। প্রথমেই মঠসংলগ্ন মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এই প্রকাণ্ড ঘরটিতে, ছাদের উপরে কতকটা খোলা জায়গায় কাঁচ লাগানো, সেইখান হইতেই যাহা কিছু

আলো ঘরের মধ্যে আসিতেছে, তাহাতেই বিস্তৃত মন্দিরগৃহের সকল দ্রব্যই বেশ পরিষ্কার দেখা যাইতেছে।

সম্মুখেই একটি উচ্চ প্রশস্ত বেদী, তাহার মধ্যস্থলে দারুময়, উপরে সোনালী রং-করা বিশালকায় একটি ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি, তাঁহার দুই পার্শ্বে দুইটি প্রকাণ্ড বহু পুরাতন গজদন্ত রক্ষিত আছে। উহা চিত্রিত এবং উভয় প্রান্তে স্বর্ণমণ্ডিত। অন্যান্য মঠে যেমন দেখিয়াছি এই মঠেও তেমনি মূল বেদীর সম্মুখেই রক্তবস্ত্রমণ্ডিত চারিটি সোপান বা স্তর, তাহাতে আলোকাধার শ্রেণীবদ্ধ। তাহার পর একটি রজতময় প্রশস্ত আধারে স্তূপাকার মাখন। একদিকের দেওয়ালে কয়েকটি ধাতুমূর্ত্তি; তাহার মধ্যে বজ্রপাণি, মৈত্রেয় বুদ্ধ এবং তারা মূর্ত্তি আছে। তারামূর্ত্তি এদেশের সকল মঠেই আছে। মূল বেদীর সম্মুখে, কিছু দূরে সারি সারি গদিপাতা বহু আসন। সেগুলি এখানকার লামাদের ধ্যান-ধারণার জন্যই রাখা আছে।

এই সকল মামুলী আসবাব ছাড়া উল্লেখযোগ্য আরও অনেক কিছু আমরা দেখিলাম। যে দেওয়ালে ঐ সকল চিত্র সেই স্থানেই কতকগুলি নর-অস্থি-নির্ম্মিত মালা ঝুলানো রহিয়াছে। উহা কোন লামার কঙ্কাল বা অস্থি হইতেই প্রস্তুত। এখানে কোন ধর্ম্মাত্মা দেহ ত্যাগ করিলে কোন কোন স্থলে তাঁহার দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া মাংসগুলি পশুপক্ষীকে খাওয়ানো হয় এবং অস্থিগুলি সংগ্রহ করিয়া নানা প্রকার অলঙ্কারে পরিবর্ত্তিত করা হয়। সেই সকল অলঙ্কার পবিত্র স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ কোনও মঠে সযত্নে রক্ষিত থাকে। আবার কোথাও ভক্তগণ অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত নানাভাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন। সেগুলি সাধনাবস্থায় সিদ্ধির সহায় বলিয়াই ইহাদের বিশ্বাস। কোথাও কোথাও উহা আপদ উদ্ধারের কবচ। কোন কোন লামার দেহ বৃহৎ কাষ্ঠনির্ম্মিত আধারে নুনের মধ্যে রাখিয়া এক স্থানে সমাহিত করা হয় এবং তাহার উপর গোম্পা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। তিব্বতে যতগুলি মঠ আছে তাহার অধিকাংশই কোন-না-কোন বিখ্যাত সিদ্ধ যোগী অথবা মোহান্ত লামার সমাধির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

যে-কেহ মন্দিরে প্রবেশ করিতেছে কিছু-না-কিছু উপহারসহ প্রণামাদি করিতেছে। আমাদের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, অন্য কোনও দ্রব্য না থাকায় এখানকার রজতখণ্ড দিয়াই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। নানা উপহার সঙ্গে

মঠাভ্যন্তর
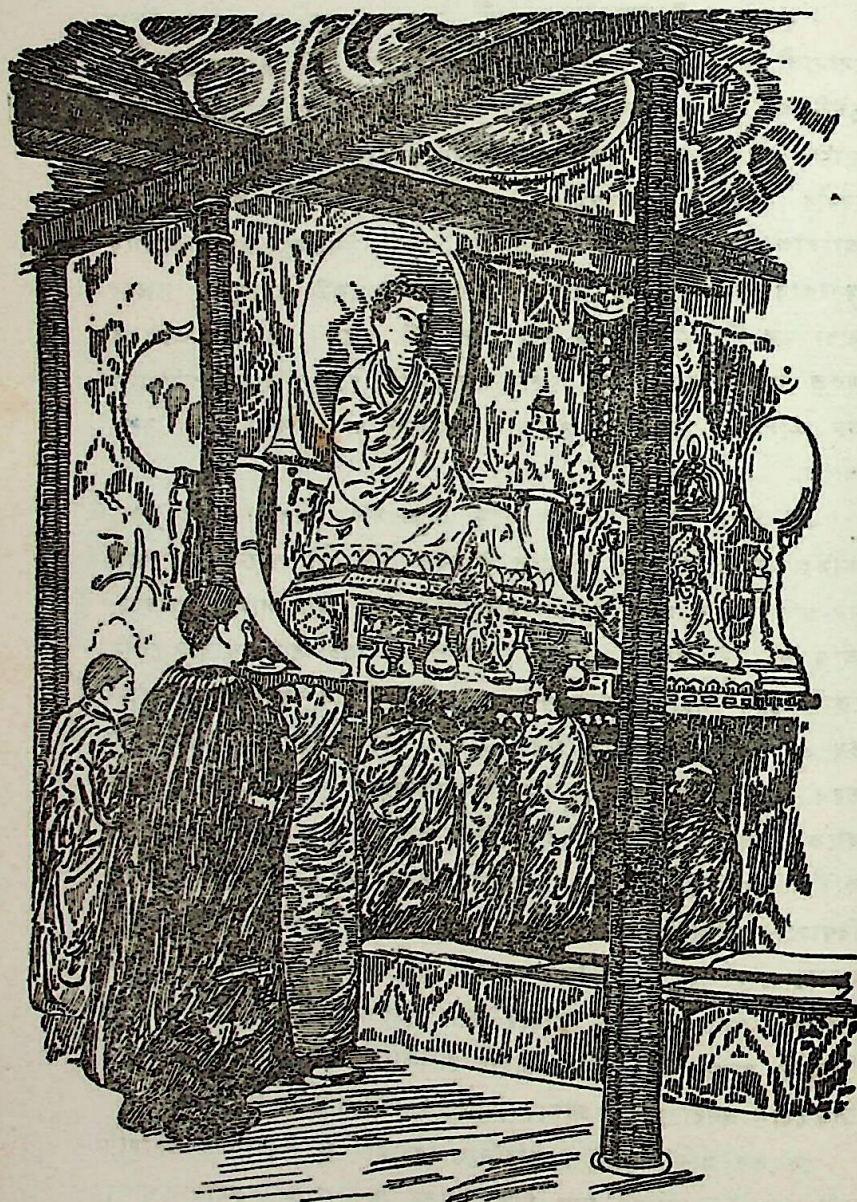
লইয়া অনেকগুলি গ্রাম্য নারীও আসিয়াছিল; তাহারা পূজারী লামার নিকট সেই সকল নিবেদন করিল। ভারতবর্ষের মত এখানেও দেবমন্দিরে নারীর জনতা।

গ্রামবাসিনী নারীগণ এখানকার লামাকে যে সকল বস্তু উপহার দিতেছে তাহার মধ্যে কঠিন দুগ্ধ এক বিশেষ দেখিবার বস্তু। দেখিতে সাদা সাদা অনেকটা বড় বড় কুমড়া বড়ীর মত, কিন্তু গন্ধ তাহার ভাল নয়। উহা এত কঠিন যে হাতুড়ির ঘা মারিলেও ভাঙে কি না সন্দেহ। উহা সিদ্ধ করিয়াই খাইতে হয়; আবার কেহ কেহ অনেকক্ষণ মুখে রাখিয়া একটু নরম করিয়া চিবাইয়া খায়। যেস্থানে এই সকল উপহার রক্ষিত হইয়াছে তাহার পশ্চাতে দেওয়ালের গায়ে কারুকার্য্যখচিত অতি প্রকাণ্ড ঢালের মত, পিত্তল-নির্ম্মিত এক জোড়া খরতাল ঝোলানো আছে, দুই হাত তার ব্যাস;— জানি না ইহা কখনও বাজানো হয় কি না।

আমরা প্রধান মন্দিরগৃহ এবং অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করিয়া একটা মুক্ত প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলাম, দেখিলাম ঠিক সম্মুখেই নদীপারে পর্ব্বতশ্রেণীর উপর শুভ্র কৈলাসশৃঙ্গ দেখা যাইতেছে। অপূর্ব্ব মনোহর, অনির্ব্বচনীয় দৃশ্যটি। পরিক্রমার পথে এই প্রথম আমাদের কৈলাস দর্শন হইল।

কতক্ষণ তন্ময় হইয়াই উপভোগ করিতেছিলাম, হঠাৎ তীব্র খলখল হাসির শব্দে চমকিত হইলাম। পার্শ্বেই একখানি ক্ষুদ্র ঘর, দ্বার ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ, তাহার উপরের দিকে কয়েকটা ঘুলঘুলির মত ছিদ্র ছিল, তাহার মধ্য দিয়াই আওয়াজ আসিতেছে। ভিতরে কতকগুলি লোকের হাসি-তামাসা চলিতেছিল। ক্রমে শুনিলাম তাহাদের মধ্যে হুড়াহুড়ি চলিতেছে। সে হুটপাট শব্দের মধ্যে ভয়ের আভাস পাইলাম। ভাষা ত কিছুই বুঝি না, কেবল উত্তেজিত অবস্থায় বাক্যবিনিময়। তারপর দুপদাপ শব্দ, পরে ভীষণ শব্দে দ্বার খুলিয়া যাওয়া। পরক্ষণেই মুণ্ডিতমস্তক লোহিত বস্ত্রে আবৃত এক যুবক লামা দ্রুতবেগে বাহির হইয়া মন্দিরের দিকে ছুটিয়া গেল। তাহার পশ্চাতে আরও দুই-তিনজন যুবা বাহির হইয়া সেই দিকেই ছুটিল। শেষে যিনি গেলেন তাঁর কপাল কাটিয়া দরদর ধারে রক্তস্রাব হইতেছিল।

তিন চারজন আমাদের দলের ভোটিয়া মরদও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। আমরা সশঙ্কচিত্তে অবাক হইয়া সেইখানেই বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ

অদ্ভুত শৈল

পরে আমাদের লোকগুলি ফিরিয়া আসিলে তাহাদের মুখে ব্যাপারটি শুনিলাম।

চার-পাঁচজন বিদ্যার্থী লামা বা ব্রহ্মচারী একত্র একস্থানে পাঠাভ্যাস করিত। একজনের উপর আর একজনের কিছু আক্রোশ ছিল, মাঝে মাঝে উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ বচসা হইত। আজ তাহারা একত্র হাসি-পরিহাস করিতেছিল, ক্রমে দুইজনে তর্ক বাধিয়া যায়, পরে তর্ক ঘনীভূত হইয়া ব্যাপার এই দাঁড়াইয়াছে। রক্তারক্তিতেই তর্কের পরিসমাপ্তি যে এখানে প্রায়ই ঘটে, আবার সেটা নিরক্ষর এবং অক্ষরসম্পন্ন উভয় শ্রেণীর মধ্যে নিঃসঙ্কোচেই অনুষ্ঠিত হয়, তাহা এখানে আমরা কয়েকবারই দেখিয়াছিলাম।

আমরা এইরূপে নিয়ান্দি-পো গোম্পা দেখিয়া এবং কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া নামিয়া আসিলাম এবং সেই নদীবেলায় সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া উত্তরমুখে অগ্রসর হইলাম। শরীর ক্রমশঃ বড়ই দুর্ব্বল বোধ হইতে লাগিল। কণ্ঠ শুকাইয়া যেন ক্রমে ক্রমে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইতে লাগিল। সঙ্গে আমাদের মরিচ, মিছরি, পুরানো তেঁতুল প্রভৃতি বরাবরই আছে এবং তাহার সদ্ব্যবহারও আমরা কম করি নাই; কিন্তু তাহাতেও এখানে সেই শুষ্কভাব এবং কণ্ঠের রসহীনতা মানিতেছিল না। মঠ হইতে নামিয়া নদীর জল অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিয়া কতক ক্ষণের জন্য সুস্থবোধ করিলাম।

প্রায় সারাদিনই আমরা সেই বিস্তৃত উপত্যকার মধ্য দিয়া উত্তরমুখে চলিতে লাগিলাম। বামে দক্ষিণে দুই দিকের গগনস্পর্শী পর্ব্বতশৃঙ্গগুলি ক্রমে ক্রমে নানা আকারে রূপান্তরিত হইতে লাগিল। তাহাদের বৈচিত্র্য নানা প্রকার আকৃতি সত্যই অদ্ভুত। কোনটি যেন একটি বিশাল গজমুণ্ড, কোনটি বা অশ্বপৃষ্ঠে সংযুক্ত নিজের মত, কোনটি বা এক পাশ হইতে যেমন দেখা যায় উপবিষ্ট হনুমানের মত, দূর হইতে এক-একটি গিরিমূর্ত্তি—ঐরূপ বোধ হইতে লাগিল। অবিরাম তুষারের সংস্পর্শে এবং বজ্রপাতের ফলে প্রকৃতির নিয়মেই পাষাণ-শরীরে মায়াময় এই সকল রূপ ফুটিয়াছে।

আমরা এ পর্য্যন্ত যত পথ চলিয়া আসিয়াছি এবং পথের মধ্যে যত দৃশ্য-বস্তুর সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়াছি—এই কৈলাস পরিক্রমার পথেই তাহার চরম হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, কৈলাসের প্রত্যেক দৃশ্যটি সৌন্দর্য্য-বর্জ্জিত, কেবলমাত্র বিভিন্ন আকারের রুক্ষ পাষাণময় শরীর, তাহার মধ্যে

বিশাল শূন্যতা—যাহা অনুভবসাপেক্ষ। ইহাতে আনন্দের বেগ ত নাইই, পরন্তু গম্ভীর এবং বিস্ময়কর। দর্শনেন্দ্রিয় মত্তকর-দৃশ্য কিছুই না থাকায় চৈতন্তের লক্ষ্য, এই রুক্ষ বহুদূর বিস্তৃত পাষাণের অন্তরালে যেন একটা শূন্য ভাবের উপর গিয়া পড়িতেছে এরূপ বোধ হইল, ইন্দ্রিয়ভোগ্যবস্তুর অভাব হইলেই মন নিরুৎসাহ হইয়া অন্তর্মুখী হয় ইহাই মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যেমন তার চাঞ্চল্য নিবারিত হয় অমনি সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি বস্তু দেখিতে পায়। সেই ভাবটি বুদ্ধির মধ্যে কোন আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া আসে না বলিয়াই তাহাকে শূন্য ভাব বলিতেছি। অথচ সে ভাব একটি জাগ্রত এবং সত্য ভাব,—উহা এমনি একটা কিছু যাহাকে আমরা বুদ্ধি দিয়া ধরিতে বা কুলাইতেই পারি না—কেবল কতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়াই থাকি। এই সকল মনে মনে তোলাপাড়া আর আনন্দ বিস্ময়মিশ্রিত একটা ভাবের মধ্যে ভাসিতে ভাসিতে চলিতে লাগিলাম। ইহাই কি কৈলাসের মাহাত্ম্য? এখানে আসিয়া দাঁড়াইলে একবার মুক্তকণ্ঠে বলিতে ইচ্ছা করে, হে তীর্থ-প্রিয় ভারতবাসিগণ, তোমরা পুরাণোক্ত ভারত খণ্ডের অনেক প্রাচীন আর্যদেবগণের লীলাভূমি দেখিয়াছ। গয়া, বারাণসী, দ্বারকা, বৃন্দাবন, রামেশ্বর, পুরুষোত্তম দর্শন করিয়াছ, কঠিন হিমালয়ের মধ্যেও হরিদ্বার, হৃষিকেশ, গঙ্গোত্রী, কেদার ও বদরিকা প্রভৃতি বহুক্লেশ স্বীকার করিয়া দর্শন ও উপভোগ করিয়াছ, কিন্তু এই চিরপ্রাচীন, ভোগবিলাসবর্জ্জিত প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বে রম্য এবং স্বতঃই সমাহিত, প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যময় শিবের প্রিয়নিকেতন, কৈলাসক্ষেত্র দেখিয়াছ কি? দিগম্বরের এ-ক্ষেত্রটি একবার দেখিবার সাধ গোপন মনে পোষণ করিও কোন সময়ে উহা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে। তখন আসিয়া এই কৈলাসপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া দেখিও—হিমালয়-পারে এই বৃক্ষলতাদিশূন্য নগ্ন শ্রীহীন পাষাণসমষ্টির অন্তরালে কি এক মহান্ শক্তির অস্তিত্ব জাগ্রতভাবে বিরাজিত। সত্য সত্যই তুমি এখান হইতে একটি নূতন জন্ম লইয়া যাইবে।

যখন বেলা প্রায় চতুর্থ প্রহর, তখন ক্রমশঃ চারিদিকেই মেঘাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। এমনই সময়ে আমরা এক বাঁকের মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে আর একটি স্রোত উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে আসিয়া এই নদীটির সঙ্গে মিলিয়াছে। আমরা প্রথম নদীর গতি ধরিয়া পূর্ব্বমুখে ফিরিলাম। এখানেও আবার অনেকগুলি 'প্রবল স্রোত চারিদিকে

ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে নদীগর্ভ অনেকটা প্রশস্ত হইয়াছে। এখানে আমাদের দলের সকলেই একত্র হইল, কারণ দুই তিনটি প্রবল স্রোত সাবধানে পার হইতে হইবে। স্ত্রীলোকেরা সকলে পারিবে না। লাল সিং পাতিয়ালের মা পারিবেন না; আর কুমায়ুনী যে চারিজন সাধু, তাঁহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ আছেন, তিনিও পারিবেন না; তাহা ছাড়া

পারাপার

আরও দুই তিনজন অশক্ত। কাণ্ডারী হইল দুইজন, সঙ্গে যে হুনিয়া বাহক স্ত্রীলোকের কম্বল ও বস্ত্রাদি আনিয়াছিল সে, আর আসকোট রাজওয়াড়ার সেই লালগীর। সে সর্ব্বত্রই নির্ভীক এবং অকুণ্ঠিতচিত্ত। বৃদ্ধ দুইজনকে সযত্নে একে একে তাহার পৃষ্ঠে লইয়া পরপারে রাখিয়া আর কাহাকেও পার করিতে হইবে কিনা—সে একবার ফিরিয়া দেখিল। তখন

প্রসন্ন নয়নে তাহার দিকে তাকাইয়া সঙ্গী-মহাশয় হাত বাড়াইলেন। তৎক্ষণাৎ সে আবার ফিরিল এবং তাঁহাকে অনায়াসে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া পার করিল। এইরূপে সঙ্গী-মহাশয় যাহাকে এতদিন ঘৃণাই করিয়াছেন, এই কঠিন পারাপারের ব্যাপারে তাহাকেই কাণ্ডারী মানিতে হইল। প্রকৃতির কি বিচিত্র বিধান। সকলে পরপারে একত্র হইলে আমরা পূর্ব্বমুখে দ্রুতগতি পা চালাইলাম। আকাশে ঘন মেঘ ক্রমশই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে,—কতক্ষণে নামে তাহার ঠিক নাই।

বোধ হয় দুই মাইল আন্দাজ চলিয়াছি এমন সময় চটপট শব্দে পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল। পরে দেখিলাম যাহা পড়িতে লাগিল তাহা ঠিক জল নয়—তুষার। পূর্ব্বে আমি তুষার দেখি নাই, এই প্রথম দেখিলাম। আমরা ঘাড় গুঁজিয়া ছুটিতে লাগিলাম। সঙ্গী-মহাশয়ের ছাতা ছিল। তুষার-বৃষ্টির সঙ্গে প্রবল ঝড়—তাহার এতটা বেগ যেন টানিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। কি শীতল বাতাস! যে যে-দিকে পাইল দৌড়াইতে লাগিল। শুনিলাম মঠ আর বেশী দূর নয়। এইরূপে ছুটিতে ছুটিতে প্রায় এক পোয়া পথ অতিক্রম করিয়া সম্মুখে মঠের লাল পতাকা দেখিতে পাইলাম। জমির উপর তখন প্রায় তিন-চার ইঞ্চি তুষার জমিয়া সাদা হইয়াছে। সকলেরই গা মাথা সাদা। চারিদিকেই নিরবচ্ছিন্ন ধবলতা। আমরা রুদ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে মঠের বড় দরজায় আসিয়া দেখিলাম দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। ঘুরিয়া ফিরিয়া অপর দিকের আর একটি দ্বারের অর্দ্ধাংশ খোলা দেখিতে পাইলাম এবং সকলে মিলিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম।

আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম, আর প্রকৃতিও শান্ত হইয়া গেল। তুষারে কাপড়-জামা বেশী ভিজে নাই, উপরের জামাটি খুলিয়া ঝাড়িতেই সব তুষার ঝরিয়া গেল। এখানে দুইজন লামাকে সিঁড়ির নীচে দেখিলাম। কিছু জিজ্ঞাসা করিবার আগেই তাঁহাদের একজন উপর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন এবং সেই সিঁড়ি দিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। আমরা সদলে উপরে উঠিয়া একটি বড় ঘরে প্রবেশ করিলাম। সেখানে দুই চারিজন যাত্রী চুপচাপ বসিয়া আছে। দ্বারের নিকট এক কোণে আমরা তিনজন স্থান করিয়া কম্বল বিছাইয়া বসিলাম। সঙ্গের স্ত্রীলোকেরা সেই ঘরের অপর দিকে তাহাদের স্থান করিয়া লইল। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই অত বড় ঘরখানি বেশ গরম হইয়া উঠিল।

এখানে দুই জন বঙ্গবাসীর দেখা পাইয়াছিলাম;—পূর্ব্ববঙ্গের লোক তাঁহারা। ঠিক পাশের ঘরেই ছিলেন। কেবল দেখা এবং অল্প দুই-চারিটি কথায় পরিচয় হইল মাত্র। তারপর আর তাঁহাদের দেখা পাই নাই।

প্রদক্ষিণের পথে এই তৃতীয় গোম্পা বা মঠের নাম দীরিপু। অন্যান্য মঠে যাহা আছে এখানেও সেই সকল বস্তুই আছে। সেই বিশাল পদ্মের উপর স্বস্তিকাসনে বুদ্ধ-মূর্ত্তি, সেইরূপ পুস্তকাগার, সেইরূপ ধ্যান-ধারণার আসন-সমূহ-ভরা, পটে চিত্রিত অন্যান্য দেবমূর্ত্তির সহিত মহাকাল ও অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি। স্তরে স্তরে দীপাধার, বৃহৎ পাত্রে মাখন স্তূপাকারে সাজানো; দেওয়ালে বৌদ্ধ পৌরাণিক চিত্রাদি, বহুল পাষাণ ও ধাতব মূর্ত্তি সুসংযতভাবে রক্ষিত হইয়া মন্দিরের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে।

এখানেও রুমা, নিজের অসুস্থ শরীর লইয়া আমাদের প্রতি যত্নের ত্রুটি করে নাই। আমরা নিজ নিজ স্থানে বেশ আরামে বসিয়া আছি দেখিয়া সে আসিয়া বলিল যে,—আমি আপনাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করিয়া আনি, আপনারা এখন এখানেই থাকুন, কোথাও যাইবেন না। এই মঠের রন্ধন-শালা হইতে সে আমাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করিয়া আনিল। এখানে, পরিক্রমার যাত্রিগণ যাহারা রাত্রিবাস করে, তাহারা অনেকেই মঠের পাক-শালা হইতে কিছু কিছু খাদ্য পাক করিয়া লয়। পাকশালায় গিয়া দেখিলাম প্রকাণ্ড একটি মাটির চুলা আট-দশ ফুট লম্বা, চার-পাচ ফুট চওড়া, অর্দ্ধ গোলাকার, উপরে মাটির প্রলেপ দেওয়া, স্থানে স্থানে পাত্র বসাইবার ছিদ্র আছে, ভিতরে অগ্নি জ্বলিতেছে। একসঙ্গে আট-দশটি খাদ্যদ্রব্য পাক হইয়া যায়। যেন একটি লাঙ্কাশায়ার-বয়লারের মৃন্ময় সংস্করণ।

আহারাদি সারিয়া আমরা মন্দিরে সন্ধ্যারতি দেখিতে গেলাম। বহুল পরিমাণে ধূপের গন্ধে সেই প্রধান মন্দিরগৃহ আমোদিত। দীপ সকল জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে। অগ্রে এই মঠের পূজারী লামা আসিয়া প্রণাম করিলেন, সেই সঙ্গে প্রধান লামার সহিত শ্রেণীবদ্ধ অপর লামাগণ আসিয়া প্রণাম করিলেন, এবং সারি সারি আসনে উপবিষ্ট হইয়া কিছুক্ষণ মন্ত্র পাঠের পর ধ্যান, শেষে আরও কিছু আবৃত্তির পরে যে যার স্থানে চলিয়া গেলেন। ইহাই এখানকার সন্ধ্যারতি।

আমরা প্রায় দুই শত তীর্থযাত্রী দীরিপু মঠে রাত্রি যাপন করিয়া রাত্রি তৃতীয় প্রহরের শেষে যাত্রা করিলাম। এবারে কুম্ভের বৎসর বলিয়া ভীড়

কিছু বেশী হইয়াছে, নচেৎ সারা বৎসরে এখানে লোকসমাগম অতি অল্পই হইয়া থাকে। আমাদের ভারতে নাসিক, হরিদ্বার, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থে যেমন দ্বাদশ বৎসরে একবার কুম্ভযোগ আসে, এখানেও সেইরূপ কুম্ভযোগ আছে। এটি কুম্ভের বৎসর, বহুতম ভারতীয় তীর্থযাত্রী সাধুসন্ন্যাসী নানা পথে এখানে আসিবার কথা। শুনিলাম এখন প্রত্যহই এ মঠে এইরূপ লোকসমাগম হইতেছে, পূর্ণিমা হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত চলিবে।

শেষ রাত্রে চন্দ্রালোক থাকা সত্ত্বেও চারিদিক কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন, দৃষ্টি বড় চলিতেছিল না। দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ পুঁটলি-পোঁটলা হাতে কম্বল পিঠে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে চলিতেছিল। আমরা দোলমা পাস অতিক্রম করিতেছি। গিরিসঙ্কটের পথে খাড়া চড়াই নয়। লিপুলাক্ পাশের মতই ক্রমোচ্চ বিশৃঙ্খল প্রস্তররাশির উপর দিয়া পথ।

জ্বর ও শিরঃপীড়ায় রুমাকে এখন অত্যন্ত কাতর করিয়াছে, তাহাতে পথে শ্বাসের কষ্ট বড়ই লাগিয়াছিল। সঙ্গী মহাশয়েরও শরীর বড়ই খারাপ হইয়া গেল, শ্বাসকষ্ট অত্যন্ত বেশী হওয়ায় তাঁহাকে বার বার বিশ্রামের জন্য বসিতে হইতেছিল। এইরূপে প্রায় মাইল দুই চলিবার পর প্রভাত হইল।

অল্পাধিক শ্বাসকষ্ট সকলকারই ছিল। লিপুলাক্ পাস ছিল ষোলো হাজার কয় শত, আর এই দোলমায় আমরা প্রায় সাড়ে-আঠারো হাজার ফুটের উপর উঠিতেছি। ধীরে ধীরে চলিতেছি বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে বুকে টান ধরিতেছে ও গলা শুকাইতেছে। কঠিন-পার্ব্বত্য-পথে শুষ্ক কণ্ঠ সরস করিবার জন্য মিছরি, মরিচ, পুরাতন তেঁতুল, কাসুন্দি প্রভৃতি যে সকল ঔষধ সঙ্গে ছিল তাহার ব্যবহারেও কিছুমাত্র স্বস্তি নাই, উপশমও নাই। নাথজী স্থিরপ্রকৃতি, তিতীক্ষাপরায়ণ এবং ত্যাগী, তাঁহার মুখে ক্লেশের চিহ্ন নাই। ঠিক তাহার পশ্চাতেই রুমা যে অত কষ্ট পাইতেছে, কাহারও সাহায্য করিবার শক্তি নাই। সকলেই আপন আপন তাল সামলাইতে ব্যস্ত, কে কাহাকে সাহায্য করিবে, এস্থানে সকলেই দুর্ব্বল ও অসহায়। কিন্তু প্রকৃতি জননীর এ সৃষ্টিতে কোথাও কোন বস্তুর অভাব নিরন্তর থাকে না—এমনই অদ্ভুত রচনা-কৌশল।

দুইজন রক্তবস্ত্রধারী, লাসানিবাসী লামাযাত্রী, উচ্চৈঃস্বরে বুদ্ধের স্তুতি-গান করিতে করিতে আমাদের পশ্চাতে আসিতেছিলেন ; উভয়ে দীর্ঘকায়

এবং শক্তিমান্ যুবক। এখন আমরা যেখানে একটু বিশ্রামলাভের জন্য বসিলাম তাঁহারাও সেইখানেই আসিয়া বসিলেন।

রুমার ভগ্নী রুমতি,—সঙ্গী-মহাশয়ের সেই দেখন-হাসি, সেও রুমার কাছেই ছিল এবং সঙ্গী-মহাশয়ের অবস্থাও দেখিতেছিল। এখন সে করিল কি,—বিপন্ন এই দুইজনের কথা তিব্বতী ভাষায় ঐ লামা যাত্রীদ্বয়ের গোচর করিল এবং যাহাতে তাঁহারা ইহাদের সাহায্য করেন সেজন্য অনুরোধ করিল। রুমতির কথা শুনিয়া তাঁহারা মহা উৎসাহে,—আনন্দিতচিত্তে গান করিতে করিতে তাঁহাদের বিশাল বাহু দ্বারা আকর্ষণপূর্ব্বক অনায়াসেই উভয়কে লইয়া চলিলেন এবং অল্পক্ষণেই শিখর-দেশে ছাড়িয়া দিলেন। এই ব্যাপারটি সঙ্গী-মহাশয়, ফিরিবার পথে পরিচিত সকলের নিকট এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন যে, কৈলাসপতি প্রসন্ন হইয়া দুইজন স্বর্গের দূত পাঠাইলেন, তাঁহারা তাঁহাকে ঐ কঠিন স্থানটি সহজেই পার করিয়া দিলেন।

এইভাবে চলিতে চলিতে যখনই বিশ্রামের জন্য কোথাও বসিতেছিলাম, তখনই একবার প্রাকৃতিক দৃশ্যটি উপভোগ করিয়া শরীরের ক্লান্তি ভুলিতেছিলাম।

একস্থানে স্তূপাকার কেশ পড়িয়া আছে। এখানেও দেখি তারকেশ্বরের মত কেশ-নখাদি মানসিকের ব্যাপার আছে। অনেক যাত্রী এখানে মস্তক মুণ্ডন করিয়া যায়, কোনপ্রকার দান-দক্ষিণার ব্যাপার নাই। তারকেশ্বরে মহান্তজীর কারবারের সঙ্গে এখানকার কিছুই ব্যবসায়গত মিল নাই। মাথা মুড়ানোর জন্য গদিতে কিছু জমা দিবার রীতি তো নাইই, পরন্তু ঐ প্রকার যাত্রীর নিকট হইতে শুল্ক লইবার ব্যাপার এখানে অজ্ঞাত, শ্রদ্ধা করিয়া কেহ কিছু যদি কোন মঠে দান করিল তো সে স্বতন্ত্র কথা।

দিবা প্রায় একপ্রহরের শেষেই আমরা দোলামা শিখরে উঠিয়াছিলাম,—এখন বিশ্রাম ও জলযোগ করিতে করিতে পথের কথা লইয়াই সকলে আলাপ করিতে ব্যস্ত হইল। সেখানে সম্মুখেই শুভ্র কৈলাসশৃঙ্গের দৃশ্য যতটা দেখা যায় আমরা উহা উপভোগ এবং তাহাতেই পথের ক্লেশ ভুলিতেছিলাম। স্থানটি ১৮,৬০০ ফুট উচ্চ, আমাদের যাত্রাপথের মধ্যে এই স্থানই সর্ব্বোচ্চ। কৈলাসশৃঙ্গের পাদমূলে প্রকাণ্ড একটি হ্রদ, বারোমাস বরফে ঢাকা, ইহাই গৌরীকুণ্ড আর দুনিয়াদের দোলমা। ইহার পূর্ব্ব তীর দিয়াই পথ। হ্রদের ওপারেই চিরতুষারমণ্ডিত কৈলাসনাথের চরণ;—এখান

নিয়ান্দি হইতে কৈলাস

হইতে শিখরের কিয়দংশ দেখা যায়। এই কৈলাসতলে গৌরীকুণ্ডের যে শোভা, তাহা অপূর্ব্ব, বাক্য স্তব্ধ—কেবল বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। প্রায় এক ঘণ্টা বিশ্রামের পর আমরা সদলবলে নামিতে আরম্ভ করিলাম।

এইপথে দক্ষিণমুখে প্রায় পাঁচ মাইল নামিয়া পরে আমরা পশ্চিমদিকে ঘুরিলাম। আরও মাইল চার চলিয়া নদীতীরে বিস্তীর্ণ কতকটা কৃষিক্ষেত্র, জণ্ডিপো নামক চতুর্থ মঠটি এইখানেই। আমাদের দলের অপর কেহ গোম্পার মধ্যে যায় নাই, কেবল আমি আর রুমার ভগিনী রুমতী দুজনে গিয়াছিলাম। বিশেষ কিছু যাহা দেখিলাম, কতকগুলি রেশমের উপর বোনা প্রাচীন চীনদেশীয় ধর্ম্মচিত্র, তাহার মধ্যে রাজা অশোকের একখানি ছবি আছে যাহা উল্লেখযোগ্য; শ্রমণবেশে মহারাজ বসিয়া আছেন, সে শ্রমণবেশও অপূর্ব্ব আলঙ্কারিক শিল্পে সমৃদ্ধ।

সাধারণতঃ বৌদ্ধশ্রমণদিগের বেশভূষা পীতবর্ণের এবং কোনপ্রকার কারুকার্য্যশূন্য আপাদস্কন্ধ-লম্বিত, ঝল্‌ঝলে পোষাক। তিব্বতে লামাদের দেখিয়াছি সর্ব্বত্রই লালবর্ণ পোষাক, শ্রমণবেশে দেবানামপিয় অশোকের যে চিত্রখানি উহা লালও নহে পীতও নয়,—উহা নানাপ্রকার কারুকার্য্য-খচিত রাজ-পরিচ্ছদ। ছবিখানির সর্ব্বাংশেই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাজ। আর একখানি মৈত্রেয় বুদ্ধের ছবি ঠিক তাহার সম্মুখেই রক্ষিত আছে। সেখানিও মোটা রেশমের উপর বিচিত্রবর্ণে বয়ন করা। বড় সুন্দর চীনের এই প্রাচীন শিল্পকীর্ত্তিগুলি।

ধাতু ও পাষাণমূর্ত্তি অনেকগুলি রহিয়াছে। তাহার মধ্যে তারা, অবলোকিতেশ্বর ও মহাকালের মূর্ত্তিই উল্লেখযোগ্য। গোম্পায় সকল ব্যাপারই একরূপ। চক্ষে আর কিছুই বিশেষ নূতন বলিয়া লাগে না।

এখন নদীতীরে একস্থানে বসিয়া একটু বিশ্রামের পর নিরালায় আমরা সবাই ভোজন-ব্যাপার সম্পন্ন করিলাম। মধ্যাহ্নভোজন হইল ভাল,—নদীর শীতল জলের সঙ্গে ছাতু এবং চিনি মিলাইয়া গলাধঃকরণ।

রুমা বড়ই কাতর হইয়া এইখানে উত্থানশক্তিরহিত হইয়া পড়িল। সে দু'চার পা যাইতে না যাইতে দুর্ব্বলতাবশত শুইয়া পড়িতে লাগিল। স্নেহময়ী ভগিনী তাহার, কাছে বসিয়া তাহাদের ভাষায়, চল চল, উঠ উঠ, ইত্যাদি বলে,—আবার সে উঠিয়া কতকটা চলিতে থাকে। এইরূপে কিছুটা আসিতে এক স্থানে দেখা গেল পৃষ্ঠে বেণী বিলম্বিত, প্রকাণ্ড উচ্চ

পিধারী হনুমন্ত তিব্বতী মহাপুরুষ কটিতে তরবারি গুঁজিয়া, ঘোড়ার মুখ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন;—তিনিও তারচেন যাইবেন। ভাগ্যক্রমে রুমার জন্য এই হুনিয়ার ঘোড়াটা ভাড়া পাওয়া গেল, ভাড়া একটি ভারতীয় টাকা। দেখিলাম ধন উপার্জ্জনের কোন সুযোগই ইহারা ছাড়িতে প্রস্তুত নয়। রুমার একটা ব্যবস্থা হইল; অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া এবার আমরা চলিতে লাগিলাম।

এ-বৎসর লাসা হইতে অনেক যাত্রী আসিয়াছে,—কুম্ভের বৎসর বলিয়া আমাদের সঙ্গে লাসার দুই-চারিজন নরনারী যাত্রী, তাহাদের মধ্যে একটি লাবণ্যময়ী নবীনা ছিলেন। এমন সুশ্রী এবং সুন্দর মূর্ত্তি এখানে আসিয়া অবধি চক্ষে পড়ে নাই। তাঁহার মাথায় ছাতা, পায়ে তিব্বতী বুট, গায়ে পশমের ঘোর সবুজ রঙের আলখাল্লা, মাথায় সিকিমীদের মত টুপি, কানে রত্নকুণ্ডল দুলিতেছে। এখানে আসিয়া অবধি কুৎসিত নারীমূর্ত্তি দেখিয়া আমার ধারণা বিগড়াইয়াছিল, এখন একটি সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া চক্ষু জুড়াইল, আনন্দনও হইল; ভাষা ত বুঝি না, তবে অনুমানে বুঝিলাম ইনি সিকিম অথবা তিব্বতে পূর্ব্বাঞ্চলের অধিবাসিনী হইবেন। সঙ্গে তাঁহার একটি লম্বা বাক্স,—তাহার মধ্যে কিছু মূল্যবান বস্তুবিশেষ ছিল। রুমার ভগ্নী বলিল যে অলঙ্কারের জন্য প্রবাল, নানাপ্রকার মূল্যবান প্রস্তরের কারবার করে, অর্থাৎ ইহারা রত্নব্যবসায়ী।

সুন্দরী যাত্রী

চমৎকার ব্যাপার! শুধুই তীর্থ করিতে যাওয়া নয়, যার যেটি ব্যবসায় বা ব্যাপার, তাহা সঙ্গে লইয়া ইহারা সর্ব্বত্রই যাতায়াত করে। এমন কি তীর্থেও ইহারা নিজ নিজ ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া আসে না।

তারচেন পৌঁছিবার পূর্ব্বে কৈলাসের পাদপ্রান্তে এক গহ্বর হইতে

সকলেই এখানকার মৃত্তিকা সংগ্রহ করিতে লাগিল;—ইহা সর্ব্বসন্তাপহর এবং অশেষ কল্যাণপ্রদ। সেখান হইতে নীলাভ মানসসরোবরের কতক অংশ দেখা যাইতে লাগিল।

আমরা পশ্চিমমুখেই আসিতেছিলাম, বেলা প্রায় অপরাহ্ন—সন্ধ্যার ছায়া নামিতেছে, আমরা তারচেন পৌছিলাম। কি ভয়ানক প্রবল বাতাস চলিতেছিল! তাহার বেগ মনে হইলে এখনও হৃৎকম্প হয়। উহা এত শীতল যে, বুকের মধ্যেও কন্‌কন্ করিতে লাগিল। তাঁবু খাটানো হইবামাত্র শয্যা গ্রহণ করিলাম। কৈলাস পরিক্রমণ সম্পূর্ণ হইল ভাবিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। সেই শয়নের সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল জ্বর।

পরদিন বেলা যতই বাড়িতে লাগিল জ্বরও ততই বাড়িতে লাগিল;—চক্ষু চাহিতে মাথায় বিষম বেদনা। প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অচৈতন্য ছিলাম। জাগিয়া দেখিলাম রূমা ও নাথজী দুজনে আমার অতি নিকটেই বসিয়া। রূমা আজ ভাল আছে বটে, কিন্তু আমার প্রবল জ্বর দেখিয়া তাহার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। নাথজী জিজ্ঞাসা করিলেন, ক্যা তকলীফ হৈ? আমি মাথা দেখাইয়া দিলাম। রূমা তখন আমার কপালে হাত বুলাইতে লাগিল। সঙ্গীমহাশয় তখন, জানি না কোথা হইতে বেড়াইয়া আসিলেন;—জুতা খুলিতে খুলিতে বলিলেন, বুঝলে হ্যা, ও কিছু কিসমিস্ ও খানিকটা গরম দুধ খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

জ্বরে আমায় ততটা কাতর করে নাই যতটা কাতর করিয়াছিল এই ভাবনায় যে, আমি কি শেষে ইহাদের যাত্রার প্রতিবন্ধক এবং অশান্তির কারণ হইলাম! পরদিন আমাদের যে মানসসরোবরের নিকট উষ্ণ প্রস্রবণের দিকে যাইবার কথা! বেশী ভাবিতে পারিলাম না,—মস্তিষ্ক যেন তমসাচ্ছন্ন হইয়া ক্রমে আবার সংজ্ঞা রহিত করিয়া দিল।

প্রবল জ্বরের অবস্থায় নানা প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে, আমার বোধ হইতে লাগিল—অস্তিত্ব স্বরূপ আমি এই অনুভব, যেন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া একেবারে কোথায়, কোন্ ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া গেলাম; আবার কতক্ষণে জানিনা চৈতন্যের মধ্যে ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিলাম—সঙ্গে আসিল কতকগুলি শব্দ,—তাহা এই যে,—সূর্য্য দর্শন করিলেই আরাম হইব। অন্তরের এই অভাস পাইবামাত্র আমার মধ্যে বেশ একটু শক্তির সঞ্চার হইল, সঙ্গে সঙ্গে এতটা অসুখ যেন অর্দ্ধেক

হইয়া গেল, তখন কিন্তু উঠিবার ক্ষমতা নাই, মনে বল আসিয়াছে মাত্র। বাহিরে যাইয়া সূর্য্য দর্শন করিবার ক্ষমতা আমার হইবে না, তবে কি হইবে! আমি ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিলাম।

সূর্য্য দেখিতেই হইবে, দেখিলাম উপরের দিকে তাঁবুর কাপড়ে একটা ছোট ছিদ্র আছে;—দ্বিপ্রহরের তীক্ষ্ণ সূর্য্যরশ্মি সেই ছিদ্রপথে আসিয়া চক্রাকারে আমার বুকের উপর পড়িয়াছে;—দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। নাথজীকে বলিলাম, আর কোন চিন্তা নাই, সূর্য্য দর্শন করিলেই নিশ্চিত
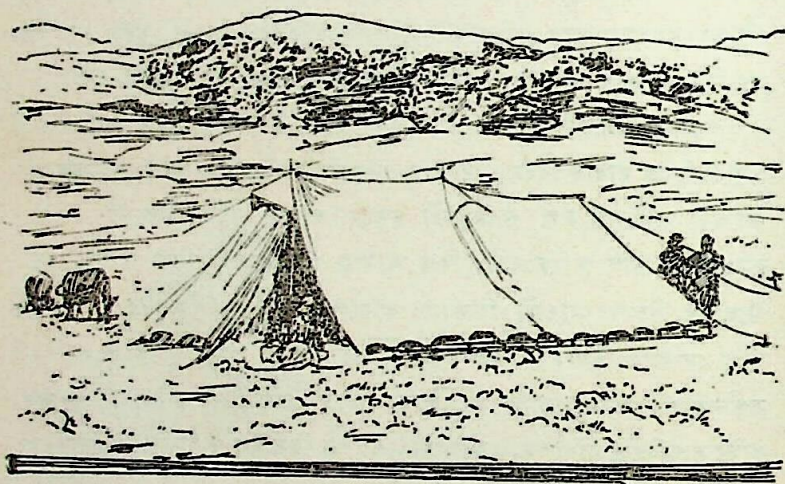
আমাদের তাঁবু

আরাম হইয়া যাইব। সেই ছিদ্রের দিকে সোজাসুজি এখন আমাকে একটু নামাইয়া দিতে পারিবে কি? নাথজী তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলেন। তখন অনেকক্ষণ ধরিয়া পলকহীননেত্রে চাহিয়া রহিলাম; আনন্দে আমার বুক গুরুগুরু করিতে লাগিল, সেই বিষম জ্বরের মধ্যে একটি অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আস্বাদ পাইলাম। উহা কোথা হইতে কি কারণে আসিতেছে তাহা বুঝিলাম না—বুঝিবার শক্তিও ছিল না। ক্রমে অনেকক্ষণ পর আবার আচ্ছন্ন বোধ করিলাম, নিদ্রার মত কেমন একটা নিস্তব্ধ ভাব আসিয়া অচেতন করিয়া দিল।

বড় আনন্দে অনেকক্ষণ পর জাগিয়া দেখিলাম, নাথজী নাই, সঙ্গী-মহাশয় বসিয়া আছেন, রুমার সহিত কথা কহিতেছেন। সে সেইখানে সেইরূপই বসিয়া আছে।

পণ্ডিতজীর সেই বাঁধা বুলি.—থোড়া গরম দুধ ঔর কিস্‌মিস্ মিলায়কে পিনেশে পেট্‌কা গোলমাল সব নিকাল যায়েগা, ঔর আচ্ছা হো যায়েগা।

জাগিয়াছি দেখিয়া আমায় বলিলেন, এখন কেমন মনে হচ্ছে।

আমায় একটু সরিয়ে দিতে পারেন?

ততক্ষণে সূর্য্যদেব অনেকটা সরিয়া গিয়াছিলেন। সেই ছিদ্রপথে আমার চক্ষুটি রাখিবার জন্য স্বস্থান হইতে উঠিয়া তিনি হাত লাগাইয়া সাহায্য করিলেন।

আবার আমি অনেকক্ষণ দেখিতে লাগিলাম, তাহার পর উহা মেঘে ঢাকিয়া গেল আর দেখা গেল না। তখন সঙ্গী-মহাশয় আরম্ভ করিলেন,—বুঝলে হ্যা, নাথজী যোগের কিছুই জানে না।

—কি করে বুঝলেন?

এই দেখ না, তার বসবার, শোবার প্রণালী দেখেই তো বুঝতে পারা যায় যে সে যোগশাস্ত্রের কিছু জানে না। যে-ব্যক্তি যোগী, যোগসাধন করেছে, তাদের শোওয়া-বসা দেখলেই বুঝতে পারা যায়। কি রকম করে শোয়,—দেখ না?

আমি বলিলাম, অসুস্থ অবস্থায় শরীর বিকল হলে তখন শরীর বশে থাকে না; স্বভাবতঃ প্রাণের গতি চঞ্চল হয়ে যায়,—তাইতেই এইরূপ শোওয়া-বসার ব্যতিক্রম ঘটে। তাহা ছাড়া নাথজী ত প্রথমেই বলেছিলেন,—অনেকদিন ওসব যৌগিক ক্রিয়াকর্ম্ম ছেড়েই দিয়েছেন। পর্য্যটন করে তীর্থে তীর্থে বেড়ালে কি যোগসাধন হয়?

এখন নাথজীকে আসিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন,—লাদাকের রাজা এসেছে, আমি তার কাছে গিয়েছিলাম, আমায় খুব খাতির করেছে, আর এই খোবানী খেজুর প্রভৃতি দিয়েছে। তার সঙ্গে অনেক কথাই হল, সে বেশ লোক। যাক,—দেখ, তুমি শাক ভালবাস, তোমার জন্য শাক আনিয়েছিলাম তা কতকমত আমরা খেয়েছি আর তোমার জন্য অর্দ্ধেক রেখে দিয়েছি, কাল তুমি খাবে। কাল আমরা সকালেই এখান থেকে খাওয়াদাওয়া করে যাত্রা করব। তোমার জন্য একটা ঝাব্বুর চেষ্টায় আছি, তাকে এখানে পাওয়া দুষ্কর। শুনিয়া আমি বলিলাম,—আপনার কোন চিন্তা নেই, কাল নিশ্চয়ই যেতে পারব এবং হেঁটেই যাব, কাল আমি আরাম হয়ে যাব।

রূমা বলিল—নহি, হামারা ঝাব্বু, হৈ—মেরা বহিনকী ভি হৈ, আপ উসিমে যাওগে। ইহ্া না মিলে তো কঠা হৈ, ভগবান করে আপ আচ্ছা হো যাও তো কালকী বাস্তে কুছ চিন্তা নহি। পয়দল চল্‌নে নেহি দেউঙ্গী, পিতাজী!

আমি বলিলাম,—কাল দেখা যায়েগা।

কেবল ঐ যে চিন্তা, শীঘ্রই আরাম হইব, কাল হাঁটিয়া যাইব, কাহারও কোন অসুবিধার কারণ হইব না;—অন্তরের মধ্যে একটা ভয়ানক স্নায়বিক উত্তেজনা আনিয়া উপস্থিত করিল—শরীর তাহা সহ্য করিতে পারিল না। মেরুদণ্ডের মধ্যে ভয়ানক কাঁপিতে লাগিল এবং বুক ও পেটের মধ্যে একটা বায়ু—যেন সর্ব্বশরীর দলিতে লাগিল, তার সঙ্গে আবার ভয়ানক শীত, তাহার পর গুটিশুটি মারিয়া মুড়ি দিয়া শোওয়া—প্রবল জ্বর আসিয়া কিছুক্ষণ কাঁপাইয়া আবার সংজ্ঞা রহিত করিল। ম্যালেরিয়ার মতই কাঁপুনিটা।

এইভাবে সমস্ত দিন কাটিল—আবার যখন রাত্রে জাগিলাম, তাঁবুটি একেবারেই নিস্তব্ধ, একদিকে আগুন জ্বলিতেছে, তাহাতে কতকটা স্থান আলোকিত হইয়াছে। নাথজী ওদিকে বামপার্শ্বে সঙ্গী-মহাশয়ের সঙ্গে বসিয়া আছেন আর শয্যার দক্ষিণপার্শ্বে একজন লামা বসিয়া, কোঁচ-নয়নে আমার মুখের উপর তীব্রদৃষ্টির খোঁচা মারিতেছেন। লামা-মূর্ত্তি দেখিয়াই আমি চমকিত হইলাম,—এখানে লামা কেন? জাগ্রত দেখিয়া তিনি তাঁহার দক্ষিণ হস্তটি বাহির করিলেন এবং তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা আমার সমস্ত কপাল এমন জোরে রগড়াইতে লাগিলেন যে, সেই ঘর্ষণে ছাল উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইল। যন্ত্রণায় আমার মুখে উঃ আঃ—এইরূপ একটা শব্দ বাহির হইল, চক্ষু চাহিতে পারিলাম না।

রূমা ও তাহার ভগ্নী নিঃশব্দে শিয়রে বসিয়াছিল, জানিতে পারি নাই। ব্যগ্রভাবে রূমা তখন বলিল, পিতাজী, অব কুছ মৎ করো, সব আরাম হো জায়গা। অব চুপচাপ শোতে রহিয়ে,—লামা ফুঁক দেগা। তখন ব্যাপার বুঝিয়া চুপ করিয়াই রহিলাম।

এইবার লামা ফুঁকিতে আরম্ভ করিলেন। সে ফুঁকের কথা আর কি বলিব! কপালে সেই কঠোর অঙ্গুলি পীড়নের সঙ্গে সঙ্গে লামা-মহাশয় জড়িত কণ্ঠে অস্পষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন;—আর এক-একবার মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বশরীরে ফুৎকার দিতে লাগিলেন। লামাজীর

উপর-পাটির সম্মুখের দুইটি দাঁত ভাঙা ছিল। আরোগ্যকামনায় তাঁহার সেই কল্যাণপ্রদ, সর্ব্বতাপহর ফুৎকারের চোটে রোগের কিছু উপশম হোক না হোক আপাতত তাঁর থুৎকারের ঝাপ্‌টায় আমার মুখমণ্ডল ভরিয়া গেল। একে ত রোগের যন্ত্রণা, তাহার উপর আবার এইরূপ নিতান্তই দুঃসহ এক ব্যাপারে জালাতন হইয়া আমি অন্যদিকে মুখ ফিরাইলাম। রুমা অমনি, নহী নহী পিতাজী, ঐসা মৎ করো,—ফুঁক লেও, জল্‌দী আরাম হো যায়গা, বো আচ্ছা গুণ লামা হৈ,—বলিয়া আমার মাথাটি জোর করিয়া আবার ফিরাইয়া দিল। তখন লামা আবার মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যৎপরোনাস্তি ফুঁকিতে লাগিলেন—আর আমি স্নেহের দায়ে সকাতরে,—লামাজীর সেই দুঃসহ ফুঁগুলি হজম করিতে লাগিলাম। প্রায় আধঘণ্টা পরে লামা-মহাশয় আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন,—আমিও পাশ ফিরিয়া বাঁচিলাম। তখন রুমা ও তাহার ভগ্নী দুজনেই, অব থোড়া আরাম মালুম হোতা হৈ কি নহী, শিরকা দরদ কম্‌তী হুয়া কি নহী, তাপ কম্‌তী হুয়া কি নহী ইত্যাদি প্রশ্নে আমায় অস্থির করিয়া তুলিল। তাহাদের প্রশ্নধারা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বলিলাম, থোড়া আচ্ছা হৈ। রুমতী বলিল, সব আচ্ছা হো জায়গা, বহুত আচ্ছা লামা হৈ।

গভীর রাত্রে প্রবল ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িয়া গেল;—পরদিন প্রাতে ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলাম। ভগবৎকৃপা ভাবিয়া প্রাণের মধ্যে যে আনন্দ হইল তাহা বলিবার ভাষা নাই। রুমা ও তাহার ভগ্নীর স্নেহ, তাহাদের উদ্বেগ-ব্যাকুলতা, লামা ডাকিয়া আনা, গত রাত্রের সকল কথাই মনে মনে তোলপাড় করিতেছিলাম যে, ভগবান আমাকে এখানে কাহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য, আজই আমরা উষ্ণ প্রস্রবণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। ঝাব্বু পাওয়া গেল না, রুমার ভগ্নী তাহার পশুটি ছাড়িয়া দিল, আমায় হাঁটিয়া যাইতে দিল না। একটু শাকের ঝোল খাইয়া ঝাব্বুতে উঠিলাম। ভাবিতেছিলাম, এই ঝাড়-ফুঁকের ব্যাপারটি আমাদের বাঙ্গলা দেশের মতই। সেখানে গ্রামে গ্রামে, এমন কি কলিকাতা সহরের মধ্যেও বহুস্থানে এ ব্যাপার আজও চলিতেছে। প্রভেদটা কেবল এখানে যাহা লামারা করেন, দেশে সেটা গুণিনের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। তন্ত্রমন্ত্রের কারবার এখানে গৃহীর মধ্যেও যত, সাধু-সন্ন্যাসীর মধ্যেও ততই।

॥ ১৫ ॥

উষ্ণপ্রস্রবণ, মানসসরোবর—

তিব্বতের শেষ কথা

দের উপরেই বাহির হইয়াছিলাম। চারিটি মাইল ঝাব্বুর পিঠে চলিয়া দ্বিপ্রহরে যখন বর্‌খার প্রান্তরে উপস্থিত হইলাম, বিশ্রামার্থে একস্থানে সকলে বসিল, আমিও জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে বাহন হইতে ঘাড় গুঁজিয়া পড়িয়া গেলাম। প্রখর রৌদ্রে যাত্রার প্রারম্ভেই আবার জ্বর আসিয়াছিল, সেটা পথে আর কাহাকেও বলি নাই। সেইদিন সেইখানেই থাকা হইল। তাহার কারণ, আমার জ্বর নহে,—যে মরুব্বির সঙ্গে আমরা পুরাং হইতে আসিয়াছি সেই মানসিংএর বিশেষ প্রয়োজন,—তিনি দুইটি চমরী খরিদ করিবেন। তার এতটা বিশেষ দরকার যখন, তখন তাঁবু সেইখানেই গাড়িতে হইল। জ্বরের ধমকে ঝাব্বুর উপর থাকিতে পারিতেছিলাম না, এবারে পুঁটুলিটির উপর মাথা রাখিয়া আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া বাঁচিলাম।

লামা যখন ঝাড়িয়া-ফুঁকিয়া গিয়াছে তখন আমি নিশ্চয়ই আরোগ্যলাভ করিয়াছি এই ভাবিয়া রুমা বেশ নিশ্চিন্তমনে হাঁটিয়া আসিতেছিল, এখন এখানে আবার জ্বরে বিপন্ন দেখিয়া তাহার মুখ শুখাইয়া গেল; সে সঙ্গী-মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল, ক্যা হোগা, পণ্ডিতজী? সঙ্গী-মহাশয়ের এক বাঁধা ঔষধ, দুধ আউর কিস্‌মিস্, ঔর অদরককা রস, থোড়া মিসরিকা সাথ গরম করকে পিলানা। ঠিক যেন হাঁসপাতালের ডাক্তারবাবু, আউটডোর রোগী একজনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন; এইটুকুই যেন তাঁর সময়। কিন্তু এই বিজন প্রবাস-প্রান্তরে দুধ কোথায় পাওয়া যাইবে, এটা ত কোন গ্রাম নয়। রুমার ভগ্নী রুমতী বলিল, প্রায় মাইলখানেক দূরে একটা পশুপালকের আড্ডা আছে, সেইখানে পাওয়া যাইতে পারে।

আমি এখনই যাইতেছি—বলিয়া রুমা তাহার ভগ্নীর উপর আমার

শুশ্রূষার ভার দিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল এবং প্রায় একঘণ্টা পরে এক পাত্র দুধ লইয়া আসিল। তাহার এতটা যে শিরঃপীড়া, অসুস্থ শরীর, এখন সে সকলের কোন লক্ষণই আর দেখা গেল না। আশ্চর্য্য এই নারীপ্রকৃতি!

সে রাত্রি একপ্রকারে কাটিল। পরদিন প্রাতে জ্বর ছিল না, মানসিংএরও চমরী কেনা হইয়াছে, আমরা যাত্রা করিলাম। সারাদিনের পর বৈকালে প্রায় পনেরো মাইল আসিয়া এবার মানসসরোবরের নিকটে উষ্ণ প্রস্রবণ পাইলাম যাহার নাম মে-চু তাগাং। এখানে একটি কুণ্ড আছে। ভূগর্ভ হইতে অবিরাম গন্ধক-মিশ্রিত অত্যুষ্ণ জল উঠিয়া কুণ্ড পূর্ণ হইতেছে এবং বেশী জলটুকু তাহারই পার্শ্বে অপর একটি কুণ্ডে গিয়া পড়িতেছে, আবার তথা হইতে ধারা হইয়া বাহিরের বিশাল মালভূমির মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছে।

আমাদের বাংলায় বীরভূম জেলায় বক্রেশ্বর নামে একটি পীঠস্থান আছে, তাহা অনেকেই জানেন;—সেখানেও ঠিক এইরূপ পাঁচ-ছয়টি কুণ্ড আছে, পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম। তারপর হিমালয়ের উচ্চস্তরে, যমুনোত্তরী, গঙ্গোত্তরী, কেদার এবং বদরীনারায়ণের মত হিমরাজ্যেও এই উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। এ এক বিস্ময়,—অত উচ্চে কি ভাবে এতটা তপ্ত জলোচ্ছ্বাস সম্ভব হইয়াছে! যাহা হউক এখন বাহন ছাড়িয়া তাঁবু গাড়িবার পূর্ব্বেই মোটঘাট নামানো হইবামাত্র আমরা গামছা লইয়া কুণ্ডের দিকে গেলাম।

সঙ্গীমহাশয়, আগেই স্নান করিলেন, বলিলেন, আঃ শরীর নীরোগ হয়ে গেল। চল, মানসসরোবরটুকু শেষ করেই যত শীঘ্র পারা যায় দেশের দিকে যাওয়া যাক্, এখানে আর নয়। কি রিগারাশ্ ক্লাইমেট্। আমরা হিন্দু, তায় বাঙালী, ভেজিটেবল না খেয়ে থাকতে পারি না। এখানে ত কিছুই পাওয়ার যো নেই। সেই ভয়ানক রুটি, আর ছাতু, এতে কি শরীর থাকে?

বাস্তবিক, কি ভয়ানক স্থানেই আমরা আনন্দলাভের আশায় আসিয়াছি।

সঙ্গী-মহাশয়ের পর আমি সেই কুণ্ডের জলে বড় আরামে সর্ব্বশরীর মার্জ্জন করিয়া, অল্পে অল্পে তাহাতে গা ডুবাইয়া স্নান করিলাম। তাহার পর শুষ্ক জামাকাপড় পরিয়া তাঁবুর মধ্যে বসিলাম। সত্যসত্যই সেই স্নানেই শরীর নীরোগ হইয়া গেল, আর কোন গ্লানিই রহিল না, বড়ই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হইল। এই স্নানের পর হইতেই জ্বরও একেবারে ছাড়িয়া গেল।

উষ্ণ-প্রস্রবণ

এই উষ্ণ-প্রস্রবণ একটি মরুর মধ্যে, মানসসরোবরের পার্শ্বেই ঠিক উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। একটি পান্থনিবাস এবং একটি মঠও এখানে আছে। মঠের নাম জু গোম্পা। আমরা এখানে আর মঠে যাই নাই। নিকটে একটি ক্ষীণ জলধারা মানসসরোবর হইতে বাহির হইয়া রাক্ষসতলের দিকে
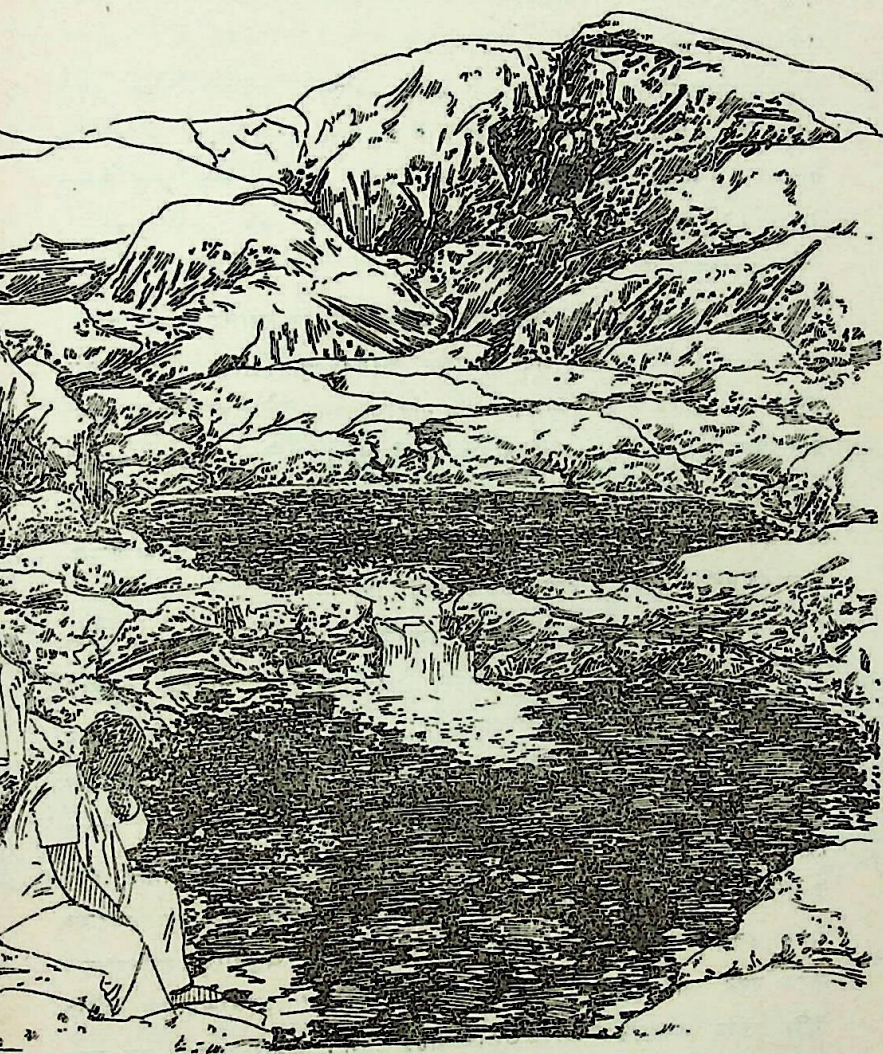
উষ্ণ-প্রস্রবণ

চলিয়া গিয়াছে। জল তত ভাল নয়, অন্য জল না থাকায় বাধ্য হইয়াই উহা পান করিতে হইল।

উষ্ণ-প্রস্রবণের জলটি শৈবালাকীর্ণ। এত উষ্ণ জলে ঘন শৈবালের রাশি কোথা হইতে আসিল ইহা ভাবিবার বিষয়। খাঁটি দুগ্ধে যেমন পুরু সর

পড়ে এ-জলেও সেইরূপ সবুজবর্ণ সর ভাসিতেছে। জলে পচা-পচা একটা গন্ধ,—গন্ধক হইতে উদ্ভূত বলিয়া বোধ হইল।

মামার বাড়ী আমার অজ পাড়াগাঁয়ে,—বাড়ীর খিড়কির দিকে একটি পুকুর ছিল তাহাকে পচাপুকুর বলিত। বড় বড় ভাসা পানা ও কলমীর দাম সারা পুকুর জোড়া;—সেই জলে ঐরূপ গন্ধকের গন্ধ আর উপরে ঐপ্রকার শৈবালের সর পড়িয়া আছে দেখা যাইত। জল একই প্রকার—পার্থক্যের মধ্যে এটি উষ্ণ, সেটি শীতল।

আমাদের স্নান শেষ হইলে পর মেয়েরা স্নানাদি সমাপন করিয়া লইল। তারপর রুমা রুটি এবং হালুয়া পাকাইল, আমরা আহারাদি সারিয়া সন্ধ্যা হইতে-না-হইতেই মুড়ি দিলাম। যখন যাত্রার জন্য উঠিলাম তখনও চন্দ্রের ম্লান জ্যোতিঃ একেবারেই মিলাইয়া যায় নাই। ঠিক ভোরেই আমরা মানসসরোবরের দিকে যাত্রা করিলাম। প্রাণে প্রবল আনন্দ, শরীরে নব বল ও সাফল্যের আশা। প্রথমেই কৈলাস হইয়াছে এখন আজ মানস-সরোবর দর্শন হইবে; জীবনের একটি স্মরণীয় দিন।

কৈলাস ও মানসসরোবর দর্শন, কতটা ভাগ্যের যোগাযোগ, এবং কতটা পুরুষার্থের সহায়ে ঘটিয়াছে, পথে যাইতে যাইতে তাহাই ভাবিতেছিলাম। এই যে অজ্ঞাতনামা সম্পূর্ণ অপরিচিত হিমালয়ের অধিবাসী ভোটিয়া বন্ধুবর্গ, ভাগ্যরূপে ইহারাই আমাদের পুরুষার্থকে সফল করিয়া ছিল, এটি দিবালোকের মতই স্পষ্ট। মনের মধ্যে এই সকল তোলাপাড়া করিতে করিতে গুটিগুটি চলিয়াছি। ক্রমে বিচিত্র বর্ণে উদ্ভাসিত অরুণোদয় দেখিলাম। মরুভূমির মত বিস্তীর্ণ অসমতল ক্ষেত্রের উপর একখণ্ড পর্ব্বত তখনও মানসসরোবরকে দৃষ্টির অন্তরালে রাখিয়াছে। ক্রমে যখন স্পষ্ট আলো, প্রভাতের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ আকাশমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিল তখন অন্তরের সকল জড়তাও ঘুচিয়া গেল। হঠাৎ সম্মুখে, বহু দূরে একটি ঘনরেখা দেখা গেল। দেখিতে দেখিতে ক্রমে উহা কিছু নিকটবর্ত্তী হইলে একদল অশ্বারোহী বলিয়া বোধ হইল। সারি সারি অনেকগুলি রক্তবস্ত্রধারী তিব্বতীয় অশ্বারোহী, মন্থর গতিতে আমাদের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। রুমা বলিল, পিতাজী দেখিয়ে, বো ক্যা হৈ। জিজ্ঞাসা করিলাম, ডাকাতের দল নাকি?—রুমা বলিল, নহী, নহী, চালিস্—মাওয়াসা।

মাওয়াসা বলিতে গৃহস্থপরিবার বা সংসার বুঝায়। চল্লিশটি সংসার একত্র দলবদ্ধ হইয়া তীর্থে যাইতেছে; উহারা এইরূপেই তীর্থ করে। এখন কৈলাস যাইতেছে, পরে কৈলাস প্রদক্ষিণাদি শেষ করিয়া মানসসরোবর পরিক্রমণ করিবে।

ক্রমে সূর্য্যোদয় হইল, মাওয়াসার দলটিও আমাদের ছাড়াইয়া দূরে চলিয়া গেল। তাহার কিছুক্ষণ পর আবার একটি ছোট দল দেখা দিল। নিকটে আসিলে দেখা গেল আট-দশজন তিব্বতী পুরুষ,—সঙ্গে নানাপ্রকার

চালিস্ মাওয়াসা

মাল, মেওয়া ফল ইত্যাদি লইয়া বিক্রয়ার্থ যাইতেছে। সঙ্গে তাহাদের, ছোট ছোট ঝুড়িতে ঢাকা, বড় বড় খোবানী, পীচ, আখ্‌রোট, বাদাম, খেজুর ইত্যাদি আমাদের দলের সকলকে দেখাইতে লাগিল। আমাদের ভোটিয়া মুরুব্বি দুইজন বেশী দাম দিয়া কিছু কিছু খরিদ করিল। তাহারা চলিয়া গেলে, রুমা বলিল, ইহারা ডাকাত, সুবিধা পাইলেই ছুরি বসায়, আবার লুটপাটও করে।

অল্পদূর অগ্রসর হইয়াই এখন মানসসরোবরের কতকাংশ নয়নগোচর

হইল। মরি মরি, কি স্নিগ্ধ মধুর দৃশ্য,—এই শীতল প্রভাতের সঙ্গে ক্ষীণ, তরল নীলিমার কি মধুর মিলন ঘটাইয়াছে। সকল মনোবৃত্তি একাগ্র হইয়া ঐ রমণীয় দৃশ্য যেন আত্মসাৎ করিয়া লইল। যে মুহূর্ত্তে মানসসরোবর নয়নগোচর হইল, মনে হইল যেন আমি ইহার সঙ্গে বহু যুগযুগান্তর ঘনিষ্ঠ ভাবেই পরিচিত আছি। গভীর-স্মৃতির মধ্যে এ দৃশ্য যেন স্পষ্টরূপেই আঁকা; যেন কতবারই দেখিয়াছি, এই বিচিত্র মনোরম দিব্য দৃশ্যটি উপভোগ করিয়াছি। জীবনে ইহার সঙ্গে বিচ্ছেদ নাই, কখনও হইবে না;— এইভাবে দ্রষ্টা ও দৃশ্য কতক্ষণ এক হইয়াই রহিল। তবে সে অবস্থা অল্পক্ষণের, কারণ স্থূল শরীর গতিবিশিষ্ট চঞ্চল, তাহার উপর দলের মধ্যে আমি একজন, যাহার স্বাধীনতা প্রতি পাদক্ষেপেই সীমাবদ্ধ।
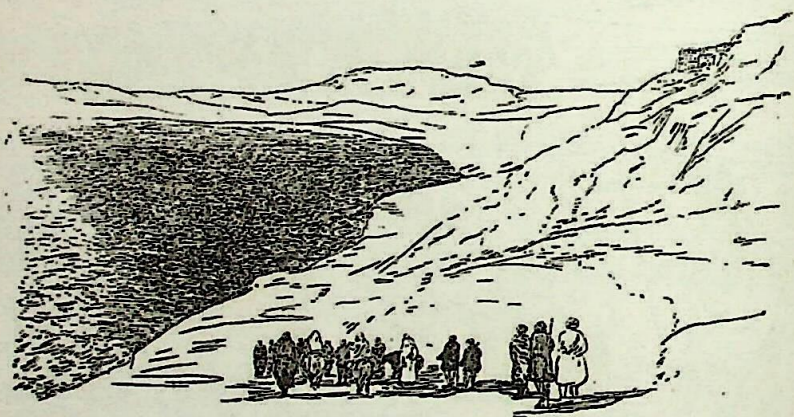
মানসের তটপথ

চতুর্দ্দিকেই পর্ব্বতমালা, বন বৃক্ষলতা, প্রভৃতি সর্ব্ববিধ হরিদ্বর্ণের সম্পর্কশূন্য। মরুভূমির মধ্যে যেমন পর্ব্বতাকার বালির স্তূপ থাকে, এই নীলাভ মানসসরোবরের চারিদিকেই সেইরূপ। বালুকা-স্তূপের বর্ণ পীতাভ ধূসর বলিয়া জলের বর্ণ সর্ব্বদাই নীল;—বেশী বেলায় প্রখর রৌদ্রে ঘোর নীল দেখায়। হ্রদটির পরিধি কেহ বলে পঞ্চাশ, কাহারও মতে আশি, আবার অন্য মতে একশত মাইল। কোন বিশিষ্ট ইউরোপীয় পর্য্যটকের মতে বর্ত্তমানে ইহা পঞ্চাশ মাইল। সরোবরের চারিদিকে উচ্চপর্ব্বতগাত্রে কয়েকটি মঠ আছে। যথা, লাম হুং লাং, সারলাং, কোশল বা গোসল, নিক্কুর, জু গোম্পা প্রভৃতি। জু গোম্পাটি উষ্ণ প্রস্রবণের ধারে,—তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মানসসরোবরের তিব্বতী নাম ত্যসো মোবাং।

আমরা হ্রদের পশ্চিম তীর দিয়া চলিতেছিলাম। সরোবরের শোভা এই প্রাতঃকালে কি মনোহর হইয়াছে তাহা বলিবার নয়। কতক্ষণ সূর্য্যোদয় হইয়াছে, জলে এখন সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইতেছে। এখানে রাজহংস নাই, পদ্ম নাই, পত্র নাই, মনোরম বলিয়া কাব্য বা পুরাণ-বর্ণিত যাহা-কিছু ইহার সৌন্দর্য্যময় উপাদান, সে সকল কিছুই নাই। দুই চারিটি ক্ষুদ্র কালো কালো হাঁস,—সাধারণতঃ যাহাকে বালিহাঁস বলে,—কখনও হ্রদের তীরে কখনও বা জলে যাতায়াত করিতেছে আর দুই একটি মাছধরা পাখী নিকটে জলের উপর ইতস্ততঃ ক্ষিপ্রগতিতে আহার অন্বেষণে উড়িতেছে। জল অতীব স্বচ্ছ। প্রভাতের মৃদুমন্দ সমীরণ হিল্লোল, হ্রদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলিয়া জলকে তরতর নাচাইতেছে, তাহার মধ্যে রজতশুভ্র সূর্য্যকিরণ—বিদ্যুতের মত তাহার ঝলকিত গতি। এই সব দেখিতে দেখিতে একটা উন্মাদ আনন্দের নেশায় দলের পিছনে পিছনে দূরস্থ গোসল গোম্পার দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাক্ষসতাল ও মানসসরোবরের মধ্যে কোথাও এক, কোথাও বা দেড়-দুই মাইলের পর্ব্বতাকার উচ্চভূমি ব্যবধান। অপর দিকেও পর্ব্বতমালা, দূরত্বহেতু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং ধূসর বর্ণ। চারিদিকেই ফাঁকা। এত বড় ফাঁকার রাজত্ব দেখি নাই। ইহার শোভা ও গাম্ভীর্য্য সাধারণ নহে। আমাদের দেশের সহরবাসিগণ যাঁহারা এরূপ স্থানের সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁহাদের পক্ষে বৃক্ষলতাশূন্য, এমন কি সবুজ বর্ণের আভাসশূন্য, পর্ব্বতবেষ্টিত বিশাল জলাশয়ের কল্পনা সম্ভব নয়। এরূপ দৃশ্য কল্পনা করিতে অনেকেই হয়ত ইহা শোভাসৌন্দর্য্যহীন ধারণা করিয়া বসিবেন;—তাহাতে কিন্তু ভুল হইবে। যেমন কুঞ্চিত অথবা সরল কেশাচ্ছাদিত মুখমণ্ডলের একটি শোভা আছে;—তেমনি আবার মুণ্ডিতশীর্ষ মুখমণ্ডলেরও একটি বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য আছে। ঠিক সেইরূপ এ যেন মুণ্ডিতমস্তক কোনও যোগীর মূর্ত্তি। বাহ্য নয়ন-ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উপাদান বড় কিছু নাই, কিন্তু অন্তরের দিকে দেখিলে একটি গাঢ় আনন্দ-রস-ময় সৌন্দর্য্যের আভাস পাওয়া যায়; তাহাতে চিত্তকে অতৃপ্তির পথে লইয়া যায় না, বরং স্থির এবং সমাহিত করিয়া দেয়। সাধারণ রূপপিপাসুগণের চক্ষে এ দৃশ্য মোটেই সুখকর নহে। সরোবরের নীলাভ জলরাশি ব্যতীত চারিদিকের সকল দৃশ্যই নয়নের অরুচিকর। কিন্তু একটু স্থির হইয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, চারিদিকে বিষমবর্ণময়

দৃশ্যের সন্ধিস্থলে জলরাশির ঐ নীলটুকুই উভয় দৃশ্যের সম্পর্ক ঘনীভূত, সুসম্বদ্ধ এবং সার্থক করিয়াছে, তাহাতেই এখানকার দিঙ্মণ্ডল অপরূপ শোভাময়, আর সেইজন্যই এ ক্ষেত্রে সবটুই মধুর এবং গভীর সৌন্দর্য্যময়।

যদি পবিত্র তীর্থের সংস্কারটি এবং প্রচলিত কিংবদন্তী বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলে সাধারণ তীর্থযাত্রীর শুধু এই বিষম দৃশ্যসমষ্টির মধ্যে প্রাণ মাতাইবার কিছুই নাই বলিয়াছি। কাজেই এ কথা বলিলে ভুল হয় না যে, স্থূল অথবা বাহ্য রূপের নেশা এবং তরল বাস্তব উপভোগের ঘোর যাহাদের না কাটিয়াছে, তাহাদের এত কষ্ট সহ্য করিয়া কৈলাস এবং মানসসরোবরে আসিয়া তৃপ্ত হইবার কিছুই নাই, সুতরাং ফলও কিছুই নাই। ইহার শোভা আর এক শ্রেণীর জীবের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে।

মহাত্মা ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনচরিতে মানসসরোবরের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহার সহিত আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম তাহার সর্ব্বাংশেরই মিল রহিয়াছে, কেবল আধ্যাত্মিক ভাবগুলি ছাড়া। আর, অধ্যাত্ম কোনো বিষয়ের প্রতিষ্ঠা সাধারণভাবে মানব-যুক্তির বহির্ভূত বলিয়া তাহার আলোচনা এক্ষেত্রে না করাই ভাল। তবে একথা বলিলে দোষ হয় না যে, অন্তর্নিহিত ভাবের তারতম্য যাহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ধরা যায়, তাহার সহিত সমষ্টিগত সাধারণের ভাবের মিল নাও হইতে পারে। ভাবরাজ্যের সকল কিছুই যুক্তিরাজ্যের বাহিরে—ইহা আমরা মানি। অন্তরের মধ্যে ভাবের স্পন্দন ঘনীভূত হইলে, সেই অবস্থায় দৃশ্যবস্তু সকল আপন অন্তরের বিশিষ্ট ধ্যান ও ধারণা অনুসারে মুর্ত্তিমান হইয়া দৃষ্টিকে সার্থক করে। আমাদের ভারতবাসী হিন্দুর মনে বুদ্ধ ও শিব উভয়েরই প্রভাব অতি গভীর সংস্কারগত, ইহা অল্পদিনের নহে। সাধারণ হিন্দু মনের মধ্যে বুদ্ধ মহানির্ব্বাণ-প্রমাযোগী এবং শিবও মৃত্যুঞ্জয় যোগীশ্বর। দুয়ের মধ্যেই যোগৈশ্বর্য্যের পরাকাষ্ঠা, ভারতীয় পুরাণ অথবা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এবং লোকপরম্পরাগত সংস্কার হইয়া গিয়াছে। এমন অবস্থায় আন্তরিক ভক্তি এবং ভাবের প্রভাবে যদি কেহ বুদ্ধের মূর্ত্তিতে শিবের মূর্ত্তি দেখেন, তবে তাহাতে বাস্তবপন্থিদের হিসাবে কিছু ভুল বোধ হইতে পারে, কিন্তু তত্ত্বতঃ উহা নির্ভুলই হয় এবং সেই দর্শনই জীবনকে অনেকাংশে সার্থক করিয়া তুলে।

অনেকেই বলেন যে, ফাল্গুনের পূর্ণিমা তিথিতে মানসসরোবরের

জলরাশি আলোড়িত হইয়া মধ্যস্থলে একটি রথের স্বর্ণচূড়া দেখা যায়, ঐ দৃশ্য যে দেখিতে পায় তাহারই যাত্রা সফল বুঝিতে হইবে। দুঃখের বিষয়, আমরা ফাল্গুনের পূর্ণিমায় যাই নাই, আর সে কারণ সেই দৃশ্যেও বঞ্চিত রহিলাম। তবে স্থানীয় কাহাকেও কাহাকেও এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কেহ গম্ভীরভাবেই অস্বীকার করিয়াছিলেন, আবার কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, হইতে পারে, এ ত দেবতার লীলার স্থান;— মানুষে এ সকল দেখিতে পায় না।

সেকথা থাক—এখন এই স্থানটি বর্ত্তমানে হিন্দুদের পুরাণোক্ত দেবতা গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, বিদ্যাধর প্রভৃতি বেষ্টিত স্থান নহে, অন্ততঃ এখনও নাই,—আর তাহারা কেহ এখানে স্নানও করে না। তবে এই হনুমান— তিব্বতীয়গণের যদি ঐ নাম হয় তবে সে স্বতন্ত্র কথা। এই হূনরাজ্যে শীতের প্রাধান্যহেতু কেহ কখনও স্নানের অভিলাষী হয় না—এখানে স্নান দূরাগত হিন্দুগণই করিয়া থাকে। স্নানে অনভ্যস্ত দেশের লোকে শুধু জল স্পর্শ করিয়াই শুদ্ধ হয়। তিনবার আপমার্জ্জন অর্থাৎ জলের ছিটা লাগাইলেই শুদ্ধ হইয়া যায়;—ইহা জানিয়া রাখা ভাল।

এখন প্রায় চারি মাইল অতিক্রম করিয়া গোসল বা কোশল গোম্পা নামক মঠের তলে এবং জলের অতি নিকটেই আমরা বোঝা নামাইলাম। অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর দলস্থ অপর যাত্রীরা উপরের গোম্পায় গেল;—তাহারা মঠের লামাদের নিকট পূজা দিবে এবং ঐখানেই আহারাদির যোগাড় করিবে। রুমা এবং আমরা তিনজন গেলাম না। মানসসরোবরের তীরে আসিয়া আর কোথাও যাইতে আমার ইচ্ছা হইল না;—প্রাণের মধ্যে অনন্তকাল ধরিয়া এই দৃশ্য দেখিতে আর ইহার সঙ্গে যুক্ত থাকিবার বাসনাই জাগ্রত হইয়া রহিল;—আর গৃহে ফিরিয়া যাইতেও ইচ্ছা হইল না। জীবনের সঙ্গে এই দৃশ্যের যেন কখনও বিচ্ছেদ না ঘটে! কিন্তু হায়, দেশ কাল ও পাত্রের অধীন জীবন, যথার্থ স্বাধীনতার বিপরীত-মার্গেই যাহার গতি, সংসারে সর্ব্ববিধ ব্যাপারে পরের সাহায্যের যোগাযোগ অপেক্ষা করে,—তাহার পক্ষে এরূপ ইচ্ছা, ইচ্ছামাত্রেই থাকিয়া যায়, কার্য্যকরী হইবার পথ পায় না।

সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন, আর স্নান করিবার প্রয়োজন নাই, শীর্ষে এবং সর্ব্বাঙ্গে মার্জ্জনেই কাজ হইবে। শীতে তাঁর বড়ই ভয়, বিশেষতঃ এই

ভয়ঙ্কর শীতে যদি ঠাণ্ডা লাগিয়া যায়, বিদেশে প্রাণের ভয় বলিয়াও ত একটা কথা আছে। আপমার্জ্জনই তাঁর পক্ষে প্রশস্ত; তিনি সেই মতই করিলেন। আমি ভাবিলাম, কত দূর হইতে এই মহাতীর্থে আসিয়া যদি অবগাহন স্নান না করিলাম তবে আসিবার সার্থকতা কি, কেবল দেখিয়াই চলিয়া যাইব? নাথজী এবং আমি, দু'জনেই আবক্ষ জলে নামিলাম,—তখন নাথজী বলিলেন, য়হ শরীর ছুটে য়া রহে কুচ বাত নহী, ইস তীরথমে তীন গোঁতেতো জরুর লাগাউঙ্গা। আমরা তিনটি করিয়াই ডুব দিলাম। যখন শেষ ডুব দিয়া মাথা তুলিলাম তখন সর্ব্বাঙ্গ যেন চলচ্ছক্তিরোহিত হইয়া গেল। প্রবল শীতে হৃৎপিণ্ডের কাজ বুঝি ক্ষণেকের জন্য বন্ধ রহিল। জলটি এত শীতল এবং এত তরল যে তাহার সহিত আমাদের দেশের জলের তুলনা হয় না। স্নান করিয়া মনে হইল আমি নীরোগ, নিষ্পাপ এবং ধন্য হইলাম।

কিংবদন্তী এইরূপ যে, অগ্রহায়ণ-পূর্ণিমা তিথিতে এক রাত্রির মধ্যে এই সরোবরের জল তুষারপাতে জমিয়া একখণ্ড হইয়া যায়, এবং ফাল্গুন-পূর্ণিমার রাত্রে ইহা আবার এক রাত্রিতেই গলিয়া যায়।

রূমা কিছুদূরে জলের অতি নিকটে গাত্রমার্জ্জন করিয়া লইল। ইতিমধ্যেই উপরের মঠ হইতে প্রত্যেকটি দুই আনা হিসাবে, রূমার ভগিনী চারিটি বোতল আনিয়া দিল। আমরা বোতলগুলি পূর্ণ করিয়া সরোবরের পবিত্র জল লইলাম। রূমার স্নানাদি হইয়া গেলে উপরের মঠে গেল এবং আমাদের জন্য রুটি ও ছাতুর হালুয়া করিয়া পাঠাইল। তখন তাহাই অল্প আহার করিয়া সরোবরের জল পান করিলাম। সঙ্গী-মহাশয় একটু মিছরি খাইলেন এবং সরোবরের জল পান করিলেন। বলিলেন, এই জলপান করিয়াই আজ কাটাইব, অন্য কিছুই খাইব না। সেদিন এবং রাত্রির মত আমাদের তাহাই আহার হইয়াছিল, কারণ পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত এ পথে আর কোনও আহার জুটে নাই।

এইবার যথার্থ বড় দুঃখের কথাটাই লিখিব, না লিখিলেও ত নয়। বড় আশা করিয়া আসিয়াছিলাম যে, মানসসরোবরে কৈলাসের মত অন্ততঃ তিনটি রাত্রি থাকা হইবে। কিন্তু যে মুরুব্বির সঙ্গে আমরা আসিয়াছিলাম তিনি উপরের মঠ হইতে নামিয়াই মালপত্র গুছাইয়াই এখান হইতে তাকলাখায় ফিরিতে হুকুম করিলেন। শুনিয়াই আমরা প্রাণে বড় ব্যথা

পর্য্যটক ৩১ বৎসর

পাইলাম, নাথজীও বিরক্ত হইলেন। তখন রুমাকে বলিলাম, আমাদের মুরুব্বি নিজে গরু কিনিবেন বলিয়া তাহা একরাত্রি পথে কাটাইলেন আর এখানে একরাত্রি থাকিতে পারিলেন না? রুমা বলিল, তার ছেলের অসুখ, স্ত্রীর শরীরও ভাল নাই ;—তাদের কারো মনে সুখ নাই, সেইজন্য দ্রুত ফিরিয়া যাইতেই কৃতসংকল্প। কাজেই একটি দিন মাত্র এই পবিত্র মানসসরোবরের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল। বিদ্রোহী মন, এই বন্ধুদলের সহায়তায় এতটা তীর্থভ্রমণের সুযোগ পাইয়াও এইভাবে দলবদ্ধ হইয়া যাওয়ার বিরুদ্ধে মহা উত্তেজনার সৃষ্টি করিল, যদি একা আসিতাম! যাহা হউক, অবশেষে সেইদিনই ফিরিতে হইল; সরোবর প্রদক্ষিণ আমাদের হইল না। এই বিষাদ মনের মধ্যে গুরুভার হইয়া চাপিয়া রহিল। আবার আসিব এবং একলাই আসিব, এই বাসনা লইয়াই ফিরিলাম, কৈলাসপতি এ বাসনা কি পূর্ণ করিবেন না?

পূর্ব্বে বলিয়াছি, যেমন কৈলাস প্রদক্ষিণ করিতে হয় এই মানস-সরোবরেও সেইরূপ পরিক্রমণের ব্যবস্থা আছে। প্রদক্ষিণের পথও সুন্দর, কোনও প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হয় না। কিন্তু তিতিক্ষাপরায়ণ সন্ন্যাসী ব্যতীত অন্য আশ্রমীর পক্ষে বড় অসুবিধা। কারণ, সরোবরের চতুর্দ্দিকে এই চার-পাঁচটি মঠ বা গোম্পা ব্যতীত আর অন্য আশ্রয় নাই। প্রবাসী গৃহস্থ লোকের মঠে থাকার অসুবিধা অনেক, গোম্পার লামাগণ দয়াপরবশ হইয়া যদি আশ্রয় দিলেন ত ভাল, না দিলেও দিতে পারেন, কোনও কথা বলিবার নাই ;—তখন একেবারেই নিরাশ্রয়।

সেইজন্য সাধারণ গৃহস্থ যাত্রীদের দলবদ্ধ হইয়া হাতিয়ার, তাঁবু প্রভৃতি এবং জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় প্রত্যেক বস্তু ও পর্য্যাপ্ত শীতবস্ত্র সঙ্গে লইয়া তিব্বতের মধ্যে ঐ সকল তীর্থে যাইবার ব্যবস্থা।

যদি কেহ বিশেষ সাবধানে থাকিয়া উপযুক্ত সরঞ্জাম সঙ্গে এখানে আসিয়া একবার তিব্বতীয় জলবায়ু হজম করিয়া ফিরিয়া যাইতে পারেন, তিনি স্বাস্থ্যরূপ অমূল্য সম্পদ সঙ্গে লইয়া যাইবেন ;—তিনি বহুকাল সুস্থ এবং সবল শরীরে নিজ কর্ম্মে অটুট থাকিবেন।

যখন দেশ হইতে হিমালয় ও কৈলাস, মানসসরোবরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি তখন দুইটি বিষয়ে আমার বন্ধুবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তি করিব এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছিলাম। প্রথমটি এই, সিদ্ধমহাপুরুষ বা উচ্চশ্রেণীর

মুক্ত যোগীপুরুষ ওখানে যাঁহারা আছেন যদি দেখাশুনা ঘটে তাহার বিবরণ, আর দ্বিতীয় বিষয়, তিব্বতের, গার্হস্থ্যজীবন ও বিবাহ-প্রণালী, এবং তাহার সহিত আমাদের হিন্দুসমাজের কোন বিষয়ে মিল আছে কি-না। ইহাই ছিল কৌতূহল। এই দুইটির কিছু কিছু অন্য প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখন বিশেষভাবে যেটুকু জানিয়াছি তাহা বলিয়াই প্রত্যাবর্ত্তনের কথা আরম্ভ করিব।

তিব্বতে ধর্ম্মজীবন বহুবিস্তৃত এবং সাধারণ। কারণ যে-দেশে গৃহস্থের তুলনায় সাধুসন্ন্যাসীর সংখ্যা বেশী, সে-দেশে ধর্ম্মব্যাপার সাধারণ হইয়াই থাকে। কিন্তু এই যে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ দলের ধর্ম্মজীবন, ইহা বিস্তৃত অধিক হইলেও তত গভীর নহে। বহুসংখ্যক সাধু-সন্ন্যাসী বা লামা দেশময় ব্যাপ্ত বলিয়া ধর্ম্মমন্দিরের ভিতরে এবং বাহিরে ব্যভিচারের অভাব নাই। সন্ন্যাসের নিয়মানুসারে কামিনী ও কাঞ্চন অথবা বালক-ঘটিত যে-সকল ইন্দ্রিয়সুখের ব্যাপারকে পাতক এবং উপভোগের ব্যভিচার বলিয়া জানি;—এখানে ইহা অনেকটা দেশাচার এবং জাতীয় ধর্ম্মজীবনে স্বাভাবিক। সঙ্ঘের একজন লামা যদি ইন্দ্রিয়ঘটিত কোন অসংযমের কর্ম্ম করিয়া ফেলেন, তাহা প্রায়শই প্রকাশ পায় নাই। এসকল ব্যাপার পুনঃ পুনঃ ঘটিলেও সেটি লইয়া আলোচনা বা এ সকল ব্যাপার সম্বন্ধে অন্যের অনুসন্ধিৎসু হইবার রীতি নাই। অতি পূর্ব্বকাল হইতেই কাহারও ব্যক্তিগত অস্বাভাবিক অসংযমের কর্ম্ম এদেশে অপরের উপেক্ষারই বিষয়। যিনি অসংযত হইবেন বা কুপ্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিবেন সে কর্ম্ম তাঁহারই ব্যক্তিগত চিন্তা বা বিচারের বিষয়, অপরের ইহাতে অধিকার নাই, পরন্তু উহা সঙ্ঘনীতির বিরুদ্ধ। প্রথম হইতে ব্যক্তিগত ধর্ম্মজীবনে আত্যন্তিক নিষ্ঠা বিধিবদ্ধ থাকায় এই সকল অসংযমের ব্যাপার সর্ব্বধর্ম্ম সঙ্ঘের মধ্যেই প্রসারিত হইয়াছে। শুনিয়াছি, এখানে ব্যক্তিগত ধর্ম্ম বা সঙ্ঘজীবনের সংযম পালন প্রভৃতি নিয়ম আমাদের ভারতীয় বর্ণাশ্রমী হিন্দুসমাজের শাস্ত্রীয় সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য নীতির মতই অতীব কঠিন। আবার এত কঠিন শাস্ত্রের অনুশাসনসত্ত্বেও এখনকার দিনে প্রাকৃতিক নিয়মে হিন্দু-সমাজের যে নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়াছে এদেশেও ঠিক সেই ব্যাপার। যেখানে যত নিয়মের বাঁধাবাঁধি,—সেখানে সকল ক্ষেত্রেই বন্ধন তত শিথিল।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে মহাশক্তি যোগিনীর কথা বলিয়াছি, যদিও আমরা

তাঁহাকে দেখি নাই তথাপি যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহাদেরই মুখে শুনিয়াছি এবং অন্তরে বিশ্বাস করিয়াছি বলিয়াই লিখিয়াছি। এখন এই শ্রেণীর সিদ্ধিপ্রাপ্ত যোগী বা যোগিনী কখনও কোন মঠাশ্রয় করেন না। মুক্তস্বভাব এবং জনকোলাহল হইতে দূরে থাকেন বলিয়াই তাঁহাদের প্রতি জনসমাজ বেশী আকৃষ্ট হয়। এখন এই মানসসরোবরের তীরে এক মহাপুরুষের বৃত্তান্ত যাহা শুনিয়াছি সংক্ষেপে তাহা লিখিয়া তিব্বতী লামার কাহিনী শেষ করিব। ইনি ছম্-সি-যাঁন বলিয়াই দেশে পরিচিত ছিলেন। প্রথমাবস্থায় গৃহী ছিলেন, স্ত্রী লইয়া ঘর করিতেন, কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই। চব্বিশ বৎসর বয়সের সময় তিনি লামা হইয়া পর্যটনে বাহির হন। তিনি তিব্বতের সকল তীর্থ ও প্রসিদ্ধ স্থানগুলি ঘুরিয়া ভারতে আসিয়া বুদ্ধগয়া, কাশী প্রভৃতি নানা স্থান দেখিয়াছিলেন;—পরে দেশে ফিরিয়া মানস-সরোবরের তীরে একটি নিভৃত গুহায় নিজ আসন পাতিয়া বসিলেন, কোনও মঠে যান নাই। এইরূপে পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল তিনি এইখানেই থাকেন। এখানে তাঁহার অনেকগুলি ভক্তও হইয়াছিল। তিনি নির্ব্বাক অর্থাৎ মৌনী ছিলেন।

একদিন তিনি তাঁহার প্রিয়তম শিষ্যকে জানাইলেন যে, তিনি আগামী পরশু দেহ ত্যাগ করিবেন। সে-কথা শীঘ্রই প্রচারিত হইয়া গেল; তখন তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর মধ্যেও হাহাকার পড়িয়া গেল। সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বসিল,—এখন আপনার কিছুতেই দেহত্যাগ করা হইবে না। আমরা জানি আপনার যোগৈশ্বর্য আছে, আপনি ইচ্ছা করিলেই দেহ রাখিতে পারেন। আপনি এখন শরীর ত্যাগ করিলে আমরাও মরিব। এইরূপে অনেকে তাঁহার চরণ ধরিয়া কান্নাকাটা করিলেও তিনি কিছুতেই দ্বিতীয় মত প্রকাশ করিলেন না। পরে যখন সকলে দেখিল যে, তিনি কোনক্রমেই মানিবেন না, তখন সকলে মিলিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিল যে যদি একান্তই শরীর ত্যাগ করিবেন তবে অন্ততঃ আর এক বৎসরের জন্য দেহ রক্ষা করুন, আমরা এই সময়টুকু প্রাণ ভরিয়া সেবা করিব এবং গম্ভীর পরমার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনার উপদেশ গ্রহণ করিব।

তখন তিনি দয়াপরবশ হইয়া উহাতে রাজী হইলেন এবং সর্বাপেক্ষা তপস্যাপরায়ণ একটি মাত্র ভক্তকে তিনি নিজের কাছে রাখিলেন এবং বলিলেন, এই ব্যক্তি আমার কাছে থাকিবে, আর তোমরা সকলে ইহার

নিকট হইতেই জ্ঞান পাইবে। তারপর বলিলেন, তোমরা প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে একবার করিয়া আমার কাছে আসিবে, তখন আমি তোমাদের সঙ্গে থাকিব। ইহাতে সকলে আনন্দিত হইয়া নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেল। তল্‌চি বো,—সেই মনোনীত ভক্তটি—কেবল তাঁহার নিকটেই রহিলেন। ঠিক এক বৎসর পরে একদিন তিনি জানাইলেন যে, পরদিন দ্বিপ্রহরে দেহত্যাগ করিবেন। তিনি সকলকে বলিলেন যে, এই তক্ত্য শরীর লইয়া তোমরা কোন স্থানে সমাধি দিবে না বা তাহার উপর কোনও প্রকার মঠ স্থাপন করিবে না। এই শরীর হইতে সমস্ত মাংস পশুপক্ষীদের খাওয়াইবে এবং অস্থিগুলি শুকাইয়া পরে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া কৈলাসের চারিধারে ছড়াইয়া দিও। এইরূপ উপদেশ দিয়া তিনি সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরদিন প্রথম প্রহরের শেষে সকলে দেখিল তিনি সমাধিস্থ অবস্থায় নিজ আসনেই লীন হইয়াছেন।

যেখানে যতটা ভাল আবার সেখানে ততটা মন্দও তাহার অপর দিকে আছে ;—এ-হিসাবে আমাদের ভারতের সঙ্গে তিব্বতের ধর্ম্মজীবনে প্রভেদ অল্পই।

দেবতা এবং অপদেবতা মানুষের উপর শুভ-অশুভ দুইটি প্রভাব বিস্তার করে—ইহাই তিব্বতীয়রা মানিয়া থাকে,—শুধু মানা নয়, জন্মগত সংস্কার বা ধারণা। এই বুদ্ধি লইয়াই ইহারা জীবনে সকল কর্ম্মই করিয়া থাকে। অশুভ বা অমঙ্গলকে দূর করিতে পারিলেই শুভ বা কল্যাণ আপনি আসিবে, এইজন্যই ইহারা প্রত্যেক অসুখ বা অশান্তির মূলে অপদেবতারই খেলা কল্পনা করিয়া তাহাকে তাড়াইতে ব্যস্ত হয়।

বুদ্ধজীবনে মারের প্রভাব হইতেই এসব ধারণা আসিয়াছে ;—সুতরাং যাহা কিছু অশুভ তাহা এই মারেরই প্রভাব বলিয়াই ইহারা ধরিয়া লয় এবং মার নামক অমঙ্গলের সঙ্গে মানুষের যুদ্ধ একটি অবশ্যম্ভাবী এবং জীবনব্যাপী কর্ম্ম বলিয়াই মনে করে। তন্ত্রমন্ত্র প্রভাবে মারকে তাড়াইতে হয়। শরীরঘটিত যত কিছু অসুখ সবই মারের প্রভাব, সুতরাং তাহার উপায়,—কবচ ধারণ ইত্যাদি তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াবিশেষণের অনুষ্ঠান, তাহাই ইহাদের ধর্ম্ম। বিজ্ঞানসম্মত কোনও মার্গে ইহারা চলিতে মোটেই অভ্যস্ত নয়।

প্রত্যেক শুভকর্ম্মের আরম্ভেই অপদেবতার অত্যাচার নিবারণের জন্য ক্রিয়াকর্ম্ম আছে। হিন্দুদেরও যাগযজ্ঞের এইরূপ অসুর রাক্ষসাদি যজ্ঞের

বিঘ্নকারী দস্যু, জাতুধান একদল, অপদেবতার উৎপাত হইতে রক্ষার জন্য বিঘ্নকারী বা বিঘ্নেশের পূজা,—উপাসনার প্রথা প্রচলিত। নবাগত একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই তাহাকে কবচ দ্বারা রক্ষা করা হয়। আমাদের দেশের পল্লীপ্রথার সঙ্গে এদিকে বেশ মিল আছে। যদিও এখন আমাদের দেশে সমাজ হইতে এ সকল সংস্কার দূরীভূত হইতেছে, কিন্তু তবুও বাঙ্গলার জননী এখনও,—এই কলিকাতায় বসিয়া স্বচক্ষে দেখিতেছি,—শিশুকে ঘরের বাহির করিবার সময় তাহার কনিষ্ঠাঙ্গুলি দংশন করিয়া গায়ে 'থু থু' করিয়া একটি থুৎথুড়ি দিয়া তবে দৃষ্টির বাহির করেন;—ইহাতে ডাইনীর দৃষ্টি হইতে রক্ষা করা হইল। তাছাড়া আমাদের মাসিকপত্রের পৃষ্ঠা উল্টাইলেই ত কবচের কত রকম বিজ্ঞাপন চক্ষে পড়ে। শুধু তাহাই নয়, আজকাল কবচের কারবার বেশ বাড়িয়া চলিয়াছে এবং ইউরোপ আমেরিকার মধ্যেও প্রচার কম নয়। কবচব্যবসায়ীরা জানেন ইহার লাভের মাত্রা আজকাল কত কত প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করিতেছে।

এ বেচারারা একে স্থূলবুদ্ধি দরিদ্র, অল্পেই তুষ্ট,—ব্যবসায় সম্পর্কে ক্ষেত্র তাহাদের সঙ্কীর্ণ,—তাহার উপরে ভারতের মত সর্ব্বদিকে পাশ্চাত্য জাতির প্রভাবাধীন হইতে পারে নাই—কাজেই এতটা কবচাদি মন্ত্রতন্ত্রের ব্যবহার নিজ দেশের ঐটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়াই রহিল,—জগতের অন্যান্য আধুনিক সভ্য দেশের মধ্যে প্রসারিত হইতে পারিল না, দারিদ্র্যও ঘুচিল না।

শুধু ইহাই নহে, এদেশে ঝড় জল বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের প্রতিকারের জন্য লামা তান্ত্রিকদের যে প্রবল মন্ত্রযুদ্ধ ঘোষণা, তাহা দেখিতেও এক অপূর্ব্ব বস্তু, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এ সকল এখনকার দিনে সাহিত্যে এবং চিত্রের সাহায্যে বোধ হয় সভ্য জগতের মধ্যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ে জানিতে বাকী নাই।

এখানকার জপপ্রণালী বড়ই বিচিত্র। একটি যন্ত্রের হাতলটিকে মুষ্টির মধ্যে ধরিয়া ঘুরপাক খাইবার একটি ঢোলকাকৃতি বস্তু আছে, তাহাতে একটি সুশৃঙ্খল সংযুক্ত অন্তে ছোট একটি ভারী ধাতুনির্মিত গোলক, সেইটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া সংখ্যায় সংখ্যায় জলপূর্ণ করে। একবার ঘুরিলেই একবার জপ হইল, এইভাবে কোন কোন লোক সমস্ত দিনই এই জপযন্ত্র ঘুরাইতেছে দেখিয়াছি। পথে-ঘাটে, যেখানে সেখানে এইরূপ জপের ব্যাপার দেখা যায়।

এইবার গার্হস্থ্য জীবনের কথা।

এখানে প্রদেশভেদে বিবাহ নানা প্রকার; তবে অল্প-বিস্তর যেটা সাধারণ সেই বিচিত্র বিবাহ-পদ্ধতিটির কথাই বলিব। কন্যাপ্রার্থী বর পূর্ব্ব হইতে কোন গৃহস্থের কন্যাকে মনোনীত করিলে প্রস্তাব উত্থাপন করিবার পূর্ব্বে ভাবী অর্দ্ধাঙ্গিনীর সহিত একটু ঘনিষ্ঠভাবে মিলিয়া থাকেন; এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, তিব্বতে বাল্য-বিবাহ বা শিশু-বিবাহ নাই, এদেশে যৌবনেই বিবাহ হয়। যাহা হউক, বরকন্যার মধ্যে আগে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইবার পরে একদিন সদলবলে অথবা সবান্ধবে বর সেই কন্যার গৃহদ্বারে উপস্থিত হন। তাঁহাদের দেখিয়া গৃহকর্ত্তা বা কর্ত্রী দ্বার বন্ধ করিয়া দেন। শুধু তাহাই নহে, পাত্রপক্ষকে চলিয়া যাইতে বলেন। কিন্তু পাত্রপক্ষ এ-সব কথায় টলেন না। এ সকল অনুগ্রহ জ্ঞান করিয়া

জপযন্ত্র

তাঁহারা জাঁকিয়া বসেন। পাত্রীর গৃহ হইতে যদি কেহ বাহির হয়, তবে বরপক্ষীয়গণ মাথার টুপি খুলিয়া তাঁহাদের সম্মান দেখাইয়া থাকেন এবং তাঁহার নিকট অভীষ্টপূরণের জন্য প্রার্থনা করেন।

যদি কন্যাপক্ষের মত হয়, অর্থাৎ যদি বর পছন্দ হয় এবং ঐ পাত্রের হাতে কন্যা দিলে সুখে থাকিবে এরূপ ধারণা হয় এবং পাত্র কন্যাকে বেশ মনোমত যৌতুক দিতে পারিবে এরূপ অবস্থা থাকে, তবে তাঁহারা দুই-তিন-চারিদিনে দ্বার খুলিয়া সকলকে ভিতরে আহ্বান করেন। আর যদি বরের দুরদৃষ্টক্রমে সমাগত পাত্রে কন্যাদান করিতে কন্যাপক্ষের অনিচ্ছা থাকে তাহা হইলে তাহাকে গালগালাজ, প্রস্তর ও শুষ্ক গোময় নিক্ষেপ ইত্যাদি সহ্য করিয়া তিন-চারদিন পরে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। তবে গালাগালি পাথর-ছোঁড়া প্রভৃতি কর্ম্মগুলি উপেক্ষিত এবং মনোনীত দুই পক্ষের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। ওটা স্ত্রী-আচারের মধ্যেই গণ্য, উহাতে অনেক সময় ধৈর্য্যের পরীক্ষা হয়। যদি বর মনোনীত

হয় তাহা হইলে তৃতীয় দিনে দ্বার খুলিয়া বরকে সবান্ধবে গৃহাভ্যন্তরে আহ্বান করা হয়। তার পর আদরযত্নের ধুম পড়িয়া যায়। শেষে এক নির্দ্ধারিত শুভদিনে শুভকার্য্য সমাধা হয়। দরিদ্র গৃহস্থের বিবাহের পণ তেরটি ভারতীয় টাকা, বরকে উহা কন্যাকর্ত্তার হাতে দিয়া কন্যাকে আনিতে হয়। তাহার পর কন্যাকে স্বগৃহে আনিয়া বরকে ভোজের আয়োজন করিতে হয়, অর্থাৎ মদ ও মাংসের সপিণ্ডকরণ হইয়া থাকে।

এদেশে জ্যেষ্ঠের বিবাহেই কনিষ্ঠেরাও বিবাহিত হন অর্থাৎ সেই এক স্ত্রীই সকলের পত্নী ও সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া থাকেন। তবে এইভাবে স্ত্রীজাতির একাধিক স্বামী থাকা হেতু একাধিক ভ্রাতাবিশিষ্ট সংসারে অশান্তি ও কলহের সীমা থাকে না। সেই কারণে আজকাল কন্যাপক্ষ বেশী সংখ্যক ভাইয়ের সংসারে কন্যা দান করিতে প্রায়ই নারাজ হন।

সিগাট্‌সী, গিয়াং-টিসি, লাসা প্রভৃতি বড় বড় শহর, রাজধানী অথবা সভ্যসমাজের কেন্দ্রগুলিতে বিবাহ আসলে এই প্রকারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে সেখানে গালাগালি বা ইট-পাটকেলের উপহারের ব্যবস্থা নাই। তাহা ছাড়া সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে কোথাও কোথাও কন্যার পিতামাতাই মনোমত পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতেছেন শুনা যায়। কিন্তু আসলে পূর্ব্বোক্ত রূপ বিবাহই তিব্বতের প্রায় সকল প্রদেশে সাধারণ ভাবে প্রচলিত।

এই অদ্ভুত বিবাহ-পদ্ধতির কারণও ইঁহারা দেখায়। প্রথমতঃ অনেক-গুলি ভাইয়ের এক স্ত্রী হইলে ভ্রাতৃবিচ্ছেদের বা গৃহবিচ্ছেদের সম্ভাবনা থাকে না। সংসার এককর্ত্রীর কর্ত্তৃত্বেই চলে, বিশৃঙ্খল হয় না। আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, ভারতের আর্য্য চন্দ্রবংশীয় পাণ্ডবদের প্রভাব এ সমাজে প্রবল। ইহারা পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে ভীমকেই অধিক শ্রদ্ধা করে, সম্মান এবং পূজা করে। সেই পঞ্চপাণ্ডবের যেমন লক্ষ্মীরূপা এক স্ত্রী দ্রৌপদী থাকায় তাহাদের আজীবন ভ্রাতৃবিচ্ছেদ হয় নাই, ইহারা সেই প্রাচীন পৌরাণিক আদর্শেরই অনুসরণ করিয়া নিজ দেশের সংসার ও সমাজ বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে।

এখানে স্ত্রী-স্বাধীনতা অবাধ। একাধিক পতি যাহার, তাহার যে-কোন পতি অমনোনীত হইলে তদ্দত্ত অলঙ্কার মাথা হইতে উন্মোচন করিলেই তাহার সঙ্গে তৎক্ষণাৎ সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হইল। ইহাই এখানকার ডাইভোর্স

এবং রাজবিধি। পুরুষের ইচ্ছামাত্রেই স্ত্রী ত্যাগ করিবার বিধি নাই। একমাত্র লামা হইয়া মঠে প্রবেশ করাই স্ত্রী ত্যাগের অন্য উপায়।

আমাদের বাংলা দেশে কোন গৃহস্থের পুত্র হইলে শঙ্খধ্বনি হয়, তাহার মুখ প্রফুল্ল হয়, কিন্তু কন্যা হইলে হাহাকার পড়িয়া যায়, মুখ বিমলিন হয়;—এখানে, তিব্বতে তাহার বিপরীত। বাংলায় পুত্র হইলে যাহা হয়, তিব্বতে কন্যা হইলে তাহাই হয়। কন্যাই গৃহস্থাশ্রমী পিতামাতার প্রার্থনীয়। অতি প্রয়োজনীয় ভোগ্য বস্তু হ্রাস প্রাপ্ত হইলে সেই অভাবই যেমন তাহার গুরুত্ব বাড়াইয়া দেয়, এখানেও সেইরূপ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির সংখ্যা কম হওয়ায় নারীর কদর এত বেশী। স্বভাবতই এখানকার নারী পুরুষগণের অত্যধিক আকাঙ্ক্ষার এবং অতিশয় যত্নের বস্তু। এখানে সর্বত্র, সকল সংসারেই, নারী যে শুধুই কর্ত্রী তাহা নহে,—সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম বাস্তবিক একা নারীকেই সম্পাদন করিতে হয় বলিয়া পুরুষ অপেক্ষা নারীর পরিশ্রমের ভাগ খুবই বেশী। জল আনা, আহার প্রস্তুত করা, কাপড় কাচা, কাষ্ঠ, শুষ্ক গোময় ইন্ধনার্থ সংগ্রহ করা, গৃহমার্জ্জন, গালিচা, নিজ নিজ পরিবারের বস্ত্রসকল বয়ন, এক কৃষিক্ষেত্রে হল-চালনা ব্যতীত সকল কাজই এই নারীই সম্পূর্ণরূপে করিয়া থাকে। এখানকার নরনারীর মধ্যে শ্রমবিভাগ অত্যন্ত বিষম। তিব্বতী পুরুষেরা স্ত্রীপরায়ণ, প্রায়ই মূঢ়চিত্ত, অলস ও মদ্যপায়ী। স্ত্রীকে বলে, 'আঁনে'। নারী বা স্ত্রীই তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় এবং শ্রদ্ধার বস্তু। অতিশয় শ্রদ্ধা ও গাঢ় প্রেমপরতন্ত্র হইয়া ইহারা বিবাহিতা স্ত্রীকে স্বভাবতঃ মাতৃসম্বোধন করিয়া থাকে। কোন সমাজেই মাতৃ-সম্বোধনের মত উচ্চ সম্বোধন ত আর নাই;—শ্রদ্ধার চরম বিকাশ হইলে তবেই না মাতৃসম্বোধনটা আসে। দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্র প্রদেশে সাধারণতঃ মাতৃসম্বোধনেই স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে দেখা যায়। এই তিব্বতের অধিবাসীরা যথার্থই তান্ত্রিক; কারণ তান্ত্রিকদের মধ্যেও ভৈরবীকে একমাত্র মাতৃসম্বোধনই চলে।

এখানকার স্ত্রীলোকেরাই প্রসিদ্ধ তিব্বতী গালিচা বুনিয়া থাকে। বিশ বাইশ হইতে আরম্ভ করিয়া উহা দুই শত টাকা অবধি জোড়া বিক্রয় হয়। তাহার মধ্যে ফুল ও লতাপাতার রচনাগুলিও তাহারাই করে। পুরুষেরা কেবল উল বা পশম কাটিয়া দেয় মাত্র। পরে সূতা কাটা, রং করা প্রভৃতি

সকল পাট তাহারাই করে। তবে ও সকল দামী আসন গালিচা ইত্যাদি লাসা অঞ্চলেই বেশী হয়।

উহারা অলঙ্কারের মধ্যে প্রবাল ব্যবহার করিতে অত্যন্ত ভালবাসে। প্রতি বৎসর তাক্লাখার মণ্ডিতে প্রায় ছয় হাজার টাকার প্রবাল ভারতবর্ষ হইতে ধারচুলার পথে তিব্বতে আসে। তবে উহা শুধুই তিব্বতের এই অঞ্চলটুকুর জন্য। ভোটিয়ারাও উহা প্রভূত পরিমাণে কণ্ঠালঙ্কারের সঙ্গে ব্যবহার করে;—হিমালয়বাসী ভোটিয়ারা অনেকাংশে তিব্বতের আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুকরণ করে ইহা আগেই বলিয়াছি। লোহিত বা রক্ত প্রবাল ব্যতীত ঘোর নীল এবং হালকা নীল দুই রকম প্রস্তরের ব্যবহারও এখানে দেখিয়াছি।

ভারতবর্ষের মধ্যে সতীত্বের গৌরব যেমন, এখানে সতীত্ব বলিয়া একটা কিছু গৌরবের বস্তু নাই, বা উহার অর্থও কেহ বুঝে না। বিবাহিতা স্ত্রী হইলেও দূর সম্পর্কের ভ্রাতৃবৃন্দ যে কেহ স্বামীর অনুপস্থিতিতে তাহার স্ত্রীর নিকট গমনাগমন করিতে পারে, তাহাদের কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিবার রীতি নাই। এইটাই আমার স্ত্রী, অপর যে কেহ তাহার প্রণয়পাত্র হইলে তাহার ধর্ম্মহানি হইবে, এসকল ভাব বা সংস্কার অন্ততঃ তিব্বতের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এ-জাতির মধ্যে নাই বলিলেই হয়। ইহাদের সমাজের মধ্যে বেশ্যা বলিয়া একটা পৃথক শ্রেণী নাই।

আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্ট শরীর যেরূপ, হাত-পা রোগা, পেটটি মোটা এবং বিবর্ণ হয়, এদিকেও সেইরূপ পুরুষের মধ্যে প্লীহাবৃদ্ধি অনেকেরই দেখিয়াছি। উহা শুষ্ক মাংস, মদ্য এবং অনাচারের ফলেই হয়। নচেৎ তিব্বতের মত স্থানে এরূপ শরীর হওয়া স্বাভাবিক নহে। গোম্পা, মঠ বা ধর্ম্মমন্দিরে স্ত্রীলোকেরাই বেশী যায়।

ভারতের কোনও কোনও প্রদেশে গৃহস্থাশ্রমী দীক্ষিতগণের মধ্যে একটা ব্যবহার অনেককাল পূর্ব্ব হইতে ছিল, স্ত্রীলোক যৌবনপ্রাপ্ত হইলে প্রথমে সন্ন্যাসী বা গুরুর নিকট গমন করিত, তিনিই তাহার গর্ভাধান করিতেন। গুরু-প্রসাদি হইলে পর তবে স্বামী নিজ বিবাহিত স্ত্রীকে ব্যবহার করিতে পারিতেন। ভারতে মধ্যযুগেও সাধুসন্ন্যাসী দ্বারা গৃহস্থ কামিনীগণের পুত্র উৎপাদন করানো একটি সৎকর্ম্মের মধ্যে ছিল; এখানেও সেই ধরনের একটি ব্যবহার আছে। অনেক স্থলে স্বামী শ্রদ্ধাপরতন্ত্র হইয়া সৎ এবং

ধার্ম্মিক পুত্রকামনায় স্বয়ং একর্ম্মে অনুমতি দিয়া থাকেন। আবার কোথাও কামিনীগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াও করেন; তাহাতে স্বামীর কোন আপত্তির কারণ নাই। এখানকার স্ত্রীগণের মধ্যে একটি বিশ্বাস আছে যে যদি কোন লামা তাহার সংসর্গ কামনা করেন, তাহাতে তাহার শরীর ত পবিত্র হইবেই, পরন্তু অন্তে তাহার সৎগতি হইবে; —আর উহাতে তাহার যে মহাপুরুষ সন্তানাদি হইবে তাহা তাহার অলামা পতির সংসর্গে হইবার সম্ভাবনা নাই। পুত্র হইলে লামা বা বুদ্ধের অবতার হইবে।

এই সকল কারণে নব্য লামাগণের মধ্যে অনেকের চরিত্রহীনতার কথা শুনা যায়। তবে একান্তবাসী সাধকের বা যোগী লামাগণের কথা স্বতন্ত্র। সমানগতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে যেমন এ সকল প্রাচীন প্রথা বিরল এবং বহু স্থানে লুপ্ত হইতেছে এখানেও সেইরূপ চলিতেছে; তবে বিলম্বিত লয়ে।

এখন ফিরিবার কথা,—আমরা সমস্তদিন মানসসরোবরের তীরস্থ পথ ধরিয়া চলিলাম। প্রায় তৃতীয় প্রহরের শেষে যখন দক্ষিণে ফিরিলাম সেই সঙ্গে সঙ্গেই রমণীয় মানসসরোবর নয়নপথ হইতে অন্তর্হিত হইল;—আর সেই সঙ্গে সকলের অগোচরে অন্তরের মধ্যে একটি বেদনাও বাজিতে সুরু করিল, ভিতরটা যেন কাঁদিয়া উঠিল। যাহাকে খুঁজিতে আসিয়াছিলাম তাহাকে না পাইয়া আমি বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতেছি;—ইহাই সেই বেদনার ভাষা।

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে মহা অশান্তির মধ্যে প্রথম রাত্রি ফাঁকা মাঠে, তাঁবুটি খাটানোর পরিবর্ত্তে পাতিয়া রাত্রি-যাপন করিতে হইয়াছিল। ইহার কারণ আমাদের মুরুব্বি মানসিং-এর মর্জ্জি। সমস্তদিন, সারাপথে,—ঝড়ের মত অতি প্রবল বাতাস পাইয়াছিলাম; সেই বাতাসের প্রভাবে শরীর ক্রমশঃ বিবশ হইয়া পড়িল। অনেক কষ্টে আরও কতকটা চলিয়া একস্থানে মাতালের মত টলিতে টলিতে একেবারে শুইয়া পড়িলাম। দলবল তখন অনেকটা আগে চলিয়া গিয়াছে। রুমা, রুমতী, সঙ্গী-মহাশয়, ঝাব্বুতে ছিলেন, সেই দলের সঙ্গে নাথজীও আগে। সে প্রচণ্ড বাতাসের কথা কি আর বলিব, স্মরণে এখনও যেন জর বোধ হয়।

সেথায় কতক্ষণ, প্রায় আধঘণ্টা হইবে, পড়িয়া থাকিবার পর রুমার ভগ্নী আসিয়া 'উঠো উঠো' বলিয়া আমায় উঠাইল, জানাইল সন্ধ্যা হইয়া

আসিতেছে, এখানে পড়িয়া থাকিলে ত চলিবে না। তাহার পর দেখি রুমাও আসিয়া উপস্থিত।

তাহার পশ্চাতেই একটা হুনিয়া দুইখানি কম্বল লইয়া আসিয়া উপস্থিত; তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। তাহারা জানাইল যে দেরী দেখিয়া লালসিং পাতিয়ালের মা এই কম্বল দুইখানি আমার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং চলিতে অশক্ত হইলে পিঠে করিয়া আনিতে বলিয়া দিয়াছেন।

যখন কম্বল আসিল তখন আর পা যেন উঠিল না। একখানি কম্বল অর্দ্ধেক পাতিয়া অপরার্দ্ধ মুড়ি দিয়া আমি সেইখানেই শুইয়া পড়িলাম। আর সেই দেখাদেখি বাহক হুনিয়াও সেইখানে শুইল। একটু দূরে রুমা ও তাহার ভগিনী আর একখানি কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। প্রথম রুমার ভগ্নী কতক্ষণ পা মেলিয়া বসিয়াছিল, তাহার পর আমার 'উঠো উঠো' করিতে করিতে সেও মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল এবং নিদ্রিত হইল।

এক ঘুমের পর উঠিলাম, দেখিলাম কম্বলাদি শিশিরে সিক্ত। গভীর নিস্তব্ধ রাত্রি, প্রায় দ্বিপ্রহর হইবে, তখন চাঁদ উঠিয়াছে, তাহার উপর অল্প কুয়াশাও ছিল। সেই হুনিয়া এবং রুমাদের উঠাইয়া দিলাম, আমার শরীর সুস্থ হইয়াছে, এখন যাইতে পারিব, চল যাওয়া যাক্।

অত্যন্ত তৃষ্ণা পাইয়াছিল, ভাবিলাম তাঁবুতে গিয়া জল পাইব, ক্ষুধাও ভয়ানক ছিল। সেই হুনিয়াদের সঙ্গে যাইতে লাগিলাম।

দেখিলাম, পথে দুই-একজন এদেশীয় যাত্রী চলিয়াছে;—তাহারা কৈলাসের দিকে চলিতেছে। কি সর্ব্বনাশ! এত রাত্রে তাহাদের দেখিয়া ডাকাত ভাবিয়া আমি পশ্চাৎ ফিরিবার যোগাড় করিতেছিলাম; সঙ্গের সেই হুনিয়া বুঝাইয়া দিল—কোন ভয় নাই, উহারা তীর্থযাত্রী, রাত্রে পথ চলিতেছে।

পরে রুমার মুখে শুনিলাম যে, দিনমানে রৌদ্রতাপে শরীর ক্লান্ত হয় বলিয়া অনেকে রাত্রেই পথ চলে। আবার এখানে আর একটি সংস্কার আছে যাঁহারা যথার্থ সাধু এবং তপস্বী তাঁহারাই রাত্রে একাকী পর্য্যটন করেন, দিনমানে একস্থানে বসিয়া যান। চলিতে চলিতে জপও চলে। আমি দেখিলাম যে, সে লোকটি মাথা হেঁট করিয়াই চলিতেছে, কোনদিকে চাহিতেছে না। আরও দেখিলাম সে তীরের মতই আমাদের অতিক্রম

করিয়া গেল, যেন বাতাসে উড়িয়া গেল। রুমা বলিল, ইনি যোগী, সিদ্ধ মহাত্মা।

যাহা হউক, তখন ত তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছিল;—সেখানে পৌঁছিয়া কোথায় জল, কোথায় জল! জল যে কোথায় কেহ জানে না। গোঁ ভরে একেবারে সন্ধ্যা অবধি চলিয়া হঠাৎ একটা জায়গায় আড্ডা করা হইয়াছিল। নিকটে জল আছে কি না দেখা হয় নাই। পাকসাকের জন্যও জলের প্রয়োজন হয় নাই; যেহেতু মুরুব্বির ইচ্ছানুসারে সকলকে চানা চিবাইয়া সেই রাত্রি কাটাইতে হইয়াছিল। তিনি তাঁহার পীড়িত সন্তানটিকে লইয়া যত শীঘ্র পারেন তাক্লাখারে ফিরিবার অবিরাম চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু হাত দিয়াই কি হাতি ঠেলা যায়? সেথায় পৌছাইতে দুইটি রাত্রি ও তিনটি দিন লাগিয়াই গেল। যাহা হউক, এখন তৃষ্ণায় কাতর হইয়া যখন সঙ্গী-মহাশয়কে পানীয় জলের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি একখণ্ড কাপড়ে বাঁধা চালছোলা ভাজা দেখাইয়া দিলেন। আজ সকলেই যাহা খাইয়াছে আমার জন্য তাহার ব্যতিক্রম হইবে কি করিয়া।

যাহা হউক, আমরা মানসসরোবর হইতে যাত্রা করিয়া তৃতীয় দিন সকালে উঠিয়া শুনিলাম, আজই আমরা তাকলাখার পৌছিব। আমাদের মুরুব্বি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত চলিয়া সদলবলে মধ্যপথে এক গৃহস্থের বাড়ীর সম্মুখে মাঠের উপর তাঁবু গাড়িলেন, সেখানেও তাঁহার কিছু কারবার আছে।
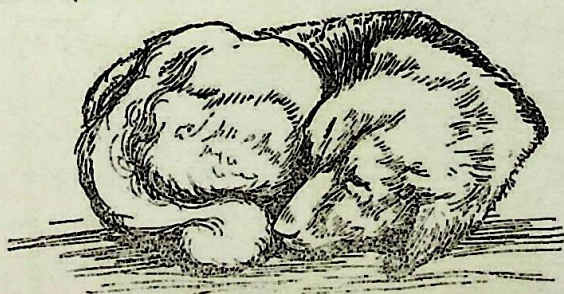
তিব্বতের চৌকিদার

লাভের মধ্যে আমাদের এক তিব্বতী কৃষক গৃহস্থের ঘরে কিছুক্ষণ অবস্থিতি ঘটিল। গৃহদ্বারে একটি বিপুলকায় তিব্বতী চৌকিদার অঘোরে ঘুমাইতেছে;—আমরা এতগুলি লোক তাহার পাশ দিয়া ভিতরে প্রবেশ

করিলাম; বেচারা অতিশয় ভদ্রব্যক্তি, কোন সাড়াশব্দ করিল না;—সুতরাং ভিতরে অবাধে প্রবেশ করিলাম। দুইটি তিব্বতী নারী এ ঘরের গৃহিণী। আমাদের মধ্যাহ্নভোজনের ব্যাপারও এইখানেই সম্পন্ন হইল। ছাতু ও ঘোল দিয়া তাঁহারা অভ্যর্থনা করিলেন। আমাদের সঙ্গে রুমা প্রভৃতি এই যে ভোটিয়া নারীর দল, ইহারা এই তিব্বতী পরিবারের সঙ্গে এমনই ঘনিষ্ঠ ব্যবহার করিল যেন কতকালের চেনা। আমাদের পরিচয় দিল কলিকাতার সাধু মহাপুরুষ বলিয়া। কাজেই গৃহলক্ষ্মীগণ আমাদের তৃপ্তির জন্য পর্যাপ্ত ছাতু ও ঘোল আনিয়া হাজির করিলেন।

ঘরের গিন্নি

নারী বলিতেছি বটে কিন্তু ইহাদের ক্ষিপ্রকারিতা এমনই অসাধারণ এমনটি আমাদের দেশে পুরুষের মধ্যেও বিরল। একজন ছাতু আনিল, সঙ্গে সঙ্গেই একজন ঘোল আনিল! রুমারা চা খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ

করিবামাত্রই চায়ের সকল কিছুই আসিয়া পড়িল। যেন তাহাদের আর কিছুই কাজ নাই, কেবল আমাদের সেবা করিবার জন্যই সেইখানে আছে। আমার একটু নুন দরকার,—সঙ্গী-মহাশয়েরও তাই ;—ঘোলটা বড়ই টক্ ছিল, তৃষ্ণায় ছাতিও ফাটিতেছিল ;—নুন চাহিবামাত্রই আসিল ; লবণযুক্ত ঘোলের সঙ্গে তৃষ্ণা মিটাইলাম। প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের অন্তর্ধান। এই দুইটি নারী ; দুইটি ঘরের কর্ত্রী। একখানি বাড়ীতে দুই দিকে দুইটি সংসার। আমরা দশ-বারোজন গিয়াছি। এই বিবাহিতা নারী দুইটিই আমাদের সৎকার করিতেছে। তাহার মধ্যেও তাহারা নিজেদের ঘরকন্নার কাজও কতক করিয়া লইতেছে। স্বামী ঘরে নাই, তাঁহারা দূরগ্রামে গিয়াছেন, কিন্তু অতিথির কোন অভাব নাই, কর্ত্তা বলিয়া আর কেহ আছে তাহা জানিবার অবকাশই নাই। সদর দরজা খুলিয়া দেওয়া হইতে আমাদের বিদায় দিয়া দরজা বন্ধ করা পর্য্যন্ত কাজ নিঃসঙ্কোচেই কলের মত হইয়া গেল। তাহাদের ঘরে আমরা প্রায় আড়াই-তিন ঘণ্টা ছিলাম। ভোজনের পর তাহাদের ঘরগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম। তিব্বতী বাসনকোসনে ঘরের দুই দিক সাজানো। বিশেষ যেগুলি চক্ষে পড়িল তাহা চায়ের কেটলি, দুগ্ধপাত্র, মাখনপাত্র, চা ঢালিবার চোঙ, রন্ধনপাত্র —আরও কত কি সব।

ইহারা চীনা চা খায়। ইটের থানের মতই কঠিনভাবে জমানো চায়ের পাতা, ব্রিক-টি তাহার ইংরেজী নাম। চাল ডাল সিদ্ধ করার মত ফুটাইয়া উহা রক্তবর্ণ হইলে নুন ও মাখনের সঙ্গে ফেনাইয়া খাইতে হয়, অতীব তেজস্কর এই উষ্ণ পানীয়। পানের সঙ্গে শীত কমিয়া দেহের তাপ বাড়িয়া যায়।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তাকলাখারে প্রবেশপথে কর্ণালীর সেতুর নিকটে দেখিলাম্ পশমের বাজার বসিয়াছে। যত বা ভেড়বকৃরী তত তাদের লোম,—আমাদের দুই দিকেই স্তূপাকার রহিয়াছে, আর মানুষ, দেশী বিদেশী খরিদ্দারও কম জমা হয় নাই। মাঠের উপরে পশম কাটাই হইতেছে, সেখানেই জমা হইতেছে ; সেইখানেই বিক্রয় হইয়া নেড়া ভেড়া-ছাগলের পাল লইয়া অধিকারীরা আপন গ্রামের দিকে চলিয়া যাইতেছে।

ক্রমে লালসিং পাতিয়ালের দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, রংদার এক তিব্বতী বহুরূপী গান করিতে করিতে আনন্দে নাচিতেছে, আর সারি সারি লোক জড় হইয়া তাহা দেখিতেছে। গানের

রংদার এক তিব্বতীয় বহুরূপী

কি স্বর, কি গিটকিরি, কিবা গমক, আমাদের কাছে সে এক অপূর্ব্ব বস্তু। তিব্বতের গান শোনাও ভাগ্যে ঘটিয়া গেল।

ফিরিবার সময় আমরা তাকলাখারে তিনটি রাত ও তিনটি দিন ছিলাম। ইতিমধ্যে রুমা, কোজর জো দর্শনে গেলে, সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন, নাথজীকে দূর করে দাও, তাঁকে আর রাখবার প্রয়োজন কি? আমি তীব্র প্রতিবাদ করিলাম, তাহাতে তখনকার মত তিনি থাকিয়া গেলেন।

এই কয়দিনে তিব্বতকে আমরা শেষ উপভোগ করিয়া লইলাম। কোজর জো হইতে ফিরিয়া রুমা আমাদের যাত্রার বন্দোবস্ত করিল। ঠিক হইল আমরা তিনজন এবং রুমা, পরদিন গারবিয়াং যাত্রা করিব। রুমাকে আমাদের সঙ্গেই যাইতে হইবে;—না হইলে গারবিয়াং হইতে আমাদের কুলী বাহক যোগাড় করিয়া কে দিবে,—সে-ই ত আমাদের এখানকার একমাত্র সহায়।

লালসিং পাতিয়ালের ঘরে এক তিব্বতী কবিরাজ দেখিলাম,— লালসিংই আলাপ করাইয়া দিল। তাঁর এখানে ঔষধপত্রের কারবার এবং
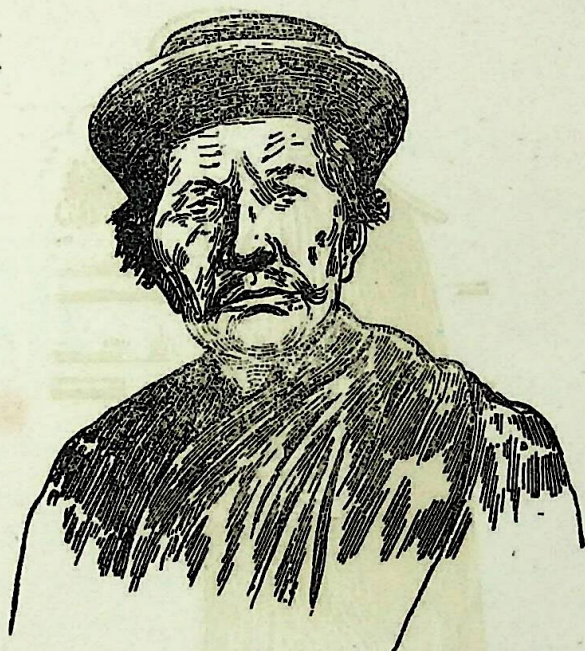
তিব্বতী কবিরাজ

হিমালয়ের অনেক জড়িবুটি সংগ্রহ করা আছে। অবশ্য আমরা শিলাজতু ব্যতীত আর কিছু খরিদ করি নাই। ইহাদের চিকিৎসা-প্রণালী স্বতন্ত্র।

গুম্ফ উৎসবের দিনে লামাদের পোষাক দেখিয়াছিলাম, যাহা রোমান ক্যাথলিকদিগের পোষাকের অনুরূপ। সে বিষয়ে একজন লামাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। শিম্পি-লিং গোম্পার একজন লামা লালসিংএর দোকানে আসিয়াছিলেন। এখানে তাঁহাকে নির্জ্জনে পাইয়া, অবশ্য একজন ভোটিয়া দোভাষীর সাহায্যেই, জিজ্ঞাসা করিলাম ঐ উৎসবের দিনে যে পোষাক-টুপি প্রভৃতি আপনারা পরিয়াছিলেন উহা কোন্ দেশের ?

তিনি বলিলেন, উহা আসলে চীন দেশের, সেইখান হইতেই আমরা বহুকাল পূর্ব্বে বুদ্ধের সময়ে আনিয়াছি।

আমি বলিলাম, বুদ্ধের সময়ে ? কি বলিতেছেন ?

তিনি বলিলেন, হাঁ, বুদ্ধ হইতেই সঙ্ঘ হইয়াছে আর সঙ্ঘ হইতেই সঙ্ঘের পোষাক-পরিচ্ছদ যা-কিছু সবই হইয়াছে।
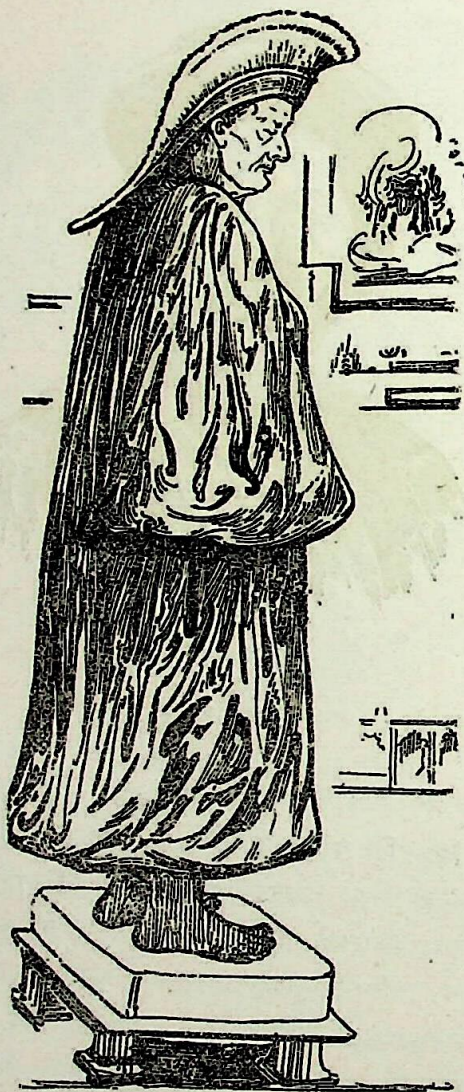
গুম্ফ উৎসবে লামার পোষাক

দেখিলাম,—লামারা এ বিষয়ে আমার মতই জ্ঞানী।

তবে প্রাচীনকালে কোন খৃষ্টীয় অব্দে উহা চীন হইতেই আনা হইয়াছে অথবা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে, ইহাই অনুমান করিলাম।

॥ ১৬ ॥

নির্ম্মাণাকা সড়ক, আবার আসকোট
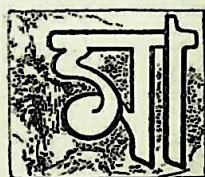
নসসরোবর ও কৈলাসদর্শন হইল, আমরা চতুর্থ দিনে পুরাং হইতে গারবিয়াং-এর পথে যাত্রা করিলাম। এবারে, না হাঁটিয়া পথের জন্য একটা বাহন লইয়াছিলাম ;—শরীর তখনও বিশেষ দুর্ব্বল ছিল—কাজেই দুইজনে দুইটি ঘোড়া লওয়া গেল। নাথজীই কেবল হাঁটিয়া যাইতে লাগিলেন, কোনও বাহনে চড়িয়া যাইতে স্বীকার করিলেন না।

আবার সেই লিপুধুরা উত্তীর্ণ হইলাম। রুমাও ঘোড়ায় ছিল। লিপুধুরায় উঠিতে এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলাম। ঘোড়াওয়ালা সেই হুনিয়া যুবকটি চাড়াইয়ের মুখে ঘোড়ার লেজ ধরিয়া টানিতে লাগিল ; তাহাতে আমি রুষ্ট হইলাম দেখিয়া রুমা বলিল, উহারা খাড়া চড়াই উঠিতে ঐভাবেই উঠে, ইহাতে ঘোড়ারও কষ্ট হয় না। একে ত ঘোড়া চড়াই উঠিতেছে, পিঠে তার পুরা মানুষ সওয়ার একটি তাহার উপর একটি বিকটদর্শন হুনিয়া সজোরে তাহার লেজ ধরিয়া টানিতেছে, ইহাতে কেমন ভাবে যে তাহার কষ্ট হয় না,—তা বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, কালাপানিতে পৌঁছিয়া গোবরিয়া পণ্ডিতের মোকামে উঠিলাম। গোবরিয়া পণ্ডিতের কথা গারবিয়াং প্রসঙ্গে বলিয়াছি, এই কালাপানিতে তাহার একখানি উৎকৃষ্ট কুঠি আছে। তাহার পরিচিত স্বজাতিরাই এখানে থাকিতে পায়। সেইখানি ছাড়া এখানে নদীর ওপারে পান্থশালা ভিন্ন আর কাহারও কোন ঘর নাই। রুমার পরিচয়ে তাহারই সঙ্গে আমরা রাত্রে সেখানে থাকিয়া পরদিন প্রভাতে আহারাদি শেষ করিয়া গারবিয়াং-পথে যাত্রা করিলাম।

কালাপানি পার হইয়া কিছুদূর আসিতে মধ্যে মধ্যে বৃক্ষলতাদি নয়নপথে আসিতে লাগিল। আজ এতদিন পরে হরিৎবর্ণের শোভা দেখিয়া প্রাণে যে আনন্দ হইল তাহা আর কি বলিব। মধ্যে মধ্যে বনগোলাপের

বনগুলাপকী ফল

গাছও দেখা যাইতে লাগিল। নাথজী আর আমি শেষে আসিতেছিলাম। নাথজী বলিল, দেখিয়ে! ইস্‌কী ফল ক্যাসা পাক্কী হৈ, দেবীজী তো খানে লাগা, বো দেখো। দেখিলাম, সত্যই দেবীজী ঘোড়ার উপরে বসিয়াই বনগোলাপের ফল ভাঙিয়া খাইতেছে। আমরা লক্ষ্য করিতেছি দেখিয়া সে হাসিয়া বলিল, পিতাজী লেওনা, বহুত মিঠা বনগুলাপকী ফল; হিঁয়া ইয়ে হাম লোক খাতা হৈ। বলিয়া কতকটা আগে আসিল এবং গোটাকতক তুলিয়া আমাদের দিল। অল্প কষা এবং অল্প মধুর ফলগুলি, বড় সুন্দর দেখিতে, অনেকটা ছোট ছোট দেশী কুলের মত! এই পার্ব্বত্য অঞ্চলে বিস্তর গোলাপ গাছ দেখিলাম, তাহাতে কাঁটা নাই, বেলফুলের মত ছোট ছোট ফুলও ইহাতে দেখিলাম। কিন্তু এই পর্ব্বতে আসিয়া গোলাপের ফুলের গৌরব ঘুচিয়া যে ফলে দাঁড়াইয়াছে তাহাই আশ্চর্য্য লাগিল। ফলগুলি কাঁচাবেলায় সবুজবর্ণ থাকে, পাকিলে লাল হয়, কোনটা বা গাঢ় বেগুনী হইয়া যায়;—সুপক্ক ফলগুলির স্বাদ বেশ মিষ্ট। গোটাকতক কাঁচা আনিয়াছিলাম, উহা সাত-আট দিন পরে কালো এবং কঠিন হইয়া গেল, কিন্তু পচিয়া যায় নাই; এক-একটা গোলাপ গাছ করবী গাছের মতই বড় দেখিয়াছি।

গারবিয়াংয়ে পৌছিয়া রুমার ওখানে দুইদিন ছিলাম। সেখান হইতে চৌদাস অবধি দুইজন ভোটিয়া বাহক রুমাই সংগ্রহ করিয়া দিল। তৃতীয় দিনে আহারাদি শেষ করিয়া গারবিয়াং হইতে আমাদের বিদায় লইতে হইল। শীতের প্রারম্ভে রুমা অবশ্য অবশ্যই কলিকাতা গিয়া মঠে মাতাঠাকুরাণীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবে একথা পুনঃ পুনঃ জানাইল। পরে তাহার এক প্রিয়তমা সঙ্গিনীর সহিত বুদির চড়াইয়ের উপর পর্য্যন্ত আসিয়া আমাদের বিদায় দিল এবং বিশেষ করিয়া মায়াবতী হইয়া যাইবার কথাটি বলিয়া দিল,—জরুর, মায়াবতী হোয়কে জানা। আমরা বাঙ্গালী বলিয়াই মায়াবতীর সাধুদের সঙ্গে আমাদের মিলাইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার ছিল।

এতদিন রুমার আশ্রয়ে থাকিয়া তাহার যত্ন ও সেবা লইয়া একটি গভীর মমতা অন্তরে চাপা ছিল, পূর্ব্বে তাহা টের পাই নাই;—এখন গারবিয়াং ত্যাগ করিবার সময় তাহা ভালরূপেই জানাইয়া দিল। তখন মনে হইল এ-স্থান আর ত্যাগ করিয়া যাইব না, এইখানেই থাকি। প্রাণ যেন আর কোনমতে গারবিয়াং ছাড়িতে চাহে না।

শেষে বিদায় লইয়া যখন কতটা নামিয়াছি তখন মিলিত বামাকণ্ঠে গান শুনিতে পাইলাম। উপরে চাহিয়া দেখিলাম রুমারা তুইজনে একখানি প্রকাণ্ড পাথরের উপর বসিয়া সাদা কাপড় উড়াইয়া গান করিতেছে। সে কি করুণ কণ্ঠ! আমি ইতিপূর্ব্বে রুমাকে গান করিতে শুনি নাই। সেই কণ্ঠ-সঙ্গীত এখনও যেন কানের মধ্যে সেইভাবে বাজিতেছে। উহা শুনিয়া শোকের মতই একটি বেদনা অন্তরে অন্তরে বাজিয়া উঠিল যেন কাহার স্নেহ মমতা পশ্চাৎ হইতে টানিতেছে। মন আর সম্মুখস্থ পথের দিকে নহে,—পশ্চাতের স্থানগুলিতে পড়িয়া তত্রস্থ অবস্থানকালের সকল কথাই স্মরণে জাগাইয়া দিতেছে। শোকের অবস্থায় অন্তরটা যেমন মুহ্যমান হইয়া পড়ে এখন আমার ঠিক সেইরূপ অবস্থা।

হায় মমতা! একটা স্থানে সুখে কিছুদিন থাকিলে ত্যাগের সময় সেই স্থানের মমতা যখন মনকে এতটা পীড়িত করে তখন এই শরীরের মধ্যে এতদিন বাস করিয়া সেটি ছাড়িতে এই দেহ বিচ্ছেদের বেদনা এড়াইতে না জানি কত অনিচ্ছা ও দ্বন্দ্ব সহ্য করিতে হয়। কিন্তু হায়, মৃত্যুর কোলে, সেই ত সব ছাড়িয়াই ঝাঁপাইতে হয়। তাই ভাবিতেছিলাম যে, ভোগের সময় বা কর্ম্মাবস্থায় মমতা টের পাওয়া যায় না; সেই অদ্ভুত জীবন্ত সত্যের প্রভাব তখনই টের পাওয়া যায় যখন বাধ্য হইয়া ত্যাগের সময় আসে। তখন কি হয়? শুধু অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার একটি বিষম বেদনা সার করিয়া প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী নিয়মের স্রোতে গা ভাসাইতে হয়। সে-নিয়মের ব্যতিক্রম করিবে কে? হায়! স্বতঃপ্রবৃত্ত ভোগমূলক প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিতে যদি আনন্দের বেগটি না থাকিত তাহা হইলে বিচ্ছেদে এত বেদনা ভোগ করিতে হইত না। এ-কথা কি কেহ বুঝিবে?

সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন, আহা, শুনচ ওরা কেমন মঙ্গলগীত গাইছে?

উৎরাইটি প্রায় তুই মাইল। যখন আমরা নীচে নামিলাম তখন গানের ধ্বনি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। গারবিয়াংয়ের সম্বন্ধ কাটাইয়া এইবার আমরা মালাবার পথ ধরিলাম।

রাস্তায় চলিতেছিলাম—দক্ষিণ হস্তে লাঠি আর পা-তুইটি অবসন্ন, শরীরটিকে লইয়া যেন কতকটা লক্ষ্যশূন্য হইয়া সেই পার্ব্বত্য বন্ধুরতা অতিক্রম করিয়া চলিতেছিল। চক্ষু তুইটি মাঝে মাঝে রাস্তা দেখিতেছিল,

আর মন তখনও ভাবিতেছিল গারবিয়াং। সেই বিশিষ্ট দৃশ্যাবলী, কালীনদী, নেপালের সীমানায় দেওয়ার জঙ্গলময় পাহাড়, বনের শেষে শৈলশ্রেণী; তদুপরি দূরত্ব হেতু ঈষৎ নীলাভ ধূসর প্রস্তরপ্রদেশ, শীর্ষে তাহার শুভ্র তুষারমণ্ডিত কিরীট।

আরও ভাবিতেছিলাম, রুমার বাড়ীঘর, যেখানে আমরা, নিজগৃহের মত প্রায় তিন সপ্তাহকাল কাটাইয়াছিলাম; তারপর প্রতিবেশী এবং প্রতিবেশিনীগণ ও দিলীপসিং। কলিকাতাবাসী বাঙালী বলিয়া তাহাদের শ্রদ্ধা ভক্তি এবং প্রীতি। তাহার পর রুমার সরল স্বভাব, ভক্তি, প্রীতি এবং কলিকাতা গিয়া মাতাজীর নিকট দীক্ষা লইবার কথা। সুদূর হিমালয়ে এই পর্ব্বতবাসিনীর রামকৃষ্ণের উপর অসীম ভক্তিশ্রদ্ধা আসিল কি প্রকারে? এই সকল ভাবিতে ভাবিতে মালপায় চলিয়া আসিলাম। রাত্রে সেই ওড়িয়ারেই শয়ন করিলাম।

পরদিন মালপা হইতে আহারাদি করিয়া দিবা প্রথম প্রহরের মধ্যেই আমরা যাত্রা করিলাম। যে-পথটি অতিক্রম করিতে চলিয়াছিলাম তাহার নাম নির্ম্মানীকা সড়ক। পথটির বৈশিষ্ট্য আছে।

পাঠকের স্মরণ আছে, যখন সাংখোলা হইতে সেই কঠিন পথে আমরা মালপায় আসি, শেষের দিকে একটি কাষ্ঠসেতু পার হইয়া কতকটা নেপালের এলাকায় আসিয়া আবার একটি পুল পার হইয়া ব্রিটিশ এলাকায় মালপার পথ ধরিতে হইয়াছিল। পুল দুইটি টুটিলে খাড়া চড়াই ভাঙিয়া যে দুর্গমপথে পাঁচ মাইলের ফের পড়ে তাহারই নাম নির্ম্মানীকা সড়ক।

প্রখর সূর্য্যকিরণে বরফ গলিয়াও বটে এবং বর্ষায় বারিপাতের জন্যও বটে কালীর বেগ অনেকটা বৃদ্ধি হওয়ায় পুল দুইটি টুটিয়াছে, উহার এখন আর কোন চিহ্নই নাই। কাজেই এই দুস্তারে এখন নির্ম্মানীকা সড়ক ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই।

প্রায় দুইমাস পূর্ব্বে যখন আসি, তখন সময় ছিল আষাঢ়ের প্রথম সুতরাং এখানে গ্রীষ্মের শেষ, এই পুল দুইটি পার হইয়া পথের অনেকটা উচ্চে সেই মনোহর জলপ্রপাতটি দেখিতে দেখিতে যে চড়াইয়ের পথটি দিয়া মালপায় পৌঁছিয়াছিলাম, এখন মালপা হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় শ্রাবণের শেষ, এখানে ঘোর বর্ষা, সুতরাং সে-পথও নাই আর পথের সে-মূর্ত্তিও নাই; চারিদিক জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে এবারে যে পথ

আমাদের ধরিতে হইল অর্থাৎ নির্ম্মানীকা সড়ক উহা সেই জলপ্রপাতের নীচের পথ হইতে প্রায় দেড় বা দুই শত ফুট উপর দিয়া অর্থাৎ প্রায় পাহাড়টির শৃঙ্গ ঘেঁষিয়া। কিন্তু শৃঙ্গ বলিতে কেহ যেন না বুঝেন যে এইখানেই পাহাড়টির উচ্চতার পরিসমাপ্তি। উহা সেই পর্ব্বতের শৃঙ্গ বটে, কিন্তু অপর একটি বিশালায়ত অচলের আরম্ভ। এতটা পথ হিমালয়ের মধ্যে বেড়াইলাম, কোথাও সর্ব্বোচ্চ শিখর বলিয়া কিছু একটা দেখিলাম না; যেথায় সর্ব্বোচ্চ শিখর বলিয়া উঠিয়াছি, দেখিয়াছি তাহার পর আর এক স্তর তাহার পশ্চাতে বা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে।

অতএব মালপা হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় এই নির্ম্মানীকা সড়ক সেই জলপ্রপাত হইতে প্রায় দুই শত ফুট উচ্চে পড়িয়াছিল এবং সেই বিশাল প্রপাতের বহুধা খণ্ডিত উপরস্থ জলধারাটিও পার হইতে হইয়াছিল। উহা পার হইবার পর হইতেই যথার্থ কঠিন পথ আরম্ভ হইল।

পথটা আগাগোড়াই বনপথ বা পাকদণ্ডী। প্রথম কতকটা ছিল শরের বন, তাহার পর সেই জলধারাটি পার হইবার পর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা-খণ্ডের মধ্য দিয়া রাস্তা, তাহার পর নানাপ্রকার বনলতার ঘন জঙ্গল। যেস্থানে চড়াই সেস্থান যেমন বিপদসঙ্কুল, আর যেখানে উৎরাই সেস্থান তাহাপেক্ষা অধিক বিপদসঙ্কুল। পথ কোথাও এক কি দেড় হাতের বেশী প্রশস্ত নহে। আর বোধ করি এমন কোন পথ নাই যে পথের বাম পার্শ্বে গভীর জঙ্গলাকীর্ণ খড্ নাই। পা যদি একটু বেতালে পড়ে তাহা হইলে রক্ষা পাইবার কি যে উপায় হইবে তাহা মনে আনিতেই ভয় হয়।

আগে পথপ্রদর্শক হইয়া আমাদের বাহকদ্বয় যাইতেছিল, তাহার পর সঙ্গী-মহাশয় যাইতেছিল, তাহার পর আমি, শেষে নাথজী; এইরূপে আমরা চলিতেছিলাম। আমার পা এবারও খালি ছিল, সুতরাং পথের বন্ধুরতা সহজে অতিক্রম করিবার সুযোগ আমারই ঘটিতে ছিল। নাথজীর ত কথাই নাই, তবে তিনি ত আমার মত চঞ্চলপ্রকৃতি নন, সর্ব্বকর্ম্মেই ধীর এবং শান্ত; নগ্নপদে চলিলেও কখনও দ্রুত চলিতেন না; বিশেষতঃ এই বন্ধুর কঠিন পথে তিনি বিশেষ সাবধানে চলিতেই অভ্যস্ত ছিলেন।

আমার সেই রোগও ছিল—যখন চলিতাম তখন অন্তরের মধ্যে চিন্তার অপ্রতিহত বেগবশতঃ পা-দুইটি তাহা অপেক্ষা কম চলিত না, যেন দৌড়িয়াই চলিত। বাস্তবিকই তখন, আমি চলিতেছি বলিয়া যে একটা

শারীরিক চেষ্টা বা আয়াস বোধ হইত না, কেবল চিন্তার অবসরে এক একবার আমার সত্তাকে অনুভব করিতাম মাত্র। যেন এই আমিটি একটি বেগ বা গতির স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে, এইরূপ একটা সুখময় অনুভূতি হইত। আবার পরক্ষণেই পথ এবং শরীর বোধটি চিন্তার তালে মিলাইয়া যাইত। এইরূপে অতি কঠিন ভয়াবহ বন্ধুর পথসকল অবলীলাক্রমেই পার হইয়া যাইতাম।

তবে মধ্যে মধ্যে এখন চলনের বেগে যখন সঙ্গী-মহাশয়ের নিকট পশ্চাতে প্রায় গা ঘেঁষিয়া পড়িতেছিলাম তখনই, চিন্তা ও চলন উভয়গতিই প্রতিহত, তালও ভঙ্গ হইতে ছিল। পথ সরু, পাশাপাশি অতিক্রম করিবার যো নাই। তা ছাড়া তাঁহার ধারণা যে, তিনি বয়সে প্রবীণ হইলেও সামর্থ্যে নবীনাধিক গরীয়ান্। আমার মাননীয় সঙ্গী-মহাশয় আমায় তো তাঁহাকে ছাড়াইয়া যাইতেই দিতেছেন না এবং দিলেও না জানিয়া ঐরূপ দ্রুতবেগে চলিতে চলিতেও বাধ্য হইয়া আমি মধ্যে মধ্যে অনেকটা পিছাইয়া, দাঁড়াইয়া, বসিয়া বিশ্রাম করিয়া যাইতেছিলাম। তাহাতেই মধ্যে মধ্যে গতি আমার ভঙ্গ হইয়া যাইতেছিল। অনেকক্ষণ পরে তাঁহাকে অতিক্রম করিবার একটু সুযোগ ঘটিল।

একস্থানে একটা ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খল উৎরাইয়ের নীচে হইতে কতকটা এমন পথ পড়িল, যাহার দক্ষিণে একেবারে দেওয়ালের মত খাড়া পাহাড় আর বামে লম্বা লম্বা একপ্রকার কঠিন তৃণসঙ্কুল ঢালু জমি বহুদূর নীচে চলিয়া গিয়াছে। তথায় আর কোন প্রকার বৃক্ষ নাই, পথটি বোধ হয় এক হাতেরও কম। সেই বন্ধুর স্থানে সুবিধামত টপাটপ পা ফেলিয়া বায়ু-বেগে আমি যখন ঐ উৎরাইটি পার হইয়া আসি শেষের ধাপটি অতিক্রম-কালে তাল সামলাইতে না পারিয়া হোঁচট খাইয়া একেবারে সঙ্গী-মহাশয়ের পশ্চাতে প্রায় গায়ের নিকটেই গিয়া পড়িলাম।

একে সর্ব্ববিষয়ে অগ্রেই সতর্ক তাহার উপর তিনি অনেকবার লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, আমি মাঝে মাঝে তাঁহার গা ঘেঁষিয়া গিয়া পড়িতেছি। তিনি এতক্ষণ কিছু বলেন নাই আর আমাকে আগে যাইতেও দেন নাই কিন্তু এইবারে আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না। পশ্চাতে ফিরিয়া একটা বিষম ধমক দিয়া বলিলেন,—দেখছ এই বিপদসঙ্কুল রাস্তা, এখানে এরকম তাড়াতাড়ি করে একটা কিছু বিপদ ঘটাবার চেষ্টায় আছ নাকি? একে

প্রাণটি হাতে করে যেতে হচ্ছে,—কখন কি বিপদ ঘটে তার ঠিক নেই,—যাও! তুমি একলাই আগে যাও, বলিয়া পথ ছাড়িয়া পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। আমি আর কোন কথা না বলিয়া তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া অবাধে খানিকটা চলিয়া বাঁচিলাম,—কিন্তু হায় তাহা বড় অল্পক্ষণের জন্যেই।

কিছুদূর গিয়া অতীব ক্ষীণ এক ঝরনা দেখিয়া জলপান করিবার জন্য সেইখানে একটু বসিলাম ;—ততক্ষণে আমাদের বাহকদ্বয় আসিয়া বোঝা নামাইল। তাহাদের মুখে শুনিলাম এস্থান দিয়া আর একটি রাস্তা আছে, উহাতে ভেড়বকরী প্রভৃতি যাইতে পারে না। উহা এত খাড়াই যে, কোন প্রকার মাল লইয়া যাতায়াতের পক্ষে অসম্ভব বলিয়াই এই পথটি তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। তবে ইহা কিছু ঘোরফেরও বটে, প্রায় দেড় মাইল আন্দাজ বেশী।

তাহারা আরও বলিল, এবার রাস্তা ভারি কঠিন পড়িবে, আপনারা সাবধানে চলিবেন। আমরা আগে গিয়া বোঝাটি একস্থানে রাখিয়া আসিব এবং আপনাদের সাহায্য করিতে পারিব। এই কথা বলিয়া তাহারা উঠিল এবং বোঝা পিঠে লইয়া চলিয়া গেল। আমিও উঠিয়া তাহাদের অনুসরণ করিলাম, সঙ্গী-মহাশয় ও নাথজী পশ্চাতে ছিলেন।

প্রায় আধ মাইল চলিয়া সেই সঙ্কটময় স্থানটি আসিল ; যে-স্থানটি নামিয়া পার হইতে হইলে বিশেষ সাবধানতা দরকার। সেটিকে পথ না বলিয়া কতকটা হেলানো দেওয়াল বলিলেই ঠিক হয়। উহা একস্তর বিশাল, প্রায় অবলম্বনশূন্য কঠিন প্রস্তর, নীচে অনেকটা নামিয়া গিয়াছে ; ঐ ঢালু পথটি আমাদের সমস্তটা অতিক্রম করিতে হইবে। সেটা চড়াই নহে উৎরাই। চড়াই হইলে একটি সুবিধা ছিল। কিন্তু উৎরাই বলিয়া বড়ই বিপদসঙ্কুল। তাহার কারণ উহার উপর মধ্যে মধ্যে লম্বা লম্বা এক প্রকার তৃণবিশেষের চাপড়া ভিন্ন অন্য কোন অবলম্বন নাই ;—এখানে পাহাড়ী লাঠিতে কোন কাজই চলে না।

নামিতে গেলে মধ্যে মধ্যে কতকটা বেশী ব্যবধানে খাঁজ বা স্তরের মত আছে বটে, কিন্তু তাহাতে দুইটি পা রাখিয়া দাঁড়াইবার স্থান নাই। আমি তালে বেতালে এতক্ষণ অনেক কঠিন কঠিন পথ বিনা চেষ্টায় অতিক্রম করিতেছিলাম, এখন এ রাস্তা দেখিয়া আমার সে স্ফূর্ত্তিটি লোপ পাইল। প্রথমে একটু ভয় হইল, তাহার পর যখন চক্ষের সম্মুখে বাহকদ্বয়কে নামিতে

দেখিলাম তখন আবার মনে সাহস আসিল, বিশ্বাস হইল ঐ কৌশলে আমিও নামিতে পারিব।

হাতে কিছু থাকিলে চলিবে না, কারণ লাঠির কাজই নাই, তাহার পরিবর্ত্তে সেই মুষ্টিতে ঘাসের চাপড়া দৃঢ় ধারণ করিতে হইবে। যখন বাহকদ্বয় নামিয়া গেল তখন হাতের লাঠিটি ফেলিয়া দিলাম, দেখিলাম, সেটি গিয়া একেবারে নীচে, যেখানে দাঁড়াইতে হইবে সেইখানে যাইয়া পড়িল, তখন পা বাড়াইলাম। বসিয়া বসিয়া যতটা পা বাড়াইতে পারা যায় ততটা পা নীচের দিকে নামাইয়া দিলাম, তাহার পর নীচের এক গোছা ঘাস ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িলাম, দাঁড়াইলাম এক চাপড়া সেই ঘাসের গোড়ায় ভর দিয়া। পায়ের ভরে যদি সেই ঘাসের গোড়া ধসিয়া যায় তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। তাহার পর সরু সরু এক স্তর পাথর পাইলাম তাহাতে পা দিয়া ক্রমে ক্রমে নামিতে লাগিলাম। এইরূপে প্রায় পনর কি বিশ মিনিটে ঐটুকু নামিয়া লাঠিটা কুড়াইয়া লইলাম। তাহার পর যে পথ উহা সরলও নহে, তবে আর অতটা বিপদসঙ্কুল নহে। তারপর সঙ্গী-মহাশয়ও নামিলেন, সোজা না নামিয়া তিনি কতকটা ঘুরিয়া বেশ কৌশলেই নামিয়া পড়িলেন।

তারপর নাথজী তাঁহার লোটাটি হাতে লইয়াই নামিয়া আসিলে আমরা তখন একটু বিশ্রাম করিয়া আবার নামিতে আরম্ভ করিলাম। ক্রমে সকলে একেবারে কালীগঙ্গার কূলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম যেখানে পুলটি ছিল অর্থাৎ যে পুলটি দিয়া নেপালের এলাকায় যাইতে হইত এবং যাহার পরেই সেই মন্দিরাকৃতি গুহার মধ্যে জলপ্রপাত দেখা গিয়াছিল সেইখানেই পথটি আসিয়া মিলিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য! বর্ষাসমাগমে সেই স্থানটির মূর্ত্তি আর একপ্রকার হইয়া গিয়াছে। বিস্তৃত কালীগঙ্গার বেগও কিছু বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু মন্দিরমধ্যে সেই ধারাটি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে।

দেখিলাম একটা বড় সাগরের উপর তিন চারিটি ভোটিয়া বসিয়া আছে, উহারা কোন্ পথে আসিয়াছে জিজ্ঞাসা করায় বাহকদ্বয় বলিল, ঐ যে একটা সোজা পথের কথা বলিয়াছি যাহা বড়ই বিপদসঙ্কুল,—ইহারা সেই পথেই আসিয়াছে।

তখন তাহাদের বলিলাম, আমাদের ত সে পথে আসিলেও হইত।

তোমরা বোঝা লইয়া না হয় এই রাস্তাতেই আসিতে। তাহারা বলিল, সে-পথও সুবিধাজনক নয়, আপনাদের ছাড়িয়া দিতে ভরসা হয় না। তাহাতে রূমা আমাদের বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছে যেন কিছুতেই আপনাদের সঙ্গ না ছাড়ি। কারণ পথ ত দেখিলেন কিরূপ কঠিন, আপনাদের অনভ্যাস, কখন কিভাবে সাহায্য প্রয়োজন হয় তাহার তো ঠিক নাই।

এইরূপে আমরা নির্পানীকা সড়ক অতিক্রম করিয়া রাজপথে আসিলাম। এক পথিকের নিকট হইতে প্রকাণ্ড এক পাঁড় শশা খরিদ করিয়া লবণ সংযোগে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা মিটাইয়া লইলাম। তারপর, ঠিক সন্ধ্যা নাগাদ সাংখোলায় নয়ান সিং প্রধানের আড্ডায় আসিয়া পানভোজনান্তে সেই ছাপ্পরের তলে রাত্রিযাপন।

পরদিন চৌদাসে পৌছিয়া বাহকদ্বয়কে বিদায় দেওয়া হইল, প্রত্যেকের ৪৷৷৹ টাকা পারিশ্রমিক। এখানকার পাটওয়ারী কিষণ সিং-এর ভাই দিলীপ সিং চৌদাসী তখন এখানে ছিল না, তৎস্থানীয় একব্যক্তি জানাইল যে খেলায় যাইবার কুলি এখানে পাওয়া যাইবে না, উহা পাঙ্গু হইতেই যোগাড় করিতে হইবে। কাজেই সে রাত্রিটি সেখানে কাটাইয়া নূতন বাহকের সন্ধানে পরদিন আমরা পাঙ্গুতে পৌছিলাম।

গরজ বড় বালাই, বহু সাধ্যসাধনায় দুইটি ভোটিয়া যুবক সহোদর প্রত্যেকে অগ্রিম বার আনা লইয়া খেলায় পৌছিয়া দিবে স্বীকার করিল। এখানে সঙ্গীমহাশয়ের একটি অতি-প্রয়োজনীয় বস্তু লোকসান করিলাম। প্রভাতে প্রবল বৃষ্টি ছিল, আমি তাঁহার ছাতাটি লইয়া বাহিরে গিয়াছিলাম। হঠাৎ একটি ঝাপটা আসিয়া উহা হস্তচ্যুত হইল, একটা সিকও ভাঙিয়া গেল। তিনি বলিলেন—তাহাতে কি—পথে সারাইয়া লইলেই হইবে। তৎপরদিন প্রভাতে আমরা খেলার পথে যাত্রা করিলাম।

আসিবার কালে যেটা চড়াই ছিল, সেটা উৎরাই হইয়া গিয়াছে; উৎরাইগুলি চড়াই হইয়াছে। আসিবার সময় খেলা হইতে উৎরাই-এর পরধৌলী গঙ্গাপার হইয়া প্রায় দুই মাইল চড়াই উঠিয়া পাঙ্গুতে পৌছিয়াছিলাম, এখন ফিরিবার সময় ঠিক তাহার বিপরীত হইল।

যে ষণ্ডামার্কা ভাই দুইটি আমাদের বোঝা লইয়া আসিতেছিল, তাহাদের মধ্যে কনিষ্ঠটি একটু নিরেটগোছের; সে বুঝিয়াছিল আমাদের

বাহকের বড়ই প্রয়োজন, তাহারা ছাড়া আমাদের আর বাহক জুটে নাই,- সেইজন্যই তাহারা কিছু বেশীই লইয়াছিল; এখন সে পীড়ন করিয়া আরও কিছু আদায়ের মতলবে আমাদের সঙ্গে একটু চাতুরি খেলিল।

পাঙ্গু হইতে উৎরাইয়ের শেষে ধৌলীগঙ্গার পুল পার হইয়া খেলার চড়াইয়ের গোড়ায় আসিয়া সে মোট নামাইয়া মাথার ঘাম মুছিয়া বসিল, এবং তারপর বলিল যে, আমাদের ত আর যাইবার কথা নয়। এই ত খেলা, মজুরির কথা যাহা হইয়াছে তাহা এই অবধি; আমাদের কাজ হইয়াছে, আমরা চলিলাম;—বলিয়া সেই বিজন স্থানে বোঝা হইতে তাহাদের দড়ি খুলিতে আরম্ভ করিল।

প্রথমে তাহার বড় ভাইটিকে লক্ষ্য করিয়া ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করিলাম এবং এমন স্থানে মোট ফেলিয়া গেলে তাহাদের সহজে ছাড়িব না,—আমরা তিনজন আছি,—একথাও তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলাম। এই ভাইটি একটু সরল লোক, সে আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিল।

তখন সঙ্গী মহাশয় বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, দেখো, এসা বদমাসী করোগে তো তোম্ দোনোকো গুলি করকে লাস এই ধৌলীগঙ্গামে ফেকেগা, হাম্ লোক্‌কা পাস বন্দুক হ্যায়।

সেই গম্ভীর আওয়াজে তাহারা ভয় পাইয়া গেল, তখন ছোট ভাই আবার মোট বাঁধিতে লাগিল, তাহার পরে, আচ্ছা চলো লেকিন এসা দস্তুর নহি, বলিয়া মোট উঠাইয়া অগ্রগামী হইল।

এখন নিরাপদে খেলায় পৌছিলাম। সেই পুরাতন ডাকখানায় আবার পুরাতন বন্ধুবর্গও পাইলাম; কেবলমাত্র ওভারসিয়ার মহাশয়টি ছিলেন না।

সঙ্গী-মহাশয় এইবার জাতিগত আচার রক্ষায় বদ্ধপরিকর হইলেন; নাথজীর হাতে রান্না আর তিনি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নন। বেশ শান্তভাবে যুক্তিপূর্ণ অনুরোধসূচক কণ্ঠে বলিলেন আর নাথজীকে রাঁধতে দিও না, এখন থেকে আমরা হিন্দুসমাজের মধ্যে পড়লাম, ওর হাতে আমরা আর খাব না, আমি না হয় রাঁধচি। এখন যে আমরা হিন্দুরাজ্যে পড়লাম এটা তিনি ঠিকমতই হিসাব রাখিয়াছিলেন।

আমি বলিলাম, নাথজী ত ব্রাহ্মণ, তাঁর হাতে খেতেই বা দোষ কি?

তবে না-ইচ্ছা হয় ত আর আপনাকে কষ্ট করতে হবে না, আমি রাঁধবো। নাথজী রাঁধিবার জন্য যখন আসিলেন তখন মুখে একটু প্রসন্নভাব দেখাইয়া বলিলাম, আপ্ বহুত রোজ তক্ হাম লোককো খিলায়', আজ হাম আপ্‌কো খিলাউঙ্গা। সদানন্দ নাথজী, বহুত আচ্ছা, হাসিয়া নিরস্ত হইলেন।

খেলা হইতে বাহক বন্দোবস্ত হইয়া গেল, কিরায়া প্রত্যেকের পাঁচ আনা করিয়া। পরদিন ধারচুলায় লোকমনিজীর আশ্রমে অতিথি হওয়া গেল। কি ভয়ানক ক্ষুধাই হইয়াছিল! এখন এমনই ক্ষুধার বেগ সময়ে সময়ে যেন সামলানো মুস্কিল হইতেছিল।

অগ্রে লোকমনির বাসায় পৌঁছিয়া লাঠি রাখিয়া আমি আরামে বসিয়া তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম, ক্ষুধার্ত্ত অনুভব করিয়া তিনি একছড়া কলা আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া উপযোগ করিতে অনুরোধ করিলেন। কখনও কলা ভালবাসিতাম না, কিন্তু এখন উপাদেয় বোধে সদ্ব্যবহার করিলাম। এমন সময় সঙ্গী-মহাশয় রাস্তা হইতেই, হামারা লোকমনিজী! পয়লা খানেকো দিজিয়ে তব পিছে বাৎ,—বলিতে বলিতে ভিতরে পদার্পণ করিলেন।

তাঁহারা ত জানিতেন না যে, আমরা আসিব, সুতরাং অনাহূত এই অতিথিদ্বয়ের জন্য তাঁহার গৃহলক্ষ্মী আপনাদের দুইজনের জন্য যে অন্ন রাঁধিয়াছিলেন তাহা আমাদের ধরিয়া দিলেন। অবশ্য তখনকার মত সদ্ব্যবহার করিলাম এবং সমাচার দিলাম যে আর একজন আসিতেছেন, পরে নাথজী আসিলেন। স্নেহময়ী সকলকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইলেন, শেষে নিজেরা কি করিলেন তাহা জানি না।

এক রাত্রের কথা মনে পড়িতেছে। যাইবার সময়, এখানকার মোটা রুটি বিষম কষ্টকর ভাবিয়া সঙ্গী মহাশয়কে বলিয়াছিলাম এরূপ রোটা ও উদ্রের্ কি দাল খাওয়া শরীরের পক্ষে বড় পুণ্যের ফল নহে, যতশীঘ্র ইহার হাত এড়ান যায় ততই ভাল। কিন্তু এখন, সেই রোটা পাতে আসিবার পর-মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইতেছে, এত ঘন ঘন নিঃশেষিত হওয়ায় জননী ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন, একটু আস্তে আস্তে খাও হে। তখন সংযত হইলাম।

তিনি একদিন থাকিয়া যাইতে ভদ্রভাবে যতটা সম্ভব অনুরোধ করিলেন

তাহাতে সঙ্গী-মহাশয় কিছুতেই রাজী হইলেন না। আমরা গৃহী, অনেক-দিন স্ত্রীপুত্রাদি ছাড়িয়া আছি, তাহার উপর শরীর ভাল নয়, এখন একদিন বিলম্ব এক মাসের মত বোধ হইতেছে;—দেশে গিয়া না পৌছাইতে পারিলে প্রাণ স্থির হইবে না - ইত্যাদি বলিয়া তৎপরদিন যাওয়াই স্থির করিলেন এবং যাহাতে তুইটি বাহক কল্য প্রাতে প্রস্তুত থাকে তাহার জন্য অনুরোধ করিলেন। লোকমনি সম্মত হইয়া বলিলেন যে, মায়াবতী হইতে একখানি পত্র আসিয়াছে, তাঁহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে ফিরিবার পথে আপনারা যেন নিশ্চিত মায়াবতী হইয়া যান। তিনি সাদরসম্মানের নিমন্ত্রণ পাইয়া প্রফুল্লচিত্তে বলিলেন, বহুত আচ্ছা, আপ্ এক খৎ লিখ্ দেনা,—ওইসাই হোয়েগা, হামলোক মায়াবতী হোয়কে যায়েগা।

নাথজীর সহিত এখানে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিল। সঙ্গী-মহাশয়ের তাঁহার সঙ্গ কিছুতেই আর ভাল লাগিতেছিল না। তিনি বলিলেন, ওকে আর কেন? বলে দাও আর যেন আমাদের সঙ্গে না আসে; ও যেমন একা ছিল সেই রকমেই চলে যাক্।

এখন জ্বালাতন হইয়া নাথজীকে সকল কথাই খুলিয়া বলিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন, ইস্‌মে ক্যা হ্যায়, যেইসা খুশি। অতঃপর তিনি এখানে রহিলেন। নাথজী ছিলেন তৈলঙ্গী, তাঁর রূপের আকর্ষণ কিছু ছিল না, কিন্তু গুণ ছিল অসাধারণ। ত্যাগী বলিতে যাহা বুঝায়, নাথজী তাহাই ছিলেন। তুনিয়ার কোন বস্তুতেই তাঁর আসক্তি ছিল না; কেবল ঐ শুলফার নেশাটি তাঁর ছিল, সেজন্য সঙ্গী-মহাশয় তাঁহাকে তুটি চক্ষে দেখিতে পারিতেন না।

এই সংযোগের পর আর তাঁহাকে দেখি নাই। তাঁহার মধুর স্বভাবটি আমার অন্তরে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল;—তাঁহাকে এ-জীবনে ভুলিতে পারিব না।

তাঁহাকে এখানে ছাড়িয়া পরদিন বালুয়াকোটে সেই মঙ্গল সিং প্রধানের আড্ডায় উঠিলাম। তাহার সেই সুন্দর যুবা পুত্রটিই আমাদের যথাযোগ্য সৎকার করিল। খেলার পর হইতে আমরা প্রত্যেক স্থানেই কলাটা খুব পাইতেছি। এখানে আসিয়া বেশ বড় তুইটি ছড়া পাইয়া সেইক্ষণেই তুজনে একটির সদ্ব্যবহার করিলাম, পরদিনের জন্য অপরটি গোঁজায় রাখিয়া দিলাম। দ্বিপ্রহরে আহারাদি শেষে আশ্রমের সম্মুখে বারান্দায় বসিয়া

আছি, সঙ্গী-মহাশয় খাটিয়াতেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

মনটা ভাল ছিল না, নাথজী বেচারাকে আমরা আসকোটে পাইয়াছিলাম, সেইখানে গেলে যাহা হয় একটা হইত। তাঁহার সঙ্গে আমার বড়ই প্রীতি জন্মিয়াছিল। তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্তরে একটা শূন্যভাব অনুভব করিতেছিলাম। এই সব কথা মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতেছি,—ও সামনে নেপাল অধিকারে পর্ব্বতমালা দেখিতেছি। এমন সময় দেখিলাম, হঠাৎ ক্ষেত্রের দিক হইতে দুইজনে একটি লম্বা পাথরের মত কিছু মাথায় করিয়া আনিতেছে; ছাতা হাতে মঙ্গল সিং প্রধান মহাশয়ও পশ্চাতে রহিয়াছেন দেখিলাম। তাহারা সেটি লইয়া আমাদের সম্মুখেই হাজির করিল। একটি প্রায় হাড়াই ফুট পাথরের বিষ্ণু-মূর্ত্তি; খুব প্রাচীন নয় তবে দুই শত বৎসরের কম বলিয়াও বোধ হইল না। প্রধান মহাশয় বলিলেন যে, ক্ষেত্রের মধ্যে মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে আজ সকালে উহা পাওয়া গিয়াছে। চমৎকার মূর্ত্তিটি। প্রধান মহাশয় সেটি এখানে প্রতিষ্ঠা করিবেন এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

পরদিন দুই মাইল চড়াই ভাঙিয়া সাড়ে দশটা নাগাত আসকোটে সেই ডাকখানায় পৌঁছিলাম এবং বাহকগণকে বিদায় দিলাম।

আমাদের পৌঁছানো সংবাদ রাজবাড়িতে পৌঁছিবার বোধ হয় দশ পনের মিনিটের মধ্যে একখানি প্রকাণ্ড থালায় দশ বারটা আম, একছড়া সুপক্ক কদলী, দুই চারিটা নাসপাতি আরও কত কি আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গী মহাশয় তৎক্ষণাৎ রাজবংশের প্রতি আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিয়াই সেই অমৃত ফলের সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহাকে তাহার সেই ঐতিহাসিক ছুরিখানি অনেকটাই সাহায্য করিয়াছিল।

কুমার বাহাদুরের অনুরোধে অর্থাৎ পরদিন ওখানে বিশ্রাম করিয়া যাওয়া হইবে স্থির হইল। তাঁহারা আদর আপ্যায়ন এবং আনন্দ প্রকাশ যথেষ্টই করিলেন। তাঁহাদের এই অভ্যর্থনায় যথেষ্টই আন্তরিকতা ছিল।

রাত্রে কুমার বিক্রম জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের গানবাজনার শখ আছে কি?

সঙ্গী-মহাশয়, শ্লেষমিশ্রিত একটু উপেক্ষার সহিত আমার দিকে

দেখাইয়া বলিলেন, এই বাবুকো শখ হ্যায়। কথাটা মিথ্যা নয়। তখন কুমার বিক্রম এক সুন্দর হারমোনিয়ম আনাইয়া সম্মুখে হাজির করিলেন। শুধু তাহাই নহে, রাজওয়াড়ার এক গায়িকা বাঈজীকে আনাইয়া আমাদের গান শুনার বন্দোবস্তও করিলেন।

বলিলাম, শুধু বাংলা ভজন গানই জানি, হিন্দী ক্লাসিক আমি তো জানি না ;—আপনারা ত বাংলা কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। কুমার ভূপেন্দ্র বলিলেন, ওই নহি, আপনা গাইয়ে!

কবির একটি গান অনেক দিন হইতেই ভিতরে ভিতরে গুমরাইতেছিল যাহার বৈশিষ্ট্য এবং সার্থকতা, এই ভ্রমণের মধ্যে সর্ব্বত্রই, বোধ হয় সর্ব্বক্ষণ অনুভব করিতেছিলাম। সেই গানটিই প্রথমে হইল :—

কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাঁই—
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।
পুরানো আবাস ছাড়ি চলি যবে, মনে ভেবে মরি কি জানি কি হবে—
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন, সে কথা যে ভুলে যাই। ইত্যাদি।

গানটি শেষ হইলে সঙ্গী-মহাশয় আগ্রহে ইহার অর্থ হিন্দীতে ব্যাখ্যা করিয়া কুমারদের বুঝাইয়া দিলে তাঁহারা বড়ই খুশী হইলেন।

তাহার পর আরও দুই একখানি গান হইল, শেষে একখানি রামপ্রসাদের গান,—হৃদি কমলমঞ্চে দোলে করালবদনী,—মনপবনে দোলাইছে দিবস-রজনী ইত্যাদি। গানখানি বাঈজীর বড়ই ভাল লাগিল, হিন্দীতে লিখিয়া লইলেন। তাহার পর বাঈজী প্রথমে কেদারা রাগিণীতে একটি মধুর গান ধরিলেন :—

গঙ্গা জটাধারী,—
শিব রমত রাস, শঙ্কর হর।
তিন নেত্র শুধ বুধ, ভস্ম ত্রিপুণ্ড্র ললাট
নীলকণ্ঠ ভাল চন্দা, বিখভকি আনোয়ারী।
ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর দ্বিতীয়টি,

বংশী ধুনা সো মাচায়ে, বাজত শ্রীবৃন্দাবন,
উমড ঘুমড রহ সঘন গরজত বাদর প্রমাণ।
ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাঈজীর গলা তত ভাল নহে, তবে গাহিবার কায়দা ছিল ;—কিন্তু তাহার সঙ্গে বাদকদলের চীৎকার যেন বিষম অরুচিকর অবস্থার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল। পুরানো চালের বাঈজী-গানের এইটি দোষ। যাহা হউক সে-রাত্র বেশ আনন্দেই কাটিল।

পরদিন প্রাতে যখন কুমার বিক্রম এবং ভূপেন্দ্র আসিলেন, তখন ঠিক হইল যে আমরা টনকপুরের পথ দিয়া যাইব। পথের খবর যথাসম্ভব লওয়া হইল, পিথোরাগড হইয়া যাইতে হইবে।

আসকোটের মজলিস্

খড়্গাসিং পাল, যিনি পিথোরাগড়ের ডেপুটি কলেক্টর, তিনি এখন এখানেই ছিলেন। সন্ধ্যার পর সঙ্গী-মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে আসিলেন এবং তাঁহার সহিত বাক্যালাপে পরম আপ্যায়িত হইয়া আরও দুই একদিন এখানে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু থাকিবার অনুরোধ রক্ষা এ সময় বড় কঠিন।

জগৎ সিং পাল পেস্কার, যাঁহার কথা প্রথমে আসকোট-প্রসঙ্গে বলিয়াছি —তিনি ছিলেন ইঁহার কনিষ্ঠ সহোদর, তাঁহার শোচনীয় অকালমৃত্যুর আলোচনা-প্রসঙ্গে সকলেই শোক প্রকাশ করিলেন।

আমরা পিথোরাগড় হইয়া টনকপুর যাইব শুনিয়া তিনি সেখানকার পেস্কারের নামে একখানি পরিচয়পত্র দিলেন, যাহাতে আমাদের থাকিবার কষ্ট না হয় ;—আর সঙ্গী-মহাশয়কে সুন্দর একখানি তিব্বতী আসন উপহার দিলেন। আমরা কোন রকমে রাত্রি প্রভাত করিয়া পরদিন যাত্রার জন্য মালপত্র সব ঠিক করিয়া রাখিলাম, তাঁহারাই এখান হইতে বাহকের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

এই আসকোট হইতে প্রায় ধারচুলা পর্য্যন্ত জঙ্গলে পরিপূর্ণ আছে দেখা যায়। পূর্ব্বে এই জঙ্গলে একপ্রকার মানুষ থাকিত ; তাহারা বৃক্ষের উপর বাস করিত, বন্য ফলমূল এবং পশু-পক্ষী শিকার করিয়া দগ্ধ করিয়া খাইত ; গ্রামবাসী মানুষ দেখিলে পলায়ন করিত। বৃক্ষপত্র জোড়া দিয়া কটিতে, অথবা চীর বা বল্কল পরিধান করিয়া লজ্জা নিবারণ করিত।

প্রাতে বড় কুমারসাহেব দেখাইলেন,—দেখিয়ে, ইয়ে জঙ্গলী আদমী। সম্মুখে দেখিলাম ছিন্ন কৌপীন, তাহার উপর সেইরূপ শতছিন্ন মলিন জামা গায়ে তিন-চারিজন লোক দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। রুক্ষ লম্বা চুল, অল্প দাড়ি গোঁফ, কৃষ্ণ বর্ণ, দেখিতে খর্ব্বাকৃতি।

কুমার বলিলেন যে,—এখন উহারা কথা কহিতে এবং সামান্য হিন্দী বলিতে শিখিয়াছে ;—পূর্ব্বে মানুষের কাছে আসিতে ভয় পাইত। ইহারা বলিত, আমরা জঙ্গলের রাজা।

জাতিবিচার করিবার কোন নিদর্শন ইহাদের আকৃতিতে নাই। রুগ্ণ বা দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত মানুষের যেরূপ মূর্ত্তি, ইহাদের দেখিতেও সেইরূপ, রুক্ষ চুল বিবর্ণ বড়ই মলিন বদন। যখন বনে থাকিত, তখন যে কিরূপ চেহারা ছিল তাহা ত জানা নাই, তবে গ্রামবাসী হইয়া রুগ্ণ শরীর আর এদেশ-বাসিগণের সংসর্গগুণে তামাক সেবন এবং অঙ্গে কোট চড়ানো আর টুপির অভাবে কখনও কখনও মাথায় ছিন্ন বস্ত্র জড়াইয়া রাখা আর দুই-চারিটা ভাঙা ভাঙা হিন্দী কথা বলিতে শিক্ষা ছাড়া আর কোন উন্নতি দেখিতে পাইলাম না।

উহাদের মুখ দেখিলে কষ্ট হয় ;—আবার এখন অমার্জিত ক্লেদযুক্ত

দন্তগুলি বাহির করিয়া হাসিমুখে কথা কয়, দেখিলে তখন আরও কষ্ট হয়। যেন অন্নবস্ত্রের হাহাকার মূর্ত্তিমান হইয়া আমার সম্মুখে বিদ্যমান।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিব্বত ভ্রমণের ফলে আর সন্ত অসুখ হইতে উঠায় আমার ক্ষুধার বেগটা অতীব প্রবল হইয়াছিল, যেখানেই উপস্থিত হই, ক্ষুধা যেন আর সামলাইতে পারি না। বিশেষতঃ তিনটি মাস শাকসবজি কিছু পেটে পড়ে নাই, ক্যালসিয়ামের অভাব অনুভব করিতাম। যেখানেই একটু তরকারী পাইতাম যেন অমৃতের মতই লোভনীয় হইত। আসকোটে আলু পাইয়াছি, তার এমনই আস্বাদ, অমৃতকে ভুলাইয়া দেয়। অন্ন এবং যে কোন প্রকার তরকারীর উপর লোভটা অসাধারণ হইয়াছিল।

দিনমানে এক ব্রাহ্মণ অন্নপাক করিত, রাত্রে কুমারদের ঘর হইতে পুরী, তরকারী, আচার আসিত। আমাদের নিজের হাতে কিছু করিতে হয় নাই। ভুট্টার ফসল সে সময় তৈরি হইয়াছে। প্রাতে নিজের হাতে কিছু ঘৃত এবং মসলা দিয়া প্রস্তুত, আমাদের জলযোগের জন্য দিয়াছিল,—এমন সুন্দর বস্তু জীবনে কখনও আস্বাদন করি নাই। অপূর্ব্ব এই আহার্য্য, বঙ্গদেশে চলন নাই।

আসকোটের খাতির হজম করিয়া যখন তৃতীয় দিন প্রভাতে ঘন কুয়াশার মধ্য দিয়া কানাছিলিনা যাত্রা করিলাম, তখন আসকোটের অতি অল্পলোকই শয্যা ত্যাগ করিয়াছে। আমাদের বাঁধা মোটঘাট এখানেই রাজানুগ্রহের উপর পড়িয়া রহিল। রাজানুগ্রহ বলিতে সেই গাঁও-সেরা বুঝিতে হইবে।—যাহার জ্বালায় যাইবার সময় খেলা অবধি আমাদের অশান্তির সীমা ছিল না। এখন তাহা ব্যতীত আর অন্য উপায়ও ছিল না।

আসিবার সময় যে পথ দিয়া ডণ্ডিহাট হইতে আসিয়াছিলাম এটা সে পথ নহে;—আসকোট পার হইয়া পথটি ডাকবাংলোর পাশ দিয়া বামে চলিয়া গিয়াছে। পথটি খুব প্রশস্ত নয়, তাহার উপর প্রথম খানিকটা একটু চড়াই-উৎরাই আছে।

———

॥ ১৭ ॥

নূতন পথে

পিথোরাগড় মায়াবতী, চম্পাওয়াৎ, সুখীডাংয়ের জঙ্গল

তধারে বাদল মাথায় করিয়াই আমরা কানালিছিনার দিকে যাত্রা করিলাম। তের মাইল রাস্তা, পথে বৃষ্টি প্রবল বেগেই নামিল। পুরাতন বর্ষাতি গায়ে ছিল, তাহাতে যে প্রকার দেহ রক্ষা হইল সে কথায় আর কাজ নাই। অবিশ্রান্ত প্রবল বৃষ্টিতে আশ্রয়ের প্রয়োজন বোধ করিয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিলাম, কোথায় আশ্রয় পাওয়া যাইতে পারে। কিছু দূরে বাঁদিকে, লম্বা সারি সারি অনেকগুলি গৃহ একত্রসন্নিবিষ্ট—একটি ব্যারাকের মত ;—সেইদিকেই দৌড়াইলাম। শ্রেণীবদ্ধ সমস্ত গৃহই দ্বিতল। প্রথম তলটি নীচু, দ্বিতীয় তল বাসোপযোগী কিছু উচ্চ; তাহার উপরে এই পার্ব্বত্য অঞ্চলে যেমন হয়, ঢালু ছাদ। উপর তলস্থ প্রত্যেক ঘরে উঠিবার উচ্চ উচ্চ সোপানশ্রেণী ঘরের দ্বার পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। নিম্নতলে গরু-বাছুর, ঘোড়া, গাধা এবং তাহাদের খোরাক, খড়কুটা, আবার ঘুঁটে, জ্বালানি কাঠ-কুটাও সঞ্চিত আছে। দ্বিতলে রন্ধন ও শয়ন গৃহ। এই সারিবন্দী গৃহমধ্যে দশ বারো ঘর শ্রমজীবী কৃষক বাস করিতেছে। তাড়াতাড়ি এমনই একটি গৃহে, তিন চারিটি ধাপ উঠিয়া দ্বারে দাঁড়াইলাম। হাতে ছিল সেই পাহাড়ী লাঠি, তাহার উপর মাথায় জলসিক্ত পাগড়ী, গায়ের পুরাতন বর্ষাতি ও কাপড় হইতে জল ঝরিতেছে ;—মুখভরা দাড়ি-গোঁফ, সুতরাং মূর্ত্তিটি একেবারেই নয়নের অরুচিকর, একথা আর না বলিলেও চলে।

একটি অশীতিপর বৃদ্ধা কুলায় গম বাছিতেছিল ; আমার মূর্ত্তিটি দেখিয়া সে কি যে বলিল, বুঝিতেই পারিলাম না। তাহার সম্মুখে একটি সুকুমারী শীর্ণা বালিকা-মূর্ত্তি শিশুকোলে বসিয়া আছে। আমি বৃদ্ধাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম, থোড়ী বৈঠনেকী জগহ, বহক বরখা। তখন বৃদ্ধা আর কিছু না বলিয়া নীচের দিকে দেখাইয়া দিল। কাজেই নীচের তলে আসিয়া

লাঠিটি বাহিরের দেওয়ালে ঠেকা দিয়া রাখিলাম এবং দ্বারহীন সেই ক্ষুদ্র গোয়ালঘরে প্রবেশ করিলাম।

চারিদিকেই কাঠ-কুটা, ঘুঁটে বিচালিতে ভরা, মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র খাটিয়া পাতা, চারিদিক দেখিয়া তাহারই উপর দেওয়াল ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িলাম।

প্রথমে দেখিতে পাই নাই, সেই ভগ্ন খাটিয়ার পার্শ্বেই বিচালির উপর দুইটি শিশু বসিয়াছিল; তাহাদের পরনে কৌপীন মাত্র। আমায় দেখিয়া ভয় পাইয়া তাহারা বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিল। দুইজনের হাতে দুইটি পয়সা দিয়া, তাহাদের গালে হাত দিয়া একটু আদর করিলাম, নাম কি?

পথের আশ্রয়

ভয়েই তাহারা আড়ষ্ট, তা উত্তর দিবে কি! ইতিমধ্যে উপর হইতে ছোট বালিকাটি আসিয়া সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া আমাদের কাণ্ড দেখিতেছিল।

ভাগ্যবানের ঘরে হইলে এই বালকবালিকার রূপ দেখিবার বস্তু।

দারিদ্র্যদোষে লাবণ্যহীন, চুল রুক্ষ, মুখে প্রফুল্লতা নাই, মলিন বস্ত্র। এই হিমালয় পাহাড়ের হিন্দু অধিবাসীগণের মধ্যে কোথাও কুশ্রী বা কুরূপ দেখিলাম না। এতটা অভাব ও দারিদ্র্যপীড়িত জনসমাজে ঘরে ঘরে এমন সৌন্দর্য্য কোথা হইতে আসিল এটি ভাবিবার বিষয়। আমাদের দেশে একটা কথা চলিত আছে যে, সুখের ঘরে রূপের বাস। যদি এটি সত্য হয় তাহা হইলে আমাদের হিসাবে ইহারা দরিদ্র হইলেও স্বীকার করিতে হইবে ইহারা সুখী; অন্ততঃ মনের দিক দিয়া দরিদ্র মোটেই নয়। ইহার আসল কারণ এখানে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব নাই।

যাহা হউক, প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বৃষ্টি থামিলে উঠিয়া গুটি গুটি পা চালাইলাম, শেষে একটা নাগাদ কানালিছিনায় পৌঁছিলাম। সঙ্গী-মহাশয় আগে পৌঁছিয়াছেন জানিতাম। আসকোট হইতে এই তেরটি মাইল পথে বেশী চড়াই-উৎরাই নাই বটে, কিন্তু প্রবল বৃষ্টির জন্যই প্রায় এক ঘণ্টা দেরী হইয়া গেল। এখানে যে সরকারী মুদীর দোকানটি, সেইখানে খোঁজ করিতেই সঙ্গী মহাশয়ের পাত্তা পাইলাম। এইমাত্র তিনি গ্রামের মধ্যে গিয়াছেন এবং আমাকেও যাইতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কাজেই এখানে আর বিশ্রাম না করিয়া একেবারে তাঁহারই উদ্দেশে পা চালাইলাম এবং দ্রুত আসিয়া পথিমধ্যে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলাম। বিলম্বের জন্য তাঁহার মেজাজটি ঠিক গরম হইয়াই আছে। দুজনে সে-বেলা দুইটি ব্রাহ্মণ-সংসারে অতিথি হইলাম। ভোজন হইল, খোসাসুদ্ধ উর্দ্দকী ডাল, ভাত আর দধি। মুখশুদ্ধির হরিতকীও ছিল।

এখানে শতাবধি ঘর ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের বাস আছে। একখানি কাপড় ও একখানি দর্জ্জির দোকান ও একটি মুদীর দোকানও আছে। আমরা কাপড় ও তৎসংলগ্ন দর্জ্জির দোকানেই রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন প্রাতে একেবারে স্নানাহার সারিয়া পিথোরাগড়ের দিকে রওনা হইলাম।

এ পর্য্যন্ত পর্ব্বতের গা বাহিয়া হিমালয়ের যত রাস্তায় যাতায়াত করিয়াছি, কানালিছিনা হইতে পিথোরাগড়ের মত এমন সুন্দর রাস্তা কোথাও দেখি নাই। এই বারো মাইল পথটি প্রায়ই সমতল, কেবল শেষের দিকে অল্পখানিকটা চড়াই। চারিদিকে শস্যক্ষেত্র, তখন সবুজে ভরা। যেদিকেই চাহিবে কেবল হরিৎ, শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা। পূর্ব্বে

হিন্দুদের সময়ে এই পিথোরাগড় শোর রাজ্যের রাজধানী ছিল, এখন আলমোড়া জেলার একটি মহকুমার সদর। এখানে মুন্‌সেফ, ডেপুটি
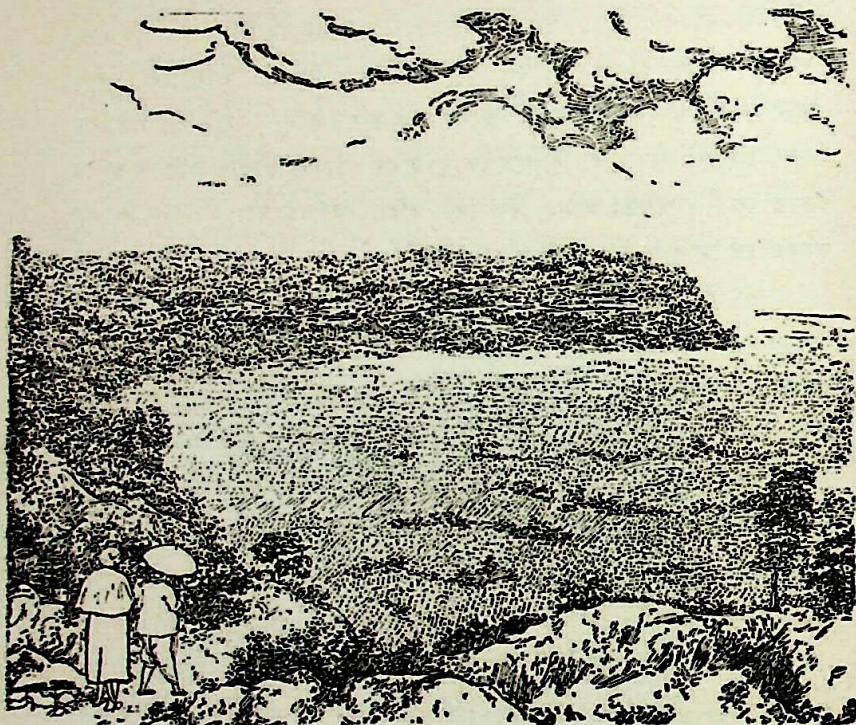
পিথোরাগড়ের পথে

ম্যাজিষ্ট্রেট, কলেক্টর প্রভৃতির কাছারি আছে। পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ অফিসও আছে। এখান হইতে তার-স্তম্ভ বরাবর টনকপুর ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়াছে।

নগরটি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু মনোরম ও অনেকটা উচ্চভূমির উপর অবস্থিত। একটি কেল্লা ছিল, এখন ডেপুটি কলেক্টরের কাছারি তাহার মধ্যে। আমরা পেস্কার মহাশয়ের গৃহে অতিথি হইলাম, তিনি গাড়োয়ালী ব্রাহ্মণ। মোটঘাট নামানো হইলে একবার নগরটি বেড়াইয়া আসিলাম। প্রধান অথবা সদর রাস্তা পাথর দিয়া বাঁধানো, অপ্রশস্ত; দুধারে দোকানশ্রেণী, তাহার মধ্যে একটি বিশাল চত্বর। তাহার চারিদিকে অনেক কিছুরই ব্যাপার চলিতেছে। মধ্যে বড় বড় দোকান। স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, চর্ম্মকার,

কুম্ভকার প্রভৃতির বহুবিধ কারবার বহুকাল ধরিয়া নগরকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এই গভীর পার্ব্বত্য অঞ্চলে সমৃদ্ধিশালী নগর দেখা যায় না, কারণ এখানে বিলাসিতা প্রবেশ করে নাই;—পাশ্চাত্য সভ্যতার হাওয়া এই পার্ব্বত্য জনসমাজের মধ্যে নানাদিকে অভাবরাশি সৃষ্টি করিয়া নিরন্তর অশান্তি এখনও বিস্তার করে নাই।

এখানে কুলীবাহক পাওয়া গেল না। আসকোট হইতে রাজওয়াড়ার লোক ত এইস্থানে আমাদের মাল পৌছাইয়া দিয়া গেল, কিন্তু এখান হইতে মাল লইয়া যাইবার ব্যবস্থা কিরূপ হইবে তাহাই হইল ভাবনা। শেষে এক লাদ্দু ঘোড়া পাওয়া গেল। পেস্কার-মহাশয় আমাদের বাঙালী দেখিয়া প্রথম হইতেই তেমন প্রসন্ন ছিলেন না,—এখন আমাদের মাল
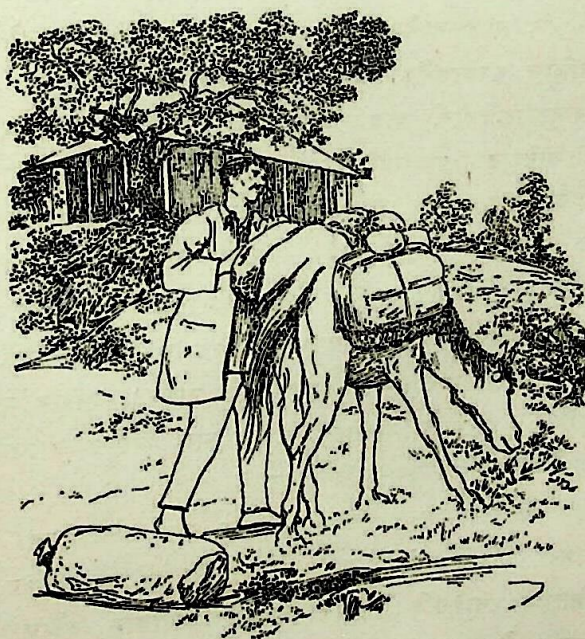
লাদ্দু ঘোড়া

চালান করিবার সময় এখান হইতে চম্পাওয়াৎ পর্য্যন্ত এক ঘোড়াওয়ালাকে সাড়ে চারি টাকা স্থির করিয়া দিলেন। আসলে এখান হইতে আড়াই বা তিন টাকার বেশী মজুরী কোনক্রমেই সঙ্গত নহে বা তিনি নিজে কখনও দিতেন না। ঘোড়াওয়ালা ব্রাহ্মণ; যদিও তাহার মলিন 'জানাউ' ব্যতীত

আকৃতি-প্রকৃতিতে তাহাকে ব্রাহ্মণবংশীয় বলিয়া ধারণা করা অসম্ভব ছিল। যাত্রা করিবার অগ্রেই সঙ্গী-মহাশয়ের ছাতাটি সারানো হইল।

পিথোরাগড়ে আসিয়াই বাড়ীতে একটি তার করিয়া দিলাম যে,— দশদিনের মধ্যেই পৌছিব। পরদিন দশটায় আহারাদির পর গুরণা যাত্রা করিলাম, এখান হইতে যাহা সাত মাইল মাত্র। বৈকালে সেখানে পৌছিয়া ডাকবাংলোর প্রশস্ত বারান্দায় আমাদের মোটঘাট নামাইলাম। পথে আমার লাঠির নীচে লোহার ফলাটি খুলিয়া গিয়াছিল। অনুসন্ধান করিয়া এই গ্রামের কামারশাল হইতে উহা পুনর্নির্ম্মাণ করা হইল, এক আনা মজুরী। ব্রাহ্মণ ঘোড়াওয়ালাই উহা ঠিক করিয়া আনিয়া দিল।

আমাদের বাংলা দেশে অনেক স্থানে বিশেষতঃ পল্লীগ্রামের দিকে দেখিয়াছি যে, ব্রাহ্মণ-বংশীয়গণ পুরুষানুক্রমে এক বিভিন্ন আবেষ্টনীর মধ্যে পড়িয়া বৃত্তিতে কৃষকশ্রেণীর মধ্যে পরিণত হইয়াছে। তাহাদের দেখিলে, আচার-ব্যবহারে, বর্ণে, আকৃতি-প্রকৃতিতে এবং সম্ভাষণে কোনপ্রকারে অনুমান করিবার যো নাই যে, ইহারা ব্রাহ্মণ-বংশাবতংশ। এখানেও ঠিক সেইরূপ এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছে। জানাউ বা পৈতা ব্যতীত তাহাদের চিনিবার উপায় নাই। অত্যন্ত দরিদ্র বলিয়া বিদ্যাভ্যাসের চলন নাই। এদিকেও আধুনিক বিদ্যাশিক্ষাপদ্ধতি ব্যয়সাধ্য। কেবল উপনয়নের সময় গোটাকয়েক সংস্কৃত শব্দ মুখস্থ করিতে হয় মাত্র, তাহাও বিকৃত। আমাদের লাদ্দুওয়ালা সেই জাতীয় ব্রাহ্মণ। তাহার সঙ্গে বেশ আলাপ হইল। গ্রামেতে নিজভাগে সামান্য চাষ, নিজের হাতেই করে, ঘরে ছেলেপুলেও তাহার তিন-চারিটি আছে।

পরদিন দ্বিপ্রহরে সরযূর বৃহৎ লৌহসেতু পার হইয়া দশ মাইলের মাথায় আমরা চীড়ায় পৌছিলাম। পিথোরাগড় হইতেই পথের নিশানা ঐ টেলিগ্রাফের পোষ্টগুলি। সরকারী মুদির দোকান হইতে মালপত্র লইয়া আমরা চীড়ায় মধ্যাহ্নভোজন শেষ করিলাম এবং দুইটা নাগাদ লোহাঘাটের দিকে যাত্রা করিলাম;—বিশ্রাম মোটেই হইল না।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, তাহার উপর সারা পথটায় জোঁকের উৎপাত। যতই দ্রুতবেগে চল না কেন, একসঙ্গে দুই-তিনটি নানা দিক হইতে পায়ে ধরিয়া শোষণ আরম্ভ করিয়া দিবে। যাহা হউক, বাদল সন্ধ্যার আঁধারকে অবলম্বন করিয়া লোহাঘাট পৌছিলাম। পণ্ডিতজী

কিছু আগে পৌছিয়াছিলেন, জানিতাম না কোথায় উঠিয়াছেন। এখন সঙ্গী-মহাশয়ের খোঁজে স্বামী পরমানন্দের পাঠশালায় গিয়া উঠিলাম।

লোহাঘাঠের আশ্রয়
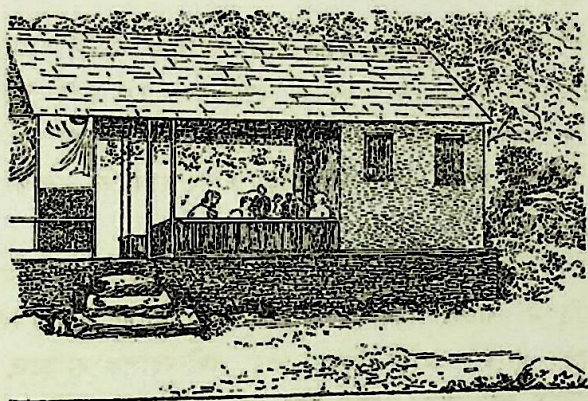
পরমহংস পুণ্যশ্লোক শ্রীরামকৃষ্ণের নামে যে কর্ম্মপরায়ণ সন্ন্যাসীসমাজ অধুনা ভারতের সর্ব্বত্র লোকহিতকর কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়া বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়াছেন, ইনি সেই মিশনেরই একজন। গৃহত্যাগী নীরব কর্ম্মী স্বামী পরমানন্দ এখন এখানে বালকগণের শিক্ষাবিস্তারে মন দিয়াছেন ; আমরা তাঁহারই আশ্রমে আজ অতিথি।

স্বামিজীর বয়স প্রায় আটচল্লিশ, মুণ্ডিতমস্তক, গোলগাল মুখখানি, শান্তস্বভাব, হৃষ্টদেহ, নিঃসঙ্কোচ, বিনয়ী, সরল এবং ভদ্র। সঙ্গী-মহাশয় প্রবীণ এবং এক্ষেত্রে অনেকটা অনাবশ্যক প্রবীণতা দেখাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অনেক অবান্তর কথা বলিতে লাগিলেন। আপনারা সব ছেলে-ছোকরার দল দেখছি, এখন প্রবীণ লোক কে আপনাদের দলে আছে?

তাঁহার সকল কথা এই ভাবেরই। তাঁহার সঙ্গে স্বামিজীর বয়সের হয়ত চার পাঁচ অথবা ছয় বৎসরের পার্থক্য। ব্যবহারকুশল বিনীত স্বামী, যথাযোগ্য উত্তর দিয়া অন্য কথার অবকাশ না দিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ রাত্রে আপনাদের জন্য আহারাদির ব্যবস্থা কি করা যায় বলুন দেখি? আমার ত সঞ্চয় কিছু নাই, কোন রকমে দিনটা চলে যায়।

সঙ্গী-মহাশয় তবুও জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রে কিরকমে চলে? কোন গৃহী-ব্যক্তি নিরবলম্ব সন্ন্যাসী সাধকের আশ্রয়ে অতিথি হইয়া ভোজনের দাবী অত্যন্ত অসঙ্গত।

স্বামিজী বলিলেন, এই যে দুইটি ছাত্র দেখছেন, এরাই রাত্রে আমার জন্য দুখানি রুটি আনে আর এখানে একটু দুধ থাকে, তাহাতেই রাত্রিটা কাটিয়ে দি। এখন আপনাদের জন্য কি করা যায়? তখন সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন, এখানে ব্রাহ্মণ এমন কেউ নেই কি, যে আমাদের জন্য দুচার খানা রুটি পাকাতে পারে?

স্বামিজী বলিলেন,—অপর কেউ নাই, এই বালক ছাত্র দুটিই আছে, যদি আপত্তি না থাকে, তবে এদের দ্বারাই আপনাদের খাবার রুটি তৈরী করিয়ে দিতে পারি। তাই হোক, বলিয়া সঙ্গী-মহাশয় দাড়িতে অঙ্গুলি চালনা করিতে লাগিলেন। সেই শিষ্ট বালকেরা রাত্রে বৃষ্টিতে ভিজিয়া বাজার হইতে আলু, আটা, ঘি ইত্যাদি আনিয়া চুলা ধরাইয়া আমাদের জন্য রুটি ও তরকারী পাক করিল। স্বামিজী নিজ হাতে ছুরি দিয়া আলু ছাড়াইয়া দিলেন এবং আমাদের ভোজনব্যাপারে নীরবে যথাসাধ্য সাহায্য করিলেন।

যখন সমস্তই প্রস্তুত হইল, তখন সঙ্গী-মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, গৈরিক পরবার আগে আপনারা কি ছিলেন, উপাধি কি ছিল, মুখুজ্যে না বাঁড়ুয্যে না কি? দূর হইতে স্বামী বলিলেন, আমরা মিত্রবংশীয়। শিষ্টতার এবম্বিধ ব্যভিচারের এইখানেই শেষ নহে, আরও আছে।

শুনিয়া পণ্ডিত সঙ্গী-মহাশয়টি তখন,—ওঃ, আচ্ছা বেশ, তবে আমি এইদিকেই খাব, হামকো ও পাত্র হামরা হাতমে দেও তো বলিয়া পাত্রটি ঝটিতি বালকের হাত হইতে লইলেন এবং আমাদের সকলের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া খাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। খাইতে খাইতে বলিলেন, আপনি আমাদের জন্য খুব করেছেন, অনেক করেছেন, বেশ, হাঁ,—আপনারাও বসুন না, খান না, তাতে কি? এক্ষেত্রে এইরূপে আমাদের নিষ্ঠাবান সদাচারী সঙ্গী-মহাশয় নিজের ব্রাহ্মণত্ব এবং উচ্চ ব্যক্তিত্বের পবিত্রতা বাঁচাইয়া লইলেন।

আহার শেষ হইলে আমাদের শয়নের ব্যবস্থা এইখানেই হইল। রাত্রি প্রভাত হইলে প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া স্বামিজী আমাদের সঙ্গে করিয়া

স্বামিজী আমাদের সঙ্গে করিয়া মায়াবতীর পথ দেখাইয়া দিলেন। বলিলেন, আপনারা মায়াবতীতে গিয়ে খেয়ে সুখ পাবেন, সেখানে ফলমূল ও শাকসবজি প্রচুর আছে।

লোহাঘাট হইতে চম্পাওয়াৎ ছয় মাইল, ঠিক মধ্যস্থলেই মায়াবতী। লোহাঘাট হইতে মায়াবতী প্রায় চারি মাইল। মায়াবতীর পথে কতকটা পর্য্যন্ত আমাদের পৌছাইয়া স্বামিজী ফিরিলেন, আমরা অগ্রসর হইলাম। কতকটা চড়াই উঠিয়া বনপথ পড়িল; দুই পার্শ্বেই ঘন জঙ্গল। এ পথেও জোঁকের উৎপাত কম নয়;---প্রায় নয়টা আন্দাজ মায়াবতী পৌছিলাম।

মায়াবতীকে এ-অঞ্চলে মায়াপট্ বলে; পূর্ব্বে এখানে এক সাহেবের চা-বাগিচা ছিল। পরে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে প্রসিদ্ধ কর্ম্মী ও ভক্ত ক্যাপ্‌টেন সেভিয়র আসিয়া আশ্রমার্থ এই পাহাড়টি খরিদ করেন। অদ্বৈত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইলে, 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামক প্রসিদ্ধ ইংরেজী মাসিকপত্র এখান হইতে বাহির হইতে আরম্ভ হয়। এখনও সেখানি বিশেষ গৌরবের সহিত চলিতেছে। মায়াবতী বলিতে প্রায় দেড় মাইল বিস্তৃত পার্ব্বত্য ভূখণ্ড বুঝায়, এখন ইহা সম্পূর্ণই অদ্বৈত আশ্রমের অধিকারে।

আশ্রমে যখন উপস্থিত হইলাম তখন সীতাপতি ব্রহ্মচারী ব্যতীত মঠে আর কেহ উপস্থিত ছিলেন না। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, অন্যান্য স্বামিগণ নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে মেলা দেখিতে গিয়াছেন, শীঘ্রই ফিরিবেন।

বড় বাংলোটির নিকটবর্ত্তী একটি ছোট বাংলোর দ্বিতলকক্ষে ব্রহ্মচারী-মহাশয় আমাদের জন্য স্থান ঠিক করিয়া দিলেন, মালপত্রও সেইখানেই রাখার ব্যবস্থা হইল। কিছুক্ষণ পরে আত্মচৈতন্য প্রমুখ মঠের অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আমাদের আগমনে বিশেষ প্রীতি ও আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে আত্মচৈতন্য ব্রহ্মচারী মহাশয় এতদিন পরে বাঙ্গালী পাইয়া প্রসন্ন মনে, একটু যেন অনুরোধের সুরেই প্রস্তাব করিলেন, আপনারা অনেকটা ক্লান্ত আছেন, আশা করি এখানে দুই-চারদিন বিশ্রাম করে যাবেন। সঙ্গী-মহাশয় তৎক্ষণাৎ এই বলিয়া ও-কথা শেষ করিয়া দিলেন যে, আমরা অনেক দিন ঘর হতে বেরিয়েছি, এখন আর কোথাও ভাল লাগছে না, আগামী কালই আমরা এখান থেকে যাত্রা করব, তিন দিনেই টনকপুর পৌছে যাব এবং দেশে গিয়েই বিশ্রাম করব। যখন তিনি

কিছুতেই রাজী হইলেন না, তখন অগত্যা তাঁহারা নিরস্ত হইলেন, তবুও আর একবার বলিলেন, এখানে আমরা বাঙালী সঙ্গী পাই না, যে কয়জন এখানে আছি সেই কয়জন ছাড়া ত আর আমাদের দেশের লোকের মুখ দেখবার জো নাই। আপনাদের পেয়ে আমরা বাস্তবিকই আশা করেছিলাম কিছুদিন দেশের বন্ধুর সঙ্গ পাব, অন্ততঃ কিছুদিন ছাড়ব না, কিন্তু যখন একান্তই আপনার এতটা অনিচ্ছা, তখন আর কি বলবার আছে।

স্থানটি যে কি মনোরম প্রত্যক্ষ না করিলে শুধু শুনিয়া অনুভব করা যায় না। সাধনার অনুকূলক্ষেত্র,—পূর্ণস্বাধীনতার হাওয়ায় সর্ব্বস্থান যেন
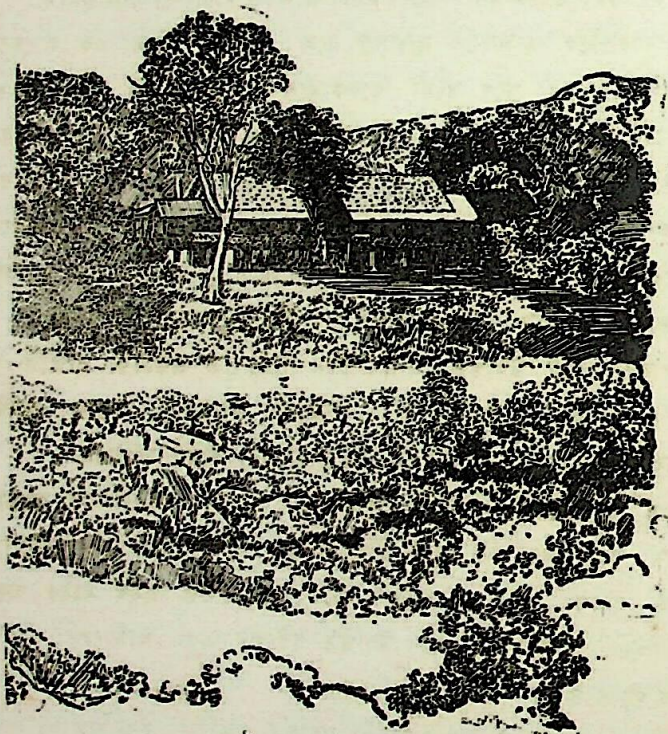
অদ্বৈত আশ্রম—মায়াবতী

সজীব হইয়া আছে, এমনই স্থানে এই অদ্বৈত-আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত ;—দেখিলে প্রাণে শান্তি আপনিই আসে। প্রধান আশ্রমটি পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর। সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ না হইলেও সমুদ্রতল হইতে ছয় হাজার ফুটের কম হইবে না। তখন ঘোর বর্ষা, আকাশে দিবারাত্রই মেঘের আড়ম্বর, আর মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি ত আছেই, সেই কারণে আমরা ভাল করিয়া স্থানটি উপভোগ করিতে

পারি নাই। কিন্তু শুনিলাম, আকাশ পরিষ্কার থাকিলে বহু দূরদূরান্তে মধ্য হিমালয়ের চিরতুষারাবৃত শৃঙ্গগুলি পরিষ্কার দেখায়;—বিশেষতঃ নন্দাদেবীর দৃশ্যটি। পাহাড়ের তিনটি স্তর, এই তিনটি স্তরে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের জন্য সুন্দর গৃহসকল নির্ম্মিত এবং পরিপাটি রূপে সজ্জিত আছে। প্রত্যেক গৃহই, বিশিষ্ট কর্ম্মের প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ আসবাবে পূর্ণ, কোথাও অতি প্রাচুর্য্য নাই, দৈন্যও নাই। স্বল্প এবং বিরল বসতি হইলেও গম্ভীর এবং সমৃদ্ধিশালী একটি গ্রাম, এই মায়াপট পর্ব্বত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। সর্ব্বত্র আপেল, নাসপাতি, আখরোট, খোবানীর গাছ। প্রথম স্তরে ফুল ও ফল দ্বিতীয় স্তরে শাকসবজি, তৃতীয় স্তরে ক্ষেত্র। সকল স্তরের রাস্তাগুলি পরিষ্কার, সযত্ননির্ম্মিত সুসমতল এবং সুরক্ষিত। মায়াবতী বাস্তবিকই হিন্দুজাতির গৌরব।

ভোজনের সময়, আপনারা কোথায় ভোজন করিবেন? যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, তখন এখানেও ভোজনব্যাপারে সঙ্গী-মহাশয় নিজ জাতিগত পবিত্রতা রক্ষা করিলেন। সাধারণ ভোজনগৃহে যেখানে সমবেত-ভোজনের পরিপাটি ব্যবস্থা আছে সেখানে ভোজন করিবেন না, বলিলেন। তিনি কাহারও সহিত খাইবেন না, নিজকক্ষেই ভোজন করিবেন। পরে আমার দিকে দেখাইয়া ঈষৎ শ্লেষের ভাবেই বলিলেন, তবে এই বাবু যদি ইচ্ছা করেন ত আপনাদের সঙ্গে খেতে পারেন, ওঁর ত আপনাদের সঙ্গে চলে। তাঁহার এইরূপ ব্যবহারে আমার অন্তর অসহ্য তিক্ত হইয়া উঠিল। কাঠগুদাম হইতে আরম্ভ করিয়া ভোটিয়া আশ্রয়দাতা মহাজনের আশ্রয়ে পর্য্যন্ত এতদিন কাটানো হইয়াছে, ইহার মধ্যে তাঁহার আচারনিষ্ঠার গভীরতা যে কতটা আমার ত দেখিতে কিছুই বাকী ছিল না। কিন্তু নিজের দেশের এই পবিত্র সঙ্ঘের মধ্যে আসিয়া তাঁহার এই প্রকার ব্যবহার এত বিসদৃশ ঠেকিল যে,—আর তাঁহার সহিত বাক্যালাপের ইচ্ছা হইল না। সকলের সঙ্গে একত্র ভোজনের আনন্দই আমার নিকট শ্রেয়ঃ বোধ হইল।

মধ্যাহ্নে বিশ্রামের পর আমরা আশ্রমের সর্ব্বস্থান তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম। প্রথমে, দ্বিতল কাষ্ঠনির্ম্মিত সুন্দর গৃহে 'প্রবুদ্ধ ভারত' কার্য্যালয়, নিম্নতলে যন্ত্র ও দপ্তরখানা প্রভৃতি। দ্বিতলে বৃহৎ একখানি কক্ষে বহুল পরিমাণে কাগজ স্তরে স্তরে সংগৃহীত আছে, অপরখানিতে এখানকার প্রকাশিত পুস্তকাবলী;—পার্শ্বেই সম্পাদকের ঘর। আরও কয়েকখানি

ঘর, তাহাতে এই বৃহৎ ছাপাখানার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ এবং অতি পরিপাটিরূপে সজ্জিত। কোথাও কোনো ব্যাপারে খুঁত নাই। প্রয়োজনীয় বস্তু ও পারিপাট্যের এমন মধুর সমাবেশ এই পার্ব্বত্য প্রদেশে এক অপূর্ব্ব চিত্তাকর্ষক ব্যাপার।

এই প্রেসের কিছুদূরে, দেখিলাম একটি ক্ষুদ্র সাধনগৃহ আছে, যেখানে সাধক একান্তে ধ্যানধারণা করিতে পারেন। তারপর নীচের স্তরে নামিয়া চিকিৎসালয় দেখিলাম। ইহার ব্যবস্থা দেখিয়া বিশিষ্ট দর্শকগণের মন্তব্য-পুস্তকে সঙ্গী-মহাশয় লিখিলেন, —এখানকার সকল বিষয় দেখিয়া শুনিয়া নিজেকে বাঙালী বলিয়া গৌরবান্বিত বোধ করিলাম। আমরা অনেকক্ষণ এখানকার সমস্ত দেখিয়া নিম্নস্তরে নামিয়া মহাত্মা সেভিয়রেরগৃহ দেখিলাম। অদ্বৈত-আশ্রমের সকল স্থান উদ্যান-পথ, ক্রীড়া-ভূমি প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে আনন্দে আজিকার বেলাটি কাটিয়া গেল, বাস্তবিকই আমাদের জীবন ধন্য হইল। নিস্তব্ধ একটি প্রেমের রাজত্ব, পূর্ব্বে এমনটি কোথাও দেখি নাই।
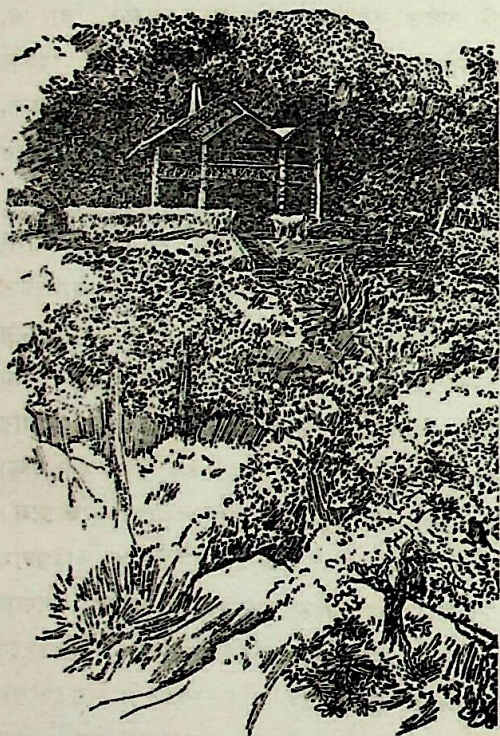
'প্রবুদ্ধ ভারত' কার্য্যালয়—মায়াবতী

এখানে একটি ডাকঘর বসাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে যদিও তখনও কার্য্যারম্ভ হয় নাই; সে স্থানটিও দেখিলাম। এমন স্থানে কিছুদিন থাকিবার ইচ্ছা আমার প্রাণের মধ্যে এতটা প্রবল হইয়াছিল যে, সঙ্গী-মহাশয়কে বলিয়া ফেলিলাম, দুই একদিন আরও থাকিলে ক্ষতি কি? আমি এই আশা করিয়াছিলাম, তিনি বলিবেন তুমি থাক আমি যাই, তাহা হইলে আনন্দেই

আমি থাকিয়া যাইব। কিন্তু তিনি তাহা বলিলেন না। দেশের লোক একেবারে দেশে পৌছাইয়া চূড়ান্ত বিশ্রাম করা যাইবে; বসিয়া বসিয়া ইহাদের এই কষ্টসঞ্চিত অন্ন ধ্বংস করিয়া লাভ কি? স্নেহের অভিনয় পূর্ব্বক তিনি এই বলিয়াই শেষ করিয়া দিলেন।

যাহা হউক স্বামীজীদের অনুরোধ, সন্ধ্যার পর সঙ্গীতে ভজন করিতে হইবে। এই নিবিড় পার্ব্বত্য অরণ্যের অন্ধকারে আমার মধ্যে একটা গান ফুটিয়াছিল। প্রথম কয়েকখানির পর সবশেষে, সেইটি হইল—

নিবিড় আঁধারে ওমা চমকে অরূপরাশি,
তাই যোগী ধ্যান করে হয়ে গিরি গুহাবাসী।
অনন্ত আঁধার কোলে মহানির্বাণ হিল্লোলে,
চিরশান্তি পরিমল অবিরল যায় ভাসি—ইত্যাদি।

সকলেই আনন্দ পাইলেন। রাত্রে ভোজনান্তে পরদিন প্রাতে যাত্রার সঙ্কল্প করিয়া ভগবান রামকৃষ্ণের কথা আলোচনা করিতে করিতে আমরা শয়ন করিলাম।

প্রাতে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আশ্রমের সাধুজন সকলেই আর একবার থাকিয়া যাইবার জন্য একবাক্যে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু সঙ্গী-মহাশয় অটল। অগত্যা তাঁহারা খেচরান্নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আহারাদির পর বৃষ্টি থামিতেই সঙ্ঘের সাধুগণকে নমস্কার করিয়া আমরা চম্পাওয়াৎ যাত্রা করিলাম। জোঁকের উৎপাতে পায়ে তেল মাখিয়া আশ্রম হইতে বাহির হইয়াছিলাম কিন্তু নিরাপদ হইতে পারি নাই। মায়াবতী হইতে বনপথে আমরা প্রায় চার মাইল দ্রুত অতিক্রম করিয়া দেড় ঘণ্টার মধ্যেই চম্পাওয়াৎ পৌছিলাম।

এখানে ঘোড়া কুলি বাহক প্রভৃতির এজেন্সী আছে। লাদু ঘোড়া-ওয়ালাকে তাহার দক্ষিণা সাড়ে চারি টাকা দিয়া এইখানেই বিদায় দিলাম।

এখানকার বর্ত্তমান নিয়ম অনুসারে প্রতি পড়াও পিছু এক মণ মোটের মজুরী ছয় আনা। সেই হিসাবেই আমাদের টনকপুর ষ্টেশন পর্য্যন্ত দুইজন বাহক লওয়া হইল। টাকাও জমা দিলাম চারটি পড়াওয়ের জন্য, প্রত্যেককে দেড় টাকা দিয়া রসিদও পাইলাম। দেউড়ি, এখান হইতে পনের মাইল, ইহাকে দুইটি পড়াও ধরা হয়। তারপর সুখীডাং, শেষে টনকপুর—যেখানে রেল-স্টেশন।

বর্ত্তমান চম্পাবতী আর নগর নহে,—নদীতীরে একখানি সাধারণ গ্রাম মাত্র, তবে বিস্তৃত এবং উচ্চ ভূমির উপর। গ্রামের মধ্যে প্রবেশপথে বড় ফটক পার হইয়া বরাবর সোজা সদর রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র
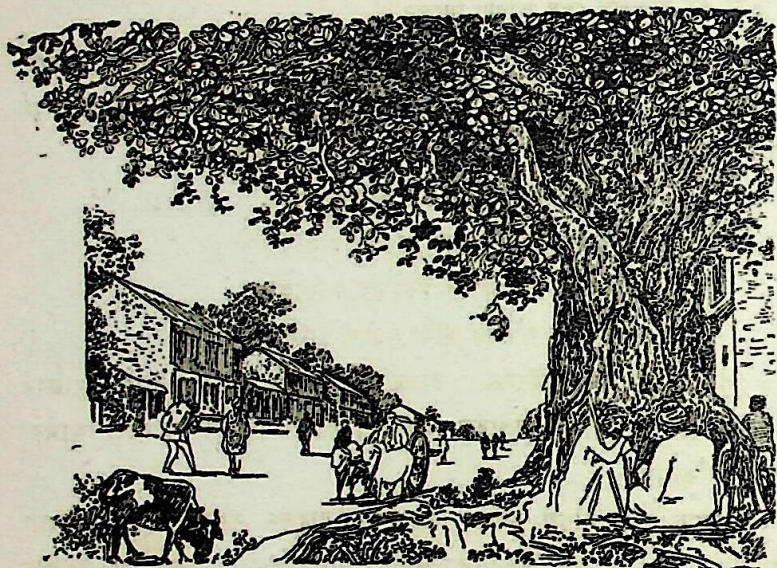
চম্পাবতীর রাজপথ

ক্ষীণকায়া নদী দেড় দুই শত ফুট নীচে,—এখন বর্ষার প্রভাবে দুইকূলে পূর্ণ। চারিদিকেই শস্যক্ষেত্র, সবুজের বিস্তৃত সভাতল। আমরা চম্পাওয়াতে বেশীক্ষণ ছিলাম না, বাহকের ব্যবস্থা করিতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু। পরে দেউড়ি অভিমুখে যাত্রা করিলাম,—এখান হইতে প্রায় পনেরো মাইল। লম্বা পাড়ি দিয়া অবসন্ন শরীরে সন্ধ্যার মধ্যেই সেস্থানে পৌছিলাম। মালপত্র সমেত ডাকবাংলোর বারান্দায় আড্ডা করা গেল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই আমরা আহারাদি সারিয়া লইলাম। রাত্রে, গভীর ক্লান্ত নিদ্রার মাঝে ঘোরতর বৃষ্টির আবির্ভাব। ব্যাঘাত পাইয়া শয্যা-দ্রব্যাদি গুটাইয়া বারান্দা হইতে ঘরের মধ্যেই আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। পরদিন প্রায় সাড়ে ছয়টা পর্য্যন্ত নিদ্রিত ছিলাম। সঙ্গী-মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, এ বেলা স্নানাহার শেষ করিয়াই একেবারে সুখাডাং-এর দিকে যাত্রা করা যাইবে। মনে আনন্দ আছে যে, পরদিন আমরা টনকপুর রেল ধরিতে পারিব, মধ্যে আজিকার একটি দিন মাত্র।

এখান হইতে সুখীডাং যাইতে দুইটি পথ আছে, একটি নাওয়া অপরটি পুরানা সড়ক্। উভয় পথেই বেশ প্রশস্ত একটি নদী পড়ে ও ঘোর জঙ্গলের মধ্য দিয়েই রাস্তা। তবে পুরানো পথটিতে একটি ঝোলা পুল আছে, নূতন পথে পুল এখনও হয় নাই, এক কোমর জল ভাঙিয়া যাইতে হয়। আমরা পুরানা সড়ক দিয়াই যাইব স্থির করিলাম, যদিও শুনিলাম এপথে কতকটা চড়াই আছে। যথা সময়েই আমরা যাত্রা করিলাম। যেমন হইয়া আসিতেছে, আমি পা পা করিয়া একসঙ্গে যাইতে যাইতে ক্রমে গতি আরও বাড়াইয়া দ্রুত চলিতে সুরু করিলাম এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই পুরানো পুলের নিকটে উপস্থিত হইলাম। সরু পুলটি, উপরে লোহার তারের কাছি ও নীচে পাতলা সারি সারি কাঠের পাটা দিয়া লঘুপ্রণালীতে প্রস্তুত, এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত বিস্তৃত। চলিতে চলিতে বুঝা যায় পুলটি দেহভারে নাচিতেছে; বেশ আরামপ্রদ। সেই নির্জ্জন পথটিতে চলিতে চলিতে বড় আনন্দেই পুলের এপারে আসিলাম; দেখিলাম, বিজন জঙ্গলের মধ্যে বন্ধুর পথ আমার সম্মুখে।

যে পর্ব্বতগাত্রে সেতুর অবলম্বন, তাহার উপর দিয়া একটি পথ গিয়াছে, আবার উহার বামেও একটি পথ আছে, সেটি পাকডাণ্ডি বা বনপথ বুঝিতে পারিলাম। সঙ্গীবাহকগণ, যাহারা মূলতঃ পথপ্রদর্শক, তাহারা পশ্চাতে অনেকটা দূরে রহিয়াছে। তাহাদের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই বনপথ ধরিয়া গেলে ঠিক বড় রাস্তায় পড়িব ভাবিয়া অগ্রসর হইলাম। সেইখানেই একটা মস্ত ভুল করিলাম;—তখন বুঝিতে পারিলাম না। এইটুকু কেবল ধারণা ছিল যে, আমায় বামে যাইতে হইবে, সেই দিকেই গন্তব্য পড়াও। এরূপ ভয়ঙ্কর জঙ্গলময় পথ হিমালয়ের উচ্চস্তরে নাই, উহা এই শিবালিকা-শ্রেণীর মধ্যেই।

যাহা হউক আমি ত সেই সেতুটি পার হইয়া পাকডাণ্ডি ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। প্রাণে আনন্দ, শরীরে বল, হাতে পাহাড়ী লম্বা লাঠি মাথায় পাকবাঁধা, গায়ে ছিল গেঞ্জির উপর একটা পুরানো বর্ষাতি এবং নগ্ন-পদ। যতই শেষ হইয়া আসিতেছিল হিমালয়ের উপর ততই তীব্র একটি আকর্ষণ অনুভব করিতেছিলাম। এত কষ্টের তীর্থভ্রমণ ও কঠিন পথ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে;—কাল আমরা সমতলভূমিতে পৌছিব এবং রেলষ্টেশন পাইব, কাজেই হিমালয়ের নির্জ্জনতা যতটুকু

পাওয়া যায় সবটুকুই উপভোগের বস্তু। এইভাবে চিন্তার তালে মগ্ন হইয়াই চলিতেছিলাম।

ক্রমশঃ পথটি মিলাইয়া যাইতে লাগিল, পথের রেখা ভাল দেখা যায় না। একস্থানে কতকটা চড়াইয়ের মত পথে বর্ষার ধারা নামিয়া স্থানে
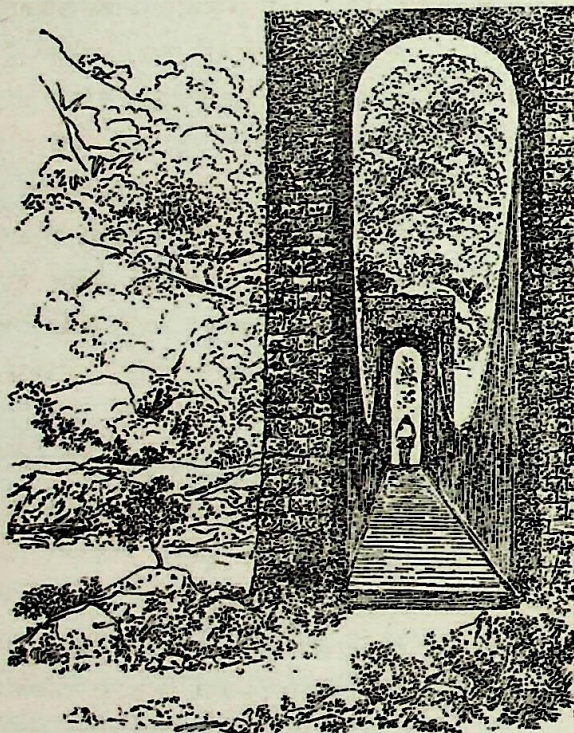
সেতু

স্থানে গভীর দাগ পড়িয়া খাল লইয়া গিয়াছে। এইরূপে কতকটা উঠিয়া দেখিলাম, সেই স্থানটি এত পরিষ্কার যেন কেহ উহা সযত্নে পরিষ্কার করিয়া গিয়াছে, ঠিক যেন কোন ঋষির আশ্রম বা তপোবন। কতকগুলি শাখামৃগও খেলা করিতেছে।

তখন প্রাণে স্ফূর্ত্তি অবাধ,—অন্যমনস্ক হইয়া তাহার মধ্য দিয়াই চলিলাম, সেই স্থানটি বড় বড় গাছে পূর্ণ, ছোট গাছ কম। তাহার পর বৃক্ষশ্রেণীর উপর ঘনপত্রাচ্ছাদন হেতু স্থানটিতে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। সেইজন্য সমগ্র ভূমিটি জুড়িয়া তাপহীন স্নিগ্ধ অন্ধকার, তাহারই মধ্যে

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক এক খণ্ড উজ্জ্বল কিরণ ক্বচিৎ পত্রব্যবধান ভেদ করিয়া ভূমি স্পর্শ করিয়াছে, তাহাতে দৃশ্যটি আরও মনোহর করিয়া তুলিয়াছে।

পথ ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণতর হইতে হইতে কখন মিলিয়া গিয়াছে দেখিতে পাই নাই,—একতালে বেশ স্ফূর্ত্তিতেই চলিতেছিলাম। যখন লক্ষ্য আমার পথের উপর পড়িল তখন হঠাৎ পথ দেখিতে না পাইয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম;—একি! পথ কোথায়! কোনো দিকেই ত পথ বলিয়া কিছু দেখিতে পাইতেছি না। পথের নিশানা সেই টেলিগ্রাফ পোষ্টগুলি নয়া সড়ক দিয়াই গিয়াছে, এপথে কিছুই নাই।

সেতু পার হইবার সময় হইতেই এই ধারণা ছিল যে, আমার গতি উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে। এখন সম্মুখে কতকটা জঙ্গলের মধ্যে মৃত্তিকা-মিশ্রিত প্রস্তরস্তর-সমাকীর্ণ বনপথের মত বোধ হইতে লাগিল, উহা পাকডাণ্ডি ভাবিয়া সেইদিকেই চলিতে লাগিলাম। কতকটা চলিয়াই বুঝিতে পারিলাম, পথ বলিয়া যেটা ধরিয়া আসিয়াছি সেটি বিপথ। উহা এমন স্থানে আনিয়া ফেলিয়াছে যেখান হইতে পথ পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই, যেহেতু এই স্থানটি ঝুপি-জঙ্গল হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় বৃক্ষ এবং লতা-গুচ্ছ পরিপূর্ণ। আশ্চর্য্য এই, মধ্যে মধ্যে দুই-একটা কলাগাছ দেখা যাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া আমার এই বুদ্ধি উপস্থিত হইল যে, নিকটে নিশ্চয়ই পথ বা লোকালয় আছে, না হইলে এখানে কলাগাছ কেন? মানুষে না বসাইলে কলাগাছ হইতেই পারে না। এই বুদ্ধির প্রভাবে আমি লতাগুল্ম পদদলিত করিয়া ত্বরিৎপদে চড়াইয়ের উপর উঠিতে লাগিলাম। কিন্তু হায়,—কল্পনা পরিচালিত মন এবং স্বধর্ম্মভ্রষ্ট বুদ্ধি, ফলে বিপরীত ঘটাইল,—পথও মিলিল না, লোকালয়ও মিল্‌ল না। যদিও অন্তরের মধ্যে তখনও বিশ্বাস রহিয়াছে যে, জঙ্গল হইতে বাহির হইবার পথ নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে, তখনও মনের বল হারাই নাই। ভাবিলাম, এখন জঙ্গল হইতে কোনক্রমে বাহির হইতে পারিলে সহজেই পথ খুঁজিয়া লইতে পারিব। দ্রুতগতিতে জঙ্গল ভাঙিয়া পা চালাইলাম। বাহির হইব কি, যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম ততই নিবিড় জঙ্গল, গলিত শুষ্ক শাখা-পত্রসঙ্কুল, পথের চিহ্নশূন্য বন সম্মুখে পড়িতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে রাশীকৃত ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা আয়তনবিশিষ্ট লতাগুচ্ছের মধ্যে পা জড়াইয়া যাইতে লাগিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, সূর্য্যের মুখ দেখা যায় না;

বেলা যে কতটা হইয়াছে তাহাও ঠিক করিতে পারিলাম না। আমরা নয়টার সময় বাহির হইয়াছিলাম, এখন হিসাব মত বেলা আন্দাজ একটা হইবে, তাহার বেশী হইবে না বলিয়াই মনে হইল।

ভিতরে উৎসাহ পূর্ণরূপেই ছিল। ভাবিলাম এখানে যখন কোনও পথ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না তখন যেমন করিয়া হোক একবার শিখরদেশে উঠিতে পারিলেই নিশ্চয়ই পথ দেখিতে পাওয়া যাইবে। এবার উপর দিকে উঠিতে লাগিলাম, লক্ষ্য হইল শিখরদেশ। প্রায় দুই ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রমের পর ঘন জঙ্গল ছাড়াইয়া শিখরদেশে উঠিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। উপরে লতাগুল্ম কম, ছোট ও মাঝারী গাছই বেশী, বড় গাছ ছিল না।

যখন চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, তখন প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। চারিদিকেই পর্ব্বতশ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে কি বিশাল ঘন কালো জঙ্গল চলিয়া গিয়াছে, কোথাও ভূমি দেখা যাইতেছে না। যে দিক হইতে আসিয়াছি একবার সেইদিকে চাহিয়া দেখিলাম, তখনও দিকভ্রম হয় নাই। বহু দূরে অনেকটা নীচের দিকেই সেই সেতুটি, মাকড়সার জালের মত দেখা যাইতেছে। এতক্ষণে বোধ করি সঙ্গী-মহাশয় সুখীডাংয়ে পৌঁছিয়া থাকিবেন, আর আমি জঙ্গলে পথভ্রান্ত হইয়া ঘুরিতেছি। এক একবার তাঁহার নিষেধবাক্য,—অত আগে যাওয়া ভাল নয়,—মনে হইতে লাগিল। এভাবে জঙ্গলের মধ্যে আমার যে পথভ্রান্তি ঘটিবে স্বপ্নেরও অগোচর। মনেই আসে নাই যে, ভুলপথে পা বাড়াইয়া দিবারাত্র কত বিপদের মধ্য দিয়া চলিতে হইবে।

এখন এই অজগর জঙ্গলের মধ্য হইতে বাহির হইব কি প্রকারে, পথ বলিয়া ত কিছুই চক্ষে পড়িতেছে না। এ দিকে দাঁড়াইয়া ভাবিলেও চলিবে না; আর না দাঁড়াইয়া পা চালাইয়া দিলাম। এবারে নামিতে লাগিলাম। পথ যদি থাকে ত নীচেই আছে এইটুকুই কেবল মনের মধ্যে জাগিতে লাগিল। ক্রমশঃ জঙ্গল বড়ই ঘন বোধ হইতে লাগিল, আবার আকাশও একদিকে ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল, চারিদিকে কালো হইয়া গেল —যেন ঝড় ও জলদানবের আসিতে আর বিলম্ব নাই। এতক্ষণ দেখি নাই—দুই পা কনকন করিয়া উঠিল। পায়ের তলা হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে কোমর পর্য্যন্ত জোঁকে ধরিয়াছে, দেখি,—তাহারা রক্ত পান করিয়া একেবারে দষ্ট স্থান হইতে স্রাবিত ঘন রক্তে জমিয়া কালো হইয়া

গিয়াছে ;—বস্ত্রখানির অনেকটাই রুধিরসিক্ত। এখন যদি বসিয়া এইসব পরিষ্কার করি তবে হয়ত বেলাটুকু চলিয়া যাইবে। কাজেই পায়ের দিকে লক্ষ্য না করিয়াই দ্রুত নামিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে পথ পাইবার আশায় যত তাড়াতাড়ি নামিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম ততই পদস্খলন হইতে লাগিল। তাহার উপর আবার একটি নূতন উপসর্গ উপস্থিত হইল, সেটা আগে অত ছিল না, এখন বেশী বেশী পাইলাম—সেটা ঘন বিছুটির জঙ্গল।

এত বড় বিছুটি গাছ জীবনে কখনও দেখি নাই। এক একটি গাছ আয়তনে প্রায় শিউলি গাছের মত এবং ডালপালা ঐরূপই স্থূল, পাতাগুলি সেই অনুযায়ী প্রকাণ্ড, আবার কাঁটা বা শোঁয়াগুলি সেই অনুপাতে দীর্ঘ। তাহার মধ্যে কতকগুলি গাছ যে কত কালের তাহার ঠিক ঠিকানা নাই। উহারা মরিয়া জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের গলিত পত্রগুলি নীচে পড়িয়া মাটি হইয়া গিয়াছে, কেবল সকণ্টক কাণ্ডটি ঠিক দাঁড়াইয়া আছে। একবার ঐরূপ একটি স্থূল শিকড়কে দৃঢ় রূপেই অবলম্বন করিয়া যেমন নামিতে যাইব, হাতের কাণ্ডটি হাতেই রহিল, একেবারে পাঁচ ছয় হাত নীচে একটি প্রকাণ্ড শৈবালাকীর্ণ প্রস্তরের উপরে পড়িয়া গেলাম। আমার হাঁটুর উপরই চোট বেশী লাগিল, ভিতরে কতকটা ধারালো পাথরের কোণ ঢুকিয়া গেল, তখন টের পাইলাম না। সে বেদনা অল্পক্ষণেই হজম করিয়া ফেলিলাম। পদতলে ও হাতের তালুতে কাঁটা ফুটিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে, লাঠিটা আর মুষ্টির মধ্যে ধরিতে পারিতেছি না। চলিতে ত হইবেই, এখন দিন শেষ হইয়া আসিতেছে, এ-সময় ত চলা বন্ধ হইতেই পারে না।

বেলা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ ভগ্নোৎসাহ হইলাম, মাথার ঠিক আর রহিল না। তখন ঘন কণ্টকলতা-সমাকীর্ণ দুর্ভেদ্য জঙ্গল না মানিয়া পা চালাইলাম। তালে বেতালে মাতালের মত পা পড়িতে লাগিল। অবশেষে কতকগুলি লতা পায়ে জড়াইয়া আবার পড়িয়া গেলাম। এবারে সাংঘাতিক লাগিল, ঘাড়মুখ গুঁজিয়া প্রায় পাঁচ ছয় হাত নীচে এক পাথরের উপর পড়িয়া সংজ্ঞারহিতপ্রায় হইলাম। নাকের গোড়া এবং কোমরে চোট লাগিল, কতক্ষণ উঠিতেই পারিলাম না। কানের গোড়ায় কি একটা সড়্ সড়্ করিয়া উঠিল। তখন আবার আগন্তুক কোন বিপদশঙ্কায় চেষ্টা করিয়া উঠিলাম। সেটা তাড়াতাড়ি ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়া গেল, দেখিতেই পাইলাম না। সন্ধ্যা আগতপ্রায়,—হায়! এই বিজন অরণ্যে কে আমায় পথ বলিয়া দিবে?

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে, এখনও কি বাহির হইবার পথ পাওয়া যাইতে পারে না? হয়ত পারে। আর একবার সেই অসম্ভব আশা জাগিয়াই যেন হঠাৎ অন্তরমধ্যেই নিভিয়া গেল। কিসের জন্য জানি না,—তবে এটা বুঝিয়াছিলাম ভয়ে নয়,—আমার চক্ষু দিয়া দরদর ধারে জল পড়িতে লাগিল,—স্থির উর্দ্ধদৃষ্টিতে কতক্ষণ চাহিয়া রহিলাম। গলদশ্রুনয়নে কয়েকবার কাহাকে ডাকিলাম। তাহার পর আর একবার বনস্থলী কাঁপাইয়া, জগদম্বা;—বলিয়া সেইখানেই নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া পড়িলাম। প্রাণ বুঝি আমার এত কাতর কখনও হয় নাই। ভক্ত বলিয়া নিজের উপর যে অভিমানটি ছিল তাহা চূর্ণ হইল। হঠাৎ কোনও আগন্তুকের বেশে ভগবান আসিয়া পথ দেখাইয়া দিবেন এ আশাও ঝটিতি মনের মধ্যে একবার চমকাইয়া গেল। কিন্তু হায়! পথ দেখাইতে কেহই আসিল না, যেটি ক্রমে বড় নিকটে আসিতে লাগিল—সেটি কেবল সন্ধ্যার অন্ধকার।

ইহার পরেই আবার প্রতিক্রিয়া,—মনে দৃঢ়তা আসিল; তখন ঠিক করিলাম, বৃথা ভগবান ডাকার ঢং না করিয়া এখন রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করাই উচিত। কিন্তু তত্রাচ, হায় ভগবান একি করিলে, বলিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।

তখন হঠাৎ একটি সতেজ গম্ভীর বাণী স্পষ্টই আমার কানে আসিল,—তোমার কৃতকর্ম্মে তুমি কি ভগবানকে কর্ত্তা বলিয়া মান?

আমি চমকিত হইলাম। স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম,—না, আমি তো তা মানি না। নিজকর্ম্মের কর্ত্তা নিজেকে মানি,—নিজকর্ম্ম মানি ও তাহার ফল মানি। আর ভগবানকে ব্যক্তিগত জীবচৈতন্য হইতে পৃথক সমষ্টিগত বিরাট চৈতন্য, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বলিয়াই মানি, যাহার সহিত জীবের কর্ম্মগত কোনও সম্বন্ধই নাই। এ সকল বোধ সত্ত্বেও তবে নিজকর্ম্মাধিকারে, ভাবের আবেগে ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া আকুল প্রাণে,—কোথায় আনিলে, পথ দেখাইয়া দাও ইত্যাদি প্রার্থনা কেন করিতেছি? ইহা মনুষ্যস্বভাবেরই গুণ,—বাল্যে বিপদে পড়িলে পিতামাতাকে ডাকা, আর প্রাপ্ত বয়সে বিপদে মধুসূদনকে ডাকা,—এটা জীবধর্ম্ম, যেন প্রাণের ক্রিয়ার মতই স্বাভাবিক হইয়া আছে।

চঞ্চল অবস্থায় যেটি বহু কল্পনা-প্রসবিনী মন, স্থির হইলে সেইটিই বুদ্ধি হইয়া যায়। বেশ টের পাইলাম ক্রমে মন স্বস্থানেই বুদ্ধিতত্ত্বে স্থির হইল—

আর বিপদের যত কল্পনা সবটুকুই কাটিয়া গেল। বেশ অনুভব করিলাম বিপদ ছিল কল্পনায়,—বিপদ বলিয়া এমন কি ঘটিয়াছে? আকস্মিক কারণে বুদ্ধি স্তম্ভিত হওয়ায় অসাবধানবশতঃ পথভ্রান্তি ঘটিয়াছে, তাহাতেই বিপথে জঙ্গলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। পুরুষার্থের দ্বারা এই ঘোর জঙ্গল হইতে বাহির হইবার চেষ্টাও ত হইয়াছে তবে তৎক্ষণাৎ বা সদ্য তাহার ফল পাওয়া যায় নাই, তা সকল অবস্থায় ত পুরুষার্থের ফল সদ্য পাওয়া যায় না, দেশ কাল আধার হিসাবে ফলপ্রাপ্তির যোগ বিলম্বিত হইয়া যায়। এত বড় একটা ভীষণ জঙ্গলরাজ্য উৎকট পুরুষার্থের দ্বারা এখনই পার হইয়া যাওয়া সাধারণ জীবের পক্ষে কি সম্ভব?—তাহার পর হিংস্র জন্তু, ব্যাঘ্র সর্প ও ভল্লুকাদির আক্রমণের ভয়। সে বিচার ত পড়িয়াই আছে; আমার মধ্যে হিংসা থাকিলে তবেই না তাহারা আমায় হিংসা করিবে, না হইলে ভয়ের কারণ কোথায়? তাহা ছাড়া সর্পব্যাঘ্রাদি সাক্ষাৎ এবং তাহাদের দ্বারা অনিষ্ট ত আমার কর্ম্মফলগত, তাহা এড়াইবার জো কোথায়?

এখন রাত্রি কাটাইব কিরূপে? সেরূপ বড় গাছ নাই যাহার শাখায় উঠিয়া নিরাপদে রাত্রি যাপন করিব। এদিকে অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে লাগিল। হৃদয় হইতে বিপদের গুরুভার নামিয়া গিয়াছে, কিন্তু সকল ভারটা যেন নামিয়া গিয়া জমা হইয়াছে পায়ের তলায়। পা আর তুলিতে পারি না,—কি দুঃসহ ভারী হইয়াছে।

একটা ব্যাপার বিপদাশঙ্কায় এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফাটিতেছিল, গলাও শুকাইয়া গিয়াছিল। এখন বিপদ কাটিয়া যেন তৃষ্ণা চাপিয়া ধরিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম,—এই জঙ্গলে কোথায় জল পাইব? এবার যেন আবার মরীচিকার পালা আরম্ভ হইল। ঐ যেন কুলুকুলু শব্দ, ঐ যে জল-যাইতেছে—সম্মুখেই। গিয়া দেখিলাম কোথাও কিছুই নাই। আবার যেন বাম দিক হইতে শব্দ আসিতেছে, আবার কোথাও কিছু নাই। আবার দক্ষিণে আরম্ভ হইল। এখন বোধ হইতে লাগিল কে যেন আমায় লইয়া খেলাইতেছে। কতক্ষণ ধরিয়া আবার উঠা-নামা চলিতে লাগিল। এইভাবে একবার কতকটা নামিয়া একটি ক্ষীণ জলস্রোত পাইলাম। এখন অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিয়া সুস্থ বোধ করিলাম, পরে কোমর হইতে পায়ের তলা পর্য্যন্ত জোঁকগুলি পরিষ্কার করিলাম। তারপর ধীরে ধীরে একটি উচ্চ পাষাণখণ্ডের উপর রাত্রিযাপনের সঙ্কল্প

করিয়া বসিলাম। উপরটা অসমতল ও শৈবালাকীর্ণ এবং আরও সুখের কথা এই যে, প্রায় চারিদিকেই ঘন বিছুটির জঙ্গল। মাথার কাপড়খানি পাট করিয়া পাতিয়া তাহার উপর বসিলাম। তখন অন্ধকারে চারিদিক ছাইয়াছে। আমার আসনের স্থানটুকু প্রায় একফুট চওড়া, লম্বায় কিছু
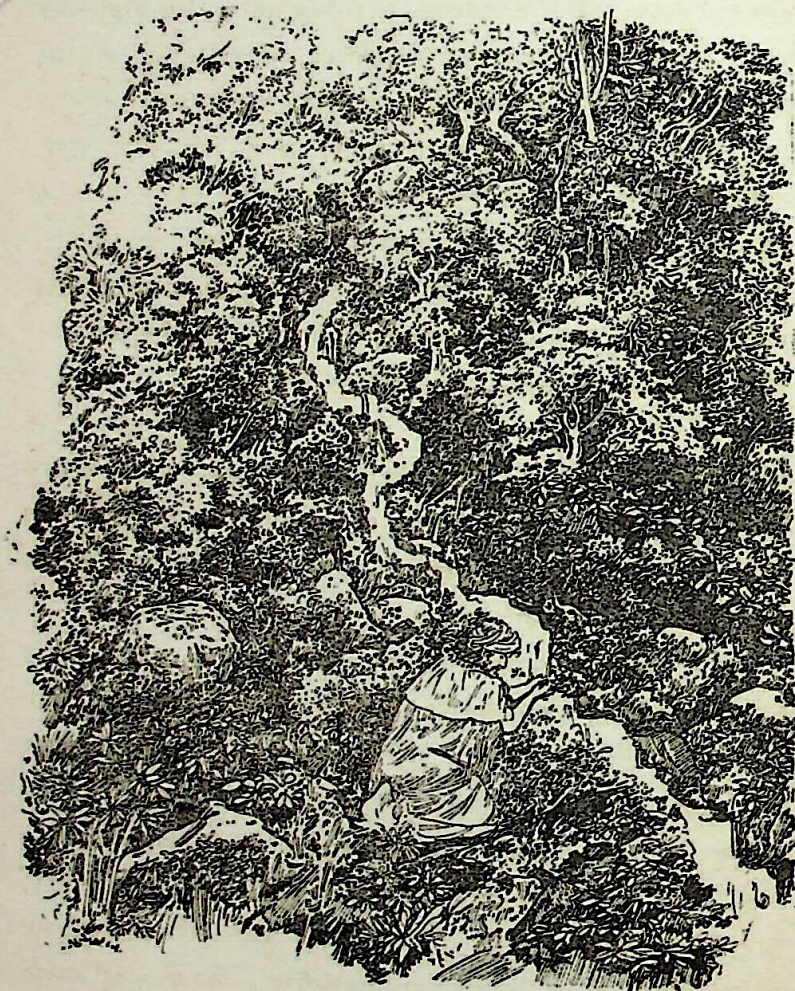
বনঝরনা

বেশী হইতে পারে। তাও আবার ঢালু এবং অসমতল। ক্রমে অভ্যাস হইয়া গেল। ঘোর তমসাচ্ছন্ন আকাশের পানে চাহিয়া দেখিলাম, ঠিক যেন আজ ভাগ্য আমার মেঘভরা ঐ আকাশের মধ্যেই নিজেকে

মিশাইয়া এক নূতনভাবে আমায় নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। আকাশের সঙ্গে অদৃষ্টের কি অপূর্ব্ব মিলন, এমনটি জীবনে আর ঘটে নাই!

ক্রমে স্থিরভাবে বসিয়া সেই বিজন জঙ্গলের নিস্তব্ধতা অনুভব করিতে করিতে তাহার মধ্যে ডুবিয়া গেলাম। বোধ হয় শেষ প্রহরে, ঘোর মেঘ-গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঠিক সেই সময়ে, দেখিতে দেখিতে তড়্‌তড়্‌ শব্দে উপর হইতে একটি বৃহৎকায় জীব আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইল। চঞ্চল না হইয়া তখন উপস্থিত বুদ্ধিমত কাপড়ের আঁচল দিয়া একটা ঝাপ্‌টা দিলাম, সেই জোর ঝাপটের শব্দে সে আবার তড়্‌তড়্‌ শব্দে উপরের জঙ্গলে উঠিয়া গেল,—এবং বিকট করুণস্বরে ডাকিয়া ডাকিয়া চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। বুঝিলাম ভীত হরিণের স্বর। কিছুক্ষণ পরে সে থামিল, আবার বৃষ্টি নামিল। প্রায় এক ঘণ্টা বর্ষণের পর মেঘমুক্ত ক্ষীণ চাঁদ উঠিল। আমি আবার স্থির আসনে উপবিষ্ট অবস্থায়—অচৈতন্য সাগরে ডুবিয়া গেলাম।

ঘোর কৃষ্ণবর্ণ জঙ্গলের মধ্যে ক্ষীণ প্রভাতের আলো জাগিতেছে, তখন নয়ন উন্মীলন করিলাম। যে আনন্দময় অবস্থায় এই রাত্রি কাটিয়াছিল তাহা আর বলিবার নহে। যখন চৈতন্য হইল, তখন অন্তরের মধ্যে এই কথাগুলি লইয়াই জাগিলাম যে, নীচের দিকে নামিয়া গেলেই পথ পাইব। আরও একটু আলো হইতেই আমি উঠিলাম।

হায় আবার সেই আকর্ষণ! যেস্থানে এত কষ্ট পাইয়া সমস্তদিন বিক্ষিপ্ত-চিত্তে শরীর ও মন লইয়া কত ছুটাছুটি ও উদ্বেগ ভোগ করিয়াছি,—রাত্রিতে থাকিবার জন্য এতটুকু অসমান শৈবালাচ্ছাদিত মলিন পাষাণখণ্ডমাত্র পাইয়াছি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি,—সেই স্থানটি ছাড়িয়া যাইতে প্রাণে বেদনা? যেন জীবনের কি এক মহারত্ন এখানে ছাড়িয়া যাইতেছি। নির্ভর ও উদ্বেগশূন্য চিত্তে বড় আনন্দে একরাত্রি কাটাইয়া স্থানটি যেন আমার হইয়া গিয়াছে। ইহার সবটুকুই মহান্, সবটুকুই পবিত্র পাষাণখণ্ডকে প্রণাম করিয়া প্রাণের মধ্যে আনন্দপ্রবাহ, শরীর ও মনে একটি শক্তির স্পন্দন লইয়া উঠিলাম। এইবার নামিতে লাগিলাম।

বনের কথা অনেক হইয়া গিয়াছে, আর তাহাতে কাজ নাই। সেই দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্য দিয়া ক্রমাগত নামিতে নামিতে প্রায় এক ঘণ্টার পর চমকিত হইয়া হঠাৎ সম্মুখেই প্রশস্ত রাজপথ দেখিলাম। আনন্দে হৃদয় পূর্ণ

হইয়া উঠিল,—গগনভেদী হরিধ্বনি করিয়া পথে উঠিলাম। পরে সেই অরণ্যধাত্রীকে রুদ্ধশ্বাসে আর একবার দেখিয়া লইলাম ;—কি জানি আর কি দেখা ঘটিবে ? হায়! সুখীডাং-এর জঙ্গল! তোমায় এ জীবনে কখনও কি ভুলিতে পারিব ?

পদতল ক্ষতবিক্ষত, একস্থানে বসিয়া পরনের কাপড় ছিঁড়িয়া তিন-চারি পাট করিয়া দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া লইলাম, তারপর চলিতে লাগিলাম,—বুঝি বিদ্যুতের মতই ছুটিতে লাগিলাম পড়াওর দিকে। হাঁটু ফুলিয়াছে, গ্রাহ্য নাই। সেখানে গিয়া শুনিলাম সঙ্গী-মহাশয় মালপত্র লইয়া আজ প্রাতে চলিয়া গিয়াছেন। টনকপুর ষ্টেশন এখান হইতে বনপথে বারো মাইলের কিছু উপর হইবে। দেখিলাম, খাবার কিছু নাই, সময়ও নাই। সেখানে একটা গোঁড়া লেবু পড়িয়া আছে। নগদ মূল্যে দু পয়সায় কিছু চিনি খরিদ করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব একপাত্র গোঁড়া-লেবুর সরবত পান করিয়া আবার রুদ্ধশ্বাসে ছুটিলাম। বারো মাইল পথ। কখন পৌছাইলে ট্রেন পাইব তাহাও জানি না।

প্রায় মাইলখানেক গিয়া একটি মুক্ত স্থান হইতে বহু দূর-দিগন্তে বিস্তৃত সমতলক্ষেত্র নয়নে পড়িল। আঃ! কি আনন্দই সেই দৃশ্যের মধ্যে ছিল! সমতলক্ষেত্রের জীব আমরা, এই দীর্ঘকাল পরে আবার সমতলক্ষেত্র নয়নে পড়িল। এক শ্রমজীবী যাইতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল,—বাবু সাহেব! ক্যা দেখ্তা ? আমি বলিলাম, ভাবর্। সমতলভূমিকে পাহাড়ীরা ভাবর্ বলে।

এবার উৎরাই। রাজপথে সোজা না গিয়া আবার বনপথে সুপরিষ্কৃত মনোহর অরণ্যের মধ্য দিয়া প্রায় চারি মাইলের মাথায় একটি খরস্রোতা তটিনী পার হইয়া আন্দাজ একটার সময় টনকপুর পৌছিলাম। সঙ্গী-মহাশয় আহারাদি সারিয়া ষ্টেশনে বসিয়াছিলেন। আমায় দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন ;—তাঁহাকে সংক্ষেপে ব্যাপারটি বলিলাম।

একখানি মাত্র ট্রেন, দুইটায় ছাড়িবে। তাড়াতাড়ি বাজার হইতে তখনকার মত ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া আসিয়া দেখি ট্রেন চলিতেছে। সঙ্গী-মহাশয় আমার মালগুলি ট্রেনে তুলিয়াছিলেন, এখন সেইগুলি নামাইয়া দিতেছিলেন। শেষ মুহূর্ত্তে যখন আমি ভগ্নপদে রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া ট্রেন ধরিলাম তখন কুলির সাহায্যে আবার সেগুলি তুলিয়া লইলেন। ট্রেনখানি তখন হুহু শব্দে ছুটিতে লাগিল।

ধৈর্য্যশীল পাঠক! আমার ভ্রমণকাহিনী শেষ হইল।

পরিশিষ্ট

এখন আমাদের আহারাদি এবং মাল লইবার জন্য বাহক কুলি প্রভৃতিতে কত খরচ হইয়াছিল তাহার হিসাব দিয়া বিদায় গ্রহণ করিব। তাহাতে বুঝিতে পারা যাইবে এ যাত্রায় আমাদের প্রত্যেকের কত খরচ লাগিয়াছিল।

আহারাদি খরচ—

কাটগুদাম হইতে আলমোড়া অবধি আমাদের প্রত্যেকের রোজ ৸৵০ আনা হিসাবে লাগিয়াছিল।

তিন দিনে—	...	২৷৵০
আলমোড়ায় দশদিন প্রতিদিন ৸৵ হিসাবে	...	৮৸০
পথের জন্য খাবার—	...	৪৲
আলমোড়া হইতে আসকোট প্রতিদিন ৸০ হিঃ—৪ দিনে—		৩৲
আসকোটে ৪ দিন রাজঅতিথি, আসকোট হইতে সাংখোলা পর্য্যন্ত অতিথি—		
খেলায় ঘৃত খরিদ পাত্রসমেত	...	২৸০
মালপা—	...	।৵০
বুদীতে—	...	।৵০
গারবিয়াংএ ১৮ দিন রুমার অতিথি—		
তাক্‌লাখারে যাত্রার পথে রসদ সঙ্গে লওয়া হয়—	...	২৲
তাক্‌লাখারে কিষণ সিংএর অতিথি ৬ দিন—		
কোদগুনাথে লামার অতিথি ১ দিন—		
কৈলাস ও মানসসরোবরের জন্য রসদ খরিদ—	...	৭॥০
ফিরিবার পথে গরিবিয়াং পর্য্যন্ত রুমার অতিথি—		
গারবিয়াং হইতে শোঁসা অতিথি—		
পাঙ্গুতে খরচ—	...	৸০
খেলার ঘৃত খরিদ	...	২৲
পরে আসকোট অবধি অতিথি—		
আসকোট হইতে পিথোরাগড় পর্য্যন্ত অতিথি—		
গুরনায়—	...	।৵০
চীড়ায় ও লোহাঘাটে	...	॥৵০
মায়াবতীতে অতিথি—		
দেউড়ীতে—	...	।০
সুখাডাংয়ে—	...	১০
টনকপুরে—	...	৷৶১০
একজনের আহারাদির সর্ব্বসুদ্ধ খরচ মোট—		৩৫৸৵০

ঘোড়া ও কুলি বাহকের খরচ, জন প্রতি—

কাটগুদাম হইতে আলমোড়া, ঘোড়া—	...	৭৲
ঐ ঐ কুলীবাহক—	...	৲
আলমোড়া হইতে আসকোট ঐ	...	৫।৵০
আসকোট হইতে ধারচুলা— গঁওসেরায়	বকশিস	।০
ধারচুলা হইতে খেলা (বাহক)	...	।০
খেলা হইতে শোঁসা (বাহক)	...	।৵০
শোঁসা হইতে গারবিয়াং—	...	৪॥০
গারবিয়াং হইতে পুরাং, ঘোড়া	...	২৲
ঐ মালবাহী ঝাব্বু	...	২৲
পুরাং হইতে কৈলাস ও মানসসরোবর ঝাব্বু—	...	৪৲
পুরাং হইতে গারবিয়াং ঘোড়া—	...	২৲
ঐ ঝাব্বু	...	২৲
গারবিয়াং হইতে শোঁসা বাহক কুলি—	...	৪॥০
পাঙ্গু হইতে খেলা—	...	৸০
খেলা হইতে ধারচুলা—	...	।৵০
ধারচুলা হইতে আসকোট—	..	১৲
আসকোট হইতে পিথোরাগড় গাঁওসেরা—	বকশিস	।০
পিথোরাগড় হইতে চম্পাওয়াৎ (লাদ্দু ঘোড়া)	...	৪॥০
চম্পাওয়াৎ হইতে টনকপুর (বাহক)—	...	১॥০
ঘোড়া ও বাহক খরচ—	...	৪৫৵০
আহারাদির খরচ—	...	৩৫৸৵০
ঐ দুইটি মিলিয়া মোট—		৮০৸৴০

ইহার সঙ্গে রেলভাড়ার খরচ ধরা হয় নাই, সেটা পৃথক। আর ওদেশে যাহা কিছু খরিদ করা হইয়াছিল—ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি, তাহাও ধরা হয় নাই, দান-খয়রাতও স্বতন্ত্র। ইহা হইতে বুঝিতে কষ্ট হইবে না যে, একজনের কৈলাস ও মানসসরোবর যাতায়াত কষ্টসাধ্য নয়, বিশেষতঃ খরচের দিক দিয়া।

॥ ইতি ॥